মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র.)
পরিবার
ও
পারিবারিক
জীবন

পরিবার ও পারিবারিক জীবন

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

খায়রুন প্রকাশনী
KHAIRUN PROKASHANI
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৯১১৯৪৪৬, ০১৭১৩-০৩৪২৩০, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭

পরিবার ও পারিবারিক জীবন
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর - ১৯৮৩
২২ প্রকাশ ঃ মার্চ - ২০১২
রবিউল সানি - ১৪৩৩
ফাল্গুন - ১৪১৮

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
খায়রুন প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
মোস্তাফা আমীনুল হুসাইন
খায়রুন প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ঃ
মোস্তাফা বশীরুল হাসান

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স, ১০-ই/এ-১, মধুবাগ,
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
মাল্টিলিংক
৬৮, ইসলাম ভবন (২য় তলা),
ফকিরাপুল, ঢাকা।

ISBN : 984-8455-13-7

মূল্য ঃ ৩৩৫.০০

Paribar O Paribarik Jiban: (Family and Familier Life) Written by Moulana Muhammad Abdur Rahim in Bangla and published by Mustafa Aminul Hussaeen of Khairun Prakashani. May. 2007

Price: TK. 335.00
US. Dollar: 5.00

গ্রন্থকারের কথা

১৯৬২ সনের কথা। ঢাকাস্থ অধুনালুপ্ত 'মজলিসে তামীরে মিল্লাত' আয়োজিত ইসলামী সেমিনারে 'ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা' পর্যায়ে ভাষণ দেয়ার জন্য আমাকে আহ্বান জানানো হয়। বক্তৃতা দিতে রাজি হয়ে আলোচ্য বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। অবশ্য পরবর্তীকালে বিশেষ কারণে সেমিনার অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় ও ভাষণ দেয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করি। কিন্তু প্রস্তাবিত আলোচনাটি আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুভূত হওয়ায় এ বিষয়ে আমার পড়াশোনা, চিন্তা-গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের কাজ অতঃপর অব্যাহত ও অবিশ্রান্তভাবে চলতে থাকে। মাঝখানে ১৯৬৪ সনের প্রায় সবকটি মাস কারাবরণ ও কারামুক্তির নিষ্কর্মতায় অতিবাহিত হয়ে যায়। অতঃপর এ পর্যায়ে সংগৃহীত বিশাল তথ্যাদি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করি এবং ১৯৬৭ সনের শেষ নাগাদ এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয়ে যায়।

গ্রন্থখানি তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এর প্রকাশনার জন্যে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে এর কোনো ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। বর্তমানে গ্রন্থখানি ঢাকাস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হতে পারছে, এজন্যে আল্লাহ তা'আলার লাখো শুকরিয়া আদায় করছি।

এ গ্রন্থে পারিবারিক জীবন, তার সুষ্ঠুতা, সুস্থতা, শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং পবিত্রতা ও মাধুর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। পারিবারিক জীবনের ভাঙন ও বিপর্যয়ের দিকগুলো বিস্তারিতভাবে প্রতিভাত করে তোলা হয়েছে এবং সর্বশেষে বর্তমান বিপর্যয়ের দিকগুলোও বিস্তারিতভাবে প্রতিভাত করে তোলা হয়েছে এবং সর্বশেষে বর্তমান বিপর্যস্ত পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর উপায় ও ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনাও পেশ করা হয়েছে। যেখানে যা কিছু বলেছি, তা আমার নিজের মত বলে যাহির করিনি বরং সংশ্লিষ্ট অকাট্য যুক্তি ও দলীল-প্রমাণে যা কিছু প্রতিভাত হয়েছে, তা-ই আমি যুক্তির ফয়সালা বলে মেনে নিয়েছি এবং তা-ই পরিবার ও পারিবারিক জীবনের জন্যে কল্যাণ মনে করেছি। এ ক্ষেত্রে যদি কেউ বিপরীত মত পোষণ করেন, তাহলে বলতে হবে, সে বৈপরীত্য আমার মতের সঙ্গে নয়, তা একান্তই যুক্তি-প্রমাণ ও অকাট্য দলীলের সাথে। তাই আমার উপস্থাপিত যুক্তি ও দলীল-প্রমাণের কোনরূপ দুর্বলতা কিংবা অসামঞ্জস্যতা কেউ দেখাতে চাইলে তা সাদরে গৃহীত এবং যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এ গ্রন্থ পাঠে কারো কোনো উপকার হলে এবং এর আলোকে পারিবারিক জীবনে পুনর্গঠন প্রচেষ্টা চালানোর ফলে কোনো কল্যাণ সাধিত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

—গ্রন্থকার

মোস্তাফা মনযিল
১৭৩, নাখালপাড়া,
তেজগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ।

নভেম্বর ১৯৮৩

প্রসঙ্গ কথা

পরিবার মানব সমাজের মৌল ভিত্তি। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। যদি পারিবারিক জীবন অসুস্থ ও নড়বড়ে হয়, তাতে ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ কারণে সমাজ-বিজ্ঞানীরা পারিবারিক জীবনের সুস্থতা ও সুষ্ঠুতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন সভ্যতার উষাকাল থেকেই। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত এই সুস্থতা ও সুষ্ঠুতা আসবে কিভাবে? এ-ব্যাপারে সমাজ-বিজ্ঞানীরা কোনো যুক্তিযুক্ত, সুসংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ নির্দেশনা দিতে পারেন নি। ফলে সুখী-সুন্দর পরিবার ও পারিবারিক জীবন গঠনের স্বপ্ন কার্যত স্বপ্নই থেকে গেছে বিশ্বের মানব সমাজের এক বিশাল অংশে।
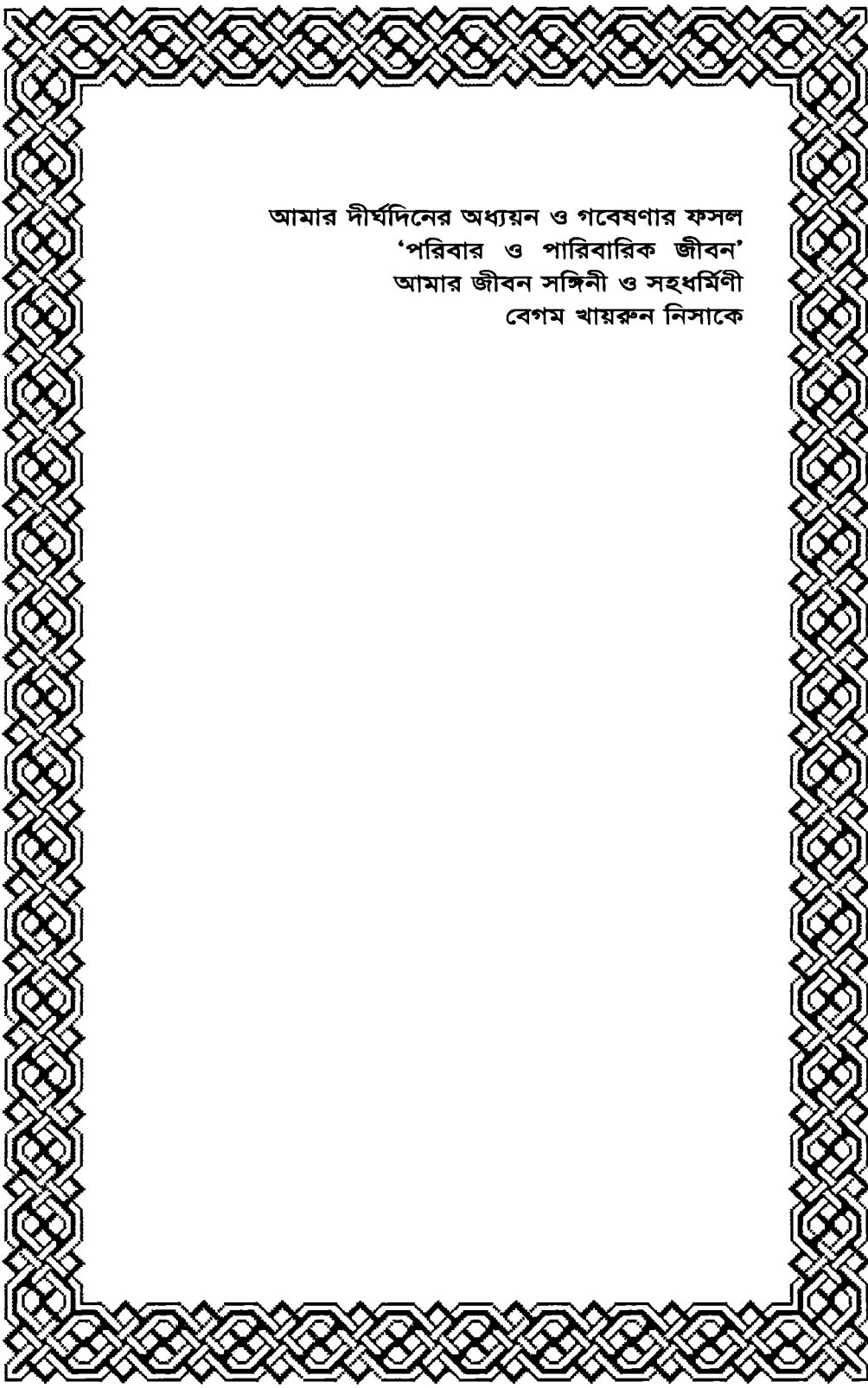
ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র কল্যাণময় জীবন বিধান। জীবনের অন্য সকল দিকের ন্যায় পরিবার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। একটি পুরুষ ও একটি নারী কিভাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করবে, তাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বিসম্বাদ দেখা দিলে কিভাবে তার নিষ্পত্তি করবে ইত্যাকার সকল বিষয়েই ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। দুর্ভাগ্যবশত ইসলামের সেই নির্দেশনা যথাযথ অনুসৃত না হওয়ায় আজ বিশ্বের মুসলিম সমাজই ভুগছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে। আর সে ব্যাধির প্রকোপে দিশেহারা হয়ে তারা এর নিরাময় খুঁজছে অধিকতর ব্যাধিগ্রস্থ পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থার কাছে।

বর্তমান শতকের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) মুসলিম সমাজের এই দুর্নীতি অবলোকন করে 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন' সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন ষাট দশকের গোড়ার দিকে। তারপর দীর্ঘ কয়েক বছরের অক্লান্ত সাধনা ও অশেষ পরিশ্রমের ফসল রূপে আলোচ্য গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয় ১৯৬৭ সালে। এই গ্রন্থে তিনি পরিবার গঠনের অপরিহার্যতা, নর-নারী সম্পর্কের ভিত্তি, যৌন-জীবনের সীমা ও স্বাধীনতা, নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা ইত্যাকার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিই শুধু বিশদভাবে তুলে ধরেননি, পরিবার ও পারিবারিক জীবনে ভাঙন ও বিপর্যয়ের কারণগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করার বৈজ্ঞানিক পন্থাও নির্দেশ করেছেন। এ দিক থেকে ইসলামী সাহিত্যে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এক অমূল্য সংযোজন।

১৯৮৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সৌজন্যে গ্রন্থটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করলে দেশের সুধী পাঠক মহলে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বামপন্থী মহল গ্রন্থটি ও তার প্রকাশনা সংস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক সমালোচনার ঝড় তোলে। এর পরিণতিতে প্রকাশনা সংস্থা বাজার থেকে গ্রন্থটি প্রত্যাহার করে নেন। অবশ্য তার আগেই গ্রন্থটির প্রায় সমুদয় কপি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সুধী পাঠক মহলে এর চাহিদাও অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। অবশ্য নানা কারণে গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ বিলম্বিত হয়। এর পর ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে নতুন অঙ্গসজ্জাসহ গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং পূর্বের মতই পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদর লাভ করে। এরপর উন্নত মুদ্রণ পারিপাট্যসহ গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ সুধী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই অনন্য ইসলামী খেদমতের বিনিময়ে গ্রন্থকারকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন, এই প্রার্থনা করি।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
চেয়ারম্যান
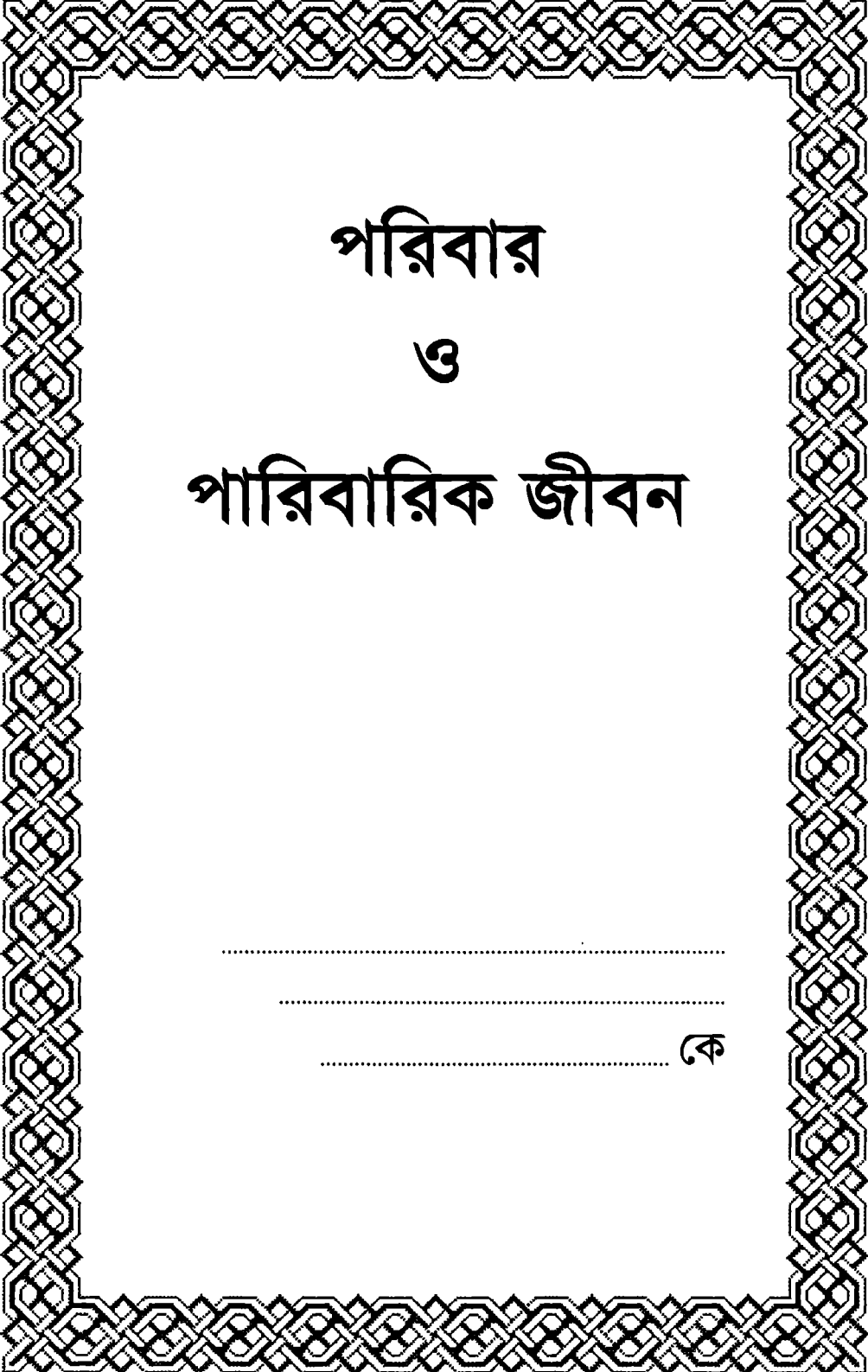
মওলানা আবদুর রহীম ফাউন্ডেশন
২০৮ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ৯১১৯৪৪৬

আমার দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল
'পরিবার ও পারিবারিক জীবন'
আমার জীবন সঙ্গিনী ও সহধর্মিণী
বেগম খায়রুন নিসাকে

আজ আমাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত। অথচ মুসলিমদের পরিবার ছিল এক-একটি দুর্গ। আর পারিবারিক জীবন পবিত্র প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা এবং পরম শান্তি ও স্বস্তির কেন্দ্রবিন্দু; সে শুভ ও কল্যাণময় অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং সুষ্ঠু পরিবার ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত।

—মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)

পরিবার
ও
পারিবারিক জীবন
কে

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

বর্তমান দুনিয়ার লোকসংখ্যা কত ?...পাঁচ শত কোটিরও বেশি! কিন্তু এত মানুষ দুনিয়ায় কোত্থেকে এল ? তারা কি আসমান থেকে টপকে পড়েছে, না জমিন ভেদ করে উঠে এসেছে কিংবা দুনিয়ায় জন্তু-জানোয়াররা একে একে মানবাকৃতি ধারণ করে অথবা কোনো এক সময় মানব শিশুর জন্ম দিয়ে মানুষের সংখ্যা এত বিপুল করে দিয়েছে ?......সকলেই স্বীকার করবেন যে, এর কোনোটিই হয়নি।

এ সংখ্যা বৃদ্ধি কি হঠাৎ করেই ঘটেছে ?......তা-ও তো নয়! দুনিয়ার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি একটা ক্রমিক পদ্ধতিতে হয়ে আসছে এবং হচ্ছে। যেমন বলা যায়, আজকের এ সংখ্যাটি বিগত বছরের এ দিনটিতে নিশ্চয়ই ছিল না।[১]

আজ থেকে একশ', দুশ', চারশ', পাঁচশ', হাজার, দেড় হাজার, দু'হাজার, চার হাজার বছর পূর্বে লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই আজকের তুলনায় অনেক-অনেক কম ছিল। তাহলে যতই দিন যাচ্ছে— কালের অগ্রগতি হচ্ছে, ততই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অমোঘ গতিতে। আর যতই পিছনের দিকে যাওয়া যায়, লোকসংখ্যা ততই কম ছিল বলে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হয়। এ এমন অকাট্য সত্য যা অস্বীকার করার সাধ্য কারোরই নেই।

তাহলে লোকসংখ্যার এ ক্রমবৃদ্ধি কি করে সম্ভব হলো,— সম্ভব হচ্ছে ? ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে কত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-অর্থনীতিবিদ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য কতই না যুক্তি-পরামর্শ-প্রস্তাবনা পেশ করেছে আর কত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তি ও সরকারই না সে মন্ত্রকে অকাট্য সত্য মনে করে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগে জনসংখ্যা প্রতিরোধের কার্যকর (?) পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেজন্যে আবিষ্কৃত কতই না প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়েছে, কত মানুষই না নিজেদের সদ্যোজাত সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করেছে, কত সহস্র লক্ষকে ভ্রূণ হওয়ার পর কিংবা তার পূর্বে সংহার করেছে অমানুষিক নির্মমতা সহকারে— তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য, এত সব উপায় অবলম্বন সত্ত্বেও জনসংখ্যা কোনো বিন্দুতে প্রতিরুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে দ্রুতগতিতে বাঁধভাঙ্গা বন্যার পানির ন্যায় বৃদ্ধিই পেয়ে গেছে ও যাচ্ছে। হাজার রকমের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া— রাজা-মায়া-ওভাকন-ভেসেকটমি-লাইগেশন একদিকে এবং অপরদিকে আণবিক বোমা, নাপাম বোমার ফলে ব্যাপক নরহত্যা সম্পন্ন করা হয়েছে— যে সম্পূর্ণ ও নির্লজ্জভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে, কোনোক্রমেই তার ক্রমবৃদ্ধি রোধ করা যায় নি বা যাচ্ছে না, তার কারণ কি ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তার একটা কারণ আছে এবং সে কারণটি এতই প্রবল যে, দুনিয়ায় মানুষ যদ্দিন থাকবে, তদ্দিন সে কারণটিও অপ্রতিরোধ্য হয়ে থাকবে। পরিভাষায় তাকে বলা হয় মানবীয় جبلة — দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি ও মেজাজ বা Nature। মানুষের প্রকৃতি সন্তান জন্মদান, সন্তানের মা বা বাবা হওয়ার প্রচণ্ড আকুলতা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। মানব বংশের ধারা এই প্রকৃতির বলেই স্থায়ী হয় ও অব্যাহত ধারায় সম্মুখের দিকেই চলতে থাকে। আর সে জন্যে স্রষ্টা প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন ও করছেন মানব প্রকৃতি নিহিত যৌন আসক্তি, প্রবৃত্তি ও যৌনাঙ্গকে। মানুষ দুভাগে

---

১. বানের পানির মতই বাড়ছে মানুষ— কোনভাবেই যেন এই বান বাঁধ মানে না। আমেরিকান আদমশুমারী ব্যুরোর হিসাব মতে গত বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮ কোটি ২০ লক্ষ। আর গত এক দশকে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় একশ' কোটি। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা সেপ্টেম্বর-১৯৮৩)

বিভক্ত— পুরুষ ও নারী। উভয়ই জন্মগতভাবে নিজ নিজ যৌন আসক্তি, প্রবৃত্তি এবং মানসিক প্রবণতা চরিতার্থ করার উপযোগী হাতিয়ার নিয়েই ভূমিষ্ট হয় মায়ের গর্ভ থেকে। এ হাতিয়ারের প্রয়োগে যথাসময়ে উদ্যোগী হওয়া মানুষের— পুরুষ ও নারীর উভয়েরই— অতীব স্বাভাবিক তাড়না। এ তাড়নার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় প্রত্যেকটি মানুষ। তা না করা পর্যন্ত মানুষের স্বস্তি লাভ বা স্বাভাবিক (Normal) থাকা কখনই সম্ভব হতে পারে না। তাই যৌনতা মানব সমাজে একটা বিরাট কৌতূহলোদ্দীপক, আকর্ষণীয়, আলোচ্য ও চিন্তা-গবেষণার বিষয় হয়ে রয়েছে প্রথম মানব সৃষ্টির সময় থেকেই। আর সেই সাথে একে কেন্দ্র করে কতগুলো মৌলিক জটিল দার্শনিক প্রশ্নও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেরই মনে। সেই দার্শনিক প্রশ্নকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে কত-না মতবাদ ও দর্শন! এই পর্যায়ে উত্থিত প্রশ্নগুলো সংক্ষেপে এই ঃ

(ক) Sex বা যৌনতার প্রকৃত নিগূঢ় তত্ত্ব (Reality) কি ?

(খ) মানব শিশুর মধ্যে যৌন আবেগ কি অনাদিকাল থেকেই সংরক্ষিত রাখা হয়েছে ?— যদি তা-ই হয়, তাহলে তার ক্রমবিবর্তন কি করে ঘটে ? আর যদি তা না-ই হয়ে থাকে, তাহলে যৌন চেতনা বা আবেগ কি সমস্ত যৌন দাবি সম্পর্কে ব্যক্তিকে অবহিত ও সচেতন বানায় ?

(গ) পরিবেশ, প্রেক্ষিত ও জীবনের সাথে যৌনতার সম্পর্ক কি ?

পাশ্চাত্য সমাজের চিন্তাবিদরা মনে করে, যৌন আবেগ চরিতার্থতার পথে সামান্য প্রতিবন্ধকতাও ব্যক্তির মনে প্রবল অনুসন্ধিৎসা (Curiosity) জাগিয়ে দেয়। সে কৌতূহল চরিতার্থ হতে না পারলে এর-ই ফলে মানসিক অস্বাভাবিকতার (Abnormalities) সৃষ্টি হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের এ মত কতটা যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য ?

প্রশ্নগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই। বর্তমান নাস্তিকতাবাদী বিশ্ব সভ্যতার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে এসব প্রশ্নের বিশদ জবাব আলোচিত হওয়া একান্তই আবশ্যক। এ পর্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার খুবই প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন' গ্রন্থে সবিস্তারে যে মূল তত্ত্বটি উপস্থাপিত করা হয়েছে, বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনা তারই 'মুখবন্ধ' হিসেবে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করছি।

উপরে যে প্রশ্নগুলোর উল্লেখ করেছি, আগেই বলেছি, পাশ্চাত্য সমাজ-দর্শনে সেগুলো বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কেননা পাশ্চাত্যের মানুষ যখন স্বাভাবিক পথ হারিয়ে ফেলেছে, তখন 'শয়তানে রাজীম' তাদের আগে আগে আলোকবর্তিকা লয়ে অগ্রসর হতে হতে নানা দার্শনিক মতের আলোকস্তম্ভ গড়ে তুলেছে। যে ভুলই তারা করেছে, যেখানেই তাদের বিচ্যুতি বা পদস্খলন ঘটেছে, তাকে সঙ্গত ও বৈধ প্রমাণের জন্য সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে। ফলে তারা জীবনের প্রতিটি বিভাগের পুনর্গঠন করেছে এমন এক একটি মতাদর্শের ভিত্তিতে যার সাথে গভীর সূক্ষ্ম চিন্তা-গবেষণা সম্পৃক্ত রয়েছে। পাশ্চাত্যের উপস্থাপিত বিশ্ব সভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে বস্তুবাদী দর্শন (Materialism), সমাজ বিপ্লব মতাদর্শ (Social Evolution Theory), ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Material Conception of History), নৈতিকতার সুবিধাবাদী মতবাদ (Utilitarianism) এবং যৌন দর্শন (Theory of sex) প্রভৃতি। এ যেন এক একটি বিষবৃক্ষ! পাশ্চাত্য সভ্যতার পংকিলতার বিষক্রিয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রত্যেকটি বিষবৃক্ষেরই মূলোৎপাটন একান্তই অপরিহার্য। সেগুলোর শুধু মূলোৎপাটনের একতরফা কাজই যথেষ্ট নয়; সাথে সাথে তার বিকল্প পূর্ণাঙ্গ সমাজ-দর্শন পেশ করার দায়িত্বও অবশ্যই স্বীকার্য করতে হবে। ইতিবাচকভাবে ইসলামের যৌন দর্শনের ভিত্তি রচনার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতসমূহকে কেন্দ্র করেই আমরা চিন্তা-গবেষণার সূচনা করতে চাই ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً - (النساء : ١)

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রব্বকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে, তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর জুড়িকে এবং সেই দুইজন থেকেই (বিশ্বময়) ছড়িয়ে দিয়েছেন বিপুল পুরুষ ও নারী।

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ - (الشورى : ١١)

তিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও তাদেরই স্বজাতীয় জুড়ি বানিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ - (البقرة : ٢٢٣)

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্যে ক্ষেতস্বরূপ।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا - (الاعراف : ١٨٩)

তিনিই আল্লাহ তিনিই তোমাদিগকে একজন মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই স্বজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার কাছে পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে।

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ - (البقرة : ١٨٧)

স্ত্রীরা তোমাদের পোশাকস্বরূপ, আর তোমরা ভূষণ হচ্ছ তাদের জন্যে।

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً - (الروم : ٢١)

তোমাদের জন্যে তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য থেকে জুড়ি সৃষ্টি করেছেন, যেন তারা তাদের কাছে পরম শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পারে এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও দয়া অনুকম্পাও জাগিয়ে দিয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا - (الفرقان : ٥٤)

এবং তিনিই আল্লাহ, যিনি পানির উপাদান দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পরে মানুষকে বংশ ও শ্বশুর সম্পর্ক জাতরূপে ধারাবাহিক বানিয়ে দিয়েছেন।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (الحجرت : ١٣)

হে মানুষ! আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদের সজ্জিত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্ররূপে, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার।

উদ্ধৃত প্রথম আয়াতটি প্রমাণ করেছে যে, মানবতার জয়যাত্রা এ পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল একজন মাত্র মানুষ দিয়ে। পরে তারই অংশ থেকে তার জুড়ি (স্ত্রী) সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর এ দু'জনের পারস্পরিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলশ্রুতি হিসেবেই দুনিয়ায় এত অসংখ্য পুরুষ ও নারীর অস্তিত্ব লাভ সম্ভবপর হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, বংশ বা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি একটি অপ্রতিরোধ্য স্বাভাবিক প্রবণতা।

দ্বিতীয় আয়াতটি জানাচ্ছে যে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বা যৌনতার (sex) স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি ও বংশধারার স্থায়িত্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতেরই অধিক ব্যাখ্যা দান করেছে তৃতীয় আয়াতটি। বলছে, স্ত্রীলোক মানব বংশের উৎসস্থল। ক্ষেত বা খামার এবং তাতে চাষাবাদ ও বীজ বপনের লক্ষ্য হচ্ছে ফসল উৎপাদন, বিশেষ একটি ফসলের বংশ বৃদ্ধি ও বংশের ধারা রক্ষা। অনুরূপভাবে স্ত্রীলোকেরা মানব বংশ ফসলের জন্য ক্ষেত-খামার বিশেষ। মানুষ-ফসল কেবলমাত্র স্ত্রী-ক্ষেত থেকেই লাভ করা যেতে পারে। অন্য কোথাও থেকে তা পাওয়ার উপাই নেই। এসব কয়টি আয়াতই এক সাথে উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দুই লিঙ্গে বিভক্ত এবং এই বিভক্তি কিছুমাত্র উদ্দেশ্যহীন নয়। আর সে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বিস্তার সাধন।

কিন্তু উদ্ভিদ ও জীব জগতে প্রজাতি রক্ষার জন্যে সে স্বভাবগত আবেগ সংরক্ষিত, তার তুলনায় মানবীয় যৌন তাকীদের (urge) সাথে বংশ রক্ষা ছাড়া আরও অনেকগুলো দিক এমন সংশ্লিষ্ট রয়েছে যা জীবনের ও দুটি পর্যায়ে (উদ্ভিদ ও জীবজন্তু) সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। উদ্ভিদ ও জীব জগতে পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন মিলনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বংশ রক্ষা। কিন্তু মানুষের দুই লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক যৌন মিলনের উক্ত নিম্নতম লক্ষ্যকে অতিক্রম করে অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছে। ৪ ও ৫ নম্বরে উদ্ধৃত আয়াতদ্বয় মানবীয় যৌন আবেগের ভিন্নতর এক দাবির দিকে ইঙ্গিত করছে। আর তা হচ্ছে, যৌন সম্পর্ক স্থাপনে শান্তি-স্বস্তি-পরিতৃপ্তি লাভ। নিছক দেহকেন্দ্রিক (Biological) শান্তি-স্বস্তি তৃপ্তি নয়। তা তো নিম্ন শ্রেণীর ইতর প্রাণীকুলের যৌন সম্পর্ক স্থাপনেও থাকে বা আছে। বরং সে শান্তি-স্বস্তি-পরিতৃপ্তি অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর-সূক্ষ্ম মানসিক ও আবেগগত ব্যাপার। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে সংঘবদ্ধতা সাহচর্য-সহৃদয়তা-সহানুভূতি-অনুকম্পার উদগ্র পিপাসা নিহিত, উক্ত পরিতৃপ্তি শান্তি-স্বস্তি তাঁরই জবাব, তারই পরিপূরক। এক্ষেত্রে পুরুষ যেমন বিশেষভাবে নারীর মুখাপেক্ষী, সেই পুরুষের প্রতি নারীর মুখাপেক্ষিতাও কিছুমাত্র সামান্য নয়। তবে পুরুষের মুখাপেক্ষিতা অধিক তীব্র। সম্ভবত সেই কারণেই কুরআনে উদ্ধৃত আয়াতসমূহে পুরুষকে বলা হয়েছে স্ত্রীর নিকট কাঙ্খিত শান্তি-স্বস্তি-তৃপ্তি লাভের কথা। এর বাস্তব কারণ রয়েছে বিশ্ব প্রকৃতিই পুরুষদের স্কন্ধে যে সব কঠিন ও দুর্বহ দায়িত্ব কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, তা হৃদয়াবেগে যে তীব্রতা, মন-মানসিকতায় যে অস্থিরতা এবং অনুভূতিতে যে প্রচণ্ডতা উন্মত্ততার সৃষ্টি করতে থাকে অবিরামভাবে, তদ্দরুন পুরুষ জীবনের গোটা পরিমণ্ডলকেই সাংঘাতিকভাবে প্রভাবান্বিত ও উদ্বেলিত করে। পুরুষ জীবন সংগ্রামে 'লৌহ প্রকৃতির প্রদর্শন করার পর প্রেম-ভালোবাসার কুসুমাকীর্ণ কাননে রূপ-পিয়াসী মুক্ত বিহঙ্গ হওয়ার জন্যে বিপরীত লিঙ্গের নিকট ঐকান্তিকভাবে নিবেদিত-উৎসর্গিত হওয়ার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। এটা মানব স্বভাবের অমোঘ অনস্বীকার্য দাবি। পুরুষ জীবনের 'ঊষর-ধূসর মরুভূমি'তে লু-হাওয়ার চপেটাঘাত খেয়ে খেয়ে উত্তম জীবন অর্ধাংশের বুকে শীতল মধুর পানীয় পান করে তার স্বভাবের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে উদগ্র হয়ে ওঠে।

শান্তি-স্বস্তি-পরিতৃপ্তি লাভের এ উদগ্র কামনা স্থায়ী বন্ধনজনিত সাহচর্যের আকাংক্ষী, শুধু সাহচর্যই তো নয়, তার জন্যে প্রয়োজন প্রেম ভালোবাসাপূর্ণ সংস্পর্শ, সাহচর্যের কুসুমাস্তীর্ণ শয্যা। ৫ নম্বর আয়াত বলছে, উভয় লিঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক ও আগ্রহপূর্ণ হতে হবে। এমন সম্পর্ক দুজনের মধ্যে থাকতে হবে, যার ফলে উভয়ই উভয়ের জন্যে সর্বদিক দিয়ে পরিপূরক হতে পারবে। একজনের অসম্পূর্ণতা অন্য জনে পূরণ করবে, অন্য জন সে একজনকে কানায়-কানায় পূর্ণ করে তুলবে। উভয়ের মধ্যে থাকবে এক স্থায়ী নৈকট্য, একমুখিতা, একাত্মতা। উভয়ের মধ্যে স্থাপিত হবে এক পরম গভীর নিবিড় সৌহৃদ্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক। মানুষকে দুই লিঙ্গে বিভক্ত করে সৃষ্টি করার মূলে যে রহস্য, তা এখানেই নিহিত।

৬ নম্বর আয়াতটি এ সত্যকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলেছে। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি-তৃপ্তি-স্বস্তি লাভের জন্যে দাবি হচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা-দয়ার্দ্রতা-কল্যাণ কামনা ও পরম বিশ্বস্ততা-নির্ভরযোগ্যতার সুদৃঢ় বন্ধন গড়ে ওঠা।

৭ ও ৮ নম্বর আয়াতদ্বয় আমাদেরকে আরও সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানব প্রজাতি সংরক্ষণের জন্যে অন্যান্য উপায়-পন্থার পরিবর্তে প্রকৃতি যদি যৌনতার (sex) পথকেই অবলম্বন করে থাকে, যদি উভয় লিঙ্গের মধ্যে এক পরম আবেগপূর্ণ ও মানসিক শান্তি-স্বস্তি-তৃপ্তির পিপাসার সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে স্থায়ী অব্যাহত সম্পর্ক স্থাপনের কারণ বা উদ্বোধক সৃষ্টি করে দিয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে, তার চরম লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি ও ব্যক্তিতে দাদা-নানা-শ্বশুর-শাশুড়ীর আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠবে এবং যে ব্যক্তি-মানুষই জন্মগ্রহণ করবে তার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সে অসংখ্য প্রকারের আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে জড়িত পাবে, যেন তার ফলে মানুষের সামষ্টিক জীবন, সুসংবদ্ধ জীবন, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক জীবন গড়ে উঠতে পারে এবং নৈরাজ্যের পরিবর্তে জীবন-পথের পথিকরা সুসংগঠিত এক-একটি কাফেলারূপে অগ্রগতি ও বিকাশের দিকে অগ্রসর হতে পারে। ৭ নম্বরের আয়াতে দাদা ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্পর্ক সৃষ্টির যে অসাধারণ কল্যাণের কথা ইঙ্গিতের মধ্যে আবৃত করে দেয়া হয়েছে, ৮ নম্বর আয়াত সেই কথাটিকেই অধিকতর ব্যক্ত ও প্রাঞ্জল করে দিয়েছে। বলে দিয়েছে যে, প্রকৃতিই এ আত্মীয়তার যৌগিকতার দ্বারা এক-একটা সুসংবদ্ধ পরিবার গড়ে তুলতে ইচ্ছুক। এ পরিবারসমূহের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে গোত্র বা সমাজ এবং এই সমাজই রূপান্তরিত হবে এক-একটি বৃহত্তম জাতিতে। তা মানবতার এ কাফেলাকে সুসভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

এ বিশ্লেষণ থেকে আমাদের সামনে একটি অতিবড় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ইসলামী যৌন-দর্শনের এ মহাসত্যকে কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, যৌন আবেগ মানুষের সাথে মানুষকে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ আবেগ থেকেই কত শত আবেগ অনুভূতির উপধারা প্রবাহিত হয়, তা গুণেও শেষ করা সম্ভব নয়। এ ধারা যদি কখনও শুষ্ক হয়ে যায়, তা হলে মানবতার ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশাল ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে মূল্যহীন হয়ে যাবে। নৈকট্য, একাত্মতা, ভালোবাসা, বন্ধুত্বের কত যে অগণিত শাখা-প্রশাখা সে বৃক্ষমূল থেকে নির্গত হয়, তার কোনো শেষ নেই; কিন্তু এখানে যৌনতাই একমাত্র জিনিস, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা মানুষের বুকে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার আরও অনেক নদী-খালের প্রবাহ চলে, যেগুলোর উৎস যৌনতা (sex) থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর। যৌনতার সাথে তার কোনো সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাছাড়াও মানুষের জন্যে অসংখ্য প্রেরণা উৎস রয়েছে, যা হয়ত সহসাই মানুষের চোখে পড়ে না।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে যৌন আবেগের গুরুত্ব কতখানি, তা উপরিউক্ত বিশ্লেষণে প্রকাশমান হয়েছে। অতএব এ আবেগের পূর্ণমাত্রার চরিতার্থতার জন্যে সুষ্ঠু-বিশুদ্ধ-পবিত্র প্রবাহপথ অবাধ ও উন্মুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায়, এই প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে গেলে এ উৎস থেকেই মানব সমাজের যে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে, তা অত্যন্ত মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক পথে প্রবাহিত হতে থাকবে। সেই সাথে মানবীয় মহান মূল্যমানের আরও যে সব গুরুত্বপূর্ণ অংশ বইয়ে নিয়ে যাবে, তা জানা ও চিহ্নিত করাও হয়ত সম্ভব হবে না। যৌন আবেগের স্বভাবসম্মত প্রবাহ পথ উন্মুক্ত করে না দিলে তার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে মানসিক বিপর্যয়ের (Mental disorders) সৃষ্টি হবে এবং গোটা সমাজ সংস্থা ভেঙ্গে পড়বে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাও, তাতে সন্দেহের অবকাশ খুব সামান্যই থাকতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা কোনোক্রমেই মনে করা যেতে পারে না যে, মানবীয় যৌন আবেগের প্রবাহিত হওয়ার সঠিক পথ তাই হতে পারে, যা জীব-জন্তু ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি দেহতাত্ত্বিক বা দেহগত দাবি পূরণের জন্যে রাখা হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে দেহগত তাগিদ-দাবিকে অসংখ্য আবেগ ও নৈতিক দাবিসমূহের সংমিশ্রণে একত্রিত করে প্রকৃত সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এখানে নৈরাজ্যের কোনো অবকাশ নেই, নেই নির্বিচার প্লাবনের ন্যায়

অন্ধভাবে প্রবাহিত হওয়ারও কোনো সুযোগ। তাকে অবশ্যই সুনিশ্চিত ও সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত নালার (Channel) মধ্যে প্রবাহিত হতে হবে। ইসলাম এ কারণেই সে প্রবাহকে বৈরাগ্যবাদ ও ব্রহ্মচর্য বা কুমারিত্ব দ্বারা শুকিয়ে ফেলার চেষ্টার প্রতি তীব্র অসম্মতি ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু সেই সাথে অপরদিকে তার সর্বপ্লাবী সয়লাব হয়ে প্রবাহিত হওয়ারও কোনো অনুমতিই দেয়নি, কোনো সুযোগ বা অবকাশই রাখা হয়নি তার। বরং তার সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত অথচ অবাধ প্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্যে বিবাহের 'চ্যানেল'কে কার্যকর করে তুলেছে। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে 'বিয়ে'ই হচ্ছে যৌন আবেগ প্রবাহিত হওয়ার স্বভাবসম্মত সুষ্ঠু ও পরিমার্জিত উন্মুক্ত পথ। আবেগের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ও মানব প্রকৃতি নিহিত সমস্ত দাবি ও প্রবণতার সম্পূর্ণরূপে ও এক সাথে চরিতার্থ হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে তাতে। 'বিয়ে' মানব প্রজাতি রক্ষার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। উভয় লিঙ্গের আবেগ নিহিত ও আনুভূতিক শান্তি-তৃপ্তি-স্বস্তিরও কার্যকর ব্যবস্থা তাই, তাতে প্রেম-ভালোবাসা, দয়া-সহানুভূতি- প্রীতি-বাৎসল্যের স্থায়ী বন্ধনও কায়েম হয়ে যায়। দাদা-শ্বশুর পর্যায়ের আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবার, বংশ-গোত্র ও জাতীয় অস্তিত্ব গড়ে তোলাও তারই মাধ্যমে সম্ভব। আর এরই সাহায্যে একটা সুস্থ-নিষ্কলুষ সামাজিক জীবন প্রাসাদ নির্মাণ করা যায়। পক্ষান্তরে যিনা-ব্যভিচার প্রজাতি রক্ষার পাশবিক পন্থা হয়তো হতে পারে এবং তাছাড়া দেহগত চাহিদা পূরণ হয়ে যাওয়াও সম্ভব। কিন্তু মানব প্রকৃতির পরবর্তী ও অন্যান্য দাবি— প্রবণতা যা যৌন আবেগের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে— পূরণ হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। কেননা যিনা-ব্যভিচার পরিবার ও সমাজ-জীবনকে মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। বস্তুত বিয়ে সুষ্ঠু-সুসংবদ্ধ সমাজ জীবনের পবিত্র প্রশস্ত রাজপথ। আর যিনা নৈরাজ্যের সর্বধ্বংসী উচ্ছৃঙ্খলতা ও পংকিলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কোনো সমাজে 'বিয়ে'র স্বাভাবিক পথে যদি নানারূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়, তাহলে তথায় যৌন আবেগ অনিবার্যভাবে ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করবেই। আর এ আবেগটি যদি একবার তার নিয়ন্ত্রিত পথ অতিক্রম করে দু'কূল ছাপিয়ে অন্ধভাবে বইতে শুরু করে দেয়, তাহলে ক্রমশ 'বিয়ে'র বাধ্যবাধকতাকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। এ কারণে ইসলাম বিয়েকে যেমন বাধ্যতামূলক করেছে তেমনি তার সমাজে এ কাজকে সহজতর এবং ব্যভিচারকে অসম্ভব বানানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে।

মনে রাখতে হবে, মানুষের যৌন আবেগকে অবদমন ও প্রতিরুদ্ধ করা একদিকে, আর অপরদিকে তাকে স্বভাবসম্মত ও নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ চ্যানেলের দু'কূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হতে দেয়া অন্যদিকে— এ দু'টি ব্যাপারই ব্যক্তিজীবনে ও সমাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সর্বাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার বৈধ পথে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করা হলেও তা ব্যক্তির মানসিক বিপর্যয় (Mental Disorder) এবং সামাজিক ব্যাপক ভাঙ্গন নিয়ে আসবেই। আর তাকে যদি নির্বিচার প্লাবন হয়ে প্রবাহিত হতে দেয়া হয়, তাহলেও এ আবেগ একদিকে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতাকে এবং অপর দিকে সমাজের নৈতিক পবিত্রতাকে একেবারে বরবাদ করে দেবে— ইসলাম এ সত্যকে নৈতিক প্রশিক্ষণ ও আইনের শাসন ব্যবস্থায় চমৎকার ও পুরাপুরিভাবে সম্মুখে রেখেছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য সহকারে।

বাচ্চাদের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তি জন্মগতভাবেই বর্তমান থাকে, যেমন থাকে অন্যান্য প্রবৃত্তিও। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে তাকে যা কিছু নিয়ে গড়ে উঠতে হবে তার সব কিছুরই মৌলিক ভাবধারা তার মধ্যে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত থাকে। এমন কি যুক্তিবিদ্যা ও গাণিতিক জ্ঞানের বীজও প্রকৃতিই বপন করে তার মধ্যে। যৌন আবেগ একটা আবেগই, কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, বাচ্চা জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কি তার যৌন আবেগ কাজ করতে শুরু করে দেয়? পাশ্চাত্য দার্শনিক-বিজ্ঞানীরা— বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় চিন্তাবিদরা এ প্রশ্নের জবাবে দাবি করেছেন যে, হ্যাঁ, বাচ্চার যৌন আবেগ জন্মের সাথে সাথে ও তাৎক্ষণিকভাবেই কাজ করে শুরু করে দেয়। কিন্তু এ পর্যায়ে যে সব সাক্ষ্য প্রমাণের উল্লেখ তারা

করেছে, তা যেমন নিছক অনুমান মাত্র, তেমনি নিতান্তই গোজামিলের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, বলতে হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মা'র স্তন চোষণে— ফ্রয়েডীয় চিন্তাবিদের মতে— শিশুর যৌন আবেগের তৃপ্তি-স্বস্তি সাধিত হয়। আর তা থেকেই সে প্রথম খাদ্য বা প্রাথমিক উত্তেজনা লাভ করে। প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু দুগ্ধ সেবনে যে স্বাদ আস্বাদন হয় তা-ই যদি ভিত্তি হয় এই যুক্তির, তাহলে আমরা যদি এই স্বাদ আস্বাদনের অন্য কোনো সরল-সহজ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করি তাহলে তখন এই যুক্তি কোথায় থাকবে? সোজা কথা, শিশুর কামনার সবচাইতে বলিষ্ঠ উৎস হচ্ছে তার ক্ষুধা আর প্রকৃতির গোপন ইঙ্গিতে সে তার হাতিয়ারসমূহের মধ্যে কেবল সেইটিই সর্বপ্রথম কাজে লাগাতে পারে, যেটিকে সে খাদ্য গ্রহণের জন্য ব্যবহার করতে পারে। এ কারণে তার স্বাদ ও বেদনার কেন্দ্রবিন্দু এই ক্ষুধা ও খাদ্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। পরবর্তীতে এ শিশু যখন বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে, তখন তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সব কিছুই কেবল তার মুখকে কেন্দ্র করেই হয়। সে তার খেলনা, কাপড়, মাটি ও পাথর খণ্ড তুলে তুলে মুখে পুরতে থাকে। কেননা তার চেতনা এখনও ঘুমন্ত। আর আরাম-বিশ্রামের নেতিবাচক কামনা ছাড়া ক্ষুধা ব্যতীত অপর কোনো ইতিবাচক কামনা কার্যকর থাকে না বলেই সে অন্য কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারে না। 'ভালো' ও 'মন্দ' যাচাইয়ের তার এখনকার মানদণ্ড কেবলমাত্র তার মুখ। তার সমস্ত স্বাদ আস্বাদনের ব্যাপারও ঘটে এ মুখকে কেন্দ্র করেই। তখন তার মুখের পেশীসমূহ তীব্রভাবে 'লালা' বের করতে থাকে। সেজন্যও যা-ই পাওয়া বা ধরা তার পক্ষে সম্ভব, সে সেটিতেই মুখ লাগিয়ে দেবে। অতএব দুগ্ধ চোষার আস্বাদন সম্পূর্ণটাই প্রকৃতির এ ব্যবস্থার ওপরই ভিত্তিশীল যে, শিশু তার অস্তিত্ব রক্ষার মৌলিক দাবি— খাদ্য গ্রহণ— পূরণ করতে সক্ষম হবে।— এর সাথে যৌন আবেগের সংযোগ কোথায় পাওয়া গেল, এ পর্যায়ে তার প্রশ্নই বা উঠছে কেন?

দ্বিতীয় যুক্তি এই দেখানো হয়েছে যে, শিশুর জীবনের প্রাথমিক কয়েকটি বছর নিজের মন এবং নিজ দেহের নিম্ন পর্যায়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের প্রতি তার খুব বেশি কৌতূহল থাকে। এ কৌতূহলকে যৌন-আবেগের চরিতার্থতা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না।

সন্দেহ নেই— দেহের নিম্নদেশীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মল-প্রস্রাব ত্যাগের মাধ্যম বানানোর সাথে সাথে তাকে যৌনতার সাথে জুড়ে দিয়ে বড়ই বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া হয়েছে। অন্যথায় দেহের আবর্জনা নিষ্কাশনের মাধ্যমে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সারাটি জীবন নিজ দেহের সাথে যুক্ত রেখে বহন করে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভবই হত না। কিন্তু একটি শিশুর যেমন ময়লা-আবর্জনা ও পরিচ্ছন্নতার পার্থক্য বোধ থাকে না, তেমনি তার মধ্যে এ উদ্দেশ্যের জন্য যৌন আবেগের বর্তমান থাকাও কিছু মাত্র জরুরী হয় না। দেহের নিম্নদেশীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি শিশুর আগ্রহের অপর একটি সহজ-সরল বিশ্লেষণও সম্ভব। বস্তুত প্রকৃতি দেহ ব্যবস্থাকে হৃদয় ও মনের সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত করে দিয়েছে যে, দেহ যেসব জিনিসের প্রয়োজন বোধ করে তাকে অর্জন করে এবং যেগুলোকে প্রতিরোধ করতে চায় সেগুলোকে প্রতিরোধ করে মন-হৃদয় স্বাদ ও আরাম অনুভব করে। এ কারণে মল-প্রস্রাব যখন দেহের নিম্ন প্রদেশে পৌঁছে যায়, তখন তাকে বাইরে ঠেলে দেয়ার জন্য একটা চাপের সৃষ্টি হয়। আর তার নিষ্কাশন সম্পন্ন হয়ে গেলে 'ক্ষতি প্রতিরোধ' নীতির অধীন স্বাদ বা তৃপ্তি অনুভূত হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তৃপ্তি বা স্বাদের এ অনুভূতিই নিম্নদেশীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি শিশুর কৌতূহল সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে।— নিম্ন দেশীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি শিশুর কৌতূহলের ব্যাখ্যাস্বরূপ এতটুকু বলা কি যথেষ্ট নয়?

ফ্রয়েডীয় চিন্তাবিদরা সকল প্রকারের মানসিক বিপর্যয়কে যৌন আবেগের অধীনে নিয়ে আসার জন্যে নানা অসংলগ্ন কথাবার্তা ও প্রলাপ পর্যায়ের যুক্তির জাল বিস্তার করেছে। চুরি, পকেট কাটা ও

হত্যা ইত্যাদির অপরাধীদের মনে যৌন-আবেগের তীব্র তাড়নার প্রভাব প্রমাণ করার জন্যও তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, একজন চোরের চৌর্যবৃত্তির অভ্যাস হওয়ার সূচনাতে নিশ্চয়ই একটি যৌন আবেগ তার সাথে যুক্ত হয়েছিল। অথচ এসব অসৎ কার্যকলাপের অভ্যাস হওয়ার আরও বহু প্রকারের কারণ সমাজে-পরিবারে বর্তমান থাকতে পারে। যেমন শিশুর আগ্রহের দ্রব্যাদি যদি পিতামাতা তার সম্মুখেই লুকিয়ে রাখে, তা হলে এ আচরণ তার মধ্যে একটা বিদ্রোহাত্মক প্রবণতা এবং তার ফলে চুরি করার প্রবল ইচ্ছা তার মধ্যে জাগিয়ে দিতে পারে। অনুরূপভাবে শিশুর ওপর যেসব কামনা-বাসনার চাপ একটা পরিবেশের মধ্যে পড়ে স্বয়ং পিতামাতা তা পূরণ করে না দিলে শিশু টাকা বা দ্রব্যটি চুরি করে নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে পারে। এভাবে অন্যান্য অপরাধ প্রবণতাও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিবেশ হতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও এ সব কিছুকে যৌন আবেগের সাথে যুক্ত করে দেয়া হাস্যকর নয় কি ?

এ পর্যায়ের একটা যুক্তিকে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুভূতি' বা Oedipus Complex বলে দাঁড় করানো হয়েছে। আর এটা ফ্রয়েডীয় যৌন দর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও বটে। কিন্তু স্বয়ং ফ্রয়েডপন্থী চিন্তাবিদরা এর প্রতি একবিন্দু আস্থা স্থাপন করতে পারে নি। কেউ কেউ বলেছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই অনুভূতি প্রত্যেকটি ব্যক্তি মানুষের প্রকৃতির গভীরে শিকড় হয়ে বসেছে। অপর কতিপয় ফ্রয়েডীয় চিন্তাবিদদের মতে তা এমন একটা কেন্দ্রীয় স্বভাবগত আবেগ যা কেবল মনস্তাত্ত্বিক রোগেই স্বীয় প্রভাব দেখায় না, ব্যক্তির সঠিক ঠিকানা এবং আরও সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে সামাজিক রসম-রেওয়াজ, সামষ্টিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্ম ও নৈতিকতার বিকাশেও বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে।

ফ্রয়েড নিজেও এই দার্শনিক মতের ব্যাখ্যাদানে খুব একটা যথার্থ কথাবার্তা বলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাঁর Three Contributions to Sexual Theory (১৯০৫ খৃ.) গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে যে, শিশু যখন একেবারে সুবোধ মাসুম থাকে, তখন তার যৌন তাড়না (urge) নিজের পথ জানে না এবং একজন পুরুষ শিশু যখন মায়ের স্তন চুষতে থাকে, ঠিক সেই অবস্থায়ই তার যৌন-কামনা মা'র ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে (নিতান্ত লজ্জাষ্কর হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যার আবরণ খুলে ফেলার জন্য আমাকে এর উল্লেখ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত) পড়ে। সে মাকে পিতার দিকে এবং পিতাকে মা'র দিকে কৌতূহলী দেখতে পেয়ে পিতাকে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে লক্ষ্য করে এবং তার মনে পিতার বিরুদ্ধে নিতান্তই অবচেতনভাবে যৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতা জেগে ওঠে, যা উত্তরকালেও তার মধ্যে পুরোপুরি কাজ করতে থাকে।

অতঃপর Totem and Taboo এবং Psychology গ্রন্থে বোঝাতে চেয়েছে যে, (তার দৃষ্টিতে পাপ অনুভূতিই হল সমস্ত ধর্ম ও নৈতিক ব্যবস্থার মূল) সেই পাপ অনুভূতি 'ঈডিপাস কম্প্লেক্স-এরই কার্যক্রমের ফলশ্রুতি হয়ে থাকে। আর এ কারণে গোটা বংশে— অন্তত তার এক-অর্ধ পুরুষ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে 'পাপ অনুভূতি' স্বভাবগত হয়ে দাঁড়ায়। তার লেখা পরবর্তী এক প্রবন্ধে (The passing of Oedipus Complex) বলেছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবেগ প্রত্যেক নিষ্পাপ শিশুর মধ্যেও থাকে। কিন্তু শিশু কি তা জন্মগত স্বভাবরূপে পায় কিংবা সে নিজ স্বভাবে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে নেয়— এই প্রশ্নের কোনো জবাব ফ্রয়েডের নিকট পাওয়া যায়নি।

আরও সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলতে চেয়েছে যে, এই 'যৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবেগ' বাল্যকালে স্বতঃই মরে যায়। এ কথাটির ফলশ্রুতি তো এই দাঁড়ায় যে, এই আবেগপূর্ণ বয়স্কদের মধ্যে হলে সে অবশ্যম্ভাবীরূপে মনস্তাত্ত্বিক রোগী হবে। মোটকথা এখানে ফ্রয়েডের 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স'-এর ভিত্তিতে নির্মিত দর্শন-প্রাসাদটি সহসাই ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে। অন্যথায় দ্বিতীয় পক্ষের মেনে নিতে হবে যে, ধর্ম ও নৈতিকতার সব নির্মাণ কার্য হয় নিষ্পাপ শিশুদের মগজ নিঃসৃত অথবা তা নির্মিত মনস্তাত্ত্বিক রোগীদের দ্বারা। কেননা 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স'-এর সব মাল-মসলা তো কেবল এ দু'জনের নিকটই পাওয়া যায়।

এই দর্শনটি অন্য একটি দিক দিয়েও ত্রুটিপূর্ণ— ফ্রয়েড নিজেও সেজন্যে নিরুপায়। তা হচ্ছে, এ দর্শনের গঠন কেন্দ্র। কেবল পুরুষ শিশু— স্ত্রী শিশুর কোনো স্থান নেই এ মতাদর্শের বেষ্টনীতে। একটি স্ত্রী-শিশুর মধ্যে এই অনুভূতি ও আবেগ কিভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

ফ্রয়েড নিজের নির্বুদ্ধিতাসমূহকে বিজ্ঞান নামে চালিয়ে দুনিয়ার কত মানুষকে যে বিভ্রান্ত করেছে, তা গুণেও হয়ত শেষ করা যাবে না!

সোজা কথায় বলা যায়, শিশুর দু'টি প্রাথমিক স্বভাবগত-জন্মগত প্রবৃত্তি হচ্ছে 'ক্ষুধা' ও 'বিশ্রাম লাভ'। আর এ দু'টির জন্য মা-ই হচ্ছে তার লীলা-কেন্দ্র। "ভয়'-এর ক্ষেত্রে আবার সেই মা-ই হচ্ছে তার আশ্রয়। ফলে মা অতি স্বাভাবিক ও অবচেতনভাবে শিশুর ভালোবাসার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। আর ভালোবাসা এমনই একটা আবেগ, যা নিজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজও জিইয়ে রাখে।

ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রবণতা বা প্রকৃতি হচ্ছে একত্ব— অংশীদারত্বহীনতা। ধন-সম্পদ ও দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি ভালোবাসা ব্যক্তি মালিকত্ব সংরক্ষণের আবেগরূপে মানব সমাজে সক্রিয় থাকে। শিশুর স্বাভাবিক ইচ্ছা হচ্ছে স্বীয় ভালোবাসা-কেন্দ্রের ভালোবাসা পর্যায়ের যাবতীয় তৎপরতা ও কার্যকলাপের একমাত্র অধিকারী হবে সে, তাতে অন্য কারো অংশীদারিত্বকে সে স্বতঃই অপছন্দ করে। পুরুষ-স্ত্রী উভয় শিশুই পিতার প্রতিকূলে নিকট বয়সী ভাইবোনদের বিরুদ্ধে অধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পোষণ করে। নবজাতকের জন্মগ্রহণের পরই তার চাইতে বয়সে বড় শিশুদের মনে এ অনুভূতি জেগে ওঠে যে, তার ভালোবাসা কেন্দ্রকে একজন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বি সহসাই এসে দখল করে নিয়েছে। পরে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবধারা নবজাতকের মধ্যে ধীরে ধীরে তার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে অর্থাৎ তার সূচনা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে। বহু পরিবারেই তার মহড়া অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুই বোন, দুই ভাই বা দুই ভাইবোনের মধ্যেও হতে পারে। অনেক সময় তা বেশি বয়স পর্যন্তও কাজ করতে থাকে। তাছাড়া শিশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবধারা কেবল মা'র সাথেই বা মাকে নিয়েই তো হয় না। খেলনা, বিশেষ শয্যা, নিজের জন্য নির্দিষ্ট থালা-বাটি-বই ইত্যাদি নিয়েও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। আর তা যেমন মা'র ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে হয়, তেমনি হয় পিতার স্নেহ-বাৎসল্য পাওয়ার জন্যেও। অন্য কথায়, ভালোবাসা সহজ-সরল ধারণানুযায়ী স্বতঃই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজের ধারক হয়। সকল প্রকারের ভালোবাসা সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। চাকর-চাকরানীদের মধ্যেও মনিবের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, কেরাণীকুলের মধ্যে উপরস্থ অফিসারের স্নেহদৃষ্টি লাভের জন্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সমাজকর্মী বা একটি রাজনৈতিক দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও নেতার প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্যে এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। প্রেমিক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভব করে অপরাপর প্রেমিকাদের বিরুদ্ধে প্রিয়তমার প্রেম লাভের জন্যে, যেন সে অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল তাকেই গ্রহণ করে।

এটা একটা সাধারণ আবেগ। এ সাধারণ আবেগকে 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' নাম দিয়ে একটি দার্শনিক মতাদর্শ বানিয়ে দেয়া এবং তাতে 'পাপ' অনুভূতির ভাবধারা সৃষ্টি করে দাবি করা যে, এ ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই ধর্ম ও নৈতিকতার ব্যবস্থা আবর্তিত হয়,— একটি অসমঞ্জস্য প্রতারণামাত্র এবং এ সাম স্যহীন প্রতারণার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ফ্রয়েডীয় দার্শনিকতার সুরম্য প্রাসাদ। ফ্রয়েডীয় চিন্তাবিদদের আসল ভুল এখানে নিহিত যে, তারা মনে করে নিয়েছে যে, All love is a manifestation of the sex instinct— যৌন আবেগের প্রকাশনাই সমস্ত প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার উৎস। যারা যারাই এ বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল করে যৌন-দর্শনের ক্ষেত্রে পদচারণা শুরু করেছে, তারা তো সকল পবিত্র-নিষ্কলুষ আবেগ-ভাবধারাকে কলুষতায় আকীর্ণ করে দেবেই, এ ছাড়া তারা আর কিই-বা করতে পারে।

আমরা মনে করি, ব্যাপারটিকে সহজ-সরলভাবেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, জটিল দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে সহজকে জটিল বানানো আজকের চিন্তাবিদদের একটা ফ্যাশনই বলতে হবে। সোজা কথা, মানব চরিত্রের অভ্যন্তর থেকে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার বহু কয়টি ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তার মধ্যে একটি স্বীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্যে, একটি নিজের ভাই বোন মা-বাপ থেকে শুরু করে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়ে দেশ, জাতি ও গোটা বিশ্ব মানবতা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। আর একটি ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (স)। অপর একটি ধারা উত্তম জীবনাদর্শ ও নৈতিকতার দিকে প্রবহমান আর একটি সৌন্দর্য প্রীতির দিকেও। কিন্তু ভালোবাসা প্রীতির এ ধারাসমূহকে যৌন আবেগের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া কলুষ-পংকিল দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রমাণ উপস্থাপিত করে, সৎ ও স্বচ্ছ মনোভাবের নয়।

বস্তুত মানব প্রকৃতিতে নিহিত ভালোবাসার বিভিন্ন দিককে যদি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেই, তাহলেই যৌন-ভালোবাসাকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়ে আমরা খুঁজে দেখতে পারি, কোথায় কোথায় তা পাওয়া যায়।

যৌন-প্রেম হচ্ছে কেবল তা, যা যৌন-অনুভূতির অঙ্গগত ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে কর্মমুখর হওয়ার দরুন একটা বিশেষ ধরনের আবেগের রূপ ধরে সম্মুখে উপস্থিত হয়। পরিবেশ এই অনুভূতিকে কখনও কখনও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সক্রিয় বানিয়ে দিতে পারে। কেননা তা বাইরের আন্দোলন ও তার বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু এটা একটা বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট অনুভূতি। তা যতক্ষণ পর্যন্ত সুনির্দিষ্টরূপে কাজ করতে শুরু না করছে ততক্ষণ তার প্রকাশ লাভের পূর্বেই শিশুর প্রত্যেকটি ভালোবাসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবেগে সেই যৌন-অনুভূতির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাওয়ার বা সেজন্য চেষ্টা করার কোনো অধিকারই কারো থাকতে পারে না— বিশেষ করে এজন্যেও যে, তার ভালোবাসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যান্য বহু কয়টি সহজ ব্যাখ্যা দান খুবই সম্ভব।

সকল জন্মগত প্রকৃতিরই নিয়ম হলো, তা স্বীয় কাজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ীই সম্পন্ন করে থাকে— যৌন আবেগ এ নিয়মের বাইরে নয়। তা সেই গতিতেই কাজ করে যে গতিতে যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণত্ব হতে থাকে। একদিকে যৌন অঙ্গের বিকাশ অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ধাক্কা দেয় আর অপরদিকে মানবতার দুই লিঙ্গে বিভক্ত হওয়াটাই একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায় বাইরে থেকে আন্দোলনের। আর লিঙ্গদ্বয়ের পার্থক্যপূর্ণ দিকসমূহই পারস্পরিক এক তীব্র আকর্ষণ (Attraction) সৃষ্টি করে। তারপর ধীরে ধীরে সে আকর্ষণের জন্যেই সেই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র বানিয়ে দেয়, যা লিঙ্গদ্বয়ের মাঝে একটি চূড়ান্ত সীমানা বানিয়ে দেয়। তার সাথে সাথে প্রকৃতির গোটা শিল্প, রঙ ও গন্ধের তরঙ্গমালা ও দিন-রাতের মনোরম মনোহর দৃশ্যাবলী সবই মানবীয় যৌন আবেগের ওপর প্রভাবশালী হয়ে থাকে। এমনি করেই তা তার বিকাশকে সম্পূর্ণ করে নেয়।

যৌন আবেগ অন্যান্য সব আবেগের মতোই মানুষের মন ও মানবীয় স্বভাব চরিত্রের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে। এই আবেগের স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকা, তার অবদমিত হওয়া এবং তার সীমাকে লংঘন করে যাওয়া— এ তিনওটি অবস্থা মানব জীবনের ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নীতিগতভাবে একথা সকল প্রকারের আবেগ সম্পর্কে বলা চলে। বাড়াবাড়ি, প্রয়োজনের চাইতে কম এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা— যে কোনো আবেগের ন্যায় যৌন-আবেগের ওপর উক্ত তিনটি অবস্থায় যে কোনো একটি আবর্তিত হলে গোটা সমাজ কাঠামোই তাতে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্য সমাজে যৌন দর্শন যে পরিবেশের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করেছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিন্তা-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। সেখানকার সমাজকে ধর্ম, নৈতিকতা ও আবহমান কাল থেকে চলে আসা ঐতিহ্য ও নিয়ম-আইনের সীমালংঘন করার অবাধ সুযোগ করে দেয়া হলো। যৌন-বিপ্লবের পর পরিবার ব্যবস্থার ভিত্তি উৎপাটিত হলো, পাশবিক দাম্পত্য

জীবনের প্রচলন হলো এবং যিনা-ব্যভিচারের একটা সর্বগ্রাসী প্লাবন সূচিত হয়ে গেল। তখন কিছু সংখ্যক নব্য দার্শনিক বেশধারী এই সর্বাত্মক বিপর্যয়কে 'চরম উন্নতি ও প্রগতি'র সনদে ভূষিত করেছিল, তখন মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণকারীও[১] এদের মধ্যে শামিল ছিল। তারা ব্যভিচারের পক্ষে পরিবেশ অনুকূল বানানোর লক্ষ্যে যৌন আবেগকে মানবীয় মনস্তত্ত্বের বিশাল ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ করে দিয়েছে এবং ব্যভিচারকে মানসিক বিকৃতিরূপে চিহ্নিত করার পরিবর্তে ব্যভিচার বিরোধী প্রাচীন বিধি-নিষেধ ও বাধা-প্রতিবন্ধকতাকেই মানসিক বিকৃতির কারণ বলে চিহ্নিত করেছে। ফ্রয়েডই হচ্ছে এ চিন্তাগত ও বাস্তব বিপর্যয়ের আসল হোতা। সে তো চরম নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়েছে এই বলে যে, মানসিক বিকৃতি বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড়, আসল ও মৌলিক কারণ হচ্ছে পরিবেশগত বাধা-প্রতিবন্ধকতার দরুন অবদমিত যৌন-আবেগ। ভুলে গেলে চলবে না, ফ্রয়েডের সম্মুখে যে সমাজ ছিল তাতে একদিকে এই আবেগের ওপর অবাঞ্ছনীয় বিধি-নিষেধের কুপ্রভাব প্রতিফলিত ছিল এবং অপরদিকে তাতে ব্যভিচার ও যৌন নৈরাজ্য এবং নগ্নতা ও পর্দাহীনতার অন্ধ-নির্বিচার সয়লাব মাথা উঁচু করে এসেছিল। এ দু'টির মধ্যে যে কোনোএকটি ব্যক্তির মানসিক বিকৃতি ও সমাজের বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। এ দু'টি পরস্পর বিরোধী কার্যকারণ একই সময় মুখোমুখি দ্বন্দ্ব করছিল এবং এ দু'টিরই দিক থেকে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য ও সমাজের নৈতিক সুস্থতার অবক্ষয় সাধিত হচ্ছিল। ফ্রয়েড আসলে একটি রোগী সমাজের অধ্যয়ন করেছে। তখন তা এ রোগাক্রান্ত অবস্থা থেকে বের হয়ে অপর একটি রোগের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল। ফলে সে স্বাভাবিক চাহিদা অপূরণের পুরাতন রোগকে 'রোগ' বলে চিহ্নিত করছিল এবং অমিতাচার অযৌক্তিকতার (Extravagance) নতুন রোগকে সুস্থতা-স্বাভাবিকতার মানদণ্ডই বানিয়ে দিয়েছিল। তার দৃষ্টিভঙ্গীই বানিয়ে নিয়েছিল যে, যৌন আবেগ চরিতার্থতার পথে যে-কোন বাধা— তা পর্দা, পোশাক, মুহাররম আত্মীয়দের প্রতি সম্মান শ্রদ্ধাবোধ কিংবা ব্যভিচার নিষিদ্ধকারী আইন-কানুন অথবা বিয়ের বন্ধন যা-ই হোক, যেরূপেই হোক, সবই উৎপাটিত করা এবং তাকে এ সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করাই প্রকৃতির চাহিদার সাথে পুরামাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ। ফ্রয়েড মানবীয় মনস্তত্ত্বের অনাবিল-নির্ভেজাল অধ্যয়ন ও গবেষণার পরিবর্তে সমসাময়িক সমাজের যৌন প্লাবনের স্রোতে ভেসে গেছে এবং তাঁর সমস্ত মেধা ও প্রতিভাকে ধর্ম ও নৈতিকতার বিধি-বন্ধনের বিরুদ্ধে নাস্তিকতা, অশ্লীলতা, যৌন অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে ব্যাপক ও দৃঢ়মূল করে তোলার অপচেষ্টায় সর্বাত্মকভাবে ব্যবহার করেছে।

ফ্রয়েডীয় চিন্তাবিদ্‌দের দাবি হচ্ছে, পর্দা লোকদের মনে কৌতূহল (Curiosity) বা অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করে। এই কারণে যৌন আবেগের প্রতিক্রিয়া (Reaction) তাদের জন্য মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। ফ্রয়েডীয় চিন্তার পূর্বোক্ত পরিবেশের প্রেক্ষিতে এরূপ দাবির কারণ সহজেই বোধগম্য হয় এবং তা যে বিকৃত পরিবেশের অসুস্থ প্রতিক্রিয়ারই প্রকাশ, তাতে কোনোই সংশয় থাকে না। উক্তরূপ বিকৃত ও কলংক-কলুষ সমাজ-পরিবেশে মানবীয় যৌন আবেগ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা না করলে যে উক্তরূপে দাবি উত্থাপিত হত তা-ও অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। আমরা বলতে পারি, ফ্রয়েডীয় যৌন

---

১. 'মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ' নামে মনোবিজ্ঞানের একটা স্বতন্ত্র School of Thought রয়েছে। কিন্তু 'মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়' পর্যায়ে মনস্তাত্ত্বিক School ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ School-উভয়ের মধ্যে যে মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে মিঃ উইলিয়ম ম্যাগডোগল তা বিশেষ যত্ন সহকারে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তিনি বলেছেন, মনস্তাত্ত্বিক School-এর লোকদের দর্শন চিন্তার একমাত্র ক্ষেত্র হচ্ছে Normal Psychology আর অপর দিকে Psycho-Analysis School সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ Normal Psychology-র ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের (Abnormal Psychology)-এর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে অর্থাৎ দার্শনিকদের একটি দল সুস্থ মনস্তত্ত্বের অধ্যয়ন করে। কিন্তু রোগীদের অধ্যয়ন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ থাকে। আর অপর দলটি রোগীদের অধ্যয়ন করে তাদের রোগাক্রান্ত থাকা অবস্থায়; কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। ফলে উভয়ই একতরফা ও পক্ষপাতদুষ্ট বিদ্যা নিয়ে যৌন বিকৃতি সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব পরিবেশন করেছে, তা স্বাভাবিকভাবেই অসম্পূর্ণ, অপরিপক্ক ও অপরিসর হয়ে রয়েছে।

দর্শনের যে কৌতূহলের ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে তা শুধু মুখাবয়ব উন্মুক্ত হলেই তো চরিতার্থ হবে না। বরং মুখাবরণ অপসারিত হওয়ার পর তা আরো উদগ্র হয়ে উঠবে। অতঃপর পুরুষ-নারীর পরনের কাপড় অপসারিত করার প্রবল দাবিও উত্থাপিত হবে। পাশ্চাত্য সমাজে যে Bottomless বা Topless পোশাক, নগ্নদের সমিতি ও ক্লাব ঘর— ইত্যাদি ব্যাপক হয়ে গেছে তা কি সে 'উদগ্র যৌন কৌতূহলে'রই ফলশ্রুতি নয়? পাশ্চাত্য সমাজ লোকদের সে কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যেই তো প্রায় উলংগ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নানা প্রকারের নৃত্য কলা ও নাটক-অভিনয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। 'নাইট ক্লাব' তো সেই পর্যায়েরই একটি প্রতিষ্ঠান। প্রাচ্যদেশসমূহেও তারই প্রভাবে অনুরূপ শত শত হাজার-হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সিনেমা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে সেই কৌতূহলেরই নিবৃত্তি চলছে! উইলিয়াম ম্যাকডোগালের একটা উদ্ধৃতি এই প্রেক্ষিতে খুবই সামঞ্জস্যশীল মনে হচ্ছে। তা হচ্ছে ঃ

In every society in which custom permits of every free intercourse of the sexes, inverted sexual practices commonly flourish among the men—In this way also we may understand how, in all societies some men of middle age who have led a life of free indulgence with the opposite sex turn to members of their own sex in order to obtain the stimuls of novelty.

একটি পর্দাহীন বন্ধনহীন নির্লজ্জ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাপূর্ণ সমাজ যে কি সাংঘাতিক পরিণতির সম্মুখীন হয় তা উপরোদ্ধৃত কথার আলোকে সহজেই বুঝতে পারা যায়। বস্তুত কোনো সমাজে যখন পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশা সাধারণ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন যৌন আবেগ নিত্য নব বিচিত্র দাবির অধীন নতুন নতুন দুষ্টামির উদ্ভাবন করে। পাশ্চাত্যের বে-পর্দা নগ্ন সমাজে যৌন আবেগ চরিতার্থ করার জন্যে স্বভাবসম্মত পন্থা অবলম্বনের বিপুল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কি সব বিচিত্র ধরনের উপায় উদ্ভাবন করেছে এবং কি কি নতুন নতুন 'অভিজ্ঞতা' অর্জন করেছে— নিতান্ত নির্লজ্জতার প্রশ্রয় দিতে পারি না বলেই তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকতে হলো। আমাদের বক্তব্য হলো, 'কৌতূহলে'র দোহাই দিয়ে পাশ্চাত্য সমাজে এবং তার অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে প্রাচ্যদেশীয় সমাজের পর্দাহীনতা ও পুরুষ নারীর অবাধ মেলামেশার যে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে তার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে সর্বত্রই।— এ সবেরই ফলে যৌন আকর্ষণই নিঃশেষ হয়ে যায়, যৌন আবেগ এতটা শীতল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে, তাকে সক্রিয় রাখার জন্যে অসংখ্য ধরনের কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য সমাজ আজ সে মারাত্মক অবস্থারই সম্মুখীন। প্রশ্ন হচ্ছে, পর্দাহীনতা, নগ্নতা, যৌন নৈরাজ্য ও ব্যভিচারের পূর্ণ স্বাধীনতার মানদণ্ড বানানো হচ্ছে যে সমাজকে, সেখানকার ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক বিকৃতি[১] ও তাদের সামষ্টিক জীবনে নৈতিক বিপর্যয় সে অনুপাতেই বাড়ছে না কি, যে অনুপাতে তাদের মধ্যে ব্যভিচারের প্লাবন বৃদ্ধি পাচ্ছে? মানসিক বিকৃতির সবচাইতে বেশি দৃষ্টান্ত তো উক্তরূপ সমাজেই লক্ষণীয়। সমকামিতা, পুরুষদের নারীসুলভ ও নারীদের পুরুষসুলভ আচার-আচরণ ও চলাফেরা কি এ সমাজেই বেশি দেখা যাচ্ছে না? সবচাইতে বেশি অপরাধ প্রবণতা ও ঘটনা-দুর্ঘটনাও কি এ সমাজে বেশি পাওয়া যাচ্ছে না?— এসব প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া আর

---

১. 'মানসিক বিকৃতির' বিভিন্ন কারণের উল্লেখ ও সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক নয়। এ পর্যায়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে মানসিক বিকৃতি বিপর্যয়ের মৌলনীতি হচ্ছে 'বৈপরীত্য'। মনস্তাত্ত্বিক জগতে বৈপরীত্য— তা যৌন ঝোঁক প্রবণতা সম্পর্কিত হোক, অথবা অপর কোনো ঝোঁক-আবেগ। কামনা-ইচ্ছা বা প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিই হচ্ছে মানসিক বিকৃতির মৌল কারণ। কুরআন মজীদ বিশেষভাবে মুনাফিকদের বিস্তারিতভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, মনের ও মুখের, বিশ্বাসের ও কাজের বৈপরীত্যই তাদের চারিত্রিক সর্বনাশ সাধন করেছে। আমার লিখিত 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি' গ্রন্থে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

কিছুই বলা যায় না। এবং তা-ই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, পাশ্চাত্য ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তারই বিভ্রান্তিতে পড়ে যেসব সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও নীতি গৃহীত হয়েছে, তা সবই সম্পূর্ণরূপে ভুল ও মারাত্মক।

এ ভুল চিন্তা ও দর্শন ইউরোপে যখন সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তখন অনতিবিলম্বে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবাধীন প্রাচ্য দেশসমূহেও তা ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং তারই প্রভাবে পড়ে প্রাচ্যের মুসলিম দেশ ও সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম-নীতিকে ভংগ করে পর্দাহীনতা ও নগ্নতার সয়লাব বইয়ে দেয়া হয়। আর তারই প্রচণ্ড আঘাতে মুসলিম দেশসমূহেও পরিবার ভেঙ্গে যায়, নারীরা ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে পড়ে; কিংবা তাদের টেনে বাইরে নিয়ে এসে পুরুষদের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়। ফলে ইউরোপে যে ব্যাপক নৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, প্রাচ্যেও অনুরূপ কাজে অনুরূপ পরিণতিই দেখা দিয়েছে অনিবার্যভাবে। আজ আমাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত। অথচ মুসলিমদের পরিবার ছিল এক-একটি দুর্গ। আর পারিবারিক জীবন পবিত্র প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা এবং পরম শান্তি ও স্বস্তির কেন্দ্রবিন্দু। সে শুভ ও কল্যাণময় অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং সুষ্ঠু পরিবার ও পারিবারিক জীবন গড়ে তোলা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত। আমার জীবনের সাধনা ও সংগ্রাম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিবদ্ধ; বর্তমান 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন' নামের এ বিরাট গ্রন্থ তারই পূর্বশর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে রচিত। মূলত এ আমার প্রায় চার বছরকালীন ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল। সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার বিচারের ভার সুধী পাঠকদের ওপরই থাকল। তবে আমার জীবন লক্ষ্য যে অতীব মহান, তাতে কোনোই সন্দেহের অবকাশ নেই।

—মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

প্রথম অধ্যায়

পরিবার রাষ্ট্রের প্রথম স্তর, সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর (First Foundation Stone)। পরিবারেরই বিকশিত রূপ রাষ্ট্র। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রভৃতি একান্নভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। বৃহদায়তন পরিবার কিংবা বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বিত রূপ হচ্ছে সমাজ। আর বিশেষ পদ্ধতিতে গঠিত সমাজেরই অপর নাম রাষ্ট্র। একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের মূলে নিহিত রয়েছে সুসংগঠিত সমাজ রাষ্ট্র, সমাজ। ও পরিবার ওতপ্রোত এবং পারস্পরিকভাবে গভীর সম্পর্কযুক্ত। এর কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অপর কোনো একটির কল্পনাও অসম্ভব।

পরিবার সমাজেরই ভিত্তি। রাষ্ট্র সুসংবদ্ধ সমাজের ফলশ্রুতি। পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতার ওপর। আবার সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। পরিবারকে বাদ দিয়ে যেমন সমাজের কল্পনা করা যায় না, তেমনি সমাজ ছাড়া রাষ্ট্রও অচিন্তনীয়। তিন তলাবিশিষ্ট প্রাসাদের তৃতীয় তলা নির্মাণের কাজ প্রথম ও দ্বিতীয় তলা নির্মাণের পরই সম্ভব, তার পূর্বে নয়।

একটি প্রাসাদের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব তার ভিত্তির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। তাই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি এই পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার ও সমাজের সুসংবদ্ধ দৃঢ়তার উপর রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব তেমনি নির্ভরশীল।

পরিবারের অপরিহার্যতা

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবারের মধ্যেই হয় মানুষের এ সামাজিক জীবনের সূচনা। মানুষ সকল যুগে ও সকল কালেই কোনো না কোনোভাবে সামাজিক জীবন যাপন করেছে। প্রাচীনতম কাল থেকেই পরিবার সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র বা প্রথম স্তর হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সোজা কথায় বলা যায়, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের যে গুরুত্ব, প্রাচীনতম কালে— মানুষের প্রথম পৃথিবী পরিক্রমা যখন শুরু হয়েছিল, মানবতার সেই আদিম শৈশবকালে পরিবার ছিল সেই গুরুত্বের অধিকারী। বংশ ও পরিবার সংরক্ষণ এবং তার সাহায্য-সহায়তার লক্ষ্যে দুনিয়ার বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে। উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনও চিরকাল সুনাম-সুখ্যাতি ও গৌরবের বিষয়রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। আর নীচ বংশে ও নিকৃষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ বা আত্মীয়তা লাভ মানুষের হীনতা ও কলংকের চিহ্নরূপে গণ্য হয়েছে চিরকাল। যে-ব্যক্তি নিজ পরিবারের হেফাযত, উন্নতি বিধান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে, সে চিরকালই বংশের গৌরব,— Hero রূপে সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে পরিবারস্থ প্রত্যেকটি মানুষের নিকট।

পরিবারের ভিত্তি

প্রাচীনকাল থেকেই পরিবার দু'ট ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়ে এসেছে। একটি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি-নিহিত স্বভাবজাত প্রবণতা। এই প্রবণতার কারণেই মানুষ চিরকাল পরিবার গঠন করতে ও পারিবারিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে এবং পরিবারহীন জীবনে মানুষ অনুভব করেছে বিরাট শূন্যতা ও জীবনের চরম অসম্পূর্ণতা। পরিবারহীন মানুষ নোঙরহীন নৌকা বা বৃন্তচ্যুত পত্রের মতোই স্থিতিহীন।

আর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে সমসাময়িককালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় পরিবার ছিল বিশাল

বিস্তৃত ক্ষেত্র। সমাজ ও জাতি গঠনের জন্যে তা-ই ছিল একমাত্র উপায়। এ কারণে প্রাচীনকালের গোত্র ছিল অধিকতর প্রশস্ত; এতদূর প্রশস্ত যে, নামমাত্র রক্তের সম্পর্কেও বহু ব্যক্তি এক-একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারত। এমন কি বাইরে থেকে যে লোকটিকে পরিবারের মধ্যে শামিল করে নেয়া হতো, তাকেও সকলেই উক্ত পরিবারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে নিত। পরিবারের নিজস্ব একান্ত আপন লোকদের জান-মাল ও ইয্‌যতের যেমন রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো, সেই বাইরে থেকে আসা লোকটিরও হেফাযত করা হতো অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে। ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে 'মুতাবান্না'— পালিত পুত্র গ্রহণের রীতি ছিল, একথা সর্বজনবিদিত। ইউরোপে এই সেদিন পর্যন্তও পালিত পুত্রকে আইন সম্মতভাবেই বংশোদ্ভূত সন্তানের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা হতো। রোমান সভ্যতার ইতিহাস এর চেয়েও অগ্রসর। সেখানে জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত পরিবারের অংশ বলে মনে করা হতো; মর্যাদা তার যত কমই হোক না কেন। এ থেকে এ সত্য জানতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিবারের পরিধি অধিকতর প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল।

সেকালে জীবন-জীবিকার বেশির ভাগই নির্ভরশীল ছিল চতুষ্পদ জন্তু ও কৃষি উৎপাদনের ওপর। এজন্যে প্রত্যেকটি পরিবারই এক বিশেষ ভূখণ্ডের ওপর প্রাচীর নির্মাণ করে নিজেদের এলাকা নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত করে রাখত। সে সীমার মধ্যে অপর কোনো পরিবারের লোক বা জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারত না। এর ফলে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আর তাদের বিশেষ কোনো স্থানে একত্রিত ও সম্মিলিত হওয়ার মতো কেন্দ্র বলতে কিছুই ছিল না। তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো সূত্র বর্তমান থাকলেও উপায়-উপাদানের অভাব ও গোত্রীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এদিকে অগ্রসর হওয়ার পথে কঠিন বাঁধা হয়ে দাঁড়াত। এমনকি এক ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে যে-সব গোত্র বাস করত এবং যাদের মধ্যে জীবনের মূল্যমান ছিল এক ও অভিন্ন, তারাও পরস্পরের শত্রু এবং যুধ্যমান ও দ্বন্দ্ব-সংগ্রামশীল হয়ে থাকত। প্রতিটি গোত্র অপর গোত্রকে চরম শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখত, পরস্পরের ক্ষতি সাধনের জন্যে সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টাই তারা চালাত। মানবতার এই প্রাথমিক স্তরে নিজেও নিজ পরিবার-গোত্রের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে কোনো বিষয় ও সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও সম্ভব হত না কারো পক্ষে। আর চিন্তা ও কর্মের শত-সহস্র যোজন পার হয়ে আসার পর আজ মানুষও পারছে না আন্তর্জাতিক ও বিশাল মানবতার দৃষ্টিতে চিন্তা করার অভ্যাস করতে।

মানুষের নিকট নিজের জান ও মাল চিরকালই অত্যন্ত প্রিয় সম্পদ। এসবের জন্যেই মানুষ চেষ্টা ও শ্রম করত; সকল প্রকার বিপদ ও ঝুঁকির মুকাবিলা করত এবং তার সংরক্ষণের জন্যে সম্ভাব্য সকল রক্ষা-ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হতো। তাদের প্রিয় জান-প্রাণ সুরক্ষিত রাখার সব উপায় ও পথ অবলম্বন করা হতো। আর এভাবেই তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন-জীবিকার দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষিত হতো।

মানুষ যখন দেখতে পায় যে, তার জান ও মালের সংরক্ষণ তার পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিপদ-মুসিবতে ভারাক্রান্ত সমগ্র পরিবেশের মধ্যে তার পরিবারই হচ্ছে তার একমাত্র আশ্রয়— এ পরিবারই তাকে সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করছে, শত্রুদের মুকাবিলায় সব সময়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, তার দুঃখ-দরদ ও বিপদ-মুসিবতের বেলায় তার সাথে সমানভাবে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তখন তার পক্ষে পরিবারের সাথে পূর্ণমাত্রায় জড়িত ও একাত্ম হয়ে থাকাই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক আরব কবি এ কারণেই বলেছেন ঃ

لَا يَسْئَلُوْنَ اَخَاهُمْ حِيْنَ يَنْدُبُهُمْ ۞ فِى النَّائِبَاتِ عَلٰى مَا قَالَ بُرْهَانًا -

বিপদ-মুসিবতে তার ভাই যখন ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে আসে, আওয়াজ তোলে, তখন সে তার এ কাজের কোনো যুক্তি খুঁজে বেড়ায় না।

তখন শুধু বলেঃ

وَقَرَّبْتُ بِالْقُرْبٰى وَجَدِّكَ اِنَّنِىْ ۞ مَتٰى يَكُ اَمْرٌ لِلنَّكِيْثَةِ اَشْهَدُ -

আমি নিকটাত্মীয়তার হক আদায় করেছি, তোমার ভাগ্যের শপথ, যখন কোনো বিপদের ব্যাপার ঘটবে, তখন আমি অবশ্যই উপস্থিত থাকব।

وَ اِنْ اُدْعُ لِلْجَلّٰى اَكُنْ مِّنْ حُمَاتِهَا ۞ وَ اِنْ يَّاتِيْكَ الْاَعْدَاءُ بِالْجَهْدِ اَجْهَدُ -

কোনো কঠিন বিপদকালে আমাকে ডাকা হলে আমি তোমার মর্যাদা রক্ষাকারীদের মধ্যে থাকব, শত্রু তোমার ওপর হামলা করলে আমি তোমার পক্ষে প্রতিরোধ করব।

গোত্র ও পরিবারের এক-একটি ব্যক্তি যখন তার এতখানি সাহয্যকারী ও সংরক্ষক হয়, তখন সে নিজেও পরিবার ও পরিবারের প্রত্যেকের জন্য নিজের সব কিছু কুরবান করতে প্রস্তুত না হয়ে কিছুতেই পারে না। তার বিপদের সময় নিজের জীবন ও প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে অবশ্যই প্রস্তুত হবে। আর এ ভাবধারা থেকেই গোত্র ও পারিবারিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভাবধারা উৎসারিত হয়; আপন ও পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়; তখন নিজ পরিবারের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সুখ্যাতি প্রচার করা হয়; এ হচ্ছে মনের স্বাভাবিক ভাবধারার মূর্ত প্রকাশ। তাদের কীর্তিকলাপ নিয়ে গৌরব করা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাকে নিজের সৌভাগ্যের বিষয় বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানকালের রাজনৈতিক ও দলীয় নেতার প্রতি যেরূপ আনুগত্য ও ভক্তি-শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি ঘটে, তারই তাগিদে তাদের কীর্তিগাঁথাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়, তাদের ভুল-ভ্রান্তিকে ভালো অর্থে গ্রহণ করে তাকে সুন্দর ব্যাখ্যার চাকচিক্যময় বেড়াজালে লুকিয়ে রাখার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করা হয়; সেকালে বংশীয় নেতা ও গোত্রপতিদের সম্পর্কেও গ্রহণ করা হতো অনুরূপ ভূমিকা। কেননা তাদের স্বপ্ন-সাধের বাস্তব প্রতিফলন তারা তাদের মধ্যেই দেখতে পেত। তাদের সাথে বন্ধন স্থাপন করেই তারা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করে তুলত।

এক কথায় বলা যায়, প্রাচীনকালে পরিবার ছিল এ কালের এক-একটি রাজনৈতিক দলের মতোই। এজন্যে সেকালের রাষ্ট্রনীতির বিস্তারিত রূপ আমরা দেখতে পাই সেকালের এক-একটি পরিবার-সংস্থার মধ্যে। সেকালের পরিবার অপর কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্য পালনের বাহন ছিল না; বরং পরিবারই ছিল সেখানে মুখ্যতম প্রতিষ্ঠান। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সেখানে সম্পর্ক স্থাপিত হতো 'রেহেম' ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে। এর-ই ভিত্তিতে পারিবারিক জীবনে আসত ভাঙন ও বিচ্ছেদ। যেখানে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তি ছিল বংশীয় সম্পর্ক, সেখানে বংশ ও পরিবারের গুরুত্ব যে কত দূর বেশি হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা চলে। এরূপ অবস্থায় মানুষ নিজেকে রক্ষা করার জন্যে আলো, পানি ও হাওয়ার মতো পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সাথে জড়িত হয়ে থাকতে বাধ্য হবে— এটাই স্বাভাবিক। অন্যথায় সে হয় নিজেকে আপন লোকেরই জুলুম-নির্যাতনের তলে নিষ্পিষ্ট করবে অথবা অপর লোকদের দ্বারা হবে সে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত।

কিন্তু সভ্যতার যখন ক্রমবিকাশ সংঘটিত হলো, জীবন-জীবিকা ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য অনান্য উপায়-উপাদান ও দ্রব্য-সামগ্রী যখন মানুষ করায়ত্ত করতে সমর্থ হলো তখন বিভিন্ন পরিবার ও গোত্রের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা স্থাপনের নানা পথ ও উপায় উদ্ভাবিত হলো। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বংশ ও রক্তের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের একই কেন্দ্রে মিলিত ও একত্রিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হলো। এ অবস্থায় মানুষের মধ্যে একতা ও ঐক্য বিধানের জন্যে কেবল আত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কই একমাত্র ভিত্তি হয়ে থাকল না, স্বাভাবিক ও জৈবিক উপায় উপাদানের ঐক্য, ভৌগোলিক সীমা, ভাষা ও বর্ণের অভিন্নতা প্রভৃতি তার স্থান দখল করে বসল। ফলে পরিবার ও গোত্র সম্পর্কিত প্রাচীন ধারণা তলিয়ে যেতে লাগল, আর তার স্থানে জাতীয়তার বীজ বপিত ও অংকুরিত হয়ে

ক্রমশ তা বর্ধিত হতে থাকল। পরিবার ও পারিবারিক ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। জাতি ও স্বদেশের প্রতি মানুষের লক্ষ্য আরোপিত হলো। ভালোবাসা, বন্ধুত্ব এবং ঘৃণা শত্রুতার মানদণ্ডও তখন পুরাপুরিভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

এ কারণে পরিবার আজকের দুনিয়ার সমাজ-বিজ্ঞানীদের নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, পরিবারের বাস্তবিকই কোনো গুরুত্ব আছে কি ? আর গুরুত্ব থাকলেও তা কতখানি ?

মূলত এ প্রশ্ন অত্যন্ত গভীর সমাজতত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত। এর জবাব না পাওয়া গেলে সমাজের অন্যান্য সমস্যারও কোনো সমাধান লাভ করা সম্ভব হতে পারে না। কাজেই বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে কয়েকটি দিকদিয়ে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে ঃ

১. সমাজের সাফল্য ও উন্নতি লাভের জন্যে পরিবার কি সত্যিই জরুরী ?

২. পুরুষ ও নারীর মাঝে সম্পর্কের সাধারণ রূপ কি এবং উভয়ের কর্মক্ষেত্রের সীমা কতদূর প্রসারিত ?

৩. পরিবারের ক্ষেত্রই-বা কতখানি প্রশস্ত ?

৪. পরিবারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ?

সমাজ পরিসরে পরিবারের গুরুত্ব

পরিবার গঠন ও রূপায়ণ এবং তার সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলার আগে একটি মৌলিক প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে হবে; আর তা হচ্ছে সমাজ ও সামাজিক জীবনের সাফল্যের জন্যে পরিবার কি সত্যই অপরিহার্য ? সুষ্ঠু রীতি-নীতির ভিত্তিতে পরিবার গঠন না করে সামগ্রিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া কি সমাজের পক্ষে— সমাজের ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভব ? পারিবারিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা কি আমাদের জীবনে এতই গভীর ও জটিল যে, তাকে উপেক্ষা করলে জীবন মহাশূন্যতায় ভরে যাবে ?..........কিংবা এ বিষয়গুলো তেমন গুরুতর কিছু নয়; এবং সহজেই তাকে উপেক্ষা করা চলে ? পরিবার ভেঙ্গে দেয়ার পর রাষ্ট্র ও সরকার কি সুষ্ঠু সামাজিক জীবন গঠনের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারবে ?

যেহেতু সমাজের উন্নতি কিংবা পতনের ব্যাপারে পরিবার ও পারিবারিক জীবন যদি সত্যিই কোনো অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে, তাহলে তা নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন। আর যদি সমাজের সাফল্য ও সামাজিক জীবনের কল্যাণ লাভের ওপর নির্ভরশীলই হয়ে থাকে, তাহলে তাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করা গোটা সমাজের পক্ষেই মারাত্মক। কাজেই প্রশ্নটির জবাব নির্ধারণের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী— স্বামী ও স্ত্রী— সঠিক মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ-ও এ প্রশ্নের জবাবের ওপরই নির্ভরশীল।

মানব জীবনের লক্ষ্য

শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভই হচ্ছে মনব-জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, মানব মনের ঐকান্তিক কামনা ও বাসনা। এদিক দিয়ে সব মানুষই সমান। উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, গরীব-ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামবাসী-শহরবাসী এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। সিংহাসনারূঢ় বাদশাহ আর ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দীনাতিদীন কুলি-মজুর সমানভাবে দিন-রাত্রি এ উদ্দেশ্যেই কর্ম নিরত হয়ে রয়েছে। কর্মপ্রেরণার এ হচ্ছে উৎসমূল। এ জিনিস যদি কেউ সত্যিই লাভ করতে পারে তাহলে মনে করতে হবে, সে জীবনের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ লাভ করেছে। তার জীবন সত্যিকারভাবে সাফল্য ও চরম কল্যাণ লাভে ধন্য হয়েছে।

নারী ও পুরুষ

সমাজের নারী এ সম্পদ লাভ করতে পারে একমাত্র পুরুষের নিকট থেকে, আর পুরুষ তা পেতে পারে কেবল মাত্র নারীর নিকট থেকে। দুই ব্যক্তির পারস্পরিক বন্ধুত্ব-ভালোবাসা, দুই সঙ্গীর সাহচর্য, দুই পথিকের মতৈক্য, দুই জাতির মৈত্রীবন্ধন, ব্যক্তির মনে তার মতবাদ-বিশ্বাসের প্রতি প্রেম, পেশা ও শিল্পের প্রতি মনোযোগিতা প্রভৃতি— যে সব জিনিস জীবন সংগঠনের জন্যে অত্যন্ত জরুরী এর কোনটিই মানুষকে সে শান্তি, সুখ ও নিবিড়তা-নিরবচ্ছিন্নতা দান করতে পারে না, যা লাভ করে নারী পুরুষের কাছ থেকে এবং পুরুষ নারীর নিকট থেকে। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবেই পারস্পরিক অতীব গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণ চুম্বকের চাইতেও তীব্র। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একজন অপরজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রত্যেকেই নিজের সে হারানো সম্পদ অপর জনের নিকট লাভ করে, যার জন্যে সে অনন্তকাল ধরে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে, অতন্দ্র প্রতিক্ষায় উন্মুখ হয়ে কাটিয়েছে যুগের পর যুগ। প্রত্যেক নারীর মধ্যে পুরুষের জন্যে অপরিসীম ভালোবাসা ও আবেগ উদ্বেলিত প্রেম-প্রীতির অফুরন্ত ভাণ্ডার সিঞ্চিত হয়ে আছে। তেমনি আছে প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে স্ত্রীর জন্য। এ এমন এক মহামূল্য নেয়ামত, যার তুলনা এই বিশ্ব প্রকৃতির বুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুখ-দুঃখের সাথী

এ দুনিয়া এক বিরাট-বিশাল কর্মক্ষেত্র। এখানে বসবাসের জন্যে গতি, কর্মোদ্যম ও তৎপরতা-একাগ্রতা একান্তই প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ কখনো আনন্দ লাভ করে, কখনো হয় দুঃখ-ব্যথা-বেদনার সম্মুখীন। আর মানুষ যেহেতু অতি সূক্ষ্ম ও অনুভূতিসম্পন্ন সেজন্যে আনন্দ কিংবা দুঃখ তাকে তীব্রভাবে প্রভাবান্বিত করে। ফলে তার প্রয়োজন হচ্ছে সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম সঙ্গী ও সাথীর, যেন তার আনন্দে সে-ও সমান আনন্দ লাভ করে আর তার দুঃখ-বিপদেও যেন সে হয় সমান অংশীদার। নারী কিংবা পুরুষ উভয়ই এ দিক দিয়ে সমান অভাবী। প্রত্যেকেরই সঙ্গী ও সাথীর প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে নারীই হতে পারে পুরুষের সত্যিকার দরদী বন্ধু ও খাঁটি জীবন-সঙ্গিনী। আর পুরুষ হতে পারে নারীর প্রকৃত সহযাত্রী, একান্ত নির্ভরযোগ্য ও পরম সান্ত্বনা বিধায়ক আশ্রয়।

স্থায়ী সম্পর্ক

মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখের এ আবর্তন সব সময়ই ঘটতে পারে— ঘটে থাকে। ফলে তার প্রয়োজন এমন সঙ্গী ও সাথীর, যে সব সময়ই— জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল সময় ও সব রকমের অবস্থায়ই তার সহচর হয়ে থাকবে ছায়ার মতো এবং অকৃত্রিক বন্ধু হিসেবে করবে সব দায়িত্ব পালন। মানুষের জীবনব্যাপী সংগ্রাম অভিযানের ক্ষেত্রে এ এক স্থায়ী, মৌলিক ও অপরিহার্য প্রয়োজন।

এ প্রয়োজন পূরণের জন্যেই নারী ও পুরুষের মাঝে স্থায়ী বন্ধন সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে নারী ও পুরুষ উভয়ই জীবনের তরে পরস্পরের সাথে যুক্ত হতে পারে, যুক্ত হয়ে থাকে। আজীবন এ বন্ধনের সুযোগেই নারী ও পুরুষের জীবন সার্থক হতে পারে এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে কার্যকর। বিয়ের বন্ধনই হচ্ছে এক অকাট্য দৃঢ় সূত্র। এ বন্ধন ব্যতীত আর কোনো প্রকার সংযোগে এ উদ্দেশ্য লাভ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু যে সম্পর্কের পিছনে শুধু ক্ষণস্থায়ী হৃদয়াবেগই হয় একমাত্র ভিত্তি, যার পশ্চাতে কোনো নৈতিক, সামাজিক— তথা আইনানুগ শক্তির অস্তিত্ব থাকে না, তা অনিশ্চিত, ক্ষণ-ভঙ্গুর। যে কোনো মুহূর্তে তা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। নিছক আবেগ-উচ্ছ্বাস, পানি-স্রোতের ওপরে পুঞ্জিভূত ফেনারাশি মাত্র, দমকা হাওয়ার মসৃণ চাপেও তা নিমেষে চূর্ণ হতে পারে, উড়ে যেতে পারে, মহাশূন্যে মিলিয়ে

যেতে পারে প্রণয়-প্রেমের এ বুদ্বুদ। কেননা নিছক আবেগ-উচ্ছ্বাসের বশে সাময়িক উত্তেজনা চরিতার্থ করার জন্যে কোনো নারী কিংবা পুরুষকে চিরদিনের তরে গলগ্রহ করে রাখা মানব স্বভাবের পরিপন্থী।

তামাদ্দুনিক প্রয়োজনে নারী-পুরুষের স্থায়ী সম্পর্ক

আরো এক দৃষ্টিতে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রেম-ভালোবাসা এবং ঘৃণা-উপেক্ষার দুই বিপরীত ভাবধারা বিদ্যমান। মানুষ কাউকে ভালোবেসে সাদরে বুকে জড়িয়ে ধরে; আবার কাউকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে দূরে ঠেলে দেয়। কারো জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়, আবার কারো নাম পর্যন্ত শুনতে রাজি হয় না। মানুষের এ স্বভাব এবং এ স্বাভাবিক ভাবধারার ফলেই মানুষের সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠে, ক্রমবিকাশ লাভ করে। মানব প্রকৃতির মধ্যে এমন সব উপাদান রয়েছে, যা থেকে মানুষের প্রকৃতি নিহিত এ ভাবধারা আলোড়িত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

নারী ও পুরুষ উভয়ই উভয়ের এ স্বভাবসম্মত ভাবধারার সংযোগ কেন্দ্র হয়ে থাকে। একজন অপরজনকে ভালোবাসে, আর একজনের মনে অপরজনের কারণে অন্য কারো বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। পুরুষ নারীকে নিয়ে ঘর বাঁধে আর নারী হয় পুরুষের গড়া এ ঘরের কর্ত্রী। উভয়ই উভয়ের কাছ থেকে লাভ করে পারস্পরিক নির্ভরতা, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট থেকে পায় কর্মের প্রেরণা এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে অগ্রসর হয়ে যায় উদ্যমপূর্ণ গতিতে। নারী ও পুরুষের এ সংযোগ ব্যতীত মানবতার অগ্রগতি আদৌ সম্ভব নয়।

পরিবার ও বর্তমান সভ্যতা

বর্তমান পাশ্চাত্য প্রভাবিত সমাজ ও সভ্যতায় নারী ও পুরুষ সম্পর্ক মানবীয় নয়, নিতান্ত পাশবিক। পাশবিক উত্তেজনা ও যৌন-লালসার পরিতৃপ্তিই হচ্ছে তথায় সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি। এর ফলে বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা বিপর্যয় ও ব্যর্থতার সম্মুখীন। অথচ নারী-পুরুষের মিলন ও একাত্মতাকে সভ্যতার অগ্রগতির কারণ ও বাহনরূপে গণ্য করা হয়েছে চিরকাল। সেজন্যই দেখতে পাই, নারী-পুরুষের মিলনে জীবনে যে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ হওয়া বাঞ্ছনীয় বর্তমান মানুষ তা থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত। বর্তমান সভ্যতা পরিবারকে চূর্ণ করে, পরিবারের গুরুত্ব হ্রাস করে দিয়ে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে রাষ্ট্রকে। অথচ পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। দ্বিতল বা চারতলা প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে যেমন দরকার প্রাথমিক তলাগুলোকে প্রথমে নির্মাণ করা এবং অধিকতর মজবুত করে গড়ে তোলা,— তা নির্মাণ না করেই উপরের তলা নির্মাণের চেষ্টা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক তেমনি বর্তমান সভ্যতা সভ্যতার প্রথম স্তর অর্থাৎ পরিবারকে প্রায় অস্বীকার করেই, তার গুরুত্ব হ্রাস করেই গড়ে উঠতে চাচ্ছে। কিন্তু হাওয়ার ওপর যেমন প্রাসাদ গড়া যায় না, তেমনি পরিবারকে ভিত্তি না করে— ভিত্তি হিসেবে পরিবারকে গড়ে না তুলে— সত্যিকারভাবে স্থায়ী কোনো সভ্যতা কিংবা মজবুত কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। সুস্থ চিন্তার অধিকারী প্রত্যেকটি মানুষের নিকট একথা অত্যন্ত প্রকট।

বর্তমানে ব্যক্তির কাছেও পরিবারের গুরুত্ব যেন অনেকখানিই কমে গেছে। পরিবারের প্রতি কোনো আকর্ষণই সে বোধ করে না। স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর, পুত্র পিতার, পিতা পুত্রের, ভাই ভাইয়ের, ভাই বোনের, বোন ভাইয়ের প্রতি কোনো দরদ অনুভব করছে না। কেউ কারোর ধার ধারে না, পরোয়া করে না। অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে সমাজ জীবনের যে ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, তা শুধু সভ্যতাকেই ধ্বংস করছে না, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকেও দিচ্ছে প্রচণ্ড আঘাত।

পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক সরোকিন বর্তমান দুনিয়ায় পরিবারের গুরুত্ব কম হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন ঃ

> আমরা বর্তমানে খাবার খাই হোটেল রেঁস্তোরায়, আমাদের রুটি বেকারী-কন্‌ফেকশনারী থেকে তৈরী হয়ে আসে আর আমাদের কাপড় ধোয়া হয় লণ্ড্রীতে। পূর্বে মানুষ আনন্দলাভ ও চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে ফিরে যেত পরিবারের নিভৃত আশ্রয়ে; কিন্তু বর্তমানে মানুষ তার জন্যে চলে যায় সিনেমা-থিয়েটার, নাচের আসর ও ক্লাব ঘরের গীতমুখর পরিবেষ্টনীতে। পূর্বে পরিবার ছিল আমাদের আগ্রহ ঔৎসুক্য ও আনন্দ-উৎফুল্লতার কেন্দ্রস্থল, পারিবারিক জীবনেই আমরা সন্ধান করতাম শান্তি, স্বস্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের নির্মলতা; কিন্তু এখন পরিবারের লোকজন হয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত। কিছু লোক একত্রে বাস করলেও তার মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে ফেলেছে সকল প্রীতি, মাধুর্য, অকৃত্রিমতা, আন্তরিকতা ও পবিত্রতা। দিনের বেশির ভাগ সময়ই মানুষ জীবিকার চিন্তায় অতিবাহিত করে, রাত্রিবেলা অন্তত পরিবারের সব লোক একত্রিত হতো। কিন্তু এখন তারা রাত্রি যাপন করে বিচ্ছিন্নভাবে, যার যেখানে ইচ্ছে— সেখানে। এখন আমাদের ঘর আমাদের আরাম বিশ্রামের স্থান নয়, ঘরে রাত্রিদিন অতিবাহিত করার তো এ যুগে কোনো কথাই উঠতে পারে না। একটি গোটা রাত্রি এখন লোকেরা নিজেদের ঘরে যাপন করবে, তা কেউই পছন্দ করে না।

সরোকিনের একথা কেবল পুরুষ ও যুবকদের সম্পর্কেই সত্য নয়, অবিবাহিতা যুবতী ও বিবাহিতা বয়স্কা নারীরাও এক্ষেত্রে কিছুমাত্র কম যায় না।

পরিবার-বিরোধী যুক্তিধারা

যারা পরিবার ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অস্বীকার করে, তারা কিছু কিছু যুক্তিও তার অনুকূলে পেশ করে থাকে। সে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাই সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই তার স্বাভাবিক দাবি—স্বভাবের প্রবণতা। পরিবারের সুদৃঢ়-সুরক্ষিত পরিবেষ্টনীতে বন্দী করে তার এ আযাদীর অধিকার হরণ করা জুলুম বৈ কিছুই নয়।

২. পরিবার মানুষের স্বভাবের দাবি নয়। পারিবারিক জীবনে স্ত্রীকে পুরুষের অধীন হয়ে প্রায় ক্রীতদাসী হয়ে থাকতে হয়, অথচ স্বাধীনভাবে থাকা তার মানবিক অধিকার। পারিবারিক জীবনে তা নির্মমভাবে হরণ করা হয়। একমাত্র পুরুষই সেখানে উপার্জন করে, স্ত্রীকে তার জীবন-জীবিকার জন্যে পুরুষের মুখাপেক্ষী— তথা গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়।

৩. আগের কালে রাষ্ট্র বর্তমানের ন্যায় সর্বাত্মক ও ব্যাপক ভিত্তিক ছিল না। তখন মানুষ পরিবারের মুখাপেক্ষী ছিল, মানুষের জন্যে তা ছিল প্রয়োজনীয়। এখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা থেকেই তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। কাজেই আগের কালে পরিবারের প্রয়োজন থাকলেও বর্তমানে তা ফুরিয়ে গেছে।

৪. পূর্বে সম্মিলিত পারিবারিক জীবন (Joint familly life) থাকার কারণে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ, কিন্তু এখন সে অবস্থা বদলে গেছে। এখন শিশু পালনের জন্যে নার্সারী হোম ও কিন্ডারগার্টেন এবং কর্মক্ষেত্র হচ্ছে কারখানা ও অফিস। কাজেই আজ পারিবারিক সম্বন্ধ অপ্রয়োজনীয়। এবং

৫. বর্তমানে রাষ্ট্র শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্যে যেরূপ সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হচ্ছে, পিতা-মাতার পক্ষে তা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আজ পরিবার ভেঙ্গে গেলে রাষ্ট্র থেকেই সব প্রয়োজন অনায়াসেই পূরণ করা যেতে পারে। এতে মানুষের কোনোরূপ অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকতে পারে না।

পরিবারের গুরুত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে মোটামুটি এই কথাগুলোই বলা হয়ে থাকে। আমাদের পরবর্তী আলোচনা এসব কথারই বিস্তারিত জবাব সম্বলিত। তাতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে যে, এই সব কথা একবারেই মূল্যহীন ও অন্তঃসারশূন্য।

পরিবার-বিরোধী যুক্তির জবাব

পরিবার-বিরোধীদের উক্ত রূপ কথাগুলোর বিস্তারিত জবাব তো এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়ই দেয়া হবে। তবে এখানে একত্রে ও সংক্ষেপে এক-একটি যুক্তির জবাব দেয়া হচ্ছে।

১. প্রথম যুক্তি হিসেবে বলা কথাগুলো প্রকৃত ব্যপার ভুল দৃষ্টি-ভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণের মারাত্মক ফল, সন্দেহ নেই। নিজেরই ঘর ও পরিবারের কাজে-কর্মে ব্যতিব্যস্ত থাকা যে নারীর অসহায়তার প্রমাণ নয়, তা সকলেই বুঝতে পারেন। এজন্যে সমাজ-পরিবেশে নারীর কোনো লাঞ্ছনা হতে পারে না, না এজন্যে তাকে ঘৃণা করা যেতে পারে। মানুষ বেঁচে থাকার জন্যে যেমন রুজী-রোজগারের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করতে বাধ্য, অনুরূপভাবে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা সুষ্ঠু নিরবচ্ছিন্ন জীবন যাপন ও উপার্জিত ধন-সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যয়-বন্টন করতে পারার ওপর নির্ভরশীল। এক ব্যক্তি কেবল উপার্জন করতে সক্ষম, কিন্তু সে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, অবুঝ। আর এক ব্যক্তির অর্থ উপার্জন করার কোনো যোগ্যতাই নেই। পরিণামের দৃষ্টিতে দু'জনার মধ্যে কোনো পার্থক্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি যেমন উপার্জনহীন হওয়ার কারণে নিজের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম, প্রথম ব্যক্তিও ঠিক তেমনি স্বীয় অযোগ্যতা ও কু-অভ্যাসের কারণে বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

পরিবার সংস্থা মূলত নারী ও পুরুষের সম্মিলিত ও পরস্পরের সম-অধিকারসম্পন্ন এক যৌথ প্রতিষ্ঠান। এখানে উভয়ই একত্রে সম্মিলিত জীবন যাপন করে। এ সম্মিলিত জীবনে পুরুষ ঘরের বাইরের কাজ-কর্মের জন্যে দায়িত্বশীল, আর স্ত্রী ঘরের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় ব্যাপারে নিয়ন্ত্রক— ঘরের রানী। এখানে একজনের ওপর অপরজনের মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রধান্যের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। একটি প্রাসাদ রচনার জন্যে যেমন দরকার ইঁটের, তেমনি প্রয়োজন চুনা-সুরকি বা সিমেন্ট-বালির। যদি বলা যায়, ইঁট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান; তাহলে জিজ্ঞাস্য হবে, কেবল ইঁটই কি পারবে বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করতে ?.........পারিবারিক জীবন প্রাসাদ রচনায় নারী ও পুরুষের ব্যাপারটি ঠিক এমনি। একটি সুন্দর পরিবার গঠনে যেমন পুরুষের যোগ্যতা-কর্মক্ষমতার একান্ত প্রয়োজন, তেমনি অপরিহার্য নারীর বিশেষ ধরনের যোগ্যতা ও কর্ম-প্রেরণার— যা অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যাবে না।

২. দ্বিতীয় যুক্তি সম্পর্কে বলা যায়, যে-সমাজে নারীর পক্ষে অর্থোপার্জনের সকল দ্বারই চিররুদ্ধ কেবল সে-সমাজ সম্পর্কেই একথা খাটে। কেননা সেখানে নারীর অস্তিত্ব কেবলমাত্র পুরুষের পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থতার উদ্দেশ্যেই একান্তভাবে নিয়োজিত থাকে। নারী সেখানে না কোনো জিনিসের মালিক হতে পারে, না পারে কোনো ব্যাপারে নিজের মত খাটাতে। কিন্তু এখানে আমরা যে সমাজ-পরিবারের ব্যবস্থা পেশ করতে যাচ্ছি, তার সম্পর্কে একথা কিছুতেই সত্য ও প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা ইসলাম নারীকে ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার দেয়, মীরাসের অংশও সে আইনত লাভ করে থাকে। কিন্তু নারীর দৈহিক গঠন ও মন-মেজাজের বিশেষ রূপ ও ধরন রয়েছে, যা পুরুষ থেকে ভিন্নতর। এ কারণে অর্থোপার্জনের মতো কঠিন ও কঠোর কাজের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করা হয়নি। পুরুষই তার যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে। বিশেষত ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় নারী এক দায়িত্বপূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা। অর্থোপার্জনের চিন্তা-ভাবনা ও খাটা-খাটনীর সাথে তার কোনো মিল নেই, শুধু তাই নয়, তা করতে গেলে নারী তার আসল দায়িত্ব পালনেই বরং ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অন্য এক দিক দিয়েও বিষয়টির পর্যালোচনা করা যেতে পারে। প্রকৃত ব্যাপারকে ভুল দৃষ্টিতে বিচার করলে সঠিক ফল লাভ সম্ভব হতে পারে না। অতীতে নারী অর্থনৈতিক ব্যাপারে পুরুষের মুখাপেক্ষী ছিল বলেই যে সে পুরুষের অধীন বা দাসী হয়ে থাকতে বাধ্য হতো এমন কথা বলা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়— পারিবারিক জীবনের বহুতর ঘটনা এর তীব্র প্রতিবাদ করছে।

চিন্তা করা যায়, যে নারীর স্বামী পঙ্গু, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পরিবারের প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাকে কোন জিনিস প্রেম-ভালোবাসা ও সেবা-যত্নের বন্ধনে বেঁধে রাখে ? কেন সে এমন অপদার্থ স্বামীকে ফেলে চলে যায় না, এ হেন স্বামীর জন্য কেন সে নিজ জীবনের আরাম আয়েশপূর্ণ উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে পর্যন্ত অকাতরে কুরবান করছে ? একটি নারী দুনিয়ার সব ধন-দৌলত, সুখ-সম্ভোগ ও আরাম-আয়েশের ওপর পদাঘাত করেও বিয়ে সম্পর্ককে কেন বাঁচিয়ে রাখে, স্বামীকেই গ্রহণ করে ? যে-সমাজ নারীকে আনন্দ স্ফূর্তি সুখ-সম্ভোগের গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়ার সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধে করে দিচ্ছে, সেখানেও কেন এরূপ ঘটনা সাধারণভাবেই ঘটছে ?— কি তার ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে ?

বাস্তব দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যাবে, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের তত বেশি ভূমিকা নেই, যত আছে অন্যান্য কার্যকারণের। তা না হলে দাম্পত্য জীবনে এমন সব ঘটনা নিত্য ঘটছে, যার দরুণ এ সম্পর্কই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া ছিল অতি স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দুজনকে একত্রিত করার কোনো কারণই দৃষ্টিগোচর হয় না বলে সে দাম্পত্য জীবন অটুটই থেকে যায়।

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের আসল কারণ হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসা, অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত দরদ ও প্রণয়-প্রীতি, যা স্বভাবতই দুজনার মধ্যে বিরাজ করছে। স্বামী ও স্ত্রী উভয় পরস্পরের জন্যে যে অপরিসীম ভালোবাসা ও তীব্র আকর্ষণ বোধ করে, পারিবারিক জীবন-সংস্থা তারই স্থিতিস্থাপকতা বিধান করে। তারা এ জিনিসকে সাময়িকভাবে একত্রিত হওয়ার ভিত্তি বানাতে কখনো রাজি হতে পারে না। বরং তাদের জীবনে এমন কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হতে থাকে, যার পরিপূরণের জন্যে তারা সমগ্র জীবনকে অকাতরে ও ঐকান্তিকভাব লাগিয়ে দেয়। তারা একটি নবতর বংশ সৃষ্টি করার দায়িত্বই পালন করে না, তাদের লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষা দান করে, সমাজের একটা কল্যাণকর অংশে পরিণত করার কাজও তারা-ই করে। এসব উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীকে নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক উর্ধ্বে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

৩. তৃতীয় যুক্তিটি মানবীয় অনুভূতি ও আন্তরিক ভাবাধারার ভুল ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল। সন্তানের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্যের পশ্চাতেও কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ নিহিত রয়েছে বলে ধরে নিলে বলতে হয়, ধনী লোকদের মনে সন্তান কামনা বলতে কিছুই থাকা উচিত নয়। আর সন্তান হলে তাদের জন্যে কোনো স্নেহ-মায়াও থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়। যে শিশু পঙ্গু, অন্ধ, যার থেকে কোনো প্রকারের অর্থনৈতিক স্বার্থ লাভের একবিন্দু আশা থাকে না, বরং বাপ-মায়ের ওপর যে কেবল বোঝা হয়েই রয়েছে, এমন সন্তানকে বাপ-মা কেন বুকে জড়িয়ে রাখে ? তার খবরাখবরের জন্যে তার সেবা-শুশ্রূষা ও তাকে আদর-যত্ন করার জন্যে পিতা মাতা কেন সতত উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে ? সে অনেক টাকা রোজগার করে বাপ-মাকে সাহায্য করবে, এমন কোনো আশা কেউ পোষণ করে কি?— বিবেকের কাছে এ যুক্তিটি আদৌ টিকে না।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সৃষ্টিকর্তা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানব বংশকে ও গোটা সৃষ্টিলোককে বাঁচিয়ে রাখতে চান, এজন্যে প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যেই এমন কিছু স্বাভাবিক দাবি ও প্রবণতা রেখেছেন, যা তাকে আত্মসচেতন করে বাঁচিয়ে রাখে এবং তার নিজের ধ্বংসের পূর্বেই তার স্থলাভিষিক্ত, তার বংশধর তৈরী করতে তাকে বাধ্য করে। এই স্বাভাবিক ভাবধারা নিঃশেষ হয়ে গেলে কোনো সৃষ্টিকেই

তার চূড়ান্ত নিশ্চিহ্নতা থেকে বাঁচানো সম্ভব নয়। শূন্যলোকের স্বাধীন মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ায় যে পাখি, তাকেও এই স্বভাবগত দাবির জন্যেই খড়কুটো আহরণ করে নীড় রচনা করতে হয় এবং স্বাভাবিক কারণেই স্বীয় বংশধরের জন্যে আবাসকেন্দ্র গড়ে তুলতে বাধ্য হতে হয়। তার পরও তাকে সে বংশধরদের বাঁচিয়ে রাখা— লালন-পালন করার জন্যে, শত্রুদের হামলা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্যে সতত ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। গোটা সৃষ্টিলোকেরই এই অবস্থা। আর এই সবই যদি নিতান্ত স্বভাবগত প্রবণতার কারণেই হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের এ স্বাভাবিক প্রবণতা ও তৎপ্রসূত কাজকে অর্থনৈতিক কারণমূলক মনে করা হবে কেন,— কোন যুক্তিতে?

৪. চতুর্থ যুক্তির জবাবে বলতে হচ্ছে, পারিবারিক ব্যবস্থা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ উদ্দেশ্যের বাস্তবিকই যদি কোন গুরুত্ব থেকে থাকে আর মানবতার কল্যাণের জন্যেই তার বাস্তবায়ন জরুরী হয়ে থাকে, তাহলে এ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয় যেসব অবস্থা, তা মানবতার পক্ষে কিছুতেই কল্যাণকর হতে পারে না। কোনো প্রতিষ্ঠান (institution) কায়েম করাই কোনো উদ্দেশ্য হতে পারে না, মানবতার দুঃখ-দরদ ও যন্ত্রনা-লাঞ্ছনা বিদূরণই হচ্ছে আসল লক্ষ্য। কোনো প্রতিষ্ঠান এ উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হলে তার মূলোৎপাটনই বাঞ্ছনীয়। সন্তান ও পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ এনে দেয়ার জন্যে আজ যে-সব প্রতিষ্ঠান দাঁড় করা হয়েছে, পারিবারিক ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে কায়েম রেখে সে সব প্রতিষ্ঠানকে কল্যাণকর ভূমিকায় নিয়োজিত করা যায় কিনা, তাও তো গভীরভাবে ভেবে দেখা আবশ্যক। এ যদি সম্ভবই না হয়, তাহলে বলতে হবে, মানুষ প্রথমে পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তারপরে তার কৃত্রিম বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে— শূন্যস্থান পূরণের জন্যে মাত্র— এসব প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানো হয়েছে। বস্তুত পরিবার ব্যবস্থাকে যথাযথ কায়েম রেখেও এসব প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যৎ মানব বংশের জন্যে কল্যাণকর বানানো যেতে পারে— কিংবা পরিবার ব্যবস্থার অনুকূলে এ ধরনের নবতর আরো অনেক প্রতিষ্ঠান কায়েম করা যেতে পারে— তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫. পঞ্চম যুক্তিটি এমন যা পেশ করতে আধুনিক যুগের লজ্জাবনত হওয়া উচিত বলেই মনে করি। বর্তমান যুগে যেভাবে শিশু-সন্তানদের লালন-পালন করা হচ্ছে, তার বীভৎস পরিণতি দুনিয়ার সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এসব প্রতিষ্ঠান মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে দেয়ার পরিবর্তে নিতান্ত পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। আজকের মানুষের হিংস্রতা ও বর্বরতা জঙ্গলের রক্তজীবী পশুকেও লজ্জা দেয়। আজকের মানব সমাজ জাহান্নামে পর্যবসিত হয়েছে। তার একটি মাত্রই কারণ এবং তা হচ্ছে এই যে, মানুষকে ভালোবাসা, দরদ, প্রীতি, সহানুভূতি প্রভৃতি সুকোমল ভাবধারা থেকে বঞ্চিত করে দিলে তখন আর মানুষ মানুষ থাকবে না, জংগলের হিংস্র জন্তু ও তার মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না— এই কথাটি আজ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। অথচ মানুষের স্বভাবগত এই প্রেম-ভালোবাসা, দরদপ্রীতি স্বাভাবিকভাবে লালিত-পালিত হলে তা মানুষকে ফেরেশতার চেয়েও অধিক মহিমান্বিত বানিয়ে দিতে পারে। আইনের কঠোর শাসন দিয়ে মানুষকে বন্দী জানোয়ার তো বানানো যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। মায়ের মমতা ও স্নেহময় ক্রোড়ই তা জাগাতে পারে। মা তার মমতাসিক্ত দৃষ্টি দিয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মনুষ্যত্বের এমন উচ্চতর জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে, এমন সব মহৎ গুণে তাকে ভূষিত করতে পারে, যা এখনকার কোনো ট্রেনিং কেন্দ্র আর কোনো গবেষণাগারও করতে পারবে না। বস্তুত মা শিশুকে কেবল স্তনই দেয় না, প্রতি মুহূর্তের সাহচর্যে অলক্ষ্যে এমন সব ভাবধারা মগজে বসিয়ে দেয়, যার দরুন এক ক্ষীণ, দুর্বলপ্রাণ শিশু জীবিত থাকে, লালন-পালনে ক্রমশ বর্ধিত হয়ে ওঠে। মায়ের ঘুমপাড়ানি গান শিশুর চোখে কেবল ঘুমই এনে দেয় না, শত্রুতা, ঘৃণা, হিংসা ও মানসিক কুটিলতাকেও স্নেহ-মমতার নির্মল স্রোতধারায় ভাসিয়ে দেয়।

আজকের মা-বাপ খুব ব্যস্ত— এতদূর ব্যস্ত যে, নিজ ঔরসজাত আর গর্ভজাত সন্তানেরও লালন-পালন করার একবিন্দু অবসর পায় না— এ একটি ভিত্তিহীন কথা। মানুষ আজ প্রকৃতই ব্যস্ত নয়, ব্যস্ততার বিলাসিতায় দিগভ্রান্ত মাত্র, যার কারণে মানুষের আসল কর্তব্য আজ উপেক্ষিত হচ্ছে, পাশ কাটাতে চেষ্টা করা হচ্ছে নিতান্ত অবহেলায়। মানুষ আজ দুনিয়ায় অমূলক ভোগ-সম্ভোগের গড্ডালিকা প্রবাহে নিরুদ্দেশের পানে ছুটে চলছে। সকলকে বঞ্চিত করে সকলের ভাগের সব কিছু একাই লুটে পুটে নেয়ার উদ্দাম নেশায় আজকের মানুষ দিশেহারা। ফলে তার আসল মানবীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্যায়ভাবে বর্জিত, অবহেলিত। পরিবার ও পারিবারিক জীবনের প্রতি আজকের মানুষের বিরাগের মূল কারণই হচ্ছে এই। বিবাহিত হয়ে দায়িত্বশীল জীবনের বোঝা আজকের মানুষের মন-মেজাজের কাছে যেন একান্তই দুর্বহ হয়ে পড়েছে। তাই সে পরিবারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ আযাদ ও মুক্ত দিনাতিপাত করতেই অধিকতর আগ্রহী। এজন্যে সে নিজ ঔরসজাত— গর্ভজাত সন্তানকে নার্সারী হোমে পাঠিয়ে দিয়ে সব ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছে। একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার দায়িত্ব না নিয়ে রক্ষিতা আর পতিতা দ্বারা— পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করে যাচ্ছে।

একটু সহজ দৃষ্টিতে বিচার করলেই দেখা যাবে, পরিবার অতি ক্ষুদ্র ও হালকা একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। তার অবশ্য কিছু বাধ্যবাধকতা আছে, আছে কিছু দাবি ও দায়দায়িত্ব। লালন-পালন ও সংগঠনের জন্যে তার নিজস্ব কতগুলো বিশেষ নিয়ম-প্রণালীও রয়েছে। যারা পারিবারিক জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত, তারা সেসব সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম। আর তারাই সেসবের মনস্তাত্ত্বিক ও অভ্যন্তরীণ ভাবধারাকে যথাযথ রক্ষা করে তার লালন-পালনের কর্তব্যও সঠিকভাবে পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি ব্যাপক বড় ও ভারী প্রতিষ্ঠান, যাকে প্রধানত আইন ও শাসনের ভিত্তিতেই চলতে হয়। এখন পরিবারকে ভেঙ্গে দিয়ে যদি গোটা রাষ্ট্রকে একটি পরিবারে পরিণত করে দেয়া হয়, তাহলে পরিবারের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক যে আন্তরিকতা ও দরদ-প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত তা নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে। রাষ্ট্র পরিবারের আইন-বিধানের প্রয়োজন তো পূরণ করতে পারে; কিন্তু নিকটাত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের লোকদের পারস্পরিক আন্তরিক ভাবধারার বিকল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় কোনোক্রমেই।

মানুষের প্রকৃতিই এমনি যে, তাকে যতদূর সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে রেখে লালন-পালন করা হবে, তার অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা-প্রতিভা তত বেশি বিকাশ স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা লাভ করতে সক্ষম হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েই মানুষ বৃহত্তর দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতে পারে। পরিবার ব্যবস্থাকে খতম করে দিয়ে মানব সন্তানকে যদি রাষ্ট্রের বিশাল উন্মুক্ত পরিবেশে সহসাই নিক্ষেপ করে দেয়া হয়, তাহলে তার পক্ষে সঠিক যোগ্যতা নিয়ে গড়ে ওঠা কখনই সম্ভব হবে না। পরন্তু পরিবারকে রাষ্ট্রীয় প্রভাবের বাইরে যথাযথভাবে রক্ষা করা হলে তা মানব বংশের জন্যে এক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র (Training centre) হতে পারে, যার ফলে উত্তরকালে তারাই রাষ্ট্রের বিরাট দায়িত্ব পালনের যোগ্যতায় ভূষিত হবার সুযোগ পাবে।

পূর্বের আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিবার হচ্ছে একটি ছোট্ট সমাজ-সংস্থা (Small Community)। কেননা বৃহত্তম সমাজ-সংস্থার পৌরহিত্যে সাধারণ জীবনের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে দেয় এই পরিবার। এর ফলেই সাধারণ ঐতিহ্য ও সাধারণ ভাবধারাকে বৃহত্তর সমাজে উপস্থাপিত করার সুযোগ হয়ে থাকে।

সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, পরিবার হচ্ছে একটি যৌন সংস্থা (association of sex), সন্তান প্রজননের একটি স্থায়ী কারখানা। আর তা সংস্থাপিত রয়েছে বিয়ে সম্বন্ধের (Contract of marriage) ওপর। তার অর্থ, পরিবার একই সঙ্গে একটি সম্প্রদায় (Community) এবং একটি মহাসম্মিলন (association)। অন্তত এ দুয়ের মাঝখানে পরিবার হচ্ছে একটি অপরিহার্য সোপান (Bridge)।

পরিবার— স্থায়ী সংস্থা

পরিবার কি কোনো কৃত্রিম ও ইচ্ছানুক্রমে উদ্ভাবিত প্রতিষ্ঠান ? তার কি অক্ষয় ও স্থায়ী হয়ে থাকা উচিত ? তার কি একটি বিশ্বজনীন, সর্বদেশের ও সর্বকালের প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত নয় ? বস্তুত মানব ইতিহাসের অতিপ্রাচীন কালেও এ পরিবারের অস্তিত্ব দেখা গেছে এবং মানুষ যদ্দিন এ ধরিত্রীর বুকে থাকবে, তদ্দিন পরিবার অবশ্যই টিকে থাকবে। কালের কুটিল গতি তাকে কিছুতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারবে না। প্লেটো থেকে এইচ. জি. ওয়েলস্ পর্যন্ত দার্শনিকদের প্রস্তাব অনুযায়ী সন্তান-সন্ততিকে বাপ-মা'র সংস্পর্শে ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু এ পদ্ধতিতে সত্যিকার মানুষ তৈরীর জন্যে কোনো সফল প্রচেষ্টা আজো কার্যকর হতে দেখা যায়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিবার হচ্ছে এক স্থায়ী ও অক্ষয় মানবীয় সংস্থা (Human institution) এবং এর এই স্থিতিস্থাপকতার কারণ মানব-প্রকৃতির গভীর সত্তায় নিহিত। অন্য কথায় পরিবার স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যবর্তী কোনো ক্ষণস্থায়ী যোগাযোগের ব্যাপার আদৌ নয়।

প্লেটোর অভিমত

দার্শনিক প্লেটো পরিবারকে একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান (natural Institution) বলে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে পরিবারই হচ্ছে সমাজ জীবনের সব অনৈক্যের (discord) মূলীভূত কারণ। কেননা এই পরিবারই মানুষকে শিক্ষা দেয় ঃ আমি ও তুমি, আমার ও তোমার। অতএব, তাঁর মতে পরিবার প্রথার উচ্ছেদই বাঞ্ছনীয়। তখন সব নারী-পুরুষ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীন ব্যারাকে বসবাস করবে এবং রাষ্ট্রকর্তাদের পর্যবেক্ষণাধীন শ্রেষ্ঠ নর শ্রেষ্ঠ নারীকে গ্রহণ করবে তাদের যৌন-লালসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে। তাদের এই যৌন মিলনের ফলে যখন কোনো নারীর সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তখন-তখনই সে সন্তানকে সরকারী নার্স অন্যত্র তুলে নিয়ে যাবে, যেন সে সন্তান তার পিতামাতাকে জানতে না পারে এবং পিতামাতাও যেন চিনতে না পারে তাদের ঔরসজাত— গর্ভজাত সন্তানকে। এরূপ কার্যক্রমের সর্বশেষ ফল দাঁড়াবে এই— এক দিনে প্রসূত সকল সন্তানকে সব বাবা-মায়ের নিজের সম্মিলিত সন্তান বলে মনে করতে থাকবে। আর কোনো পিতামাতা কোনো সন্তানকেই নিজের সন্তান বলে দাবি করার এবং অন্যদের থেকে পৃথক করে দেখবার সুযোগ পাবে না। এর ফলে রাষ্ট্র সর্ব দিক থেকেই সুরক্ষিত থাকতে পারবে। অন্যথায়, প্রত্যেকটি পরিবারের প্রয়োজন নির্বাহের জন্যে

আলাদা আলাদা সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেবে এবং রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকা 'আমার' ও 'তোমার' মধ্যে বণ্টিত ও খণ্ডিত হয়ে পড়বে। কিন্তু প্রস্তাবিত পন্থায় পরিবারও যেমন নির্ভুল হবে, তেমনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও বিলুপ্ত হবে। আর এর দরুন সমাজের সব বিভেদ ও অনৈক্য বিদূরিত হবে এবং সব অসামঞ্জস্যও বিলীন হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত এর দরুন গোটা রাষ্ট্রই পরিণত হবে একটি মাত্র পরিবারে, আর সে পরিবারের সদস্যরূপে গণ্য হবে দেশের সমস্ত মানুষ।

এ্যারিস্টটলের অভিমত

কিন্তু এ্যারিস্টটল প্লেটোর সাথে এ ব্যাপারে মোটেই একমত নন। তাঁর মতে পরিবার একটি অতি স্বাভাবিক মানবীয় সংস্থা। কেননা এর মূল নিহিত রয়েছে মানুষের নৈত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের গভীর তলে। কোনো মানুষই ব্যক্তিগতভাবে তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনাবলী পরিপূরণের জন্যে তার প্রয়োজন একজন সহকারীর, সাহায্যকারীর, সহকর্মীর। আর স্ত্রী-ই যে হতে পারে তার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সহকারী, সাহায্যকারী, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। এ কারণে নারী পুরুষ পরস্পরের যোগাযোগে আসে কেবল পছন্দের মাধ্যমেই নয়, নিজস্ব অভ্যন্তরীণ আবেগের তাড়নায়ও। অতএব গার্হস্থ্য সমাজ— অন্য কথায় পরিবার— হচ্ছে প্রথম স্বাভাবিক সমাজ, জনসম্মিলন। কেননা এই সম্মিলন স্ত্রী-পুরুষের অন্তঃস্থিত স্বাভাবিক তৃপ্তির অনুভূতির ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয়ত, কেবল সন্তান লাভের কামনায়ই নারী-পুরুষ পরস্পরে সংস্পর্শে আসে না, গার্হস্থ্য জীবনের প্রথম প্রয়োজন— খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের দাবি পূরণের জন্যেও তাদের এই সম্মিলন কাম্য। কাজেই দৈনন্দিন আর্থিক প্রয়োজন পূরণের তাড়নাও গড়ে তোলে পরিবার, পারিবারিক জীবন। আর উভয়ের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কর্মবণ্টন সম্ভব হয়ে থাকে এই পারিবারিক জীবনে।

তৃতীয়ত, মানুষ স্বভাবের দিক দিয়েই সামাজিক জীব এবং নর ও নারী নিজ নিজ প্রজাতীর গুণের কারণে একত্রিত ও সম্মিলিত জীবন যাপনে বাধ্য। এ কারণেই তাদের মিলন অস্থায়ীও যেমন নয়, তেমনি নিছক কার্যকারণ ঘটিতও নয়; বরং এ হচ্ছে একান্তই স্থায়ী ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা। এজন্যে পরিবারকে বলা যায়ঃ

A moral friendship rejoicing in each other's goodness. পরস্পরের কল্যাণ কামনাপূর্ণ নৈতিক বন্ধুত্ব।

বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে এক সুখ ও পরিতৃপ্ত সমাজের প্রথম ধাপ। আর সন্তান লাভ হচ্ছে এ সুখী সমাজের চতুর্থ স্তর। এ কথা প্রমাণ করে যে, পরিবার কেবল যৌন ও পাশবিক জৈবিক জীবন রক্ষার জন্যেই প্রয়োজনীয় নয়, স্বভাবতই এর লক্ষ্য হচ্ছে এক উন্নত নৈতিক পবিত্র ও নির্দোষ জীবন যাপন।

এ সব বাস্তব (Natural) কারণ ছাড়াও— এ্যারিস্টটল বলেন ঃ প্রকৃত প্রেম ভালোবাসা ও প্রীতি-প্রণয় অল্প সংখ্যক মানুষের খুবই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ পরিবেষ্টনীর মধ্যেই উৎসৃষ্ট ও বিকশিত হতে পারে। পরিবেশের লোকসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে, ভালোবাসার মাত্রাও ঠিক সেই অনুপাতে হ্রাস (decreases) প্রাপ্ত হবে। এ কারণেই বলা যায়, পরিবারের একটি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে ভালোবাসা বেশ দানা বেঁধে, ফুলে ফলে সুশোভিত ও শাখায়-প্রশাখায় বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। আর তারই ফলে সাধারণ স্বার্থের ব্যাপারে তা-ই হতে পারে একটি বৃহত্তম ও শক্তিসম্পন্ন মানসিকতা (strong sentiment)। এখানে প্রেম-ভালোবাসার এ জন্মভূমিকেই যদি— প্লেটোর মত অনুযায়ী— বিনষ্ট করে দেয়া হয়, তাহলে গোটা সমাজ সংস্থাই বিশ্লিষ্ট ও শিথিল হয়ে পড়বে। আর শেষ পর্যন্ত সাধারণ

জীবনের অনুকূলে কোনো জোরালো মানসিকতা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন কি, মানসিকতার যে পবিত্র সুকুমার ও সুন্দরতম অনুভূতি তাও নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে শেষ কথা এই যে, পরিবার ভেঙ্গে দিলে মানব-সন্তান তার নৈতিক উদ্বর্তন হারিয়ে ফেলবে। কেননা তারা পিতামাতার স্বাভাবিক স্নেহ-বাৎসল্য থেকে হবে বঞ্চিত। একজন নার্স বা ধাত্রী কি কোনো দিক দিয়েই মা'র স্থলাভিষিক্ত হতে পারে,— যে মা দশমাস কাল যাবত স্বীয় গর্ভে বত্রিশ নাড়ী দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছে তার সন্তানকে! আর বড় কষ্ট ও মর্মান্তিক বেদনা-যন্ত্রণা ভোগ করে তাকে প্রসব করেছে ?— এসব কারণে মা সন্তানের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই যতখানি দরদ ও রক্তের টান অনুভব করবে, ধাত্রী বা নার্স কি তার এক লক্ষ ভাগের একভাগও অনুভব করতে পারে ?— অথচ মানব শিশুর মানুষ হয়ে গড়ে উঠবার জন্যে তা একান্তই অপরিহার্য।

তাছাড়া প্রত্যেকটি মানুষই স্বাভাবিকভাবে নিজস্ব সম্পত্তি গড়ে তুলতে চেষ্টিত হয়ে থাকে। এ তার নিজেরই স্বার্থ, নিজেরই উৎসাহ-উদ্দীপনা। তা যদি সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়, তাহলে তার প্রতি সাধারণের অযত্ন ও অনাসক্তি হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। শিশু সন্তানদের ব্যপারেও একথা অনস্বীকার্য। তাই বলতে হচ্ছে, প্লেটোর কল্পিত সমাজে শিশু-সন্তান যখন কারো নিজস্ব হবে না, হবে সকলের সর্বসাধারণের সমান আপন, (?) তখন প্রকৃতপক্ষে সে শিশু কারোরই নিজের হবে না। তাদের প্রতি সকলের ও সর্বসাধারণের অবজ্ঞা ও অবহেলা হওয়াই স্বাভাবিক। এভাবে একটি মহামূল্য সেবা ও দানের কাজ তার সব মূল্য ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে। সকলেরই 'আপন' বানাবার চেষ্টা কারোই 'আপন' বানাবে না, মনস্তত্ত্বের এ সত্য কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও বলা যায়, একটি সুষ্ঠু পরিবার সুস্থ নাগরিক জীবন গড়ে তোলার জন্যে অপরিহার্য। বরং বলা যায়, সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের জন্যে পরিবারই হচ্ছে প্রথম স্বাভাবিক বীজকেন্দ্র। এর ফলে যদিও একজন নাগরিক পরিবারকেন্দ্রিক এবং সাধারণ সমাজ বিমুখ হয়ে পড়তে পারে; কিন্তু তবুও তার ক্ষতির পরিমাণ পরিবার ধ্বংস করার অনিবার্য পরিণতির তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক কম। সত্য বলতে কি মায়ের বাৎসল্যপূর্ণ চুম্বন এবং পিতার স্নেহপূর্ণ সেবাযত্নের পবিত্র পরিবেশেই জন্ম নিতে পারে মানুষের ভবিষ্যৎ সমাজ। নাগরিকত্বের প্রথম শিক্ষা মায়ের ক্রোড়ে আর বাবার স্নেহছায়াতেই হওয়া সম্ভব। যে দেশে পরিবার নেই কিংবা নেই পারিবারিক শৃঙ্খলা পবিত্রতা সেখানকার বংশধর বা ভবিষ্যত সমাজ যে কতখানি উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন— অতএব দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে গড়ে উঠেছে, বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকা তথা চীন ও রাশিয়া তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। এ দৃষ্টান্ত দেখার পরও যারা পরিবারকে অস্বীকার করার দুঃসাহস করে, তাদেরকে মানবতার শত্রু বলাই শ্রেয়।

একজন পুরুষ ও একজন নারী বিবাহিত হয়ে যখন একসঙ্গে জীবন যাপন করতে শুরু করে, তখনি একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এখানে পুরুষ হয় স্বামী আর নারী হয় স্ত্রী। এ দুয়ের সম্মিলিত ভালোবাসাপূর্ণ যৌন জীবনকেই বলা হয় দাম্পত্য জীবন।

নারী-পুরুষের এ দাম্পত্য জীবনের উদ্‌গাতা হলো বিয়ে। এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য, নির্দিষ্টভাবে স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তির অবাধ ও নিঃশংক চরিতার্থতা। স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা দাম্পত্য জীবনের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। মনের মিল ও পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি এ বন্ধনকে দুশ্ছেদ্য করে তোলে। এর দ্বিতীয় মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশের ধারা অব্যাহত রাখা— উত্তরাধিকারী উৎপাদন। পূর্ব পুরুষের মৃত্যু ও উত্তর পুরুষের মধ্যবর্তীকালে নিজেকে জীবন্ত করে রাখার স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষকে এজন্যে সর্বতোভাবে উদ্যোগী ও তৎপর বানিয়ে দেয়। তখন এ হয় এক চিরন্তন সত্য, এক চিরস্থায়ী বংশ-প্রতিষ্ঠান।

বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন বিশ্বপ্রকৃতির এক স্বভাবসম্মত বিধান। এ এক চিরন্তন ও শাশ্বত ব্যবস্থা, যা কার্যকর হয়ে রয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির পরতে পরতে, প্রত্যেকটি জীব ও বস্তুর মধ্যে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ - (الذاريات : ٤٩)

প্রত্যেকটি জিনিসকেই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।

বস্তুত সৃষ্ট জীব, জন্তু ও বস্তুনিচয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার তাৎপর্যই এই যে, সৃষ্টির মূল রহস্য দুটো জিনিসের পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকাতেই নিহিত রয়েছে। যখনই এভাবে দুটো জিনিসের মিলন সাধিত হবে, তখনই তা থেকে তৃতীয় এক জিনিসের উদ্ভব হতে পারে। সৃষ্টিলোকের কোনো একটি জিনিসও এ নিয়মের বাইরে নয়;একটি ব্যতিক্রমও কোথাও দেখা যেতে পারে না। তাই কুরআন মজীদে দাবি করে বলা হয়েছে ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ - (يس : ٣٦)

মহান পবিত্র সেই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টিলোকের সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন— উদ্ভিদ ও মানবজাতির মধ্য থেকে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে, যার সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'বিয়ে' ও 'সম্মিলিত জীবন যাপন' এবং তার ফলে তৃতীয় ফসল উৎপাদন করার ব্যবস্থা কেবল মানুষ, জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ গাছপালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এ হচ্ছে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত এক সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক জগতের কোনো একটি জিনিসও এ থেকে মুক্ত নয়। গোটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থাই এমনিভাবে রচিত যে, এখানে যত্রতত্র যেমন রয়েছে পুরুষ তেমনি রয়েছে স্ত্রী এবং এ দুয়ের মাঝে রয়েছে এক দুর্লংঘ্য ও অনমনীয় আকর্ষণ, যা পরস্পরকে নিজের দিকে প্রতিনিয়ত তীব্রভাবে টানছে। প্রত্যেকটি মানুষ— স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যেও রয়েছে অনুরূপ তীব্র আকর্ষণ এবং এ আকর্ষণই স্ত্রী ও পুরুষকে বাধ্য করে পরস্পরের সাথে মিলিত হতে— সম্মিলিত ও যৌথ জীবন যাপন করতে। মানুষের অন্তর— অভ্যন্তরে যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা, আকুলতা ও সংবেদনশীলতা রয়েছে বিপরীত লিঙ্গের সাথে একান্তভাবে মিলিত হওয়ার জন্যে, তারই পরিতৃপ্তি ও

প্রশমন সম্ভবপর হয় এই মধু মিলনের মাধ্যমে। ফলে উভয়ের অন্তরে পরম প্রশান্তি ও গভীর স্বস্তির উদ্রেক হয় অতি স্বাভাবিকভাবে।

মানুষের অন্তর্লোকে যে প্রেম ভালোবাসা প্রীতি ও দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-বাৎসল্য ও সংবেদনশীলতা স্বাভবিকভাবেই বিরাজমান, তার কার্যকারিতা ও বাস্তব রূপায়ণ এই বৈবাহিক মিলনের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। এজন্যে হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ اَنَا اللّٰهُ .... وَاَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرِّحْمَ وَ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِّنْ اِسْمِىْ -

(ابوداؤد، ترمذی- وقال حدیث حسن صحیح)

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আমিই আল্লাহ্, আমারই নাম রহমান, অতীব দয়াময়, করুণা নিধান, আমিই ‘রেহেম’ (রক্ত সম্পর্কমূলক আত্মীয়তা) সৃষ্টি করেছি এবং আমার নিজের নামের মূল শব্দ দিয়েই তার নামকরণ করেছি।

অন্য কথায়, প্রেম-প্রীতি, দয়া-সংবেধনশীলতা ও স্নেহ-বাৎসল্য মানব-প্রকৃতি নিহিত এক চিরন্তন সত্য। আর এ সত্যের মুকুল পুষ্পাকৃতি লাভ করতে পারে না এবং এ পুষ্প উন্মুক্ত উদ্ভাসিত হতে পারে না মানব-মানবীর মিলন ব্যতিরেকে। এ মিলনই সম্ভব হতে পারে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে।

পরিবারের ইতিবৃত্ত

বস্তুত বিয়ে নারী ও পুরুষের মাঝে এমন এক একত্ব ও একাত্মতা স্থাপন করে, যা ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হয়ে থাকে। এ ঐক্য (Unification) ও একাত্মতার ভিত্তি হচ্ছে নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক। বিয়ের মাধ্যমেই নারী পুরুষের মাঝে এ একত্ব ও একাত্মতা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তখন নারী-পুরুষের মাঝে কেবল দৈহিক মিলনই অনুষ্ঠিত হয় না, মন ও প্রাণেরও গভীর সূক্ষ্ম মিলনসূত্র গ্রথিত হয়। মন, প্রাণ ও দেহ— এ তিনের মিলন ও একাত্মতা ব্যতীত ‘বিবাহ’ কিংবা পারিবারিক জীবন কল্পনাতীত। আর দৈহিক মিলন ব্যতীত মন ও প্রাণের একাত্মতা সৃষ্টি হতে পারে না, পারে না তা পূর্ণত্ব লাভ করতে। অন্য কথায় দৈহিক মিলন অর্থ যৌন জীবনের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব। নারী ও পুরুষের যৌন-জীবন নির্ভুল রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী কায়েম না হলে কিংবা এ ব্যাপারে পারস্পরিক যৌন ক্ষুধা ও পিপাসা অতৃপ্ত থেকে গেলে না দৈহিক মিলন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে, না মানসিক ও আত্মিক মিলন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান— যার উৎপত্তি হয়েছে নাস্তিকতাবাদী ইউরোপীয় সমাজে— বিয়ের ও পারিবারিক জীবনের এক অদ্ভুত ইতিহাস উপস্থাপিত করেছে। এ ইতিহাস অনুযায়ী অতি প্রাচীনকালে মানব সমাজে বিয়ের আদৌ কোনো প্রচলন ছিল না। মানুষ নিতান্ত পশুর স্তরে ছিল এবং পশুদের ন্যায় জীবন যাপন করত। তখনকার মানুষের একমাত্র লক্ষ্য ছিল খাদ্য সংগ্রহ ও যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি লাভ। যৌন মিলন ছিল নিতান্ত পশুদের ন্যায়। তখনকার সমাজে বিষয়-সম্পত্তির ওপর ছিল না ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার, ছিল না কোনো বিশেষ নারী বিশেষ কোনো পুরুষের স্ত্রী বলে নির্দিষ্ট। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্যে তাদের সম্মুখে ছিল খাদ্য পরিপূর্ণ বিশাল ক্ষেত্র, তেমনি যৌন প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্যে ছিল নির্বিশেষে গোটা নারী সমাজ। উত্তরকালে মানুষ যখন ধীরে ধীরে সভ্যতা ও সামাজিকতার দিকে অগ্রসর হলো, বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক হতে থাকল তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাশক্তি; তখন নারী পুরুষের মাঝে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের এবং বিশেষ পুরুষের জন্যে বিশেষ নারীকে নির্দিষ্ট করার প্রশ্ন দেখা দিল। সন্তান প্রসব, লালন-পালনের ও সংরক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই নারীদের ওপর বর্তে সেজন্যে সেই প্রাথমিক যুগে নারীর গুরুত্ব অনুভূত এবং সমাজ

ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হলো। সেকালে সন্তান পিতার পরিবর্তে মা'র নামে পরিচিত হতো। কিন্তু এ রীতি অধিক দিন চলতে পারেনি। নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের মনোভাব ক্রমে ক্রমে বদলে গেল। নারীদের স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা তাদের স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দখল করে বসল এবং দখলকৃত বিত্ত-সম্পত্তির উপযোগী আইন-কানুন নারীদের ওপরও চালু করল। কিন্তু সমাজ যখন ক্রমবিবর্তনের ধারায় আরো কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে গেল, তখন পরিবার ও গোত্রের ভিত্তি স্থাপিত হলো। রাষ্ট্র ও সরকার সংস্থা গড়ে উঠল। আইন ও নিয়ম-নীতি রচিত হলো। তখন বিয়ের জন্যে নারীদের তার পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে কিংবা নগদ মূল্যের বিনিময়ে লাভ করার রীতি শুরু হল। যদিও মূল্যদানের সে আদিম রীতি আজকের সভ্য সমাজেও কোনো না কোনো রূপ নিয়ে চালু হয়ে আছে। বস্তুত পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বে মানুষকে পশুরই অধঃস্তন মনে করে নেয়া হয়েছে, তাই মানব জীবন ও সমাজের এই পাশবিক সূচনার ইতিহাসও সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে রচনা করে নিতে হয়েছে! কিন্তু তাই মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হবে— এমন কথা সত্য নয়।

একজন স্ত্রী স্বামীর প্রতি চরম মাত্রার অভিমানে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজ স্বামী ও সন্তানদের পরিত্যাগ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েও তার সেই স্বামী সন্তান ও সংসারের একান্ত নিজস্ব পরিমণ্ডলের মায়ায় সে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা এবং পুনরায় স্বামী সন্তান নিয়ে স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার— এবং অনুরূপ কারণে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় গৃহে ফিরিয়ে আনার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাবলী অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, নারী ও পুরুষ উভয়েই প্রকৃতিগতভাবে পারিবারিক জীবন যাপনে একান্তভাবে আগ্রহী। বাইরের অন্যান্য ব্যস্ততার আকর্ষণ যত তীব্র ও দুর্দমনীয় হোক, স্ত্রী বা স্বামীর সন্তান ও সংসারের বিনিময়ে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হওয়া কোনো সুস্থ প্রকৃতির নারী বা পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, চিন্তনীয়ও নয়।

কিন্তু কুরআন মজীদে মানব-সৃষ্টি ও সমাজ-সভ্যতার ইতিহাস যেমন সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে পেশ করা হয়েছে, বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের সূচনা সম্পর্কেও তার উপস্থাপিত ইতিহাস চলেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায়। আধুনিক ইতিহাস যাকে সূচনা ও আদিম বলে ধরে নিয়েছে এবং যা কিছু ভালো ও কল্যাণময়, তাকে ক্রমবিবর্তনের ফলে রূপে তুলে ধরেছে, ইসলামের পারিবারিক ইতিহাস যেহেতু তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এজন্যে সে সূচনা ও আদিকে পরবর্তী কালের কোনো মনুষ্যত্ববোধহীন এক স্তরের ব্যাপার বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু তা-ই যে একমাত্র সূচনা ও আদি, তা স্বীকার করে নেয়া সম্ভব নয়।

কুরআন অনুযায়ী প্রথম মানব যেমন আদম তেমনি মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল আদম ও হাওয়াকে কেন্দ্র করে। উত্তরকালে তাদের সন্তানদের মধ্যেও এ পারিবারিক জীবন পূর্ণ মাত্রায় ও পূর্ণ মর্যাদা সহকারেই প্রচলিত ছিল। এই প্রথম পরিবারের সদস্যদ্বয়— স্বামী ও স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছিলেনঃ

يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا - (الاعراف : ١٩)

হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে একত্রে বসবাস গ্রহণ করো এবং যেখান থেকে মন চায় তোমরা দুজনে অবাধে পানাহার করো।

বস্তুত মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম পরিবার যেমন সর্বতোভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার ছিল, তেমনি তাতে ছিল পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এবং তার ফলে সেখানে বিরাজিত ছিল পরিপূর্ণ তৃপ্তি, শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দ। এ সূচনাকালের পরও দীর্ঘকাল ধরে এ পারিবারিক জীবন-পদ্ধতি ও ধারা মানব সমাজে অব্যাহত থাকে। অবশ্য ক্রমবিবর্তনের কোনো স্তরে মানব-সমাজের কোনো শাখায় এর ব্যতিক্রম ঘটেনি, তেমন কথা বলা যায় না। বরং ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কোনো

কোনো স্তরে মানব জাতির কোনো কোনো শাখায় পতনযুগের অমানিশা ঘনীভূত হয়ে এসেছে এবং সেখানকার মানুষ নানাদিক দিয়ে নিতান্ত পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে শুরু করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ পর্যায়ে এসে তারা ভুলেছে সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানবীয় কর্তব্য। নবীগণের উপস্থাপিত জীবন-আদর্শকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ধাবিত হয়েছে এবং একান্তভাবে নফ্সের দাস ও জৈব লালসার গোলাম হয়ে জীবন যাপন করেছে। তখন সব রকমের ন্যায়নীতি ও মানবিক আদর্শকে যেমন পরিহার করা হয়েছে, তেমনি পরিত্যাগ করেছে পারিবারিক জীবনের বন্ধনকেও। এই সময় কেবলমাত্র যৌন লালসার পরিতৃপ্তিই নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অবস্থা ছিল সাময়িক। বর্তমান সময়েও এরূপ অবস্থা কোথাও-না-কোথাও বিরাজিত দেখতে পাওয়া যায়। তাই মানব সমাজের সমগ্র ইতিহাস যে তা নয় যেমন ইউরোপীয় চিন্তাবিদ্‌রা পেশ করেছেন, তা বলাই বাহুল্য। বর্ণিত অবস্থাকে বড় জোর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমই বলা যেতে পারে। অথচ এই ব্যতিক্রমের কাহিনীকেই ইউরোপীয় ইতিহাসে গোটা মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস বলে ধরে নেয়া হয়েছে। অতএব বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলা যায়, সেটা মানব সমাজের ইতিহাস নয়, তা হলো ইতিহাসের বিকৃতি, মানবতার বিজয় দৃপ্ত অগ্রগতির নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় নগণ্য ব্যতিক্রম মাত্র।

বস্তুত ইসলামী সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবার এবং পারিবারিক জীবন হচ্ছে সমাজ জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। এখানেই সর্বপ্রথম ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্মিলন ঘটে এবং এখানেই হয় অবচেতনভাবে মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের হাতেখড়ি। ইসলামের শারীর-বিজ্ঞানে ব্যক্তি দেহে 'কল্‌ব' قلب এর যে গুরুত্ব, ইসলামী সমাজ জীবনে ঠিক সেই গুরুত্ব পরিবারের, পারিবারিক জীবনের। তাই কল্‌ব সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর বাণী ঃ

اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَ هُوَ الْقَلْبُ -

দেহের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, তা যখন সুস্থ ও রোগমুক্ত হবে, সমস্ত দেহ সংস্থাও হবে সুস্থ ও রোগশূন্য। আর তা যখন রোগাক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন সমগ্র দেহ জগত চরমভাবে রোগাক্রান্ত ও বিষ-জর্জরিত। তোমরা জেনে রাখ যে, তাই হলো কল্‌ব বা হৃদপিণ্ড।

পরিবার সম্পর্কেও একথা পুরোপুরি সত্য। তাই সমাজ জীবনে, সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে সুস্থ করে তোলা যাদের লক্ষ্য, পারিবারিক জীবনকে সুস্থ ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলা তাদের নিকট সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। অন্যথায় সমাজ সংস্কার ও আদর্শিক জাতি গঠনের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না। সুস্বাস্থ্য ও আয়ুর দৃষ্টিতেও বিবাহিত ও পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। ১৯৫৯ সনের ৬ই জুনের পত্রিকায় জাতিসংঘের একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল ঃ বিবাহিত নারী পুরুষ অবিবাহিতদের তুলনায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এ অবিবাহিতরা নারী বা পুরুষ বিধবা তালাকপ্রাপ্ত বা চিরকুমার যাই হয়ে থাক না কেন।

নদীর যে কেন্দ্রস্থল থেকে বহু শাখা-প্রশাখা নানাদিকে প্রবাহিত, সেই সঙ্গম-স্থলের পানি যদি কর্দমাক্ত হয়, যদি হয় বিষাক্ত ও পংকিল, তাহলে সে পানি প্রবাহিত হবে যত উপনদী, ছোট নদী ও খাল-বিলে তা সবই সে পানির সংস্পর্শে তিক্ত ও বিষাক্ত হবে অনিবার্যভাবে। অতএব পারিবারিক জীবন যদি আদর্শভিত্তিক, পবিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ না হয়, তাহলে সমগ্র জীবন— জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগও বিপর্যস্ত, বিষাক্ত ও অশান্তিপূর্ণ হবে, এটাই স্বাভাবিক এবং এর সত্যতায় কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না।

দুনিয়ার ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজ ও জাতির জীবনে ধ্বংস ও বিপর্যয় সংঘটিত হওয়ার যেসব কাহিনী লিখিত রয়েছে, তার যে-কোনোটিরই বিশ্লেষণ ও তত্ত্বানুসন্ধান করে দেখলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, পরিবার ও পারিবারিক জীবনের বিপর্যয়-ই হচ্ছে তার মূলীভূত কারণ। মুসলিম জাতি সংগঠনকালীন ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সুস্থ ও সুন্দর পরিবার গড়ে তোলার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং উত্তরকালে মুসলিম জাতির যে অভ্যুদয় ঘটে তার মূলেও ছিল পারিবারিক দৃঢ় ভিত্তি ও পারিবারিক জীবনের সুস্থতা, পবিত্রতা। মুসলিম জাতির বর্তমান দুর্বলতা ও অধোগতির মূল কারণও যে এই পরিবার ও পারিবারিক জীবনে সূচিত বিপর্যয়, তা দৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীলের নিকট কিছুমাত্র অস্পষ্ট নয়। তাই জাতীয় পূনর্গঠনের এ সন্ধিক্ষণে পরিবার পুনর্গঠনের গুরুত্ব সর্বপ্রথম স্বীকৃতব্য। মুহূর্তের তরেও ভুলে গেলে চলবে না যে, পরিবার ও পারিবারিক জীবনই হলো ইসলামী সমাজের রক্ষাদুর্গ। এ দুর্গের অক্ষুণ্ন ও সুরক্ষিত থাকার ওপরই একান্তভাবে নির্ভর করে ইসলামী সমাজ ও জাতীয় জীবনের পবিত্রতা, সুস্থতা এবং বলিষ্ঠতা ও স্থিতি। মুসলিম জাতির এ দুর্গ এখনো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় নি, যদিও ঘুণে ধরে একে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে অনেকখানি। উপরন্তু পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাবাদ, নগ্ন ও নীতিহীন সভ্যতার ঝঞ্ঝা বায়ু এর ওপর প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে প্রচণ্ডভাবে। আল্লাহ্ না করুন, এ দুর্গও যদি চূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মুসলিম জাতির সামষ্টিক অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ নেই। এ প্রেক্ষিতে এ পর্যায়ের আলোচনা, গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

যৌন স্পৃহার সুষ্ঠু পরিতৃপ্তি ও বিয়ে

বিবাহিত হয়ে পারিবারিক জীবন-যাপন ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য। এতে যেমন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন সম্ভব, তেমনি যৌন মিলনের স্বাভাবিক অদম্য ও অনিবার্য স্পৃহাও সঠিকভাবে এবং পূর্ণ শৃঙ্খলা, নির্লিপ্ততা ও নির্ভেজাল পরিতৃপ্তি সহকারে পূরণ হতে পারে কেবলমাত্র এ উপায়ে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই যে যৌন মিলনের স্পৃহা বিদ্যমান, তার পরিপূরণ ও চরিতার্থতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া একান্তই আবশ্যক। বর্তমান দুনিয়ায় যৌন মিলন স্পৃহা পরিপূরণের জন্যে বিয়ের বাইরে নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হতে দেখা যাচ্ছে। কোথাও হস্তমৈথুন গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্বীয় হস্তদ্বয়ের সাহায্যে নিজের যৌন উত্তেজনা প্রশমিত করার দিকে মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। আধুনিক সভ্য সমাজের এক বিরাট অংশ আজ এ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। এর ফলে ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রকারের অভিনব যৌন ও মানসিক রোগ। এ রোগ একবার যাকে ভালোভাবে পেয়ে বসে, তার পক্ষে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ যেমন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তেমনি বিয়ে করে সাফল্যজনকভাবে পারিবারিক জীবন-যাপন করা তার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভবপর হয় না। কেননা তার অন্যান্য বহু রকমের রোগের সঙ্গে দ্রুত বীর্য-স্খলনের রোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে সে কোনো দিনই স্বীয় স্ত্রীকে যৌন তৃপ্তি দিতে সক্ষম হতে পারে না। আর তা না হলে কোনো স্ত্রীই তার সঙ্গে বিবাহিতা হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে রাজি হবে না।

কোথাও কোথাও দেখা যায়, যৌন মিলন স্পৃহা পরিপূরণের জন্যে সমমৈথুন (homo sexuality) বা পুংমৈথুনের পথ অবলম্বন করা হচ্ছে। এর ফলে নারী বা পুরুষ তারই সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই এই রোগ বর্তমানে মারাত্মক ও সংক্রামক হয়ে দেখা দিয়েছে। আমেরিকার ডঃ কিন্‌সে এ সম্পর্কে দীর্ঘকালীন গবেষণা ও অনুসন্ধান পরিচালনার পর ১৯৪৮ সনে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাতে তিনি বলেন ঃ আমেরিকার পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক লোকদের মধ্যে এ রোগ অতি সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বৃটেনে তো এই কুকর্মকে আইনসিদ্ধই করে নেয়া হয়েছে প্রবল আন্দোলনের মাধ্যমে।

বস্তুত ছোট বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি উচ্ছৃঙ্খল যৌন লালসা দেখা দেয়, তাহলে তারা স্বাভাবিকভাবেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়ে। বরং তার প্রতি তাদের মনে জাগে ঘৃণা ও বিরাগ। আর সমলিঙ্গের প্রতি তারা হয় আকৃষ্ট। ধীরে ধীরে এ রোগই উৎকর্ষ হয়ে সমমৈথুনের মারাত্মক কুঅভ্যাস শক্তভাবে গড়ে ওঠে। সূচনায় যদিও তা এক বালকসুলভ চপলতা মাত্র, কিন্তু ক্রমে তা দৃঢ়মূল অভ্যাসে পরিণত হয়। আর তাই শেষ পর্যন্ত এক অবাঞ্ছিত সামষ্টিক রোগের রূপ পরিগ্রহ করে।

এসব রোগের মনস্তাত্ত্বিক কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ বলেছেন, যে সব ছেলে মায়ের অসদাচরণ দেখতে পায়, স্ত্রী জাতির প্রতি তাদের মনে তীব্র অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। এ কারণে তারা সমলিঙ্গের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মা বাপকে কিংবা কোনো নিকটাত্মীয় পুরুষ স্ত্রীলোককে তারা যা কিছু করতে দেখে অথবা করে বলে তাদের মনে ধারণা জন্মে, তারা তাই সমলিঙ্গের ছেলেমেয়েদের সাথে করতে শুরু করে। ফলে এরা কোনোদিনই বিবাহিত হয়ে বিপরীত লিঙ্গের সাথে স্থায়ী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয় না। বরং বহু দিনের এ কুঅভ্যাসের ফলে বিপরীত লিঙ্গ সম্পর্কে তাদের মনে এক প্রকারের ভীতির সঞ্চার হয়। বিয়ে করা তাদের পক্ষে আর কখনও সম্ভব হয় না কিংবা বিয়ে করে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া তাদের ভাগ্যে জুটে না।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিগমণ্ড ফ্রয়েড তাঁর Psychology of Everyday Life গ্রন্থে লিখেছেনঃ

> এই সমমৈথুন নিষ্ফল ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। এর পরিণাম দুঃখ ও চিন্তা ভারাক্রান্ততা এবং শেষ পর্যন্ত অপমৃত্যু ছাড়া কিছু নয়।

বস্তুত এ কাজ যে অতিশয় কদর্য, বীভৎস ও বদ-অভ্যাস, আর আল্লাহ্‌র বিধানের দৃষ্টিতে কঠিন গুনাহের কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়, মানুষের জীবনীশক্তি ও প্রজনন ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। যে উদ্দেশ্যে মানুষকে নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, এসব কাজে তা বিনষ্ট ও ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ধরনের কাজে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে নিতান্ত পশুতে পরিণত হয়ে যায়। বিবাহিত হয়ে সুস্থ পবিত্র জীবন যাপন করা ও স্থায়ী যৌন মিলন ব্যবস্থায় পরিতৃপ্ত হওয়া এ কুঅভ্যাসের লোকদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিয়ে করে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ করাকে তারা অবাঞ্ছিত ঝামেলা মনে করে থাকে। বর্তমান জগতে এ ধরনের স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা কিছুমাত্র কম নয়।

ঠিক এই কারণেই ইসলামে এ সব কাজ— যৌন স্পৃহা পূরণের এসব অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি ঘুঁজা ও বাঁকা চোরা পথ অবলম্বন— চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। সমমৈথুন সম্পর্কে কুরআন শরীফে কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। লূত নবীর সময়কার এ বদ-অভ্যাসের লোকদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঃ

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَ تَذَرُوْنَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ -

(الشعراء : ١٦٥ - ١٦٦)

> তোমরা পুরুষেরা দুনিয়ায় পুরুষদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছ, আর পরিত্যাগ করছ তোমাদের জন্যে সৃষ্ট তোমাদের স্ত্রীদের ?— তোমরা হচ্ছ সীমালংঘনকারী লোক।

এ আয়াত পুরুষদের দ্বারা পুরুষদের (এবং মেয়েদের দ্বারা মেয়েদের)-কে যৌন উত্তেজনা পরিতৃপ্ত করা (লেওয়াতাত)-কে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছে। যৌন উত্তেজনা পরিতৃপ্তির জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্যে বিপরীত লিঙ্গের সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান বা দেহাংশ রয়েছে। আর এ উদ্দেশ্যে কেবল তাই গ্রহণ করা কর্তব্য, উভয়ের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এ হচ্ছে সকলের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ নেয়ামত। এ নেয়ামত গ্রহণ না করে যারা এর বিপরীত সমমৈথুনে মনোযোগ দেয় তারা বাস্তবিকই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে, তারা মানবতার কুলাংগার। কুরআন মজীদে এজন্যে কঠোর দণ্ডের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَ اَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا -

(النساء : ١٦)

> তোমাদের মধ্যে যে দুজন পুরুষ (বা স্ত্রী) এ অন্যায় কাজ করবে, তাদের দুজনকেই শাস্তি দাও। তার পরে যদি তারা তওবা করে ও নিজেদের চরিত্র সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অতীব তওবা কবুলকারী দয়াবান।

অর্থাৎ দুজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ একজন নারী অথবা দুজনই নারী যদি চরিত্রহীনতার কাজ করে বসে, তবে সে দুজনকেই কঠোর শাস্তি দিতে হবে। শাস্তি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সদুপদেশ ও ভালো নসীহতও করতে হবে। এ আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন (হিজরীর তৃতীয়-চতুর্থ বছর পর্যন্ত) যিনা ও লেওয়াতাত উভয়-রকম পাপেরই শাস্তি ছিল এই। জ্বিনার শাস্তির হুকুম পরে নাযিল হয়; কিন্তু লেওয়াতাতের শাস্তিস্বরূপ অন্য কিছু নাযিল হয়নি। ফলে কুরআনবিদদের মধ্যে আয়াতটির প্রয়োগক্ষেত্র

নিয়ে কিছুটা মতভেদের সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন দেখা দেয়, জ্বিনার এই শাস্তি লেওয়াতাতের ব্যাপারে প্রযোজ্য, না পূর্বশাস্তিই এ ব্যাপারে বহাল রাখা হয়েছে! এর অপরাধীকে কেবল হত্যা করা হবে, না অপর কোনো রকম শাস্তি দেয়া হবে?— অনেকে এ আয়াতকে যিনার ব্যাপারেই প্রযোজ্য বলেছেন, অনেকে বলেছেন, লেওয়াতাতের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আবার অনেকে এই উভয় প্রকারের অপরাধের শাস্তির ব্যাপারে এ আয়াত প্রযোজ্য বলে মনে করেছেন।

হাদীস শরীফে এ অপরাধের দণ্ড হিসাবে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ وَّجَدْ تُّمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ - (ترمذى)

যে দুজনকেই তোমরা লেওয়াতাতের (সমমৈথুন) কাজ করতে দেখতে পাবে, তাদেরকেই তোমরা হত্যা করবে।

লেওয়াতাতকারী বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত, ইমাম মালিক, ইমাম শাফয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায় ও অন্যান্য ফিকাহবিদের মতে তাদের ওপর রজম— পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলার দণ্ড— কার্যকর করতে হবে। হাসান বসরী, ইবরাহীম নখয়ী, আতা ও আবূ রিবাহ প্রমুখ মনীষী বলেছেন ঃ

حَدُّ اللُّوْطِيْ حَدُّ الزَّانِيْ - —জ্বিনাকারীর জন্যে দণ্ডই লেওয়াতাতকারীর দণ্ড।

সুফিয়ান সওরী ও কুফার ফিকাহবিদদের মতও এই। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, ১৮৯ পৃঃ)

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِيْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ - (مسند احمد : ج -١٦، ص - ١٠٣)

আমার উম্মতদের সম্পর্কে যেসব বিষয় আমি আশংকা বোধ করি ও ভয় পাচ্ছি, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আশংকার বিষয় হচ্ছে লেওয়াতাতের পাপে লিপ্ত হওয়া।

বস্তুত তিরমিযী শরীফের এক হাদীসের ঘোষণানুযায়ী লেওয়াতাতকারী আল্লাহ্র অভিশপ্ত, আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত। হযরত আলী (রা) লেওয়াতাতকারী দুই ব্যক্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাদের ওপর দেওয়াল ভেঙ্গে দিয়ে তাদের হত্যা করেছিলেন। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'নারী যখন অপর নারীর সংস্পর্শে যৌন তৃপ্তি গ্রহণ করে, তখন তারা দুজনই ব্যভিচারিণী'।

হস্তমৈথুনকারী সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ হস্তমৈথুনকারী অভিশপ্ত।

এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক নারী-পুরুষের স্বাভাবিক যৌন স্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা সুষ্ঠু ও পবিত্র পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর সে পথ হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত হওয়া। এ ছাড়া অন্য যত পথই রয়েছে— মানুষ ব্যবহার করছে— সবই স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ, মনুষ্যত্বের পক্ষে অন্য সব পথই হচ্ছে সর্বতোভাবে মারাত্মক। এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে সাবধান ও সতর্ক হতে বলে বিয়ের একমাত্র পথ পেশ করেছেন এবং বিয়ে ছাড়া অন্যান্য সব পথকেই সীমালংঘনকারী বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ - (المؤمنون : ٥-٧)

আর সফলকাম হবে সে-সব মু'মিন, যারা তাদের যৌন-স্থানকে পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। তারা নিষ্কলংকের সাথে যৌন সম্ভোগ করে কেবলমাত্র তাদের বিয়ে করা স্ত্রীদের সঙ্গে কিংবা ক্রীতদাসীদের সঙ্গে। আর যারা এ নির্দিষ্ট ছাড়া অন্য পথে যৌন অঙ্গের ব্যবহার করবে, তারা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, বান্দার কল্যাণ নির্ভর করে তার যৌন অঙ্গের সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহারের ওপর। এ না হলে বান্দাহর কল্যাণ লাভের আর কোনো পথ বা উপায় নেই।

এ আয়াত মোটামুটি তিনটি কথা প্রমাণ করে। যে লোক স্বীয় যৌন অঙ্গের সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহার করে না, সে কখনই কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পারে না। সে অবশ্যই ভর্ৎসিত ও ধিকৃত হবে, সে হবে সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারী মাত্রই সমস্ত কল্যাণ থেকে হবে বঞ্চিত। বরং সে সীমালংঘনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন ঃ

لَا اَعْلَمُ بَعْدَ الْقَتْلِ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنَ الزِّنٰى -

নরহত্যার পর জ্বিনা-ব্যভিচার অপেক্ষা বড় গুনাহ আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একদা নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ اَيُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ —সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?' রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ —আল্লাহ্ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কাউকে মেনে নেয়াই হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ্।' তিনি আরো বললেন ঃ তারপরে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে খাদ্যাভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করা এবং তার পরের বড় গুনাহ হচ্ছে ঃ اَنْ تَزْنِىْ حَلِيْلَةَ جَارِكَ '—তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।'

এ থেকে জানা গেল, জ্বিনা মূলতই কবীরা গুনাহ। তবে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তা করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। (محاسن التاويل ج ١١ : ص ٤٣٨٨)

সূরা আহ্যাব-এর এক আয়াতাংশে যৌন অঙ্গের হেফাযত করা— জায়েয পথে তার ব্যবহার করা এবং অন্য পথে তার ব্যবহার না করা সম্পর্কে অনুরূপ তাগিদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন।

وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا -
(الاحزاب: ٣٥)

যারা নিজেদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে, তারা পুরুষ হোক কি স্ত্রীলোক— আর যারা খুব বেশি আল্লাহ্র স্মরণ করে স্ত্রীলোক কি পুরুষ— আল্লাহ্ তাদের জন্যে বহু বড় সওয়াবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

যৌন অঙ্গের অর্থনৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখা এবং যৌন অঙ্গকে খারাপ পথে ও হারামভাবে ব্যবহার না করা। এ চরিত্র যারা গ্রহণ করবে আর যেসব নারী-পুরুষ স্বামী-স্ত্রী— আল্লাহ্র স্মরণ করবে, বিশেষ করে যৌন অঙ্গের ব্যবহারের ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করবে তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বড় পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। ইসলামে নৈতিক চরিত্রের যা মূল্যমান, দুনিয়ার অপর কোনো ধর্ম বা জীবন বিধানেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং বলা যায়, অন্য কোনো মানবিক বিধানেই তার দৃষ্টান্ত নেই। এ কারণে রাসূলে করীম (স) সব সময়ই নও-মুসলিম নারীর নিকট থেকে যিনা না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন। কুরআন মজীদের সূরা 'আল-মুমতাহিনা'য় এই প্রতিশ্রুতির কথা নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ - (الممتحنة: ١٢)

এবং তারা প্রতিশ্রুতি দিত এই বলে যে, তারা ব্যভিচার করবে না আর তাদের সন্তান হত্যা করবে না।

দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মে, মতাদর্শে, সমাজে ও সভ্যতায় নারী ও পুরুষকে কি দৃষ্টিতে দেখা হয়—বিশেষত নারী সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করা হয়, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা একান্ত জরুরী। এই পর্যায়ে প্রথমে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করা হচ্ছে। পরে অন্যান্য দিক নিয়েও পর্যালোচনা করা হবে।

নারী-পুরুষের একত্ব

ইসলামে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করা হয়, তা কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً - (النساء : ١)

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই আল্লাহ্কে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক জীবন্ত সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুড়ি। আর এই উভয় থেকেই অসংখ্য পুরুষ ও নারী (সৃষ্টি করে) ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এ আয়াতে সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মধ্যে যেমন রয়েছে পুরুষ, তেমনি নারী। এ উভয় শ্রেণীর মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, পুরুষ ও নারী একই উৎস থেকে প্রবাহিত মানবতার দুটি স্রোতধারা। নারী ও পুরুষ একই জীবন-সত্তা থেকে সৃষ্ট, একই বংশ থেকে নিঃসৃত। দুনিয়ার এই বিপুল সংখ্যক নারী ও পুরুষ সেই একই সত্তা থেকে উদ্ভূত। নারী আসলে কোনো স্বতন্ত্র জীবসত্তা নয়, না পুরুষ। নারীও পুরুষের মতোই মানুষ, যেমন মানুষ হচ্ছে এই পুরুষরা। এদের কেউ-ই নিছক জন্তু জানোয়ার নয়। মৌলিকতার দিক দিয়ে এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পুরুষের মধ্যে যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, নারীর মধ্যেও তা বিদ্যমান। এ সব দিক দিয়েই উভয়ে উভয়ের একান্তই নিকটবর্তী, অতীব ঘনিষ্ঠ। এজন্যে তাদের যেমন গৌরব বোধ করা উচিত, তেমনি নিজেদের সম্মান ও সৌভাগ্যের বিষয় বলেও একে মনে করা ও আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া কর্তব্য।

প্রথম মানবী হাওয়াকে প্রথম মানব আদম থেকে সৃষ্টি করার মানেই হচ্ছে এই যে, আদম সৃষ্টির মৌলিক উপাদান যা কিছু তাই হচ্ছে হাওয়ারও। আয়াতের শেষাংশ থেকে জানা যায়, মূলত নারী-পুরুষ জাতির বোন আর পুরুষরা নারী জাতির সহোদর কিংবা বলা যায়, নারী পুরুষেরই অপর অংশ এবং এ দুয়ে মিলে মানবতার এক অভিন্ন অবিভাজ্য সত্তা।

সূরা আল-হুজুরাত-এ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - (الحجرت : ١٣)

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও বংশ-শাখায় বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় লাভ করতে পার।

তবে একথা নিশ্চিত যে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ।

এ আয়াত থেকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বড় বড় যে কয়টি কথা জানা যায়, তা হচ্ছে এই ঃ

১. দুনিয়ার সব মানুষ— সকল কালের, সকল দেশের, সকল জাতের ও সকল বংশের মানুষ-কেবলমাত্র আল্লাহ্র সৃষ্টি।

২. আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসেবে দুনিয়ার সব মানুষ সমান, কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়; কেউ উচ্চ নয়, কেউ নীচ নয়। সৃষ্টিগতভাবে কেউ শরীফ নয়, কেউ নিকৃষ্ট নয়। উভয়ের দেহেই একই পিতামাতার রক্ত প্রবাহিত।

৩. দুনিয়ার সব মানুষই একজন পুরুষ ও একজন নারীর যৌন-মিলনের ফলে হিসেবে সৃষ্ট। দুনিয়ার এমন কোনো পুরুষ নেই, যার সৃষ্টি ও জন্মের ব্যাপারে কোন নারীর প্রত্যক্ষ দান নেই কিংবা কোনো নারী এমন নেই, যার জন্মের ব্যাপারে কোনো পুরুষের প্রত্যক্ষ যোগ অনুপস্থিত। এ কারণে নারী-পুরুষ কেউই কারো ওপর কোনোরূপ মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না এবং কেউই অপর কাউকে জন্মগত কারণে হীন, নীচ, নগণ্য ও ক্ষুদ্র বলে ঘৃণা করতেও পারে না। মানবদেহের সংগঠনে পুরুষের সঙ্গে নারীরও যথেষ্ট অংশ শামিল রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নারীর অংশই বেশি থাকে প্রত্যেকটি মানব শিশুর দেহ সৃষ্টিতে।

নারী ও পুরুষ যে সবদিক দিয়ে সমান, প্রত্যেকেই যে প্রত্যেকের জন্যে একান্তই অপরিহার্য— কেউ কাউকে ছাড়া নয়, হতে পারে না, স্পষ্টভাবে জানা যায় নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে ঃ

اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ - (ال عمران : ١٩٥)

নিশ্চয়ই আমি নষ্ট করে দেই না তোমাদের মধ্য থেকে কোনো আমলকারীর আমলকে, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে— আসলে এক ও অভিন্ন।

তাফসীরকারগণ 'তোমরা পরস্পর পরস্পর থেকে, আসলে এক ও অভিন্ন' আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, এ বাক্যটুকু ধারাবাহিক কথার মাঝখানে বলে দেয়া একটি কথা। এ থেকে এ কথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, তাতে পুরুষদের সাথে নারীরাও শামিল। কেননা পরস্পর পরস্পর থেকে হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, এরা সবাই একই আসল ও মূল থেকে উদ্ভূত এবং তারা পরস্পরের সাথে এমনভাবে জড়িত ও মিলিত যে, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যের প্রাচীর তোলা কোনোক্রমে সম্ভব নয়। দ্বীনের দৃষ্টিতে তারা সমান, সেই অনুযায়ী আমল করার দায়িত্বও দু'জনার সমান এবং সমানভাবেই সে আমলের সওয়াব পাওয়ার অধিকারী তারা। এক কথায় নারী যেমন পুরুষ থেকে, তেমনি পুরুষ নারী থেকে কিংবা নারী-পুরুষ উভয়ই অপর নারী-পুরুষ থেকে প্রসূত।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ - (البقرة : ١٨٧)

মেয়েরা হচ্ছে পুরুষদের পোশাক, আর তোমরা পুরুষরা হচ্ছ মেয়েদের পরিচ্ছদ।

এ আয়াতেও নারী ও পুরুষকে একই পর্যায়ে গণ্য করা হয়েছে এবং উভয়কেই উভয়ের জন্যে 'পোশাক' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত 'লেবাস" لباس শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'লেবাস' মানে পোশাক, যা পরিধান করা হয়, যা মানুষের দেহাবয়ব আবৃত করে রাখে। প্রখ্যাত মনীষী রবী ইবনে আনাস বলেছেন ঃ স্ত্রীলোক পুরুষদের জন্যে শয্যাবিশেষ আর পুরুষ হচ্ছে স্ত্রীলোকদের জন্য লেপ। স্ত্রী পুরুষকে পরস্পরের 'পোশাক' বলার তিনটি কারণ হতে পারে ঃ

১. যে জিনিস মানুষের দোষ ঢেকে দেয়, দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখে, দোষ প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাই হচ্ছে পোশাক। স্বামী-স্ত্রীও পরস্পরের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখে— কেউ কারো কোনো প্রকারের দোষ দেখতে বা জানতে পারলে তার প্রচার বা প্রকাশ করে না— প্রকাশ হতে দেয় না। এজন্যে একজনকে অন্যজনের 'পোশাক' বলা হয়েছে।

২. স্বামী-স্ত্রী মিলন শয্যায় আবরণহীন অবস্থায় মিলিত হয়। তাদের দুজনকেই আবৃত রাখে মাত্র একখানা কাপড়। ফলে একজন অন্যজনের পোশাকস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এদিক দিয়ে উভয়ের গভীর, নিবিড়তম ও দূরত্বহীন মিলনের দিকের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

৩. স্ত্রী পুরুষের জন্যে এবং পুরুষ স্ত্রীর জন্যে শান্তিস্বরূপ। যেমন অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

(مفردات راغب اصفهانی)

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا - (الاعراف : ٩ -١)

এবং তার থেকেই তার জুড়ি বানিয়েছেন যেন তার কাছ থেকে মনের শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে।

ইবনে আরাবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اَلْمَعْنٰى هُنَّ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الثَّوْبِ وَيُفْضِىْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ اِلٰى صَاحِبِهٖ وَيَسْتَتِرُ بِهٖ وَ يَسْكُنُ اِلَيْهَا

(احکام القران :ج - ١، ص - ٩٠)

পুরুষের জন্য স্ত্রীরা কাপড় স্বরূপ, একজন অপর জনের নিকট খুব সহজেই মিলিত হতে পারে। তার সাহায্যে নিজের লজ্জা ডাকতে পারে, শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে।

তিনি আরো বলেছেন যে, এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর কেউ নিজেকে অপর জনের থেকে সম্পর্কহীন করে ও দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না, কেননা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মিল-মিশ ও দেখা-সাক্ষাত খুব সহজেই সম্পন্ন হতে পারে।

অন্যরা বলেছেনঃ

كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مُّتَعَفِّفٌ بِصَاحِبِهٖ يَسْتَتِرُ بِهٖ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهٗ مِنَ لتَّعَرِّىْ مَعَ غَيْرِهٖ - (ايضًا)

প্রত্যেকেই অপরের সাহায্যে স্বীয় চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে পারে। স্ত্রী ছাড়া অপর কারো সামনে বিবস্ত্র হওয়া হারাম বলে এ অসুবিধা থেকেও এই স্ত্রীর সাহায্যেই রেহাই পেতে পারে।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ - (احمد، ابوداؤد، ترمذی)

মেয়েলোকেরা যে পুরুষদেরই অর্ধাংশ কিংবা সহোদর এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তুত নারী ও পুরুষ যেন একটি বৃক্ষমূল থেকে উদ্ভূত দুটি শাখা।

অন্যান্য ধর্মমত— অন্যান্য মতাদর্শ

কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মমত ও মতাদর্শের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের এ সমান মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত।

ইহুদী ধর্মে নারীকে 'পুরুষের প্রতারক' বলে অভিহিত করে হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট (আদি পুস্তক)-এ হযরত [illegible] ও হাওয়ার জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ব্যাপারটিকে এভাবে পেশ করা হয়েছে ঃ

তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে, তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম। কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি। তিনি কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ উহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, তুমি এ কি করিলে? নারী কহিলেন, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাই খাইয়াছি। (আদি পুস্তক— মানব জাতির পাপের পতন ১০-১১ ক্ষেত্র)

এর অর্থ এই হয় যে, বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হওয়া আদম তথা মানব জাতির পক্ষে অভিশাপ বিশেষ এবং এ অভিশাপের মূল কারণ হচ্ছে নারী— আদমের স্ত্রী। এজন্যে স্ত্রীলোক সে সমাজে চিরলাঞ্ছিতা এবং জাতীয় অভিশাপ, ধ্বংস ও পতনের কারণ। এজন্যে পুরুষ সব সময়ই নারীর ওপর প্রভুত্ব করার স্বাভাবিক অধিকারী। এ অধিকার আদমকে হাওয়া বিবি কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর শাস্তি বিশেষ এবং যদ্দিন নারী বেঁচে থাকবে, ততদিনই এ শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে।

ইহুদী সমাজে নারীকে ক্রীতদাসী না হলেও চাকরানীর পর্যায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে বাপ নিজ কন্যাকে নগদ মূল্যে বিক্রয় করতে পারত, মেয়ে কখনো পিতার সম্পত্তি থেকে মীরাস লাভ করত না, করত কেবল তখন, যখন পিতার কোনো পুত্র সন্তানই থাকত না।

প্রাচীনকালে হিন্দু পণ্ডিতরা মনে করতেন, মানুষ পারিবারিক জীবন বর্জন না করলে জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হতে পারে না। মনু'র বিধানে পিতা, স্বামী ও সন্তানের কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়ার মতো কোনো অধিকার নারীর জন্যে নেই। স্বামীর মৃত্যু হলে তাকে চির বৈধব্যের জীবন যাপন করতে হয়। জীবনে কোনো স্বাদ-আনন্দ-আহ্লাদ-উৎসবে অংশ গ্রহণ তার পক্ষে চির নিষিদ্ধ। নেড়ে মাথা, সাদা বস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ খেয়ে জীবন যাপন করতে হয় তাকে।

প্রাচীন হিন্দু ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প, আগুন-এর কোনোটিই নারী অপেক্ষা খারাপ ও মারাত্মক নয়।

যুবতী নারীকে দেবতার উদ্দেশ্যে— দেবতার সন্তুষ্টির জন্যে কিংবা বৃষ্টি অথবা ধন-দৌলত লাভের জন্যে বলিদান করা হতো। একটি বিশেষ গাছের সামনে এভাবে একটি নারীকে পেশ করা ছিল তদানীন্তন ভারতের স্থায়ী রীতি। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সহমৃত্যু বরণ বা সতীদাহ রীতিও পালন করতে হতো অনেক হিন্দু নারীকে।

অনেক সমাজে নারীকে সকল পাপ, অন্যায় ও অপবিত্রতার কেন্দ্র বা উৎস বলে ঘৃণা করা হতো। তারা বলত, এখনকার নারীরা কি বিবি হাওয়ার সন্তান নয়? আর হাওয়া বিবি কি আদমকে আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি?— পাপের কাজকে তার সামনে আকর্ষণীয় করে তোলেনি? ধোঁকা দিয়ে পাপে লিপ্ত করেনি? আর মানব জাতিকে এই পাপ-পংকিল দুনিয়ার আগমনের জন্যে সেই কি দায়ী নয়? সত্যি কথা এই যে, হাওয়া বিবিই হচ্ছে শয়তান প্রবেশের দ্বারপথ, আল্লাহ্র আনুগত্য ভঙ্গ করার কাজ সেই সর্বপ্রথম শুরু করেছে। এ কারণে তারই কন্যা বর্তমানের এ নারী সমাজেরও অনুরূপ পাপ কাজেরই উদগাতা হওয়া স্বাভাবিক। তাই নারীরা হচ্ছে শয়তানের বাহন, নারীরা হচ্ছে এমন বিষধর সাপ, যা পুরুষকে দংশন করতে কখনো কসুর করেনি।

এসব মতের কারণে দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতায় নারী জাতির মর্মান্তিক অবস্থা দেখা গিয়েছে। এথেন্সবাসীরা হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য প্রাচীনতম জাতি। কিন্তু সেখানে নারীকে পরিত্যক্ত দ্রব্য-সামগ্রীর মতো মনে করা হতো। হাটে-বাজারে প্রকাশ্যভাবে নারীর বেচা-কেনা হতো। শয়তান অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত ছিল সেখানে নারী। ঘরের কাজকর্ম করা এবং

সন্তান প্রসব ও লালন-পালন ছাড়া অন্য কোনো মানবীয় অধিকারই তাদের ছিল না। স্পার্টাতে আইনত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ থাকলেও কার্যত প্রায় প্রত্যেক পুরুষই একাধিক স্ত্রী রাখত। এমনকি নারীও একাধিক পুরুষের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে সেখানে বাধ্য হতো। সমাজের কেবল নিম্নস্তরের মেয়েরাই নয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা-বৌ'রা পর্যন্ত এ জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকত। রুমানিয়ায়ও এর রেওয়াজ ছিল ব্যাপকভাবে। শাসন কর্তৃপক্ষ দেশের সব প্রজা-সাধারণের জন্য একাধিক বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সমাজের কোনো লোক— পাদ্রী-পুরোহিত কিংবা সমাজ-নেতা কেউই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেনি।

ইহুদী সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল আরো মারাত্মক। মদীনার 'ফিতুম' নামক এক ইহুদী বাদশাহ আইন জারী করেছিল ঃ "যে মেয়েকেই বিয়ে দেওয়া হবে, স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে এক রাত্রি যাপন করতে হবে।" (وفاء باخبار دار المصطفى جـ ١، صـ ١٣٤-١٣٥)

খ্রিস্টধর্মে তো নারীকে চরম লাঞ্ছনার নিম্নতম পংকে নিমজ্জিত করে দেয়া হয়েছে। পোলিশ লিখিত এক চিঠিতে বলা হয়েছে ঃ নারীকে চুপচাপ থেকে পূর্ণ আনুগত্য সহকারে শিক্ষালাভ করতে হবে। নারীকে শিক্ষাদানের আমি অনুমতি দেই না; বরং সে চুপচাপ থাকবে। কেননা আদমকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পরে হাওয়াকে। আদম প্রথমে ধোঁকা খায় নি, নারীই ধোঁকা খেয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়েছে।

জনৈক পাদ্রীর মতে নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল। তারা আল্লাহ্‌র মান-মর্যাদার প্রতিবন্ধক, আল্লাহ্‌র প্রতিরূপ, মানুষের পক্ষে তারা বিপজ্জনক। পাদ্রী সন্তান বলেছেন ঃ নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী, ঘরে ও সমাজে যত অশান্তির সৃষ্টি হয়, সব তারই কারণে। এমন কি, নারী কেবল দেহসর্বস্ব, না তার প্রাণ বলতে কিছু আছে, এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে বড় বড় খ্রিস্টান পাদ্রীদের এক কনফারেন্স বসেছিল 'মাকুন' নামের এক জায়গায়।

ইংরেজদের দেশে ১৮০৫ সন পর্যন্ত আইন ছিল যে, পুরুষ তার স্ত্রীকে বিক্রয় করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এক একটি স্ত্রীর দাম ধরা হয়েছিল অর্ধশিলিং। এক ইটালীয়ান স্বামী তার স্ত্রীকে কিস্তি হিসেবে আদায়যোগ্য মূল্যে বিক্রয় করেছিল। পরে ক্রয়কারী যখন কিস্তি বাবদ টাকা দিতে অস্বীকার করে, তখন বিক্রয়কারী স্বামী তাকে হত্যা করে।

অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ফরাসী পার্লামেন্টে মানুষের দাস প্রথার বিরুদ্ধে যে আইন পাস হয়, তার মধ্যে নারীকে গণ্য করা হয় নি। কেননা অবিবাহিতা নারী সম্পর্কে কোনো কিছু করা যেতো না তাদের অনুমতি ছাড়া। (المراة بين الفقه والقانون صـ ٢١)

৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বহু চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা-গবেষণা ও তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, নারী জন্তু নয়— মানুষ। তবে সে এমন মানুষ যে, পুরুষের কাজে নিরন্তর সেবারত হয়ে থাকাই তার কর্তব্য। কিন্তু তাই বলে তাকে শয়তানের বাহন, সব অন্যায়ের উৎস ও কেন্দ্র এবং তার সাথে সম্পর্ক রাখা অনুচিত প্রভৃতি ধরনের যেসব কথা বলা হয়, তার প্রতিবাদ বা প্রত্যাহার করা হয়নি। কেননা এগুলো ছিল তার স্থির ও মজ্জাগত আকীদা।

(المراة بين البيت و المجمع صـ ٧٦)

গ্রীকদের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা কি ছিল, তা তাদের একটা কথা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সেখানে বলা হতোঃ

আগুনে জ্বলে গেলে ও সাপে দংশন করলে তার প্রতিবিধান সম্ভব; কিন্তু নারীর দুষ্কৃতির প্রতিবিধান অসম্ভব।

পারস্যের 'মাজদাক' আন্দোলনের মূলেও নারীর প্রতি তীব্র ঘৃণা পুঞ্জীভূত ছিল। এ আন্দোলনের প্রভাবাধীন সমাজে নারী পুরুষের লালসা পরিতৃপ্তির হাতিয়ার হয়ে রয়েছে। তাদের মতে দুনিয়ার সব অনিষ্টের মূল উৎস হচ্ছে দুটি— একটি নারী আর দ্বিতীয়টি ধন-সম্পদ। (الملل و النحل للشهرستنى)

প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা অন্যান্য সমাজের তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট ছিল। প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত আইন রচয়িতা মনু মহারাজ নারী সম্পর্কে বলেছেন ঃ

'নারী— নাবালেগ হোক, যুবতী হোক আর বৃদ্ধা হোক— নিজ ঘরেও স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে পারবে না।'

'মিথ্যা কথা বলা নারীর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। মিথ্যা বলা, চিন্তা না করে কাজ করা, ধোঁকা-প্রতারণা, নির্বুদ্ধিতা, লোভ, পংকিলতা, নির্দয়তা— এ হচ্ছে নারীর স্বভাবগত দোষ।'

ইউরোপে এক শতাব্দীকাল পূর্বেও পুরুষগণ নারীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। পুরুষের অত্যাচার বন্ধ করার মতো কোনো আইন সেখানে ছিল না। নারী ছিল পুরুষের গোলাম। নারী সেখানে নিজ ইচ্ছায় কোনো কাজ করতে পারত না। নিজে উপার্জন করেও নিজের জন্যে তা ব্যয় করতে পারত না। মেয়েরা পিতামাতার সম্পত্তির মতো ছিল। তাদের বিক্রয় করে দেয়া হতো। নিজেদের পছন্দসই বিয়ে করার কোনো অধিকার ছিল না তাদের।

প্রাচীন আরব সমাজেও নারীর অবস্থা কিছুমাত্র ভালো ছিল না। তথায় নারীকে অত্যন্ত 'লজ্জার বস্তু' বলে মনে করা হতো। কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতামাতা উভয়ই যারপর নাই অসন্তুষ্ট হতো। পিতা কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করে ফেলত। আর জীবিত রাখলেও তাকে মানবোচিত কোনো অধিকারই দেয়া হতো না। নারী যতদিন জীবিত থাকত, ততদিন স্বামীর দাসী হয়ে থাকত। আর স্বামী মরে গেলে তার উত্তরাধিকারীরাই অন্যান্য বিষয় সম্পত্তির সাথে তাদেরও একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসত। সৎমা— পিতার স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী বানানো সে সমাজে কোনো লজ্জা বা আপত্তির কাজ ছিল না। বরং তার ব্যাপক প্রচলন ছিল সেখানে। আল্লামা আবূ বকর আবল জাস্‌সাস লিখেছেন ঃ

وَقَدْ كَانَ نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ مُسْتَفِيْضًا شَائِعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ - (احكام القران)

জাহিলিয়াতের যুগে পিতার স্ত্রী— সৎ মা বিয়ে করার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

সেখানে নারীর পক্ষে কোনো মীরাস পাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। আধুনিক সভ্যতা নারীমুক্তির নামে প্রাচীন কালের লাঞ্ছনার গহবর থেকে উদ্ধার করে নারী স্বাধীনতার অপর এক গভীর গহবরে নিক্ষেপ করেছে। নারী স্বাধীনতার নামে তাকে লাগামহীন জন্তু জানোয়ার পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। আজ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের নামে নারীর লজ্জা-শরম-আবরু ও পবিত্রতার মহামূল্য সম্পদকে প্রকাশ্য বাজারে নগণ্য পণ্যের মতো ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে। পুরুষরা চিন্তার আধুনিকতা উচ্ছলতা ও শিল্পে অগ্রগতি ও বিকাশ সাধনের মোহনীয় নামে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে এবং ক্লাবে, নাচের আসরে বা অভিনয় মঞ্চে পৌছিয়ে নিজেদের পাশবিক লালসার ইন্ধন বানিয়ে নিয়েছে। বস্তুত আধুনিক সভ্যতা নারীর নারীত্বের সমাধির ওপর লালসা চরিতার্থতার সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। এ সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে নারীকে দেয়নি কিছুই, যদিও তার সব অমূল্য সম্পদই সে হরণ করে নিয়েছে নির্মমভাবে।

বিশ্বনবীর আবির্ভাবকালে দুনিয়ার সব সমাজেই নারীর অবস্থা প্রায় অনুরূপই ছিল। রাসূলে করীম (স) এসে মানবতার মুক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে বিপ্লবী বাণী শুনিয়েছেন, তাতে যুগান্তকালের পংকিলতা ও পাশবিকতা দূরীভূত হতে শুরু হয়। নারীর প্রতি জুলুম ও অমানুষিক ব্যবহারের প্রবণতা নিঃশেষ হয়ে গেল। মানব সামজে তার সম্মান ও যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলো। জীবনক্ষেত্রে তার

গুরুত্ব যেমন স্বীকৃত হয়, তেমনি তার যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদাও পুরাপুরি বহাল হলো। নারী মানবতার পর্যায়ে পুরুষদের সমান বলে গণ্য হলো। অধিকার ও দায়িত্বের গুরুত্বের দিক দিয়েও কোনো পার্থক্য থাকল না এদের মধ্যে। নারী ও পুরুষ উভয়ই যে বাস্তবিকই ভাই ও বোন, এরূপ সাম্য ও সমতা স্বীকৃত না হলে তা বাস্তবে কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

নারী ও পুরুষ পিতামাতার উত্তরাধিকারের দিক দিয়েও সমান। একটি গাছের মূল কাণ্ড থেকে দুটি শাখা বের হলে যেমন হয়, এও ঠিক তেমনি। কাজেই যারা বলে যে, নারী জন্মগতভাবেই খারাপ, পাপের উৎস, পংকিল— তারা সম্পূর্ণ ভুল কথা বলে। কেননা বিবি হাওয়া স্ত্রী পুরুষ সকলেরই আদি মাতা, তার বিশেষ কোনো উত্তরাধিকার পেয়ে থাকলে দুনিয়ার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তা পেয়েছে। তা কেবল স্ত্রীলোকেরাই পেয়েছে, পুরুষরা পায় নি— এমন কথা বলা তো খুবই হাস্যকর। আর বেহেশত আল্লাহ্র নিষিদ্ধ গাছের নিকট যাওয়া ও তার ফল খাওয়ায় দোষ কিছু হয়ে থাকলে কুরআনের দৃষ্টিতে তা আদম ও হাওয়া দুজনেরই রয়েছে। শুরুতে দুজনকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঃ

يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ - (البقرة : ٣٥)

হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং সেখান থেকে তোমরা দুজনে প্রাণভরে পানাহার করো— যেখান থেকেই তোমাদের ইচ্ছা। আর তোমরা দুজনে এই গাছটির নিকটেও যাবে না— গেলে তোমরা দুজনই জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।

পরবর্তী কথা থেকেও জানা যায়, আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার কারণে তাঁদের যে ভুল হয়েছিল, তা এক সঙ্গে তাঁদের দুজনেরই হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুজনই সেজন্যে আল্লাহ্র নিকট তওবা করে পাপস্খালন করেছিলেন। একথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত কয়টিতে ঃ

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ - (الاعراف : ٢٢-٢٣)

অতঃপর তারা দুজনই যখন সে গাছ আস্বাদন করল, তাদের দুজনেরই লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে পড়ল। এবং তারা দুজনই বেহেশতের গাছের পাতা নিজেদের গায়ে লাগিয়ে আবরণ বানাতে থাকে এবং তাদের দুজনের আল্লাহ্ তাদের দুজনকে ডেকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদের দুজনকেই তোমাদের (সামনের) এই গাছটি সম্পর্কে নিষেধ করিনি ? আমি বলিনি যে, শয়তান তোমাদের দুজনেরই প্রকাশ্য দুশমন ? তখন তারা দুজনে বলল ঃ হে আমাদের রব্ব, আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছি, এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি রহমত নাযিল না করো, তাহলে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে নারী সম্পর্কে যাবতীয় অমানবিক ও অপমানকর ধারণা ও মতাদর্শের ভ্রান্তি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। বস্তুত দুনিয়ায় কুরআনই একমাত্র কিতাব, যা নারীকে যুগযুগ সিঞ্চিত অপমান-লাঞ্ছণা ও হীনতা-নীচতার পূঞ্জীভূত স্তূপের জঞ্জাল থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি দান করেছে এবং তাকে সঠিক ও যথোপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতও করেছে। মুছে দিয়েছে তার ললাটস্থ সহস্রাব্দকালের মসিরেখা।

ইসলাম নারীকে সঠিক মানবতার মূল্য দান করেছে। নারী স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তি ও সহজাত গুণাবলীর বিকাশ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য। এজন্যে ইসলাম নারীকে ঘরের বাইরে মাঠে-ময়দানে, হাটে-বন্দরে, অফিসে-বাজারে, দোকানে-কারখানায়, পরিষদে-সম্মেলনে, মঞ্চে-নৃত্যশালায়-অভিনয়ে টেনে নেয়ার পক্ষপাতী নয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে যোগ্যতা সহকারে পুরোমাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্যে যেসব স্বাভাবিক গুণ ও কর্মক্ষমতার প্রয়োজন, তা নারীকে জন্মগতভাবেই দেয়া হয়নি। নারীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা দান করা হয়েছে এবং ইসলাম নারীর জন্যে যে জীবন-পথ ও যে কাজের দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে, তা সবই ঠিক এ দৃষ্টিতেই করা হয়েছে। ইসলাম নারীর স্বাভাবিক যোগ্যতার সঠিক মূল্য দিয়েছে, দিয়েছে তা ব্যবহার করে তার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিধান ও ব্যবস্থা। কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় নারীদের দ্বারা যে সব কাজ করানো হচ্ছে কিংবা যেসব কাজ করতে তাদের নানাভাবে বাধ্য করা হচ্ছে, তা সবই তার প্রকৃতি পরিপন্থী, প্রলোভন বা জোর জবরদস্তিরই পরিণতি মাত্র। সে সব কাজের জন্যে মূলতই নারীদের সৃষ্টি করা হয়নি, তা নিঃসন্দেহেই বলতে চাই।

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন যাপনই হচ্ছে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যে চিরকল্যাণের উৎস। এ জীবনের বিস্তারিত ব্যবস্থার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই যেমন সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত মর্যাদায় ভূষিত করেছে তেমনি নারী ও পুরুষের মধ্যে বিশেষ কতগুলো গুণের বর্তমানতাও ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য। এ গুণগুলোই তাদের পূর্ণ আদর্শবাদী বানিয়ে দেয় এবং এ আদর্শবাদ চিরউজ্জ্বল ও বাস্তবায়িত রাখতে পারলেই ইসলামের দেয়া সে মর্যাদা নারী ও পুরুষ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের পরিবারিক জীবনের বিস্তারিত বিধান পেশ করার পূর্বে আমরা এখানে সে বিশেষ গুণাবলী সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করতে চাই। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا - (الاحزاب : ٣٥-٣٦)

আল্লাহ্‌র অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্য ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহ্‌র নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, রোযাদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহ্‌কে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক— আল্লাহ্ তা'আলা এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোকের জন্যে— আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে তার বিপরীত কিছুর ইখতিয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার কোনো অধিকার নেই। আর যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়।

এই দীর্ঘ আয়াত থেকে যে গুণাবলী প্রমাণিত হচ্ছে— সেসব গুণাবলী নর-নারীর মধ্যে বর্তমান থাকলে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে— তা এখানে খনিকটা ব্যাখ্যাসহ সংখ্যানুক্রমে উল্লেখ করা যাচ্ছে, যেন পাঠকগণ সহজেই সে গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন।

১. মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম স্ত্রীলোক। 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণকারী, আনুগত্য, বাধ্য। আর কুরাআনী পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণকারী, আল্লাহ্‌র অনুগত ও বাধ্য। ব্যবহারিকভাবে আল্লাহ্‌র আইন পালনকারী।

২. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা। 'মু'মিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈমানদার। ঈমান অর্থ কোনো অদৃশ্য সত্যে বিশ্বাস স্থাপন, আর কুরআনী পরিভাষায় কুরআনের উপস্থাপিত অদৃশ্য বিষয়সমূহকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে নেওয়াই হচ্ছে ঈমান। এই অনুযায়ী মু'মিন হচ্ছে সে পুরুষ ও স্ত্রী, যারা কুরআনের উপস্থাপিত অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাসী। মুসলিম-এর পরে মু'মিন বলার

তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ার মানুষকে কেবল আল্লাহ্‌র বাহ্যিক আইন পালনকারী হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে তাঁর প্রতি মন ও অন্তর দিয়ে ঐকান্তিক বিশ্বাসী।

৩. আল্লাহ্‌র দিকে মনোযোগকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যাদের মন ও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্‌র বিধান পালনে সতত মশ্‌গুল।

৪. সত্য ও ন্যায়বাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। এর অর্থ সেসব লোক, যারা সর্বপ্রকার মিথ্যাকে পরিহার করে আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে চলে। ফলে তাদের আমলে কোনো প্রকার রিয়াকারী বা দেখানোপনা থাকে না।

৫. সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক। মূল শব্দ صبر সব্‌র। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নিজেকে বেঁধে রাখা, ধৈর্য ধারণ করা। এখানে সেসব পুরুষ-স্ত্রীলোককে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীন পালন ও তাঁর বন্দেগী অবলম্বন করতে গিয়ে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট অকাতরে সহ্য করে, তার ওপর দৃঢ় হয়ে অচল অটল হয়ে থাকে। শত বাধা-প্রতিকূলতার সঙ্গে মুকাবিলা করেও দ্বীনের ওপর মজবুত থাকে এবং কোনোক্রমেই আদর্শ বিচ্যুত হয় না।

৬. আল্লাহ্‌র নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা অন্তর, মন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কিছু দিয়ে আল্লাহ্‌র বিনীত বন্দেগী করে। মূল শব্দটি হচ্ছে خشوع 'খুশূয়ূন', অর্থ প্রশান্তি, স্থিতি, প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভক্তি, বিনয়, ভয়মিশ্রিত ভালোবাসা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ।

৭. দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা গরীব-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি অন্তরে দয়া অনুভব করে উদ্বৃত্ত মাল ও অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অভাবগ্রস্ত লোকদের দেয়।

৮. রোযাদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র হুকুম-মুতাবিক রোযা রাখে, যে রোযার ফল হচ্ছে তাক্‌ওয়া পরহেযগারী লাভ এবং যার মাধ্যমে ক্ষুৎপিপাসার জ্বালা ও যন্ত্রণা অনুভব করা যায় প্রত্যক্ষভাবে ও তার জন্যে ধৈর্য ধারণের শক্তি অর্জন করতে পারেন।

৯. লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যারা নিজেদের লজ্জাস্থান অন্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে না— তাতে লজ্জাবোধ করে এবং নিজেদের লিঙ্গস্থানকে হারামভাবে ও হারাম পথে ব্যবহার করে না। ঢেকে রাখার যোগ্য দেহে— দেহের কোনো অঙ্গকে ভিন্‌-পুরুষ— স্ত্রীর সামনে উন্মুক্ত করে না।

১০. আল্লাহ্‌কে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহ্‌কে কস্মিনকালেও এবং মুহূর্তের তরেও ভুলে যায় না, আর মুখ ও কল্‌ব উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌কে চিরস্মরণীয় রাখে।

এই দশটি মৌলিক গুণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হোক এবং এ গুণধারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত হোক, কুরআনের এ ভাষণের মূল লক্ষ্য তাই। এ মৌলিক গুণাবলী নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই কাম্য। কেবল পুরুষদেরই নয়, নারীদেরও এই গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। আর তা হতে পারলেই এই পুরুষ ও নারী সমন্বয়ে গঠিত হবে আদর্শ সমাজ যা কুরআন গড়ে তুলতে চায়।

কুরআনের অপর একটি ছোট্ট আয়াতে বিশেষভাবে মুসলিম মহিলার গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ – (النساء : ٣٤)

অতএব যারা নেককার স্ত্রীলোক, তারা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনকারী এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে গোপনীয় বা রক্ষণীয় বিষয়গুলোর হেফাযতকারী হয়ে থাকে; কেননা আল্লাহ্ নিজেই তার হেফাযত করেছেন। (যদি কেউ সে-সবের হেফাযত করতে চায়, তবে তার পক্ষে তা সম্ভব ও সহজ হবে)।

এ আয়াতের তাফসীরে লেখা হয়েছে ঃ

اَیْ عَلَیْهِنَّ اَنْ یَّحْفَظْنَ حُقُوْقَ الزَّوْجِ فِیْ مُقَابِلَةِ مَا حَفِظَ اللّٰهُ حُقُوْ قَهُنَّ عَلٰی اَزْوَاجِهِنَّ حَیْثُ اَمَرَ هُمْ بِالْعَدْلِ عَلَیْهِنَّ وَاِمْسَ کِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاِعْطَاءِ مِنْ اُجُوْرِهِنَّ - (محاسن التاويل : ص -١٢١٩)

অর্থাৎ নারীদের জন্যে কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে যে, তারা তাদের স্বামীদের অধিকার রক্ষা করবে এর বিনিময়ে যে, আল্লাহ নিজেই তাদের অধিকার তাদের স্বামীদের ওপর সংস্থাপন ও তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্যেই তিনি স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়নীতি ও সুবিচার স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন পুরুষদেরকে। তাদেরকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে বলেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন পুরুষদেরকে তাদের মোহরানা আদায় করতে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ নারী

কুরআন মজীদে মহিলাদের দুটি আদর্শ নারীর চরিত্র পেশ করা হয়েছে এবং দুনিয়ার ঈমানদার নারীদেরকে তাদের আদর্শ চরিত্রের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

তার মধ্যে একটি আদর্শ হচ্ছে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুজাহিম। ফিরাউন ছিল আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র দ্বীনের প্রকাশ্য দুশমন। কিন্তু তার স্ত্রী ছিলেন আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি পূর্ণ ও মজবুত ঈমানদার। ফিরাউনের ন্যায় প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও এবং অত্যন্ত কুফরী পরিবেশে থেকেও তিনি আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহ্কে ভয় করতেন, তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে চলতেন। এত বড় সম্রাটের স্ত্রী হওয়াকে তিনি নিজের জন্যে সামান্য গৌরবের বিষয় বলেও মনে করতেন না। বরং রাতদিন আল্লাহ্র নিকট এই আল্লাহ্-বিরোধী সম্রাটের আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে কাতর কণ্ঠে দো'আ করতে থাকতেন। ফিরাউনের নাফরমানীর কারণে গোটা জাতির ওপর আল্লাহ্র যে গজব ও অভিশাপ বর্ষিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল, তা থেকেও তাঁর নিকট পানাহ্ চাইতেন। কুরআন মজীদে এই আল্লাহ্ বিশ্বাসী মহিলাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَمْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ـ اِذْقَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِیْ عِنْدَكَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ وَنَجِّنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ - (التحريم - ١١)

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার লোকদের জন্যে ফিরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করেছেন। সে (স্ত্রী) দো'আ করলঃ 'হে আল্লাহ্! আমার জন্যে তোমার নিকট জান্নাতে একখানি ঘর নির্মাণ করো এবং ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও জালিম লোকদের নির্যাতন থেকে।'

এ দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

جَعَلَ اللّٰهُ حَالَ امْرَاةِ فِرْعَوْنَ مَثَلًا لِّحَالِ الْمُؤْمِنِیْنَ تَرْغِیْبًا لَهُمْ فِیْ الثَّبَاتِ عَلَی الطَّاعَةِ وَالتَّمَسُّكِ بِالدِّیْنِ وَالصَّبْرِ فِیْ الشِّدَّةِ وَاِنَّ صَوْلَةَ الْكُفْرِ لَا تَضُرُّ هُمْ كَمَا لَمْ تَضُرُّ امْرَاَةَ فِرْعَوْنَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَ اَكْفَرِ الْكَافِرِیْنَ وَصَارَتْ بِاِیْمَانِهَا بِاللّٰهِ فِیْ جَنّٰتِ النَّعِیْمِ - (فتح القدير:ج -٥، ص - -٢٤)

মু'মিন লোকদের প্রকৃত অবস্থা কি হতে পারে তা দেখার ও তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন। সেই সঙ্গে আল্লাহ্র আনুগত্যে দৃঢ়তা দেখানো, দ্বীন ইসলামকে সর্বাবস্থায় আঁকড়ে ধরে থাকার এবং কঠোর দুর্বিষহ

অবস্থায়ও ধৈর্য ধারণ করার উৎসাহ দান করা হয়েছে এ উপমা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পরন্তু দেখানো হয়েছে যে, কুফরী শক্তির যতই দাপট ও প্রতাপ হোক, তা ঈমানদার লোকদের একবিন্দু ক্ষতি করতে পারবে না, যেমন ফিরাউনের মতো একজন বড় কাফেরের স্ত্রীর হওয়া সত্ত্বেও সে তার স্ত্রীর একবিন্দু ক্ষতি করতে পারে নি, বরং তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ঈমান সহকারেই নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে চলে যেতে পেরেছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, হযরত মরিয়মের চরিত্র। তিনি ছিলেন পবিত্রতা, সতীত্ব এবং আল্লাহ্‌-ভীরুতার জ্বলন্ত প্রতীক। আল্লাহ্‌ নিজেই বলেছেন ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهٖ وَ كَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ - (تحريم : ١٢)

আল্লাহ্‌ তা'আলা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন ইমরান-কন্যা মরিয়মের কথা। সে তার সব শংকাপূর্ণ স্থান (যৌন অঙ্গ) সমূহের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। তখন আমি (আল্লাহ) তার মধ্যে আমার থেকে রূহ ফুঁকে দিলাম এবং সে তার আল্লাহ্‌র সব কথা ও তাঁর কিতাবসমূহের সত্যতা মেনে নিয়েছে। বস্তুত সে ছিল তার আল্লাহ্‌র আদেশ পালনকারী বিনয়ী লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্‌র হুকুম পালন, বিনয় ও আল্লাহ্‌-ভীরুতার বাস্তব প্রতীক হিসেবে ওপরের আয়াতদ্বয়ের যেমন দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুটি খারাপ চরিত্রের নারীর দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা হয়েছে অপর আয়াতে। তাদের এক দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে হযরত নূহ ও হযরত লূত নবীর স্ত্রীদ্বয়ের উল্লেখ হয়েছে। দুজনের প্রতিই আল্লাহ্‌র অপরিসীম অনুগ্রহ ছিল, দুজনকেই আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবেক জীবন যাপন করতে এবং তাদের স্বামীদ্বয় যে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাতে যদি তারা তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা করত— সব রকমের দুঃখ-কষ্টে তাঁদের অকৃত্রিম সহচরী ও সঙ্গিনী হত, তাহলে তাদের স্বামীদ্বয়ের মতো আল্লাহ্‌র নিকট তাদেরও মর্যাদা হতো। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা বরং এ ব্যাপারে নিজ নিজ স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের সে কাজকে তারা অতি হীন ও নগণ্য মনে করেছে। তাদের দুশমনদের সাথে তারা গোপনে হাত মিলিয়েছে। ফলে নবীদ্বয়ের দুঃখ ও বেদনার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই কারণে জাতির ফাসিক-ফাজির লোকেরা আল্লাহ্‌র যে আযাবে নিমজ্জিত হয়েছে, তারাও সেই আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ - (تحريم - ١٠)

আল্লাহ্‌ কাফেরদের অবস্থা বোঝাবার জন্যে নূহ্‌ ও লুতের স্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। এই দুজন মেয়েলোক ছিল আমার দুই নেক্‌ বান্দার স্ত্রী। তারা দুজনই নিজ নিজ স্বামীর সাথে খেয়ানতের অপরাধ করেছে। কিন্তু নেক স্বামীদ্বয় তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র আযাবের মুকাবিলায় কোনো উপকারে আসেনি। বরং তাদের দুজন (স্ত্রীদ্বয়)-কেও আদেশ করা হলোঃ তোমরা অন্যান্যদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করো।

কুরআন মজীদে এ পর্যায়ে তৃতীয় যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো আবূ লাহাবের স্ত্রীর কথা। আবূ লাহাব ছিল ইসলাম-বিরোধী কুফরী আদর্শের একজন বড় নেতা। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের সে ছিল অতি বড় দুশমন। তার স্ত্রী ছিল বড় খবীস প্রকৃতির, হীন ও নিকৃষ্ট চরিত্রের এক দুর্দান্ত মেয়েলোক। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে রাসূলে করীম (স)-এর বিরোধিতা করত প্রাণপণে। তাদের এ বিরোধীতা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণের ওপর ভিত্তিশীল ছিল না,

ছিল না কোনো নীতির ভিত্তিতে। বরং এ বিরোধীতা ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও আক্রোশ পর্যায়ে। অপরদিকে আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল অত্যন্ত আধুনিক। তার বিলাস-ব্যসনের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে দেয়ার জন্যে সে স্বামীর ওপর প্রতিনিয়ত চাপ প্রয়োগ করত। আবূ লাহাব নিতান্ত বোকার মতো স্ত্রীর যাবতীয় দাবি-দাওয়া পূরণের জন্যে ন্যায়-অন্যায় নির্বিচারে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করত। এতবড় একজন সমাজপতি হওয়া সত্ত্বেও হাজীদের পরিচর্যার জন্যে সংগৃহিত অর্থ বিনষ্ট ও আত্মসাত করত। এমন কি, আল্লাহ্‌র ঘরে রক্ষিত স্বর্ণ চুরি করত বলে অনেকেই তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করত। তার এসব অসদাচরণের একমাত্র কারণ ছিল তার প্রিয়তমা স্ত্রীর অবাঞ্ছিত বিলাস-ব্যসনের আবদার রক্ষা। এ ধরনের একটি নারী গোটা জাতির পক্ষেও বিপজ্জনক হতে পারে। এ কারণে কুরআন মজীদে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এ নারীর উল্লেখ করা হয়েছে। আর তার দুষ্কৃতকারী স্বামীর মর্মান্তিক পরিণতির ব্যাপারে তাকেও সমানভাবে অংশীদার বানানো হয়েছে। কুরআনে তার নির্মম পরিণতির যে চিত্র অংকন করা হয়েছে, তা হচ্ছে এমন একটি নারী, যে গলায় রশি ঝুলিয়ে বনে-জঙ্গলে কাষ্ঠ আহরণ করে বেড়াচ্ছে এবং সে ইন্ধন সংগ্রহ করে আগুনকে দ্বিগুণভাবে তেজস্বী করে জ্বালিয়েছে। এ আগুনেই জ্বলছে তার নিজের স্বামী। কেননা আবূ লাহাবের জাহান্নামে যাওয়ার যাবতীয় কারণ এ দুনিয়ায় সেই উদ্ভাবন করেছিল। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ۞ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞

وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ - (لهب)

আবূ লাহাব ধ্বংস হোক,— আর তার সব ক্ষমতা প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হলো সে নিজে ধ্বংস হলো। না তার ধন-সম্পদ তাকে রক্ষা করতে পারল, না তার হারাম-হালাল উপার্জন। সে শীঘ্রই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে। তার স্ত্রীও তারই সঙ্গে— যার কাজ ছিল কেবল ইন্ধন সংগ্রহ করা-তার গলদেশে ঝুলতে থাকবে মোটা পাকানো রশি।

অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করে এবং খেয়ানত করে আবূ লাহাব যে সব মূল্যবান অলংকার বানিয়ে তার স্ত্রীকে দিত, কিয়ামতের দিন তা-ই তার গলায় বড় বড় রশি হয়ে ঝুলতে থাকবে। বস্তুত মরণকালেও যে পাকানো রশি দ্বারা জালানী কাঠ বেঁধে আনতো তার গলায় ঐ রশির ফাঁস লেগে তার মৃত্যু হয়েছিল।

কুরআন মজীদে উল্লিখিত বিভিন্ন নারীর এ দৃষ্টান্ত দুনিয়ার নারীকুলের জন্যে যেমন বিশেষ অনুসরণীয় ও উপদেশ গ্রহণের স্থল, তেমনি দুনিয়ার স্বামীকুলের জন্যেও এর মধ্যে রয়েছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, রয়েছে উপদেশ গ্রহণের উন্নত শিক্ষা। এ আলোচনার মাধ্যমে কুরআন নারীকুলের সামনে নৈতিকতার একটি মান— একটি নৈতিক লক্ষ্য সংস্থাপন করেছে। যে সব মহিলা দ্বীনদার, কিন্তু স্বামীরা ফাসেক-ফাজের— দ্বীন-ইসলামের বিরোধী কিংবা তার পক্ষে নয়, তাদের জন্যেও যেমন এখানে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে, তেমনি সব কাফের, চরিত্রহীন ও আল্লাহ্‌-দ্রোহী নারীদের জন্যেও এতে রয়েছে নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে কল্যাণের পথ এ দুনিয়ায়ই গ্রহণ করার উপযুক্ত শিক্ষা, যাদের স্বামীরা বড় দ্বীনদার পরহেযগার। দুনিয়ার স্বামীকুল সম্পর্কেও এই একই কথা।

স্বামী যদি বেঈমান হয়, আর স্ত্রী হয় ঈমানদার, আল্লাহ্‌ভীরু, তাহলে এ কারণেই স্বামীর পক্ষে পরকালীন মুক্তি লাভ সম্ভব হবে না। আর এরূপ অবস্থায়ও যে স্ত্রীলোকদের পক্ষে দ্বীন পালন করা উচিত, স্বামীর অন্যায় কাজের সমর্থন করতে গিয়ে নিজেদেরকেও জাহান্নামী করা স্ত্রীর পক্ষে উচিত কাজ নয়, আর তা যে সম্ভব, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুরআনে উল্লিখিত ফিরাউনের স্ত্রী— আছিয়া।

পক্ষান্তরে বেঈমান স্ত্রীদের স্বামীরা যদি নবীও হয়, তবু কেবলমাত্র এই বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রেহাই দেবেন— এরূপ ধারণা বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলামে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছে। নারীকে প্রথম মর্যাদা দেয়া হয়েছে কন্যারূপে। দ্বিতীয় মর্যাদা দেয়া হয়েছে বধুরূপে, তৃতীয় মর্যাদা 'মা' রূপে এবং চতুর্থ মর্যাদা সমাজ-সংস্থার সমান গুরুত্বপূর্ণ সদস্যারূপে।

কন্যা-রূপে নারী

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, কন্যারূপে নারীর বড়ই অমর্যাদা ছিল আরব জাহিলিয়াতের সমাজে। সেখানে কন্যা-সন্তানকে অকথ্যভাবে ঘৃণা করা হতো। তাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। কন্যা-সন্তানের মুখ দেখতেও রাযি হতো না স্বয়ং কন্যার পিতা। কুরআন মজীদে এ নারী অপমানের চিত্র অংকন করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۞ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط

اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ - (النحل : ٥٨-٥٩)

সে সমাজের কাউকে তার কন্যা-সন্তান জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে সারাদিন তার মুখ কালো হয়ে থাকত। সে ক্ষুব্ধ হতো এবং মনে মনে দুঃখ অনুভব করত। এ সুসংবাদের লজ্জার দরুন সে অন্য লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে চলত। সে চিন্তা করত, অপমান সহ্য করে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখবে, না তাকে মাটির তলায় প্রোথিত করে ফেলবে!— কতই না খারাপ সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করত!

ইসলাম মানবতা-বিরোধী ভাবধারার প্রতিবাদ করেছে। এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা-সন্তানকে পুরুষ ছেলের মতোই জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। আর কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা হলে কিয়ামতের দিন যে তার পিতাকে আল্লাহ্‌র দরবারে কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে, তা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছেঃ

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۞ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ - (التكوير : ٨-٩)

জীবন্ত প্রোথিত কন্যা-সন্তানকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে— কোন অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল?

এ কারণে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যে লোকের কোনো কন্যা-সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার ওপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশত দান করবেন। (আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদব)

আরব জাহিলিয়াতের সমাজে নারী ও কন্যাকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে পঙ্গু করে রাখা হতো। তাকে পিতার মীরাস লাভের অধিকার মনে করা হতো না। বরং সেখানে মীরাস দেয়া হতো সেসব পুত্র-সন্তানকে, যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর সঙ্গে মুকাবিলা করতে পারত। নারীদের মীরাসের অংশ দেয়া তো দূরের কথা, স্বয়ং এই নারীদেরও মীরাসের মাল মনে করা হতো এবং পুরুষরা তাদের নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিত। কন্যা-সন্তানের প্রতি চরম অমানবিক অবজ্ঞা এই বিংশ শতাব্দীর

বিজ্ঞান ও সভ্যতার চরম উন্নতির যুগেও যত্রতত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিক চীনের দুজন নারীকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে শুধু এ অপরাধে যে, তারা কেবল কন্যা সন্তানই প্রসব করেছে, স্বামীকে কোনো পুত্র সন্তান উপহার দিতে পারেনি।

কিন্তু ইসলাম মানবতার পক্ষে এই চরম অবমাননাকর রীতি চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে। কুরআনে নারীকে— কন্যাকেও পুরুষদের মতোই মীরাসের অংশীদার করে দেয়া হয়েছে। যদিও পুরুষদের তুলনায় তাদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কম বলে পুরুষদের অপেক্ষা তাদের অংশ অর্ধেক রাখা হয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ - (النساء - ١١)

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের বিশেষ অর্থনৈতিক বিধান দিচ্ছেন। তিনি আদেশ করেছেন, একজন পুরুষ দুজন মেয়েলোকের সমান অংশ পাবে। কেবল মেয়ে-সন্তান দুজন কিংবা ততোধিক হলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি মাত্র একজন কন্যা হয়, তাহলে সে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

এ আয়াতে মেয়েদেরকেও পুরুষ ছেলেদের সমান সম্পত্তির অংশীদার বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাধারণ লোক এ আইনকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা বলল, এদের মধ্যে কেউ তো এমন নয় যে, যুদ্ধে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করতে পরে। এ মনোভাবের প্রতিবাদ করে কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতে কন্যা-সন্তানকে বিয়ের পূর্বেই এমন পরিমাণ মীরাস লাভের অধিকার দেয়া হয়েছে, যা তার জন্যে যথেষ্ট হতে পারে।

পিতা জীবিত থাকতে ছেলের বালেগ হওয়া পর্যন্ত তার লালন-পালন করা যেমন পিতার কর্তব্য, মেয়ের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার জন্যেও পিতার অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে। উপরন্তু ছেলে বড় হলে পিতা তাকে কামাই-রোজগার করার জন্যে বাধ্য করতে পারে; কিন্তু কন্যা সন্তানকে তা পারে না।

স্ত্রী-রূপে নারী

তদানীন্তন আরব সমাজের স্ত্রী হিসেবেও নারীদের চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হত। তাদেরকে স্বামীর ঘরে যথাযোগ্য মর্যাদা বা অধিকার দেয়া হতো না। তাদেরকে হীন, নগণ্য ও দয়ার পাত্রী মনে করা হতো। নিতান্ত দাসী-বাঁদীর মতো ব্যবহার করা হতো তাদের সাথে।

ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদ দিয়েছে। প্রথমত ঘোষণা করা হয়েছে, তারা নারী বলে মৌল অধিকারের দিক দিয়ে পুরুষদের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। বলা হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - (البقرة -٢٢٨)

স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের রয়েছে তাদের ওপর এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

অন্য কথায়, স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণ সমান। তাদের অধিকারও অভিন্ন এবং এ দুয়ের মাঝে এক্ষেত্রে কোনোই পার্থক্য করা যেতে পারে না। মৌল অধিকারের দিক দিয়ে কেউ কম নয়, কেউ বেশি নয়।

আরব সমাজে স্ত্রীদের ওপর নানাভাবে অকথ্য জুলুম ও পীড়ন চালান হতো। কোনো কোনো স্বামী তাদের মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখত, না পেত তারা স্ত্রীত্বের পূর্ণ অধিকার, না পেত তাদের কাছ থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি। স্বামী একদিকে যেমন তাদের পুরাপুরি স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকার দিত না, অন্যদিকে তেমনি তালাক দিয়ে মুক্ত করে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না। বরং এভাবে আটকে রেখে তাদের নিকট থেকে নিজেদের দেয়া ধন-সম্পদ ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাত এবং সেজন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করত। কুরআন মজীদ এর প্রতিবাদ করেছে তীব্র ভাষায়। বলেছে ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ - (النساء - ١٩)

তোমরা— হে স্বামীরা— তাদের (স্ত্রীদের) বেঁধে আটকে রাখবে না এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের নিকট থেকে তোমাদের দেয়া ধন-সম্পদের কিছু অংশ কেড়ে নেবে।

সেকালে স্ত্রীদের ঘরের অন্যান্য মাল-সামানের মতোই অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করা হতো এবং স্বামী মরে গেলে তার স্ত্রীকেও পরিত্যক্ত মাল-সম্পত্তির ন্যায় উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। এ প্রথা প্রথমকালে মুসলমানদের মধ্যেও চালু ছিল বলে মনে হয়। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَآءَ كَرْهًا - (النساء : ١٩)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মেয়েদেরকে অন্যায় জবরদস্তি করে নিজেদের মীরাসের সম্পদ বানিয়ে নিও না-তা তোমাদের পক্ষে আদৌ হালাল হবে না।

নবী করীম (স) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেন ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ - (مسلم ج الكتاب الحج)

তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে অবশ্যই ভয় করে চলবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহ্‌র নামে এবং এভাবেই তাদের হালাল মনে করেই তোমরা তাদের উপভোগ করেছ।

এই পর্যায়ে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর একটি কথা উল্লেখ্য। তিনি বলেছিলেন ঃ

وَللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَانُعِدُّ لِلنِّسَاءِ اَمْرًا حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِنَّ مَآ اَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ - (مسلم، كتاب الطلاق)

আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা মেয়েলোকদের কিছুই মনে করতাম না— কোনোই গুরুত্ব দিতাম না। পরে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট অকাট্য বিধান নাযিল করলেন এবং তাদের জন্যে মীরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন, তখন আমাদের মনোভাব ও আচরণের আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো।

মা-রূপে নারী

ইসলামে মা হিসেবে নারীকে যে উঁচু মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে, দুনিয়ার অপর কোনো সম্মানের সাথেই তার তুলনা হতে পারে না। নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الاُمَّهَاتِ -

বেহেশত মা'দের পায়ের তলে অবস্থিত।

অর্থাৎ মাকে যথাযোগ্য সম্মান দিলে, তার উপযুক্ত খেদমত করলে এবং তার হক আদায় করলে সন্তান বেহেশত লাভ করতে পারে। অন্য কথায় সন্তানের বেহেশত লাভ মা'য়ের খেদমতের ওপর নির্ভরশীল। মা'য়ের খেদমত না করলে কিংবা মা'র প্রতি কোনোরূপ খারাপ ব্যবহার করলে, মা'কে কষ্ট ও দুঃখ দিলে সন্তান যত ইবাদত বন্দেগী আর নেকের কাজই করুক না কেন, তার পক্ষে বেহেশত লাভ করা সম্ভবপর হবে না।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ নবী করীম (স)-এর সময়ে আল-কামা নামক এক যুবক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তার রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত সেবা-শুশ্রূষাকারীরা তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমা পাঠ করার উপদেশ দেয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে তা উচ্চারণ করতে পারে না। রাসূলে করীম (স) এই আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার মা কি জীবিত আছে ? বলা হলো, তার পিতা মারা গেছে, মা জীবিত আছে, অবশ্য সে খুবই বয়োবৃদ্ধা। তখন তাকে রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত করা হলো। তার নিকট তার ছেলের এ অবস্থার উল্লেখ করে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। সে বলল, আল-কামা বড় নামাযী, বড় রোযাদার ব্যক্তি এবং বড়ই দানশীল। সে যে কত দান করে, তার পরিমাণ কারো জানা নেই। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সাথে তার সম্পর্ক কিরূপ ?' উত্তরে বৃদ্ধা মা বলল, 'আমি ওর প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট।' তার কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বলল, 'সে আমার তুলনায় তার স্ত্রীর মন যোগাত বেশি, আমার ওপর তাকেই বেশি অগ্রাধিকার দিত এবং তার কথামতোই কাজ করত।' তখন রাসূলে করীম (স) বললেন, 'ঠিক এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে কালেমার উচ্চারণ বন্ধ করে দিয়েছেন।' অতঃপর রাসূলে করীম (স) হযরত বিলালকে আগুনের একটা কুণ্ডলি জ্বালাতে বললেন এবং তাতে আল-কামাকে নিক্ষেপ করার আদেশ করলেন।

আল-কামার মা একথা শুনে বলল, 'আমি মা হয়ে তা কেমন করে হতে দিতে পারি! সে যে আমার সন্তান, আমার কলিজার টুকরা।'

রাসূলে করীম (স) বললেন, "তুমি যদি চাও যে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিন তাহলে তুমি তার প্রতি খুশী হয়ে যাও। অন্যথায় আল্লাহ্র শপথ, তার নামায, রোযা ও দান-খয়রাতের কোনো মূল্যই হবে না আল্লাহ্র দরবারে।

অতঃপর আল-কামার জননী বললো, "আমি আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।" এরপর খবর নিয়ে জানা গেল যে, আল-কামা অতি সহজেই কালেমা উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়েছে।

এ একটি ঘটনা এবং নির্ভুল বর্ণনাভিত্তিক বলে এর সত্যতায় কোনোই সন্দেহ নেই। যদিও বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে এর সত্যতা স্বীকৃত নয় এবং এ সব ঘটনার কোনো মূল্যও নেই। কিন্তু ইসলাম যে নৈতিক ও আদর্শিক বিধান উপস্থাপিত করেছে, তাতে এ ধরনের ঘটনা মানুষের চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

সমাজ-সংস্থার সদস্যা হিসেবে নারী

নারী কেবল কন্যা, বধু এবং মা-ই নয়, ইসলামের সমাজ-সংস্থায় সে সমান মর্যাদা সম্পন্না একজন সদস্যাও বটে। ইসলামে পুরুষের মর্যাদা যেমন স্বীকৃত, তেমনি তার ওপর অনেক গুরু দায়িত্বও অর্পিত। অনুরূপভাবে নারীকে সমাজ ক্ষেত্রে যেমন মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তেমনি তারও রয়েছে অনেক মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। দ্বীনী আমল-আখলাকের নিয়ম-কানুন পালন করা যেমন পুরুষের কর্তব্য, তেমনি নারীরও এবং কর্তব্য পালনের ফল লাভের অধিকারও উভয়ের সম্পূর্ণ সমান। ইসলামে এ ব্যাপারে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

কুরআন মজীদের ঘোষণা হল ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا - (النساء : ١٢٤)

পুরুষ বা স্ত্রী— যে লোকই নেক আমল করবে ঈমানদার হয়ে, সে-ই বেহেশতে দাখিল হতে পারবে এবং এদের কারো উপর একবিন্দু জুলুম করা হবে না।

বস্তুত ইসলামী শরীয়ত নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান সামাজিক মর্যাদা এবং অধিকার দিয়েছে। অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, জ্ঞান অর্জন ও চর্চা— প্রভৃতি মানসিক, জ্ঞানগত ও বুদ্ধিগত, শারীরিক ও দ্বীনী কল্যাণ সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষেত্রেই উভয়ের মাঝে পূর্ণ সমতা স্থাপন করেছে। কোনো নারী যদি আশ্রয়হীন বা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে তাহলে সে তার জীবন-জীবিকার প্রয়োজন পূরণ ও স্বীয় সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে যে-কোনো হালাল উপায়ে কামাই-রোজগার করতে পারে। এজন্যে সব রকমের বিধিসম্মত উপায়ও সে অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু তার এ দায়িত্ব খতম হয়ে যায় তখন, যখন তার এ দায়িত্ব পালনের জন্যে কোনো পুরুষ স্বামী হিসেবে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। তখন এ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোটা পারিবারিক দায়িত্ব ভাগ হয়ে যাবে। একটি গোটা পরিবারে একদিকে যেমন আয় করার ব্যবস্থা থাকতে হবে, তেমনি অপরদিকে সে আয়ের সুষ্ঠু বণ্টন ও বিলি-ব্যবস্থার প্রয়োজন। পরিবারে কর্মবণ্টন এভাবে হতে পারে যে, পুরুষ আয় করবে, স্ত্রী তা ব্যয় করে ঘরের ব্যবস্থাপনা চালাবে। এর ফলে উভয়ের সামাজিক মর্যাদা সমান ও অভিন্ন থাকে।

বস্তুত নারী জীবনের আবাহন, পুলকের সঙ্গীত, পবিত্র স্নেহ-মমতার প্রতীক, প্রতিমূর্তি, বিশ্ব নিখিলের প্রাণ-সম্পদ। আল্লামা ইকবাল নারীর প্রশংসায় বলেছেন ঃ

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ

বিশ্ব নিখিলের ছবিতে যা কিছু চাকচিক্য তা সবই কেবলমাত্র নারীর কারণেই।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বন্ধুত্ব, প্রেম-প্রীতি, সহানুভূতি আত্মদানই হচ্ছে নারীর ভূষণ— বৈশিষ্ট্য। অনন্তকাল পর্যন্ত নারীর এ ভূষণ স্থায়ী থাকবে। সে মৃত মনে নব জীবনের স্পন্দন জাগিয়েছে সতত— সর্বত্র। বিপদ-কাতর ব্যক্তিকে সে দিয়েছে জীবনের মন্ত্র, ভীরু কাপুরুষের মধ্যে জাগিয়েছে সাহস, বিক্রম ও বীরত্ব। বিপদের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বাত্যায় বৃক্ষের কচি শাখার মতোই সে রয়েছে অটুট স্থায়ী। সামান্য আনন্দেই তার আননে খেলেছে হাসির উদ্বিল লহরী, দুঃখ ভারাক্রান্ত মানসে জ্বালিয়েছে আশার আলো।

বিশ্বের বড় বড় ব্যক্তি, তারা সবাই নারীর গর্ভে অস্তিত্ব লাভ করেছে, নারী কর্তৃক প্রসবিত এবং নারীর ক্রোড়েই লালিত-পালিত হয়েছে। মানব জাতির মর্যাদা সে বাড়িয়েছে। পুরুষের মনোরাজ্যে সে স্থাপন করেছে স্বীয় সিংহাসন, বিস্তার করেছে রাজত্ব— পুরুষের সমগ্র জীবনব্যাপী। গোটা মানবতাই নারীর কাছে ঋণী। তাই নারীর গুরুত্ব ও মর্যাদা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, পারেনি, পারবেও না কোনো দিন। জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ মূল্যমান নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। পবিত্রতা, সতীত্ব ও প্রেম-ভালোবাসা প্রভৃতি শব্দ তারই জন্যে হয়েছে রচিত। এ সব রক্ষা করার মাধ্যমে কন্যা, বধূ ও জননীর ভূমিকায় সার্থকভাবে দায়িত্ব পালন করবে সে, ইসলামী আদর্শের তাই একমাত্র লক্ষ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব

ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব যে কতোখানি, তা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্যে যে পূর্ণাঙ্গ জীবনের বিধান নাযিল করেছেন, তাতে নানাভাবে ও নানা প্রসঙ্গে এ গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

কুরআনে পরিবারকে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং পারিবারিক জীবন যাপনকারী নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েকে বলা হয়েছে 'দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত (محصنين) লোকগণ।' দুর্গ যেমন শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য, তার ভিতরে জীবনযাত্রা যে রকম নিরাপদ, ভয়-ভাবনাহীন, সর্বপ্রকারের আশংকামুক্ত; পরিবারের নারী-পুরুষ ও ছেলেমেয়ে নৈতিকতা বিরোধী পরিবেশ ও অসৎ-অশ্লীল জীবনের হাতছানি বা আক্রমণ থেকে তেমনিই সর্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। বস্তুত পরিবারস্থ ছেলেমেয়ের পক্ষে পিতামাতা, ভাই বোনের তীব্র শাসন ও নিকটাত্মীয়দের সজাগ দৃষ্টির সামনে পথভ্রষ্ট হওয়া বা নৈতিকতা বিরোধী কোনো কাজ করা খুব সহজ হতে পারে না।

আল্লামা রাগেব ইস্ফাহানী কুরআনে উদ্ধৃত حِصْنٌ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

কারো সম্পর্কে تَحَصَّنَ বলা হয় তখন اذاتخذ الحصن مسكنا। 'যখন সে দুর্গকে বসবাসের স্থানরূপে গ্রহণ করে।' (المفردات ص ١٢٠)

আল্লামা শাওকানী লিখেছেনঃ

أَصْلُ التَّحَصُّنِ التَّمَنُّعُ -

দুর্গবাসী হওয়ার আসল মানে হচ্ছে প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন হওয়া।

যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ -

যেমন তোমাদেরকে তোমাদের ভয়-ভীতি থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে।

এ কারণেই ঘোড়াকে বলা হয় حصان

لِاَنَّهُ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ الْهَلَاكِ

কেননা সে তার মনিবকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

আর এই দৃষ্টিতেই حصان বলা হয় ঃ

اَلْمَرْاَةُ الْعَفِيْفَةُ لِمَنْعِهَا نَفْسَهَا -

পবিত্র চরিত্রসম্পন্না নারীকে, কেননা সে নিজকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে রাখে।

এখান থেকেই বলা হয় ঃ

اَلْاِحْصَانُ تَحْصِيْنُ النَّفْسِ عَنِ الْوُقُوْعِ فِيْمَا لَا يَرْضَى اللّٰهُ تَعَالٰى -

আল্লাহ্‌র অসন্তোষজনক কাজ থেকে নিজকে বিরত রাখাকে বল হয় 'ইহ্‌সান'।

কুরআনে বিবাহিতা মহিলাকে এ কারণেই বলা হয়েছে حصان অর্থাৎ পরিবারের দুর্গস্থিত সুরক্ষিত মহিলাগণ। শাওকানী বলেছেন ঃ المراد من المحصنات هنا ذوات الازواج এখানে 'মুহ্‌সানাত' মানে বিবাহিতাগণ। স্বামীসম্পন্না মেয়েলোক; এমন মেয়েলোক, যাদের স্বামী রয়েছে। এজন্যে যে ঃ

لِاَنَّهُنَّ اَحْصَنَّ فُرُوْجَهُنَّ مِنْ غَيْرِ اَزْوَاجِهِنَّ - (فتح القدير : ج-١، ص-٤١٣)

তারা তাদের যৌন অঙ্গকে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষদের থেকে সুরক্ষিত করে রেখেছে।

আল্লামা আলূসী লিখেছেন ঃ

المراد بهن على المشهور ذوات الازواج احصنهن التزوج او الا زواج اولاولياء اى منعهن عن الوقوع فى الاثم - (روح المعانى :ج -٥، ص-١)

মুহ্‌সানাত মানে স্বামীসম্পন্না মেয়েলোক, বিয়ে কিংবা স্বামী অথবা অলী— অভিভাবক তাদের গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

পারিবারিক জীবনের এই দুর্গপ্রাকার রক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করা আবশ্যক ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۞ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا - (بنى اسرائيل : ٢٣-٢٥)

তোমার আল্লাহ্ চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোরই দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের একজন কিংবা দুজনই যদি তোমার নিকট বৃদ্ধাবস্থায় জীবিত থাকে, তবে তাদের জন্যে কোনো কষ্টদায়ক ও দুঃখজনক কথা বলো না, তাদের ভর্ৎসনা করবে না এবং তাদের জন্যে সম্মানজনক কথাই বলবে। তোমার দুই বাহু তাদের খেদমতে অপরিসীম বিনয় ও দয়া-মায়া সহকারে বিছিয়ে দাও এবং তাদের জন্যে সব সময় এই বলে দো'আ করতে থাকোঃ হে আল্লাহ্ পরোয়ারদেগার! তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, যেমন করে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছেন আমার ছোট্ট শিশু অবস্থায়। তোমাদের আল্লাহ্ ভালোভাবেই জ্ঞাত আছেন তোমাদের মনের অবস্থা সম্পর্কে। তোমরা যদি বাস্তবিকই নেককার হতে চাও, তাহলে আল্লাহ্ তওবাকারী ও আশ্রয় ভিক্ষাকারীদের জন্যে সব সময়ই ক্ষমাশীল রয়েছেন।

এ আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ্‌র একত্বের কথা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলা হয়েছে এবং কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনের হুকুম অনেকটা বিস্তারিত করে পেশ করেছেন।

সূরা আল-আন'আম-এ বলা হয়েছে ঃ

اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - (১৫১)

আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছুই শরীক বানাবে না এবং পিতামাতার সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবে।

এ আয়াতেও পূর্বোল্লিখিত আয়াতের মতোই প্রথমে আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করতে নিষেধ— এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - (৮৩)

তোমরা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব কবুল করবে না এবং পিতামাতার সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবে।

কুরআন মজীদের এসব আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মানুষের ওপর সর্বপ্রথম হক হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার এবং তার পর পরই ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই হক হচ্ছে পিতামাতার। অনুরূপভাবে মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তার পরই কর্তব্য হচ্ছে পিতামাতার প্রতি। আরো অগ্রসর হয়ে বলা যায়, প্রত্যেকটি মানুষের সর্বাধিক কর্তব্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা এবং পিতামাতার প্রতি। এ দুয়ের মাঝে যদি কখনও বিরোধ বাধে, একটি ছেড়ে অপরটি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে আল্লাহ্‌র হক— আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্য অগ্রাধিকার পাবে। তার পরে হবে পিতামাতার হক্— পিতামাতার প্রতি কর্তব্য।

বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়, এসব আয়াতেই আল্লাহ্‌র হক ও আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে খুবই সংক্ষিপ্ত— একটি মাত্র শব্দে; আর পিতামাতার প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে অনেকটা বিস্তারিতভাবে। এ থেকে একদিকে যেমন একথা প্রমাণিত হয় যে, যে লোকই আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করবে, সে অবশ্যই পিতামাতার প্রতি তার কর্তব্য আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ীই পালন করবে। অনুরূপভাবে একথাও প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতার প্রতি সঠিক কল্যাণমূলক ব্যবহার করা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব— তারাই তা করে ও করতে পারে— যারা একমাত্র আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব কবুল করেছে, যারা শপথ নিয়েছে সমগ্র জীবন ভরে এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করার।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যের ওপর এখানে এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হলো কেন? আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করার নির্দেশ দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কেন পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করার হুকুম দেয়া হলো এবং কেনই বা তা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত করে বলা হলো?

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, আল্লাহ তা'আলার দেয়া জীবন-ব্যবস্থায় আকীদার দিক দিয়ে প্রথম ভিত্তি তওহীদ— আল্লাহ্‌র একত্ব; এবং সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে প্রথম ইউনিট হচ্ছে পরিবার। আর এ পরিবার গড়ে ওঠে পিতামাতার দ্বারা। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের বিবাহিত হয়ে একত্র বসবাস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হয় একটি পরিবারের প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর। এ আয়াতের বিশেষ বর্ণনাভঙ্গী ও পরম্পরা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের মূল লক্ষ্য এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বাস্তবায়িত করা, তার জন্যে পরিবার গঠন ও পারিবারিক জীবন যাপন না করলে এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী কবুল করা ও তদনুরূপ বাস্তব জীবনধারা পরিচালিত করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, এ পারিবারিক জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ ও শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনে সতত প্রস্তুত ও তৎপর হয়ে

থাকা। সন্তান-সন্ততি যদি পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনে প্রস্তুত না হয়, বিশেষ করে তাদের কর্তব্য ও অক্ষমতার অসহায় অবস্থায়ও যদি তাদের বোঝা বহনকারী পৃষ্ঠপোষক আশ্রয়দাতা ও প্রয়োজন পূরণকারী হয়ে না দাঁড়ায়— বরং যৌবনের শক্তি-সামর্থ্যের অহমিকায় অন্ধ হয়ে যদি তারা পিতামাতার প্রতি কোনোরূপ খারাপ ব্যবহার করে, জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তাদের খেদমত না করে, তাদের সাথে বিনয় ও নম্রতাসূচক ব্যবহার না করে, যদি তাদের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাভক্তি ও অন্তরের অকৃত্রিম দরদ পোষণ না করে, তাহলে সে অবস্থা পিতামাতার পক্ষে চরম দুঃখ, অপমান ও লাঞ্ছনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে পরিবার ও পারিবারিক জীবনের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে জাগে চিরন্তন অশ্রদ্ধা। এরপর অপর কোনো পুরুষ ও স্ত্রী পারিবারিক জীবন যাপনে— তথা সন্তান জন্মদান করে পিতামাতা হতে এবং সন্তানের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও দুঃসহ কষ্ট স্বীকার করতে আর কেউ রাজি নাও হতে পারে। তাহলে আল্লাহ্র একত্ববাদের বাস্তব রূপায়ণের প্রথম ভিত্তি এবং ইসলামী সমাজ-জীবনের প্রথম ঐকিক পরিবার গড়ে উঠতে পারবে না। আর তাই যদি না হয় তাহলে সেটা যে বড় মারাত্মক অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরিবার ও পারিবারিক জীবনের এ অপরিসীম গুরুত্বের কারণেই ইসলামে সেইসব বিধি-ব্যবস্থা ইতিবাচকভাবে দেয়া হয়েছে, যার ফলে পরিবার দৃঢ়মূল হতে পারে, হতে পারে সুখ-শান্তি ও মাধুর্যপূর্ণ এবং সেসব কাজ ও ব্যাপার-ব্যবহারকে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দেয়া হয়েছে যা পরিবারকে ধ্বংস করে, পারিবারিক জীবনকে তিক্ত ও বিষময় করে তোলে। আর তারই বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।

ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে বিয়েই হচ্ছে একমাত্র বৈধ উপায়, একমাত্র বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। বিয়ে ছাড়া অন্য কোনো ভাবে— অন্য পথে— নারী-পুরুষের মিলন ও সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিয়ে হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মাঝে সামাজিক পরিবেশে ও সমর্থনে শরীয়ত মুতাবেক অনুষ্ঠিত এমন এক সম্পর্ক স্থাপন, যার ফলে দুজনের একত্র বসবাস ও পরস্পরে যৌন-সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরূপে বৈধ হয়ে যায়। যার দরুন পরস্পরের ওপর অধিকার আরোপিত হয় এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্য পালনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

الزواج والطلاق فى الاسلام الزاكى الدين شعبان -

বস্তুত এ বিয়েই হচ্ছে ইসলামী সমাজে পরিবার গঠনের প্রথম প্রস্তর। একজন পুরুষ ও এক বা একাধিক স্ত্রী যখন বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস ও স্থায়ী যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে, তখনই একটি পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত হয়— হয় পারিবারিক জীবন যাপনের শুভ সূচনা।

কুরআন মজীদে এই বিয়ে ও স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থাকে নবী ও রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ দান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা 'আর-রায়াদ'-এ বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً - (٣٨)

হে নবী! তোমার পূর্বেও আমি অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের জন্যে স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

সূরা আন্-নূর-এ বয়স্ক ছেলেমেয়ে ও দাস-দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ - (٣٢)

এবং বিয়ে দাও তোমাদের এমন সব ছেলে-মেয়েদের, যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই, বিয়ে দাও তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য হয়েছে।

প্রথমোক্ত আয়াতে নবী ও রাসূলগণের জন্যে স্ত্রী গ্রহণ ও সন্তান লাভের সুযোগ করে দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তার মানে, বিয়ে করা ও সন্তান-সন্ততি লাভ করা নবী-রাসূলগণের পক্ষে কোনো অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছনীয় কাজ নয়। কেননা তাঁরাও মানুষ আর মানুষ হওয়ার কারণেই তাঁদের স্ত্রী গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে এবং বিয়ে করলে বা স্ত্রী গ্রহণ করা হলে তাদের সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। আবার জাহিলিয়াতের সময়কার লোকদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল এই যে, আল্লাহ্র নবী বা রাসূল হলে তাঁর আর বিয়ে-শাদী ও সন্তান হওয়া প্রভৃতি ধরনের কোনো বৈষয়িক বা জৈবিক কাজ করা অবাঞ্ছনীয় এবং অন্যায়। এ কারণে হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তারা উপযুক্ত বা সঠিক নবী বলে মানত না। এরই প্রতিবাদ করে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমোক্ত আয়াতে বলেছেন ঃ বিয়ে করা, স্ত্রী গ্রহণ করা, আর সন্তান-সন্ততি হওয়া হযরত মুহাম্মাদের বেলায় নতুন কোনো ব্যাপার নয়। তাঁর পূর্বেও বহু নবী ও রাসূল দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রায় সকলেই বিবাহিত ছিলেন, তাঁদের স্ত্রী ছিল আর

ছিল সন্তান-সন্ততি— যেমন হযরত মুহাম্মাদের রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিয়ে করা, স্ত্রী গ্রহণ করা ও সন্তান লাভ হওয়ার ব্যবস্থা করা— আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তাঁর নবী ও রাসূলগণের প্রতি এ নেয়ামত দিয়েছিলেন বিপুলভাবে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ও আল্লাহ্র এ বিশেষ নেয়ামতের দান থেকে বঞ্চিত থেকে যান নি।

নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ التَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالْخِتَانُ - (مسند احمد، ترمذى)

চারটি কাজ নবীগণের সুন্নাতের মধ্যে গণ্য; তা হচ্ছে ঃ সুগন্ধি ব্যবহার করা, বিয়ে করা, মিস্‌ওয়াক করা এবং খাতনা করানো।

উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতটিতে বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে ছেলেমেয়ের অভিভাবক মুরুব্বীদের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের আরবী তরজমা আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাশেমীর ভাষায় এরূপ ঃ

اَىْ زَوِّجُوْا مَنْ لَّا زَوْجَ لَهٗ مِنَ الْاَحْرَا وَالْحَرَائِرِ - وَمَنْ كَانَ فِيْهِ صَلَاحٌ مِنْ غِلْمَانِكُمْ وَجَوَارِيْكُمْ -

(محاسن التاويل : ج -١٢، ص -٤٥١)

তোমাদের স্বাধীন ছেলেমেয়েদের মধ্যে যার যার স্বামী বা স্ত্রী নেই, তাদেরকে বিয়ে দাও। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যেও যাদের বিয়ের যোগ্যতা রয়েছে, তাদেরও বিয়ে দাও।

'যার স্বামী বা স্ত্রী নেই' মানে যাকে আদৌ বিয়ে দেয়া হয়নি— যারা কুমার বা কুমারী, তাদের সকলেরই বিয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার মানে, একবারও যাদের বিয়ে হয়নি তাদের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা তো করতেই হবে; তেমনি যাদের একবার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তালাক কিংবা মৃত্যু যে-কোনো কারণে এখন জুড়িহারা তাদেরও বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। একবার বিয়ে হলে পরে কোনো কারণে স্বামীহারা বা স্ত্রীহারা হলে পুনরায় তার বিয়ের ব্যবস্থা না করা কিংবা বিয়ে করতে রাজি না হওয়া আল্লাহ্র নির্দেশের পরিপন্থী। আমাদের সমাজে এরূপ প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনো মেয়ে হয়ত একবার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে অথবা স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হয়ে গিয়েছে, অনুরূপভাবে কোনো ছেলের স্ত্রী মরে গেছে কিংবা তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে, এরূপ অবস্থায় তারা পুনর্বিবাহে প্রস্তুত হয় না। সমাজের শালীনতা ও পবিত্রতা এবং মানুষের জৈব প্রবণতা ও ভাবধারার দৃষ্টিতে এরূপ কাজ কল্যাণকর হতে পারে না।

মোটকথা, বিয়ের যোগ্য হয়েও কেউ যাতে অবিবাহিত ও অকৃতদার হয়ে থাকতে না পারে, তার ব্যবস্থা করাই ইসলামের লক্ষ্য। কেননা অকৃতদার জীবন কখনই পবিত্র ও পরিতৃপ্ত জীবন হতে পারে না। অবশ্য যে লোক বিয়ে করতে সমর্থ নয়, তার কথা স্বতন্ত্র।

একবার কিছু সংখ্যক সাহাবী সারা রাতদিন ধরে ইবাদত করার, সারা রাত জেগে থেকে নামায পড়ার, সারা বছর ধরে রোযা রাখার এবং বিয়ে না করার সংকল্প গ্রহণ করেন। নবী করীম (স) এসব কথা শুনতে পেয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং রাগত স্বরে বলেন ঃ

اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهٗ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَ اُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَ اَرْقُدُ وَ اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ - فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ - (بخارى، مسلم)

তোমরাই কি এ ধরনের কথাবার্তা বলনি ? আল্লাহ্র শপথ, একি সত্যি নয় যে, আমিই তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্কে বেশি ভয় করি, আমিই তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকি ?......কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রোযা থাকি, রোযা ভঙ্গও করি, নামায পড়ি, শুয়ে নিদ্রাও যাই

এবং রমণীদের পানিও গ্রহণ করি। এই হচ্ছে আমার নীতি-আদর্শ; অতএব যে লোক আমার এই নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

وَفِيْهِ اَنَّ النِّكَاحَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَعَمَ الْمَهْلَبُ اَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْاِسْلَامَ وَ اَنَّهُ لَا رَهْبَانِيَةَ فِيْهِ - وَ اَنَّ مَنْ تَرَكَهُ رَاغِبًا عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ مَذْمُوْمٌ مُبْتَدِعٌ - وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ اَجَلِ اَنَّهُ اَرْفَقُ لَهُ وَ اَعْوَنُ عَلَى الْعِبَادَةِ فَلَا مَلَا مَةَ عَلَيْهِ - وَزَعَمَ دَاوُدُ -مَنْ تَبِعَهُ اَنَّهُ وَاجِبٌ - (عمدة القارى : ج - ٢٠، ص -٦٥)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে করা নবীর সুন্নাত বিশেষ। মনীষী মহ্‌লাব বলেছেনঃ বিয়ে ইসলামের অন্যতম রীতি ও বিধান। আর ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো অবকাশ নেই। যে লোক রাসূলের সুন্নাতের প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাসের কারণে বিয়ে পরিত্যাগ করবে, সে অবশ্যই ভর্ৎসনার যোগ্য বিদয়াতী। তবে যদি কেউ এজন্যে বিয়ে না করে যে, তাহলে তার নিরিবিলি জীবন ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া সহজ হবে, তবে তাকে দোষ দেয়া যাবে না। ইমাম দায়ূদ জাহেরী এবং তাঁর অনুসারীদের মতে বিয়ে করা ওয়াজিব।

রাসূলের বাণী 'সে আমার উম্মতের মধ্যেই গণ্য নয়'-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই যে, যে লোক রাসূলের আদর্শের অনুসরণ না করবে, সে ইসলামের সহজ ঋজু ও একনিষ্ঠ পথের পথিক হতে পারে না, বরং রাসূলের আদর্শের সত্যিকার অনুসারী হবে সে ব্যক্তি ঃ

اَلَّذِيْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ اَنْ يُفْطِرَ لِيَقْوِيْ عَلَى الصَّوْمِ وَيَنَامُ لِيَقْوِيْ عَلَى الْقِيَامِ وَيَنْكِحُ النِّسَاءَ لِيُعَفَّ نَظْرَهُ وَفَرْجَهُ - (سبل الاسلام : ج -٣ ،ص- ١٠٩)

যে লোক নির্দিষ্টভাবে ইফতার করবে (রোযা ভঙ্গ করবে) রোযা পালনের সামর্থ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, নিদ্রা যাবে রাতে ইবাদতের জন্যে দাঁড়াবার শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে এবং বিয়ে করবে দৃষ্টি ও যৌন-অঙ্গকে কলুষমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, যদি কেউ রাসূলের এ আদর্শের বিরোধিতা করে এই ভেবে যে, রাসূলের আদর্শ অপেক্ষা অন্য আদর্শ উত্তম ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, তাহলে রাসূলের এ বাক্যাংশের অর্থ হবে ঃ

لَيْسَ مِنْ اَهْلِ مِلَّتِيْ - (سبل السلام : ج -٣ ، ص -١٠٩)

সে আমার মিল্লাত ও জাতির মধ্যে গণ্য নয়।

অন্য কথায়, সে পূর্ণ অর্থে মুসলিম নয়। কেননা এরূপ ধারণা পোষণ করা সুস্পষ্ট কুফরী।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهٰى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدً - (مسند احمد، بوغ السرام)

নবী করীম (স) আমাদেরকে বিয়ে করতে আদেশ করতেন, আর অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা থেকে খুব কঠোর ভাষায় নিষেধ করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীমের নিম্নোক্ত বাণী বর্ণনা করেছেন ঃ

لَا صَرُوْرَةَ فِىْ الْاِسْلَامِ - (مسند احمد)

কুমারিত্ব ও অবিবাহিত নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের কোনো নিয়ম ইসলামে নেই।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قَدَرَعَلٰى اَنْ يَّنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا - (دارمى، كتاب النكاح)

যে লোক বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়।

'ইবনে মাজাহ্' কিতাবে হযরত আয়েশা (রা) থেকে রাসূলের নিম্নোক্ত বাণী বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ - (ابن ماجه ابواب النكاح)

রাসূলে করীম (স) বলেছেন, বিয়ে করা আমার আদর্শ ও স্থায়ী নীতি, যে লোক আমার এ সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।

বস্তুত বিয়ে স্বভাবের দাবি, মানব প্রকৃতিতে নিহিত প্রবণতার স্বাভাবিক প্রকাশ, মানব সমাজের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত জরুরী। এজন্যে রাসূলে করীম (স) সমাজের যুবক-যুবতীদের সম্বোধন করে বলেছেনঃ

يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهٗ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهٗ لَهٗ وِجَاءٌ -

হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিয়ে করা কর্তব্য। কেননা বিয়ে দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী, যৌন অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যার সামর্থ্য নেই সে যেন রোযা রাখে, যেহেতু রোযা হবে তার ঢাল স্বরূপ।

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব যে কতখানি, তা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মে ও সমাজে বিয়ের তেমন কোনো গুরুত্ব স্বীকার করা হয়নি। বর্তমানে প্রাচীন কালের মানব সমাজের যে ইতিহাস প্রচলিত রয়েছে— আমার মতে তার প্রায় সম্পূর্ণটাই কল্পিত। তাতে ধারণা দেয়া হয়েছে যে, আদিম সমাজে বিয়ের প্রচলন ছিল না, বিয়ে হচ্ছে পরবর্তীকালের বিকাশমান সভ্যতার অবদান। খ্রিস্টধর্মে বিয়েকে একভাবে নিষেধই করে দেয়া হয়েছিল। ক্রীনথিওনের নামে লিখিত চিঠিতে উল্লিখিত রয়েছে ঃ

আমি অবিবাহিত ও বিধবাদের সম্বন্ধে মনে করি যে, তাদের এরকমই থাকা উচিত। কিন্তু যদি সংযম রক্ষা করতে না পারে, তবেই বিয়ে করবে।

উক্ত চিটির অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

তোমার স্ত্রী না থাকলে তুমি স্ত্রীর সন্ধান করো না। আর যদি বিয়ে করই তবু তাতে গুনাহ নেই।

মার্টিন লুথার সর্বপ্রথম বিয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিয়ে হচ্ছে সম্পূর্ণ দুনিয়াদারীর কাজ। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের নেতৃস্থানীয় লোকেরাও একে ধর্ম সম্পর্কহীন একটি কাজ মনে করতেন। বিয়ের স্বপক্ষে তারা কোনো স্পষ্ট রায় দেন নি। কিন্তু বিয়ে করা যে মানুষের— স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই— স্বভাবের এক প্রচণ্ড ও অনমনীয় দাবি, তা দুনিয়ার সব বিজ্ঞানীই স্বীকার করেছেন। গ্রীক-বিজ্ঞানী জালিনুস বলেছেন ঃ

প্রজনন ক্ষমতার ওপর আগুন ও বায়ুর প্রভাব রয়েছে, তার স্বভাব উষ্ণ ও সিক্ত। এর অধিকাংশই যদি অবরুদ্ধ হয় এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে নানা ধরনের মারাত্মক রোগ জন্মিতে পারে। কখনো মনে ভীতি ও সন্ত্রাসের ভাব সৃষ্টি হয়, কখনো হয় পাগলামীর রোগ। আবার মৃগী রোগও হতে পারে। তবে প্রজনন ক্ষমতার সুস্থ বহিষ্কৃতি ভালো স্বাস্থ্যের কারণ হয়। বহু প্রকারের রোগ থেকেও সে সুরক্ষিত থাকতে পারে।

প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল্লামা নফীসী বলেছেনঃ

وَقَدْ يَسْتَحِيْلُ الْمَنِيْ اِلٰى طَبْعِيَّةٍ سَمِيَّةٍ وَ يُرْسِلُ اِلَى الْقَلْبِ وَالدِّمَاغِ بُخَارًا رَدِّيًا سَمِيًّا يُوْجِبُ الْغَشِيُّ وَالصَّرْعَ وَ نَحْوِ هِمَا - (نفيسى : ص - ٤٢٤)

শুক্র প্রবল হয়ে পড়লে অনেক সময় তা অত্যন্ত বিষাক্ত প্রকৃতি ধারণ করে বসে। দিল ও মগজের দিকে তা এক প্রকার অত্যন্ত খারাপ বিষাক্ত বাষ্প উত্থিত করে দেয়, যার ফলে বেহুঁশ হয়ে পড়া বা মৃগী রোগ প্রভৃতি ধরনের ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দিহলভী বিয়ে না করার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে লিখেছেনঃ

اِعْلَمْ اَنَّ الْمَنِيَّ اِذَا كَثُرَ تَوَلَّدُهٗ فِى الْبَدَنِ صَعُدَ بُخَارُهٗ اِلَى الدِّمَاغِ - (حجة الله البالغة : ج - ١)

জেনে রাখো, শুক্রের প্রজনন ক্ষমতা যখন দেহে খুব বেশি হয়ে যায়, তখন তা বের হতে না পারলে মগজে তার বাষ্প উত্থিত হয়।

কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা বিয়ের গুরুত্বকে নষ্ট করে দিয়েছে। পারিবারিক জীবনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। পাশ্চত্য মনীষীদের বিচারে ইউরোপীয় সমাজে বিয়ে ও পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতার কতগুলো কারণ রয়েছে। কারণগুলোকে নিম্নোক্তভাবে আট-নয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

১. বিয়ে এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের অননুকূল দৃষ্টিভঙ্গি;
২. আধুনিক সভ্যতার চোখ জলসানো চাকচিক্য ও ব্যাপক কৃত্রিমতা;
৩. শিল্প বিপ্লবোত্তর নারী স্বাধীনতার আন্দোলন;
৪. নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে ভুল ধারণা;
৫. নারী-পুরুষের সাম্য ও সমানাধিকারের অবৈজ্ঞানিক দাবি;
৬. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ববোধ না থাকা;
৭. পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ভাবধারা এবং নৈতিকতা ও মানবিকতার পতন;
৮. পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠুতা, সুস্থতা ও সফলতা লাভের জন্যে অপরিহার্য নিয়ম বিধানের অভাব; এবং
৯.সাধারণভাবে জনগণের ধর্মবিমুখতা, ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতা।

পরিবার ও পারিবারিক জীবনে আধুনিক ইউরোপে যে ব্যর্থতা এসেছে, তার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের আলোচনার দৃষ্টিতেই এখানে উল্লেখ করা হলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বিধান এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। তার ফলে উভয় সমাজ ব্যবস্থা ও আদর্শের মৌলিক পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তেমনি বিশ্বমানবতার পক্ষে কোন ব্যবস্থাটি কল্যাণময়— মানবোপযোগী, তাও প্রতিভাত হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে ও পরিবার সম্পূর্ণরূপে একটি দেওয়ানী চুক্তির ফল। নারীর নিজেকে বিয়ের জন্যে উপস্থাপিত করা এবং পুরুষের তা গ্রহণ করা— এই 'ঈজাব' ও 'কবুল' দ্বারাই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরই ফলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে দাম্পত্য জীবন যাপন শুরু করার সুযোগ লাভ করে থাকে। এতে করে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতগুলো অধিকার নির্দিষ্ট হয়। দু'হাজার বছরের ধারাবাহিক ও ক্রমাগত চেষ্টা সাধনা সত্ত্বেও ইউরোপীয় সমাজ বিয়ে ও পরিবারকে অতখানি স্থান ও মর্যাদা দিতে পারেনি, যতখানি চৌদ্দশ বছর আগে ইসলাম দিয়েছে।

বিয়ের উদ্দেশ্য

বিয়ে এবং বিবাহিত জীবন যাপনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। দুনিয়ার কোনো কাজই সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া সম্পাদিত হয় নি। কুরআন মজীদে বিয়ের উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। কুরআনের এতদ্‌সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে সামনে রেখে চিন্তা করলে পরিষ্কার মনে হয়, কুরআনের দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্য নানাবিধ। এর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় নৈতিক চরিত্র, পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও কলুষমুক্ত রাখতে পারা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের গভীর প্রশান্তি ও স্থিতি লাভ এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক জীবন যাপন করে সন্তান জন্মদান, সন্তান লালন-পালন ও ভবিষ্যত সমাজের মানুষ গড়ে তোলা। নিম্নোক্ত কুরআন ভিত্তিক আলোচনা থেকে এসব উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সূরা আন-নিসা'র এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ – (النساء : ٢٤)

এই মুহাররম মেয়েলোক ছাড়া অন্য সব মেয়েলোক বিয়ে করা তোমাদের জন্যে জায়েয— হালাল করে দেয়া হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে তাদের লাভ করতে চাইবে নিজেদের চরিত্র দুর্জয় দুর্গের মতো সুরক্ষিত রেখে এবং বন্ধনহীন অবাধ যৌন চর্চা করা থেকে বিরত থেকে।

এ আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, নির্দিষ্ট কতকজন মেয়েলোক বিয়ে করা ও তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম। সেই হারাম বা মুহাররম মেয়েলোক কয়জন ছাড়া আর সব মেয়েলোকই বিয়ে করা পুরুষের জন্যে হালাল। দ্বিতীয়ত এসব হালাল মেয়েলোক তোমরা গ্রহণ করবে 'মোহরানা' স্বরূপ দেয়া অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করে। তৃতীয়ত মোহরানা ভিত্তিক বিয়ে ছাড়া অন্য কোনোভাবে এই হালাল মেয়েদের সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা যায় না এবং পঞ্চমত এভাবে বিয়ে করে নৈতিক চরিত্রের এক দুর্জয় দুর্গ— পরিবার-রচনা করা যায় এবং অবাধ যৌন চর্চার মতো চরিত্রহীনতার কাজ থেকে নিজকে বাঁচানো যায়। আর বিয়ের উদ্দেশ্যও এই যে, তার সাহায্যে স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্রের দুর্গকে দুর্জয় করতে হবে এবং অবাধ যৌন চর্চা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে।

সূরা আন্‌-নিসা'র অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ –

(النساء : ٢٥)

তোমরা মেয়েদের অভিভাবক মুরুব্বীদের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে করো, অবশ্য অবশ্যই তাদের দেন-মোহর দাও, যেন তারা তোমাদের বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিতা হয়ে থাকতে পারে এবং অবাধ যৌন চর্চায় লিপ্ত হয়ে না পড়ে। আর গোপন বন্ধুত্বের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিপতিত না হয়।

এ আয়াত যদিও ক্রীদদাসীদেরকে বিয়ে দেয়া সম্পর্কে, কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এ আয়াত থেকে বিয়ের উদ্দেশ্য জানা যায়। আর তা হচ্ছে, বিয়ে করে পরিবার-দুর্গ রচনা করা, জ্বেনা-ব্যভিচার বন্ধ করা, গোপন বন্ধুত্ব করে যৌন স্বাদ আস্বাদন করার সমস্ত পথ বন্ধ করা। আর এসব কেবল বিয়ে করে পারিবারিক জীবব যাপনের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। পূর্বোক্ত আয়াতে পুরুষদের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে আর এ আয়াতে সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর মেয়েদের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে এবং দুটো আয়াতেই পরিবারের দুর্জয় দুর্গ রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইমাম রাগেব লিখেছেন ঃ

وسمى النكاح حصنا لكونه حصنا لذويه عن تعاطى القبيح - (مفردات)

বিয়েকে দুর্গ বলা হয়েছে, কেননা তা স্বামী-স্ত্রীকে সকল প্রকার লজ্জাজনক কুশ্রী কাজ থেকে দুর্গবাসীদের মতোই বাঁচিয়ে রাখে।

নারী-পুরুষ কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই পরস্পর মিলিত হবে। তাহলেই উভয়ের চরিত্র ও সতীত্ব পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা পাবে। এ দুটো আয়াতেই বিয়েকে حصن 'দুর্গ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। দুর্গ যেমন মানুষের আশ্রয়স্থল, শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, বিয়ের ফলে রচিত পরিবারও তেমনি স্বামী-স্ত্রীর নৈতিক চরিত্রের পক্ষে একমাত্র রক্ষাকবচ। মানুষ বিবাহিত হলেই তার চরিত্র ও সতীত্ব রক্ষা পেতে পারে— অবশ্য যদি সে পরিবার সুরক্ষিত দুর্গের মতোই দুর্ভেদ্য ও রুদ্ধদ্বার হয়। মোটকথা, নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ ও পবিত্রতা— সতীত্বের হেফাযত হচ্ছে বিয়ের অন্যতম মহান উদ্দেশ্য।

নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُّطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ - (ابن ماجه)

যে লোক কিয়ামতের দিন পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন চরিত্র নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবার বাসনা রাখে, তার কর্তব্য হচ্ছে (স্বাধীন মহিলা) বিয়ে করা।

অর্থাৎ বিয়ে হচ্ছে চরিত্রকে পবিত্র রাখার একমাত্র উপায়। বিয়ে না করলে চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশংকা প্রবল হয়ে থাকে। মানুষ আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করে পাপের পংকিল আবর্তে পড়ে যেতে পারে যেকোনো দুর্বল মুহূর্তে।

বাস্তবিকই যে লোক তার নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখতে ইচ্ছুক, বিয়ে করা ছাড়া তার কোনোই উপায় নেই। কেননা এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করলে সে এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ সাহায্য লাভ করতে পারবে। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয়। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُكَاتِبُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِىْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (ترمذى، نسائى، ابن ماجه)

তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহ্‌র কর্তব্য হয়ে পড়ে। তারা হলো ঃ

১. যে দাস নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায় (আজকাল বলা যায় যে, কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার ঋণ আদায় করতে দৃঢ়সংকল্প);

২. যে লোক বিয়ে করে নিজের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়; আর

৩. যে লোক আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে আত্মসমর্পিত।

বস্তুত নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা কিছুমাত্র সহজসাধ্য কাজ নয়। বরং এ হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা এজন্যে প্রকৃতি নিহিত দুষ্প্রবৃত্তিকে— যৌন লালসা শক্তিকে— দমন করতে হবে। আর এ যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে লোক পাশবিকতার নিম্নতম পঙ্কে নেমে যাবে। কাজেই যদি কেউ এ থেকে বাঁচতে চায়, আর এ বাঁচার উদ্দেশ্যেই যদি বিয়ে করে— স্ত্রী গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্‌র সাহায্য-সহযোগিতা সে অবশ্যই লাভ করবে। আর আল্লাহ্‌র এই সাহায্যেই সে লোক বিয়ের মাধ্যমে স্বীয় নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে সফলকাম হবে।

কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই যে সতীত্ব ও নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা যেতে পারে, কুরআন মজীদে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ - (البقرة : ٧ -١)

স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ, আর তোমরা হচ্ছ তাদের জন্যে পোশাকবৎ।

অর্থাৎ পোশাক যেমন করে মানবদেহকে আবৃত করে দেয়, তার নগ্নতা ও কুশ্রীতা প্রকাশ হতে দেয় না এবং সব রকমের ক্ষতি-অপকারিতা থেকে বাঁচায়, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্যে ঠিক তেমনি। কুরআন মজীদেই পোশাকের প্রকৃতি বলে দেয়া হয়েছে এ ভাষায় ঃ

قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ -

নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্যে পোশাক নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখে।

পূর্বোক্ত আয়াতে স্বামীকে স্ত্রীর জন্যে পোশাক বলা হয়েছে। কেননা তারা দুজনই দুজনের সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ঢাকবার ও যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি সাধনের বাহন। ইমাম রাগেব লিখেছেন ঃ

جُعِلَ اللِّبَاسُ كِنَايَةً عَنِ الزَّوْجِ لِكَوْنِهِ سَتْرًا النَّفْسِهِ وَالزَّوْجِهِ أَنْ يَّظْهَرَ مِنْهُمَا سُوْءٌ كَمَا أَنَّ اللِّبَاسَ سَتْرٌ يَمْنَعُ أَنْ يَّبْدُوْا مِنْهُ الشَّوْاٰةَ - (محسن التاويل : ج -٣، ص- ٤٥٦)

পোশাক বলতে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীকে (আর স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে) মনে করা হয়েছে। কেননা এ স্বামী ও স্ত্রী একদিকে নিজে নিজের জন্যে পোশাকবৎ আবার প্রত্যেকে অপরের জন্যেও তাই। এরা কেউই কারো দোষ জাহির হতে দেয় না— যেমন করে পোশাক লজ্জাস্থানকে প্রকাশ হতে দেয় না।

বিয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী-পুরুষের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার দাবি পূরণ এবং যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি ও স্থিতি বিধান। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً - (الروم : ٢١)

এবং আল্লাহ্‌র একটি বড় নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য থেকে জুড়ি গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন তোমরা সে জুড়ির কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে তিনি প্রেম-ভালোবাসা ও দরদ-মায়া ও প্রীতি-প্রণয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

'তোমাদেরই মধ্য থেকে' অর্থ ঃ

مِنْ جِنْسِكُمْ لَا مِنْ جِنْسٍ اُخَرَ -

তোমাদেরই স্বজাতির মধ্য থেকে; অপর জাতির লোককে নয়।

অর্থাৎ মানব-মানবীর জুড়ি মানব-মানবীকে বানাবার নিয়ম করে দেয়া হয়েছে। নিম্নস্তরের বা উচ্চস্তরের অপর কোনো জাতির মধ্য থেকে জুড়ি গ্রহণের নিয়ম করা হয়নি।

এ আয়াতে জুড়ি গ্রহণের বা বিয়ে করার উদ্দেশ্যস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ যেন তোমরা সে জুড়ির কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি ও গভীর শান্তি-স্বস্তি লাভ করতে পার। তার মানে, স্বামী-স্ত্রীর মনের গভীর পরিতৃপ্তি— শান্তি স্বস্তি ও স্থিতি লাভ হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য। আর এ বিয়ের মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা জন্ম নিতে পেরেছে। আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা করে ইমাম আলূসী লিখেছেন ঃ

اَىْ جَعَلَ بَيْنَكُمْ بِالزَّوَاجِ الَّذِىْ شَرَعَهُ لَكُمْ تَوَادًا وَ تَرَحُّمًا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَكُمْ مُسَابِقَةُ مَعْرِفَةٍ وَ لَا مُرَابِطَةً مُصَحِّحَةً لِلتَّعَاطُفِ مِنْ قَرَابَةٍ اَوْرَحْمٍ - (روح المعانى : ج -٢١، ص -٣١)

অর্থাৎ তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়তের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা— বিয়ের মাধ্যমে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রেম-প্রণয় এবং মায়া-মমতা দরদ-সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অথচ

পূর্বে তোমাদের মাঝে না ছিল তেমন কোন পরিচয়, না নিকটাত্মীয় বা রক্ত-সম্পর্কের কারণে মনের কোনোরূপ সুদৃঢ় সম্পর্ক।

হযরত হাওয়া ও হযরত আদমের যখন প্রথম সাক্ষাত হয়, তখন হযরত আদাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : من انت 'তুমি কে?' তিনি বললেন :

حواء خلقنى الله لتسكن الى واسكن اليك - (عمدة القارى : ج -٥، ص- ٢١٢)

আমি হাওয়া, আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি আমার নিকট পরিতৃপ্তি ও শান্তি-স্বস্তি লাভ করবে। আর আমি পরিতৃপ্তি ও শান্তি লাভ করব তোমার কাছ থেকে।

অতএব এ থেকে আল্লাহ্র বিরাট সৃষ্টি ক্ষমতা ও অপরিসীম দয়া-অনুগ্রহের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সূরা 'আল আ'রাফ-এর নিম্নোক্ত আয়াতেও এ কথাই বলা হয়েছে গোটা মানব জাতি সম্পর্কে :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا - (٩-١)

সেই আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র মানবাত্মা থেকে এবং তার থেকেই বানিয়েছেন তার জুড়ি, যেন সে তার কাছে পরম সান্ত্বনা ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে।

এখানে পরম শান্তি ও তৃপ্তি বলতে মনের শান্তি ও যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতা বোঝানো হয়েছে। বস্তুত মনের মিল, জুড়ির প্রতি মনের দুর্নিবার আকর্ষণ এবং যৌন তৃপ্তি হচ্ছে সমগ্র জীবন ও মনের প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি লাভের মূল কারণ। তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মানে চরম অতৃপ্তি ও অশান্তির ভিতরে জীবন কাটিয়ে দেয়া। মনের প্রশান্তি ও যৌন তৃপ্তি যে বাস্তবিকই আল্লাহ্র এক বিশেষ দান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এজন্যে ঈমানদার স্ত্রী-পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে এ প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তিকে আল্লাহ্র সন্তোষ এবং তাঁরই দেয়া বিধান অনুসারে লাভ করতে চেষ্টা করা। এ আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এই দুনিয়ায় মানুষের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব যেমন এক স্বাভাবিক ব্যাপার, জুড়ি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও তেমনি এক প্রকৃতিগত সত্য, এ সত্যকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। এজন্যে প্রথম মানুষ সৃষ্টি করার পরই তার থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন। এ জুড়ি যদি বানানো না হতো, তাহলে প্রথম মানুষের জীবন অতৃপ্তি আর একাকীত্বের অশান্তিতে দুঃসহ হয়ে উঠত। আদিম মানুষের জীবনে জুড়ি গ্রহণের এ আবশ্যকতা আজও ফুরিয়ে যায় নি। প্রথম মানুষ যুগলের ন্যায় আজিকার মানব-দম্পতিও স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী। আজিকার স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে লাভ করে মনের প্রশান্তি ও যৌন তৃপ্তি, পায় কর্মের প্রেরণা। একজনের মনের অস্থিরতা ও উদ্বেগ ভারাক্রান্ততা অপরজনের নির্মল প্রেম-ভালবাসার বন্যাস্রোতে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যায়। একজনের নিজস্ব বিপদ-দুঃখও অন্যজনের নিকট নিজেরই দুঃখ ও বিপদরূপে গণ্য ও গৃহীত হয়। একজনের যৌন লালসা-কামনা উত্তেজনা অপরজনের সাহায্যে পায় পরম তৃপ্তি, চরিতার্থতা ও স্থিতি।

এসব কথা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মানুষের— সে স্ত্রী হোক কি পুরুষ— যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি লাভ এবং তার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে জুড়ি গ্রহণ বা বিয়ে ও বিবাহিত জীবন। যৌন উত্তেজনা মানুষকে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করে। এই সময় পুরুষ নারীর দিকে এবং নারী পুরুষের দিকে স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়ে। তখন একজন অপরজনের নিকট স্বীয় স্বাভাবিক শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের দরুন মনোবাঞ্ছা পূরণের নিয়ামক হয়ে থাকে। এজন্যে রাসূলে করীম (স) নির্দেশ দিয়েছেন যে, এরূপ অবস্থায় পুরুষ যেন স্বীয় (বিবাহিতা) স্ত্রীর কাছ চলে যায়।

তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِىْ قَلْبِهٖ فَلْيَعْمُدْ اِلٰى اِمْرَاَتِهٖ فَلْيُوَاقِعْهَا - فَاِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَافِىْ نَفْسِهٖ - (مسلم)

কোনো নারী যখন তোমাদের কারো মনে লালসা জাগিয়ে দেয়, তখন সে যেন তার নিজের স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তার সাথে মিলিত হয়ে স্বীয় উত্তেজনার উপশম করে নেয়। এর ফলে সে তার মনের আবেগের সান্ত্বনা লাভ করতে পারবে এবং মনের সব অস্থিরতা ও উদ্বেগ মিলিয়ে যাবে।

ইমাম নববী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اِنَّهٗ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ رَاٰى اِمْرَاَةً فَتَحَرَّكَتْ شَهْوَتَهٗ اَنْ يَاتِىَ اِمْرَاَتَهٗ فَلْيُوَاقِعْهَا فَيَدْفَعَ شَهْوَتَهٗ وَ تَسْكُنَ نَفْسُهٗ وَيَجْمَعَ قَلْبَهٗ عَلٰى مَا هُوَ بِصَدَدِهٖ (شرح مسلم : ج -١، ص -٤٤٩)

যে লোক কোনো মেয়েলোক দেখবে এবং তার ফলে তার যৌন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়ে উঠবে, সে যেন তার স্ত্রীর কাছে আসে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে তার যৌন উত্তেজনা সান্ত্বনা পাবে, মনে পরম প্রশান্তি লাভ হবে, মন-অন্তর তার বাঞ্ছা ও কামনা লাভ করে এককেন্দ্রীভূত হতে পারবে।

বিয়ে এবং বিবাহিত জীবনের তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান লাভ।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ - (البقرة : ٧ -١)

এখন সময় উপস্থিত, স্ত্রীদের সাথে তোমরা এখন সহবাস করতে পার— তাই তোমরা করো এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা কিছু নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাই তোমরা সন্ধান করো, তাই লাভ করতে চাও।

এখানে যে مباشرت 'মুবাশিরাত'-এর অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার মানে হচ্ছে اِلْصَاقُ الْبَشْرَةِ بِالْبَشْرَةِ একজনের শরীরের চামড়ার সাথে অপরজনের দেহের চামড়াকে লাগিয়ে দেয়া, মিশিয়ে দেয়া। আর এর লক্ষ্যগত অর্থ হচ্ছে ঃ اَلْجِمَاعُ الَّذِىْ يَسْتَلْزِمُهَا স্ত্রী সহবাস— সঙ্গম, যার জন্যে স্বামীর দেহের চামড়াকে স্ত্রীর দেহের চামড়ার সাথে মিলিয়ে-মিশিয়ে দিতে হয়।' আর 'আল্লাহ্ যা তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন' বলে দুটি কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে রমযান মাসের রাত্রি বেলায় স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি দান। কেননা এ আয়াত সেই প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সন্তান লাভ। কেননা স্ত্রী-সহবাসের মূল লক্ষ্য হলো সন্তান উৎপাদন। যেহেতু এ-ই তার ফল, তার পরিণতি। তাই 'লওহে মাহ্ফুযে' যে সন্তান তোমার জন্যে নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে, স্ত্রী-সহবাসের ফলে তাই পেতে চাওয়া উচিত— তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। অনুমতি প্রাপ্ত এ স্ত্রী-সহবাসের মূলে নিছক যৌন উত্তেজনার পরিতৃপ্তি আর লালসার চরিতার্থ তাই কখনো স্ত্রী সহবাসের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। এজন্যে যে ধরনের যৌন-উত্তেজনা পরিতৃপ্তির ফলে সন্তান লাভ হয় না যেমন পুংমৈথুন বা হস্তমৈথুন— তাকে শরীয়তে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আর যে ধরনের স্ত্রী-সহবাসের ফলে সন্তান লাভ সম্ভব হয় না কিংবা সন্তান হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে কিংবা স্ত্রী-সহবাস হওয়া সত্ত্বেও সন্তান হতে পারে না, শরীয়তে তাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এজন্যেই সূরা আল-বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ - (البقرة : ٢٢٣)

তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন করো— যেভাবে তোমরা চাও— পছন্দ করো।

এ আয়াতে স্ত্রীদেরকে কৃষির ক্ষেত বলা হয়েছে। অতএব স্বামীরা হচ্ছে এ ক্ষেতের চাষী। চাষী যেমন কৃষিক্ষেতে শ্রম করে ও বীজ বপন করে ফসলের আশায়, তেমনি স্বামীদেরও কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রী-সহবাস করে এমনভাবে বীজ বপন করা, যাতে সন্তানের ফসল ফলতে পারে— সন্তান লাভ সম্ভব হতে পারে।

কুরআনের এ দৃষ্টান্তমূলক কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। চাষী বিনা উদ্দেশ্যে কখনো কষ্ট স্বীকার করে ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে জমি চাষ করে না, কেবলমাত্র মনের খোশ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে কেউ এ কাজে উদ্যোগী হয় না। এ কাজ করে একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে আর তা হচ্ছে ফসল লাভ। কুরাআনের ভাষায় স্বামীরাও এমনি উদ্দেশ্যপূর্ণ চাষী— সন্তান ফসলের চাষাবাদকারী। স্ত্রীদের যৌন অঙ্গ হচ্ছে তার কাছে চাষের জমিস্বরূপ আর স্ত্রীর যৌন অঙ্গে শুক্র প্রবেশ করানো হচ্ছে চাষীর জমিতে শস্য বীজ বপন করার মতো। চাষী যেমন এই সমস্ত কাজ ফসলের আশায় করে, স্বামীদেরও উচিত সন্তান লাভের আশায় স্ত্রী-সঙ্গম করা। কেবল যৌন স্পৃহা পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে এ কাজ হওয়া উচিত নয়। বরং এই সন্তান-ফসল লাভের উদ্দেশ্যেই বিয়ে করতে হবে। স্ত্রী গ্রহণ ও তার সাথে সঙ্গম করতে হবে। অতএব বিয়ের একটি চরমতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান লাভ। এ কথাই আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আয়াতের পরবর্তী অংশে ঃ

وَقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ -

এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যে কাজ করো।

অর্থাৎ এ স্ত্রী-সহবাস দ্বারা সন্তান লাভ করার আশা মনে মনে পোষণ করতে থাকো।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীলোক কেবলমাত্র যৌন লালসা পরিতৃপ্তির মাধ্যম বা উপায় নয়, স্ত্রী গ্রহণ ও তার সাথে মিলে পারিবারিক জীবন যাপনের এক মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যের মধ্যে সন্তান লাভ— ভবিষ্যৎ মানব বংশকে রক্ষা করা— হচ্ছে অন্যতম। মানব সমাজের কুরআন ভিত্তিক ইতিহাস থেকেই জানা যায়, স্ত্রীলোক গ্রহণ করে বিবাহিত ও পারিবারিক জীবন যাপন করার ফলেই দুনিয়ায় মানব জাতির এই বিপুল বিস্তার সম্ভব হয়েছে। এ কারণেই স্বাভাবিকভাবে রমনীর মনে সন্তান লাভের দুর্বার আকাঙ্খা বিদ্যমান থাকে। এমন কি আজকাল বন্ধ্যা নারীরাও টেস্ট টিউবের সাহায্যে সন্তান লাভের চেষ্টা চালাচ্ছে। সম্প্রতি পত্র-পত্রিকার খবরে প্রকাশ, ব্রিস্টলের লেসলী ব্রাউন নামের জনৈক বন্ধ্যা রমণী টেস্ট টিউবের সাহায্যে দুই বার গর্ভবতী হয়ে দুটি সন্তানের জননী হয়েছেন। আর মানব বংশের এই ধারা বৃদ্ধির স্থায়িত্বের জন্যেই বিয়ে করাকে এক অপরিহার্য কাজ বলে ইসলামে ঘোষিত হয়েছে। বিয়ে ব্যতীত নারী পুরুষের যৌন মিলন নিষিদ্ধ— হারাম করে দেয়া হয়েছে। কেননা তা মানুষের নৈতিক চরিত্রের পক্ষে যেমন মারাত্মক, তেমনি তার ফলে মানব বংশের পবিত্রতা রক্ষা ও সুষ্ঠুভাবে ভবিষ্যত সমাজ গঠন বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। ইউরোপে মেয়েদের 'বয় ফ্রেণ্ড' 'ছেলে বন্ধু' ও ছেলেদের 'গার্ল ফ্রেণ্ড' 'মেয়ে বান্ধবী' গ্রহণের এবং রক্ষিতা রাখার অবাধ সুযোগ দিয়ে যেমন সুস্পষ্ট ব্যভিচারের পথ খুলে দেয়া হয়েছে, তেমনি তা ভবিষ্যত বংশের পবিত্রতাকেও বিনষ্ট করে ফেলেছে। এর ফলে সাময়িকভাবে যৌন পরিতৃপ্তি লাভ হতে পারে বটে, কিন্তু একজন নারীর পক্ষে একজন পুরুষের স্থায়ী জীবন সঙ্গিনী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ সম্ভব হয় না, বংশের ধারাও সুষ্ঠুভাবে রক্ষা পেতে পারে না। এর ফলে তাই ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব এত বেশি। ইসলামের

বিয়ে হচ্ছে নারী-পুরুষের এক স্থায়ী বন্ধন। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের মিলন এমন কোনো ক্রীড়া নয়, যা দু'দিন খেলা হলো, তারপর যে যার পথে চম্পট দিয়ে চলে গেল। এ জন্যে কুরআনে বিবাহিতা স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَ اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا - (النساء : ٢١)

এবং বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদের নিকট থেকে শক্ত ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।

ইসলামে বিয়ে এমনি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিরই বাস্তব অনুষ্ঠান। এ প্রতিশ্রুতি সহজে ভঙ্গ করা যেতে পারে না।

বিয়ের তাগিদ

ওপরের আলোচনা থেকে একদিকে যেমন বিয়ের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, অপর দিকে ঠিক তেমনি বিয়ের আবশ্যকতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ উজ্জ্বল ও প্রতিভাত হয়েছে। বস্তুত বিয়ে করা ইসলামে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিয়ের তাগিদও করা হয়েছে কুরআন ও হাদীসে।

বিয়ের তাগিদ সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত আমরা আবার পড়তে পারি। তাতে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ - (النور : ٣٢)

এবং বিয়ে দাও তোমাদের মধ্যের জুড়িহীন (স্বামী বা স্ত্রীহীন) ছেলে-মেয়েদের আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য তাদের।

আয়াতে উদ্ধৃত الايامى শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

يُقَالُ ذٰلِكَ لِلْمَرْءَةِ الَّتِىْ لَا زَوْجَ لَهَا وَالرَّجُلُ الَّذِىْ لَا زَوْجَةَ لَهٗ وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ثُمَّ فَارَقَ اَوْلَمْ يَتَزَوَّجْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا - تفسير ابن كثير ج-٤، ص٢٨

'আয়ামা' বলতে বোঝায় এসব মেয়েলোক, যাদের স্বামী নেই এবং সেসব পুরুষকে যাদের স্ত্রী নেই, একবার বিয়ে হওয়ার পর বিচ্ছেদ হওয়ার কারণে এরূপ হোক কিংবা আদৌ বিয়েই না হওয়ার ফলে।

সংশ্লিষ্ট আয়াতাংশের অর্থ করা হয়েছে এ ভাষায় ঃ

ياايها المؤمنون زوجوا من لا زوج له من احرار رجالكم وامائكم ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواريكم - (عمدة القرى : ج -٢٠، ص -١٢١)

হে মু'মিন লোকেরা! তোমাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাদের স্বামী নেই, তাদের বিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিয়ের যোগ্য তাদেরও।

ইমাম ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

هذا امر بالتزويج وقد ذهب طائفة من العماء الى وجوبه على كل من قدرعليه -

এ আয়াতে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়ার আদেশ করা হয়েছে। ইসলামের মনীষীদের মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।

এ শ্রেণীর মনীষীরা উপরিউক্ত আয়াতের পরে নিম্নোদ্ধৃত হাদীসটিও একটি দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন। হাদীসটি পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। রাসূলে করীম (স) যুবক বয়সের লোকদের সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন ঃ

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء - (بخارى، مسلم)

হে যুবক-যুবতীগণ! তোমাদের মধ্যে যারাই বিয়ের সামর্থ্যবান হবে, তাদেরই বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে তাদের চোখ বিনত রাখবে, তাদের যৌন অঙ্গ পবিত্র ও সুরক্ষিত রাখবে। আর যাদের সে সামর্থ্য নেই, তাদের রোযা রাখা কর্তব্য। তাহলে এই রোযা তাদের যৌন উত্তেজনা দমন করবে।

হাদীসে 'যুবক-যুবতী' কাদের বোঝানো হয়েছে, তার জবাবে ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

وَالشَّابُّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا هُوَ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِزْ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً -

আমাদের লোকদের মতে যুবক-যুবতী বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে, যারা বালেগ— পূর্ণ বয়স্ক হয়েছে এবং ত্রিশ বছর বয়স পার হয়ে যায় নি— তাদের।

আর এই যুবক-যুবতীদের বিয়ের জন্যে রাসূলে করীম (স) তাগিদ করলেন কেন, তার কারণ সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

اِنَّمَا خَصَّ الشَّبَابَ بِالْخِطَابِ لاَنَّ الْغَلِبَ وَجُوْدُ قُوَّةِ الدَّاعِىْ فِيْهِمْ اِلَى النِّكَاحِ بِخِلاَفِ الشُّيُوْخِ .

(عمدة القارى : ج -٢٠، ص- ٦)

হাদীসে কেবলমাত্র যুবক-যুবতীদের বিয়ে করতে বলার কারণ এই যে, বুড়োদের অপেক্ষা এই বয়সের লোকদের মধ্যেই বিয়ে করার প্রবণতা ও দাবি অনেক বেশি বর্তমান দেখা যায়।

আর

نِكَاحُ الشَّابَّةِ فَاِنَّهَا اَلَذُّ اِسْتِمْتَاعًا وَ اَطْيَبُ نُكْهَةً وَ اَحْسَنُ عُشْرَةً وَ اَفْكَهُ مُحَادَثَةً وَ اَجْمَلُ مَنْظَرًا وَالْيَنُ مَلْمَسًا وَ اَقْرَبُ اِلَى اَنْ يُّعَوْدَهَا زَوْجُهَا الاَ خَلاَقَ الَّتِىْ يَرْتَضِيْهَا وَ اِسْتِحْبَابَ الاَسْرَارِ بِمِثْلِهِ -

(عمده القارى : ج-٢٠، ص- ٦)

যুবক-যুবতীর বিয়ে যৌন সম্ভোগের পক্ষে খুবই স্বাদপূর্ণ হয়, মুখের গন্ধ খুবই মিষ্টি হয়, দাম্পত্য জীবন যাপন খুবই সুখকর হয়, পারস্পরিক কথাবার্তা খুব আনন্দদায়ক হয়, দেখতে খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, স্পর্শ খুব আরামদায়ক হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী তার জুড়ির চরিত্রে এমন কতগুলো গুণ সৃষ্টি করতে পারে, যা খুবই পছন্দনীয় হয় আর এ বয়সের দাম্পত্য ব্যাপার প্রায়শই গোপন রাখা ভালো লাগে।

যুবক বয়স যেহেতু যৌন সম্ভোগের জন্যে মানুষকে উন্মুখ করে দেয়, এ কারণে তার দৃষ্টি যে কোনো মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এবং সে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় পড়ে যেতে পারে। এজন্যে রাসূলে করীম (স) এ বয়সের ছেলেমেয়েকে বিয়ে করতে তাগিদ করেছেন এবং বলেছেনঃ বিয়ে করলে আর চোখ যৌন সুখের সন্ধানে যত্রতত্র ঘুড়ে বেড়াবে না এবং বাহ্যত তার কোনো ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকবে না। এ কারণে রাসূলে করীম (স) যদিও কথা শুরু করেছেন যুবক মাত্রকেই সম্বোধন করে; কিন্তু

শেষ পর্যন্ত বিয়ের এ তাগিদকে নির্দিষ্ট করেছেন কেবল এমন সব যুবক-যুবতীদের জন্যে, যাদের বিয়ের সামর্থ্য রয়েছে। বিয়ের সামর্থ্য মানে রতিক্রিয়া, যৌন, সম্ভোগ স্ত্রী সঙ্গম। আর যারা যুবক বয়সেও নানা কারণে তার সামর্থ্য রাখে না, যারা রতিক্রিয়া ও স্ত্রী সঙ্গমেও অক্ষম, তাদেরকে রাসূল (স) বলেছেন রোযা রাখতে। যেন ঃ

لِيَقْطَعَ شَهْوَتَهُ يَقْطَعَ شَرَّ مَنِيِّهِ - (عمدة القارى : ج -٢٠، ص -٦٨)

তার যৌন উত্তেজনা দমিত হয়, দমিত হয় তার বীর্যশক্তির দাপট।

لانه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسارعن الشهوة - (سبل السلام :ج-٣،ص-١٠٧)

রোযা রাখলে পানাহার কম হয়। আর পানাহারের মাত্রা কম হলে যৌন প্রবৃত্তি দমিত হয়।

উপরিউক্ত হাদীসে যদিও বাহ্যত কোনো যৌন সঙ্গম কার্যে অক্ষম লোকদেরকে রোযা রাখতে বলা হয়েছে; কিন্তু আসল কথা কেবল তাদের সম্পর্কেই নয়, বরং তাদের সম্পর্কেও যারা বিয়ের ব্যয় বহনের সঙ্গতি রাখে না, এ শ্রেণীর লোককেও রোযা রাখতে বলা হয়েছে। এ কথার সমর্থনে অপর দুটো বর্ণনার উল্লেখ করা যায়।

একটি ইসমাঈলীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَزَوَّجَ فَلْيَتَزَوَّجْ -

তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সমর্থ, তাদের বিয়ে করা উচিত।

আর অপরটিতে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ ذَاطَوِيْلٍ فَلْيَنْكَحْ - (نسائى)

যে-ই বিয়ের ব্যয়ভার বহনে সামর্থ্যবান, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে।

ফল কথা, বিয়ে করার ব্যয়ভার বহন এবং যৌন সঙ্গম কার্যে সক্ষম যুবক-যুবতীর বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই বিয়ে করা উচিত।

এই প্রসঙ্গে মনীষীগণ নিম্নোক্ত হাদীসটিকেও উল্লেখ করে থাকেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ

تَزَوَّجُوا الْوَلُوْدَ تَنَاسَلُوْا فَاِنِّىْ مُبَاهٍ بِكُمُ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (تفسير ابن كثير : ج -٣، ص- ٢٨٦)

তোমরা সব অধিক সন্তানবতী মেয়েলোকদের বিয়ে করো এবং বংশ বাড়াও; কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যা বিপুলতা নিয়ে অপর নবীর উম্মত সংখ্যার মুকাবিলায় গৌরব করব।

বিয়েতে কুফু'র প্রশ্ন

বিয়েতে কুফু'র কোনো গুরুত্ব আছে কি ? এ সম্পর্কে ইসলামের জবাব সুস্পষ্ট ও যুক্তিভিত্তিক।

'কুফু' মানে اَلْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَلَةُ 'সমতা ও সাদৃশ্য'। অন্য কথায়, বর ও কনের 'সমান-সমান হওয়া', একের সাথে অপরজনের সমঞ্জস্য হওয়া। বিয়ের উদ্দেশ্য যখন স্বামী-স্ত্রীর মনের প্রশান্তি লাভ, উভয়ের সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষা, তখন উভয়ের মধ্যে যাতে করে সমতা ও সমঞ্জস্য রক্ষা পায়— যেন এ মিলমিশ লাভের পথে বাধা বা অসুবিধা সৃষ্টির সামান্যতম কারণও না ঘটতে পারে, তার ব্যবস্থা করা একান্তই কর্তব্য।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ط وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا - (الفرقان -٥٤)

সেই মহান আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'পানি' থেকে, তার পরে তাকে পরিণত করেছেন বংশ ও শ্বশুর-জামাতার সম্পর্কে। আর তোমার আল্লাহ্ বড়ই শক্তিমান।

ইমাম বুখারী 'বুখারী শরীফ'-এ এ আয়াতটিকে 'কুফু' অধ্যায়ের সূচনায় উল্লেখ করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী তার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

وَغَرْضُهٗ مِنْ اِيْرَادِ هٰذِهِ الْاٰيَةِ الْاِشَارَةِ اِلٰى اَنَّ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حُكْمُ الْفَائَةِ -

(عمدة القارى : ج -٢٠، ص -٣ -)

এ আয়াতটিকে এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বংশ ও শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ক এমন জিনিস, যার সাথে কুফু'র ব্যাপারটি সম্পর্কিত।

এ আয়াতে মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগ হচ্ছে বংশ রক্ষার বাহন— মানে পুরুষ ছেলে, বংশ তাদের দ্বারাই রক্ষা পায়, 'অমুকের ছেলে অমুক' বলে পরিচয় দেয়া হয়। আর দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষার বাহন— মানে কন্যা সন্তানকে অপর ঘরের ছেলের নিকট বিয়ে দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আর এ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে যাতে করে ভবিষ্যত বংশ রক্ষার ব্যবস্থা হয় সেই দৃষ্টিতে কুফু' রক্ষা করা একটা বিশেষ জরুরী বিষয়।

কুফু'র মানে যদিও اَلْمِثْلُ وَالنَّظِيْرُ —সমান-সদৃশ, তবু বিয়ের ব্যাপারে কোন কোন দিক দিয়ে এর বিচার করা আবশ্যক, তা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ।

এ পর্যায়ে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

اَلْاَكْفَاءُ الَّتِىْ بِالْاِ جْمَاعِ هِىَ اَنْ يَّكُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمَةِ اَنْ تَزَوَّجَ بِالْكَافِرِ -

'কুফু'— যা ইসলামের বিশেষজ্ঞদের নিকট সর্বসম্মত ও গৃহীত— তা' গণ্য হবে দ্বীন পালনের ব্যাপারে। কাজেই মুসলিম মেয়েকে কাফিরের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল সায়য়ানী লিখেছেন ঃ

وَالْكَفَاءَةُ فِى الدِّيْنِ مُعْتَبَرَةٌ فَلَا يَحِلُّ تَزْيِجُ مُسْلِمَةٍ بِكَافِرٍ اِجْمَاعًا -

কুফু'র হিসেব হবে দ্বীনদারীর দৃষ্টিতে। আর এ হিসেবেই কোনো মুসলিম মেয়েকে কোনো কাফির পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না— ইজমা'র সিদ্ধান্ত এই।

কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট ঘোষণায় এ ইজমা'র ভিত্তি উদ্ধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ - (النور : ٣)

ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে, পক্ষান্তরে ব্যভিচারী নারীকে অনুরূপ ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষ ছাড়া আর কেউ বিয়ে করবে না। মু'মিনদের জন্যে তা হারাম করে দেয়া হয়েছে।

কুরআন এর পূর্ববর্তী আয়াতে জ্বেনাকারীদের জন্যে কঠোর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে জ্বেনাকারী পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে কোনোরূপ বিষয়ে সম্পর্ক স্থাপন করাকে ঈমানদার স্ত্রী পুরুষের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আল্লামা আল-কাসেমী লিখেছেন ঃ

وَفِيْهَا دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الزَّانِىْ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَطْلَقَ الْاِيْمَانِ وَ اِنْ لَّمْ يَكُنْ مُشْرِكًا -

(محاسن التاويل : ج -١١، ص -٤٤٤٣)

এ আয়াত থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, ব্যভিচারী মোটামুটিভাবেও ঈমানদার নয়, যদিও তাকে মুশরিক বলা যায় না।

আর আয়াতটির শেষ শব্দ থেকে জানা যায় ঈমানই ব্যভিচারী পুরুষ স্ত্রীকে বিয়ে করতে ঈমানদার লোকদের বাধা দেয়— নিষেধ করে। যে তা করবে সে হয় মুশরিক হবে, নয় ব্যভিচারী। সে ধরনের ঈমানদার সে নয় অবশ্যই, যে ধরনের ঈমান এ ধরনের বিয়েকে নিষেধ করে, ঘৃণা জাগায়। কেননা জ্বেনা-ব্যভিচার বংশ নষ্ট করে আর জ্বেনাকারীর সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপনে পাপিষ্ঠের সঙ্গে স্থায়ীভাবে একত্র বাস— সহবাস করা অপরিহার্য হয়। অথচ আল্লাহ্ এ ধরনের সম্পর্ক-সংস্পর্শকে চিরদিনের তরে নিষেধ করে দিয়েছেন।

অন্য কথায়, ব্যভিচারী পুরুষ ঈমানদার মেয়ের জন্যে এবং ব্যভিচারী নারী ঈমানদার পুরুষের জন্যে কুফু নয়। কেননা স্বভাব-চরিত্র ও বাস্তব কাজের দিক দিয়ে এ দুশ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে, এ দুয়ের মধ্যে মনের মিল, চরিত্র ও স্বভাবের ঐক্য হওয়া, হৃদয়ের সম্পর্ক দৃঢ় হওয়া, নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং প্রাণের শান্তি ও স্বস্তি লাভ— যা বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য— কখনো সম্ভব হবে না। তাই কুরআন মজীদের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ط لَايَسْتَوٗنَ - (السجدة : ١٨)

মু'মিন কি কোনোক্রমেই ফাসিকদের সমান হতে পারে ? না, এরা সমান নয়।

মানে, মু'মিন ও ফাসিক এক নয়, নেই এদের মধ্যে কোনো রকমের সমতা ও সাদৃশ্য। অতএব মু'মিন স্ত্রী বা পুরুষ কখনোই ফাসিক বা কাফির স্ত্রী বা পুরুষের জন্য কুফু নয়।

কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের সমর্থনে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখযোগ্য। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেনঃ

اَلزَّانِى الْمَجْلُوْدُ لَا يَنْكِحُ اِلَّا مِثْلَهٗ - (مسند احمد، ابوداؤد)

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যভিচারী তারই মতো দণ্ডপ্রাপ্তা ব্যভিচারিণী ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে না।

উম্মে মাহজুল নাম্নী কোনো ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করা হলে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

اَلزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ - (مسند احمد)

ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী বা মুশরিক ছাড়া অন্য কাউ বিয়ে করবে না।

বলা বাহুল্য, হাদীসদ্বয়ের সনদ সহীহ্ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। তাবারানী ও মজমাওয যওয়ায়িদ গ্রন্থেও এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। (نيل الاوطار جـ ٦، صـ ٢٨٢)

সূরা আন-নূর-এর নিম্নোক্ত আয়াতটিও এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য। বলা হয়েছে ঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ج وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ - (النور : ٢٦)

দুশ্চরিত্রশীলা মেয়েলোক দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা মেয়েদের জন্যে আর সচ্চরিত্রবতী মেয়েলোক সচ্চরিত্রবান পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্রবান পুরুষ সচ্চরিত্রা মেয়েদের জন্য।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

চরিত্রহীনা মেয়ে চরিত্রহীন পুরুষদের জন্যে, তাই চরিত্রহীনা মেয়েলোক চরিত্রবান পুরুষদের জন্যে বিবাহযোগ্য হতে পারে না। কেননা তা কুরআনে বর্ণিত চূড়ান্ত কথার খেলাফ। অনুরূপভাবে সচ্চরিত্রবান পুরুষ সচ্চরিত্রবতী মেয়েদের জন্যে। অতএব কোনো চরিত্রবান পুরুষই কোনো চরিত্রহীনা মেয়ের জন্যে বিয়ের যোগ্য হতে পারে না। কেননা তাও কুরআনের বিশেষ ঘোষণার পরিপন্থী। (تفسير محاشن التاويل جـ -١١، صـ ٤٤٧٤)

অন্য কথায় নেককার পুরুষ কেবলমাত্র নেককার স্ত্রীলোকই গ্রহণ করবে, বদকার ও চরিত্রহীনা নারী নয়। কেননা তা তার জন্যে কুফু নয়। এমনিভাবে কোনো নেককার চরিত্রবতী মেয়েকে বদ্‌কার চরিত্রহীন পুরুষের নিকট বিয়ে দেয়া যেতে পারে না। কেননা তা তার জন্যে কুফু নয়। সারকথা এই যে, বিয়ের ব্যাপারে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কুফুর বিচার অবশ্যই করতে হবে। আর সে কুফু হবে নৈতিক চরিত্র ও দ্বীনদারীর দিক দিয়ে।

তাই নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا اَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهٗ وَ عَقْلَهٗ فَانْكِحُوْهُ - (ترملى)

তোমরা যখন বিয়ের জন্যে এমন ছেলে বা মেয়ে পেয়ে যাবে যার দ্বীনদারী চরিত্র ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে তোমরা পছন্দ করবে, তো তখনই তার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করো।

ইমাম শাওকানী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اِعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِى الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ - (نيل الاوطار : ج -٦، ص -٢٦٢)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, দ্বীনদারী ও চরিত্রের দিক দিয়ে কুফু আছে কিনা বিয়ের সময়ে তা অবশ্য লক্ষ্য করতে হবে।

ইমাম মালিক (রহ) সম্পর্কে ইমাম শাওকানীই লিখেছেন ঃ

وَقَدْ جَزَمَ بِاَنَّ اِعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ مُخْتَصٌّ بِالدِّيْنِ مَالِكٌ -

ইমাম মালিক দৃঢ়তা সহকারে বলেছেন, কেবলমাত্র দ্বীনদারীর দিক দিয়েই কুফু বিচার করতে হবে— অন্য কোনো দিক দিয়ে নয়।

আল্লামা খাত্তাবী সুনানে আবূ দাউদ-এর ব্যাখ্যায় ইমাম মালিকের নিম্নোক্ত কথাটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اَلْكَفَاءَةُ فِى الدِّيْنِ وَاَهْلُ الْاِسْلَامِ كُلُّهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَكْفَاءُ - (معالم السنن : ج -٣، ص- ١٨٠)

কুফু কেবলমাত্র দ্বীনদারীর দিক দিয়েই লক্ষণীয় ও বিবেচ্য। আর ইসলামী জনতার সকলেই পরস্পরের জন্যে কুফু।

এ ছাড়া ধন-সম্পদ ও বংশমর্যাদা ইত্যাদির দিক দিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কুফুর কোনো প্রশ্ন নেই। কেবলমাত্র ইমাম শাফিঈ (রহ) ধন-সম্পত্তির দৃষ্টিতেও কুফু'র গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা এ কথা প্রমাণ করতে পারেনি যে, ধনী ও গরীবের সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক বিয়ে হলে দাম্পত্য জীবনে তাদের প্রেম ও ভালোবাসার সৃষ্টি হতে পারে না। তবে এক তরফের ধন-ঐশ্বর্য ও বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্য অনেক সময় দাম্পত্য জীবনে তিক্ততারও সৃষ্টি করতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিঈ একটি হাদীসের ভিত্তিতে বংশীয় কুফু'র গুরুত্বও স্বীকার করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে এই— নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءُ بَعْضٍ وَالْمَوَالِى بَعْضُهُمْ اَكْفَاءُ - (حاكم)

আরবের লোকেরা পরস্পরের জন্যে কুফু। আর ক্রীতদাসেরাও পরস্পরের কুফু।

কিন্তু এ হাদীসের সনদ ও তার শুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। কেননা এর সনদে একজন বর্ণনাকারী এমন রয়েছে, যার নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম ইবনে আবূ হাতিম তাকে অপরিচিত লোক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি তাঁর পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

هٰذَا كَذِبٌ لَا اَصْلَ لَهُ -

এ হাদীসটি মিথ্যা, এর কোনো ভিত্তি নেই।

অপর এক জায়গায় বলেছেন, এ হাদীসটি বাতিল। ইমাম দারে-কুত্নী বলেছেন ঃ لَايَصِحُّ 'হাদীসটি সহীহ্ নয়।' ইবনে আবদুল বাররয় বলেছেন ঃ هٰذَا مُنْكَرٌ مَوْضُوْعٌ 'এ হাদীসটি গ্রহণ অযোগ্য, এটি কারো নিজস্ব রচিত।' (سبل السلام جـ ٣، صـ ١٢٧) আল্লামা শাওকানী এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেনঃ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ এ হাদীসের সনদ দুর্বল' । (نيل الاوطار جـ ٢، ضـ ٢٦٣)

হাদীসটিকে যদি সহীহ বলে ধরা যায়, তবে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আরবের সাধারণ অধিবাসী যদিও পরস্পরের জন্যে কুফু, কিন্তু ক্রীতদাস তাদের জন্যে কুফু নয়। কিন্তু এ কথা কুরআন ও অন্যান্য সহীহ্ হাদীসের সম্পূর্ণ খেলাফ। কুরআনের ঘোষণা اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ اَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী— আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের সকলের অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত।' এতে যেমন বংশের দিক দিয়ে মানুষের পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি, তেমনি পার্থক্যের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে পেশ করা হয়েছে তাকওয়া— আল্লাহ্-ভীরুতা, দ্বীনদারী ও পরহেযগারীকে। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ وَلَدُ اٰدَمَ —"সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান।' এ মানুষে মানুষে বংশের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য স্বীকার করা হয়নি। দ্বিতীয় হাদীস ঃ

اَلنَّاسُ كَاَسْنَانِ الْمَشْطِ لَافَضْلَ لِاَحَدٍ عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا بِالتَّقْوٰى -

মানুষ চিরুনীর দাঁতের মতোই সমান, কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, তবে পার্থক্য হতে পারে কেবলমাত্র তাকওয়ার কারণে। (ঐ)

ওপরের আলোচনা থেকে কুফুর ব্যাপারে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং জানা গেছে যে, মানুষে মানুষে তাকওয়া পরহেযগারী এবং দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্র ছাড়া অপর কোনো দিক দিয়েই পার্থক্য করা উচিত নয়, কুফুর বিচারও কেলমাত্র এই দিক দিয়েই করা যেতে পারে।

এ হলো ইসলামের আদর্শিক দৃষ্টিকোণ। কিন্তু এই আদর্শিক দৃষ্টিকোণের বাইরে বাস্তব সুবিধে-অসুবিধের বিচার ও বিয়ের ব্যাপারে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়। কেননা বিয়ে বাস্তবভাবে দাম্পত্য জীবন যাপনের বাহন। এজন্যে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে যথাসম্ভব সার্বিক ঐক্য ও সমতা না হলে বাস্তব জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে ইসলামে বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গিও যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে গণ্য ও গ্রাহ্য। ইসলামের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীও এর অনুকূলে মত জানিয়েছেন। ইমাম খাত্তাবী তাই লিখেছেন ঃ

وَالْكَفَاءَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِىْ قَوْلِ اَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ بِاَرْبَعَةِ اَشْيَاءَ بِالدِّيْنِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالصَّنَاعَةِ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِعْتَبَرَ فِيْهَا السَّلاَمَةَ مِنَ الْعُيُوْبِ وَالْيَسَارِ فَيَكُوْنَ جَمَّاعُهَا سِتُّ خِصَالٍ - (معالم السنن : ج -٣، ص ٧-٢)

বহু সংখ্যক মনীষীর মতে চারটি বিষয়ে কুফুর বিচার গণ্য হবেঃ দ্বীনদারী, আযাদী, বংশ ও শিল্প-জীবিকা। তাদের অনেকে আবার দোষক্রটিমুক্ত ও আর্থিক সচ্ছলতার দিক দিয়েও কুফুর বিচার গণ্য করেছেন। ফলে কুফু বিচারের জন্যে মোট দাঁড়াল ছয়টি গুণ।

হানাফী মাযহাবে কুফুর বিচারে বংশমর্যাদা ও আর্থিক অবস্থাও বিশেষভাবে গণ্য। এর কারণ এই যে, বংশমর্যাদার দিক দিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পার্থক্য হলে যদিও একজন অপরজনকে ন্যায়ত ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু একজন অপর জনকে যে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে অসমর্থ হতে পারে তা অস্বীকার করা যায় না। অনুরূপভাবে একজন যদি হয় ধনীর দুলাল আর একজন গরীবের সন্তান তাহলেও— যদিও সেখানে ঘৃণার কোনো কারণ থাকে না, কিন্তু একজন যে অপরজনের নিকট যথেষ্ট আদরণীয় না-ও হতে পারে, তা-ই বা কি করে অস্বীকার করা যেতে পারে ? এ সব বাস্তব কারণে দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বংশমর্যাদা, জীবিকার উপায় ও আর্থিক অবস্থার বিচার হওয়াও অন্যায় কিছু নয়।

কনের জরুরী গুণাবলী

কনে বাছাই করার সময় ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ একটি গুণের যাচাই করে দেখা আবশ্যক। সে গুণটি হচ্ছে কনের দ্বীনদার ও ধার্মিক হওয়া। এ সম্পর্কে নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَا لِهَا وَلِدِ يْنِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ ادِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ -

(بخاری، مسلم)

চারটি গুণের কারণে একটি মেয়েকে বিয়ে করার কথা বিবেচনা করা হয়ঃ তার ধন-মাল, তার বংশ গৌরব— সামাজিক মান-মর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারী। কিন্তু তোমরা দ্বীনদার মেয়েকেই গ্রহণ করো।

যে সব কারণে একজন পুরুষ বিশেষ একটি মেয়েকে স্ত্রীরূপে বরণ করার জন্যে উৎসাহিত ও আগ্রহান্বিত হতে পারে তা হচ্ছে এ চারটি। এ গুণ চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে দ্বীনদারী ও আদর্শবাদিতার গুণ। হাদীসেও উল্লিখিত চারটি গুণ স্বতন্ত্র গুরুত্বের অধিকারী। এর প্রতিটি গুণই এমন যে, এর যে কোনো একটির জন্যে একটি মেয়েকে বিয়ে করা যেতে পারে, যদিও এ গুণ

চতুষ্টয়ের মধ্যে মেয়ের দ্বীনদার তথা ধার্মিকতা ও চরিত্রবতী হওয়ার গুণটিই ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বাগ্রগণ্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নবী করীম (স)-এর আলোচ্য নির্দেশের সারকথা হলো :

اِنَّهُمْ اِذَا وُجِدُوْا ذَاتُ الدِّيْنِ فَلَا يَعْدِلُوْا عَنْهَا - (سبل السلام : ج -٣، ص -١٠١)

দ্বীনদারীর গুণসম্পন্না কনে পাওয়া গেলে তাকেই যেন স্ত্রীরূপে বরণ করা হয়, তাকে বাদ দিয়ে অপর কোনো গুণসম্পন্না মহিলাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হওয়া উচিত নয়।

দ্বীনদার ও ধার্মিক কনেকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত— অন্য কথায় বিয়ের জন্যে চেষ্টা চালানো পর্যায়ে কনের খোঁজ-খবর লওয়ার সময়— রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ হলো, কেবল দ্বীনদার কনেই তালাশ করবে। বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কনে সম্পর্কে প্রথম জানবার বিষয় হলো কনের দ্বীনদারীর ব্যাপার। অন্যান্য গুণ কি আছে তার খোঁজ পরে নিলেও চলবে অর্থাৎ কনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে তার দ্বীনদার হওয়া। ধনী, সদ্বংশজাত ও সুন্দরী রূপসী হওয়াও কনের বিশেষ গুণ বটে; এবং এর যে-কোনো একটি গুণ থাকলেই একজন মেয়েকে স্ত্রীরূপে বরণ করে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এসব গুণ মুখ্য ও প্রধান নয়— গৌণ। রাসূল (স)-এর নির্দেশ অনুযায়ী কেবল ধন-সম্পত্তি, বংশ-মর্যাদা ও রূপ-সৌন্দর্যের কারণেই একটি মেয়েকে বিয়ে করা উচিত নয়। সবচাইতে বেশি মূল্যবান ও অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য গুণ হচ্ছে কনের দ্বীনদারী।

চারটি গুণের মধ্যে দ্বীনদার হওয়ার গুণটি কেবল যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা-ই নয়, এ গুণ যার নেই তার মধ্যে অন্যান্য গুণ যতই থাক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য কনে নয়। রাসূল (স)-এর হাদীস অনুযায়ী তো দ্বীনদারীর গুণ-বঞ্চিতা নারীকে বিয়েই করা উচিত নয়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন :

لَاتَنْكِحُوْا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيْهِنَّ وَلَا لِمَا لِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيْهِنَّ وَانْكِحُوْهُنَّ لِلدِّيْنِ وَلَا مَةٌ سَوْدَاءُ خَرِقَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ اَفْضَلُ - (ابن ماجه، البزار، البيهقى)

তোমরা নারীর কেবল বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করো না। কেননা তাদের এ রূপ সৌন্দর্য তাদের নষ্ট ও বিপথগামী করে দিতে পারে। তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেও বিয়ে করবে না। কেননা ধন-সম্পদ তাদের বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত বানিয়ে দিতে পারে। বরং বিয়ে করো নারীর দ্বীনদারীর গুণ দেখে। মনে রাখবে, কৃষ্ণকায়া দাসীও যদি দ্বীনদার হয় তবু সে অন্যদের তুলনায় উত্তম।

এ হাদীসটির ভাষা অপর এক বর্ণনায় এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে :

لَا تَتَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسٰى حُسْنُهُنَّ اَنْ يُرْدِيْهِنَّ وَلَا تَتَزَوَّجُوْا لِاَمْوَالِهِنَّ فَعَسٰى اَمْوَالُهُنَّ اَنْ يُّطْغِيْهِنَّ وَلٰكِنْ تَتَزَوَّجُوْا هُنَّ عَلَى الدِّيْنِ وَلَا مَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ الدِّيْنِ اَفْضَلُ - (ابن ماجه، البزار، البيهقى)

তোমরা স্ত্রীদের কেবল তাদের রূপ-সৌন্দর্য দেখেই বিয়ে করো না— কেননা এ রূপ-সৌন্দর্যই অনেক সময় তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। তাদের ধন-মালের লোভে পড়েও বিয়ে করবে না— কেননা এ ধন-মাল তাদের বিদ্রোহী ও অনমনীয় বানাতে পারে। বরং তাদের দ্বীনদারীর গুণ দেখেই তবে বিয়ে করবে। বস্তুত একজন দ্বীনদার কৃষ্ণাঙ্গ দাসীও কিন্তু অনেক ভালো।

রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ 'বিয়ের জন্য কোন ধরনের মেয়ে উত্তম ?' জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

اَلَّتِيْ تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ اِذَا اَمَرَ وَ لَا تُخَالِفُهُ فِيْمَا يَكْرَهُ فِيْ نَفْسِهَا وَ مَالِهِ - (مسند احمد)

যে মেয়েলোককে দেখলে বা তার প্রতি তাকালে স্বামীর মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়, তাকে যে কাজের আদেশ করা হবে তা সে যথাযথ পালন করবে এবং তার নিজের ও স্বামীর ধন-মালের ব্যাপারে স্বামীর মত ও পছন্দ-অপছন্দের বিপরীত কোনো কাজই করবে না।

অপর এক হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে— সাহাবায়ে কিরাম একদিন বললেন ঃ

لَوْعَلِمْنَا اَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ اَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ عَلَى اِيْمَانِهِ - (مسند احمد، ترمذى)

সর্বোত্তম মাল-সম্পদ কি, তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তাহলে তা আমরা অবশ্যই অর্জন করতে চেষ্টা করতাম। একথা শুনে নবী করীম (স) বললেন ঃ সর্বোত্তম সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র যিক্র-এ মশগুল মুখ ও জিহবা, আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী দিল এবং সেই মু'মিন স্ত্রীও সর্বোত্তম সম্পদ, যে স্বামীর দ্বীন-ঈমানের পক্ষে সাহায্যকারী হবে।

এ সব হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় ঃ

اِنَّ مُصَاحِبَةَ اَهْلِ الدِّيْنِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ هِيَ الْاَوْلَى لِاَنَّ مُصَاحِبَهُمْ يَسْتَفِيْدُ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَبَرَكَتِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ وَ لَاسِيَّمَا الزَّوْجَةُ فَهِيَ اَوْلَى مَنْ يُّعْتَبَرُ دِيْنُهُ لِاَنَّهَا ضَجِيْعَتُهُ وَ اُمُّ اَوْلَادِهِ وَ اَمِيْنَتُهُ عَلَى مَالِهِ وَ مَنْزِلِهِ وَعَلَى نَفْسِهَا - (سبل السلام : ج -٣،ص -١٠٩)

সর্ব পর্যায়ে দ্বীনদার লোকদের সাহচর্য অতি উত্তম। কেননা দ্বীনদার লোকদের সঙ্গী-সাথীগণ তাদের চরিত্র, উত্তম গুণাবলী ও ধরন-ধারণ, রীতিনীতি থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে স্ত্রী তো দ্বীনদার হওয়া একান্তই অপরিহার্য এবং এদিক দিয়ে যে ভালো সেই উত্তম। কেননা সে-ই তার শায়িনী, সে-ই তার সন্তানের জননী, গর্ভধারিণী, সে-ই তার ধন-মাল, ঘর-বাড়ি ও তার (স্ত্রীর) নিজের রক্ষণাবেক্ষণের একমাত্র দায়িত্বশীল ও আমানতদার।

বস্তুত রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-মাল যেমন স্থায়ী নয়, তেমনি দাম্পত্য জীবনের স্থায়ীত্ব দানে তার ক্রিয়া গভীর ও সুদূরপ্রসারীও নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে এ রূপ-সৌন্দর্য ও ধন-মাল পারিবারিক জীবনে অনেক তিক্ততা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে থাকে— করতে পারে। সুন্দরী-রূপসী নারীদের মধ্যে— বিশেষত যাদের রূপ-সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কোন মহৎ গুণ নেই— অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। আর তার ফলে হয়ত তারা স্বামীর কাছে নতি স্বীকার করতে বা তার প্রতি নমনীয় হতে কখনও প্রস্তুত হয় না। উপরন্তু তাদের রূপের আগুনে আত্মাহুতি দেয়ার জন্যে অসংখ্য কীট-পতঙ্গ চারদিকে ভীড় জমাতে পারে আর তারা পারে ওদের আত্মাহুতি দেয়ার জন্যে অনেক অবাধ সুযোগ করে দিতে। তখন এ রূপ ও সৌন্দর্যই হয় তার ধ্বংসের কারণ। ধন-মালের প্রাচুর্যও তেমনি নারী জীবনের ধ্বংস টেনে আনতে পারে। যে নারী নিজে বা তার পিতা বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক তার মনে স্বাভাবিকভাবেই একটা অহংকার ও বড়ত্বের ভাব (Superiority Complex) থেকে থাকে। তার বিয়ে যদি হয় এমন পুরুষের সাথে, যার আর্থিক মান তার সমান নয় বরং তার অপেক্ষা কম কিংবা সে যদি গরীব হয়, তাহলে এ দুজনের দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারে না বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেননা ধনী কন্যা বা ধনশালী স্ত্রী সব সময়ই তার গরীব স্বামীকে হেয়, হীন ও নীচ মনে করতে থাকবে। তার

ফলে স্বামী নিজেকে তার স্ত্রীর নিকট ক্ষুদ্র, অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করবে। আর এ কারণেই এ ধরনের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন না হবে স্থায়ী, না হবে সুখের ও মাধুর্যময়।

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতও হাদীসের ঘোষিত নীতিরই সমর্থক। সূরা আন্-নূর-এ বলা হয়েছে ঃ

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ - (النور : ٣٢)

এবং বিয়ে দাও তোমাদের জুড়িহীন ছেলেমেয়েকে, আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা নেককার— যোগ্য, তাদের।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ -

তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ্-ভীরু ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানার্হ।

এরশাদ হয়েছে ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ - (المجادلة)

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের ইল্ম দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সম্মান ও মর্যাদা অধিক উচ্চ ও উন্নত করে দেবেন।

এজন্যে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ - (مسند احمد)

দুনিয়ার সব জিনিসই ভোগ ও ব্যবহারের সামগ্রী। আর সবচেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট সামগ্রী হচ্ছে নেক চরিত্রের স্ত্রী।

কেননা নেক চরিত্রের স্ত্রী স্বামীকে সব পাপের কাজ থেকে ফিরেয়ে রাখে এবং দুনিয়া ও দ্বীনের কাজে তাকে পূর্ণ সাহায্য ও তার সাথে আন্তরিক সহযোগিতা করে থাকে। এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে ঃ

اِنَّهَا سَوْءُ الْمَتَاعِ لَوْ لَمْ تَكُنْ صَالِحَةً - (بلوغ الامانی)

স্ত্রী যদি নেক চরিত্রের না হয়, তাহলে সে হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বেশি খারাপ সামগ্রী।

আর নেক চরিত্রের স্ত্রী বলতে বোঝায় ঃ

اَلتَّقِيَّةُ الْمُصْلِحَةُ لِحَالِ زَوْجِهَا فِىْ بَيْتِهِ الْمُطِيْعَةُ لِاَمْرِهِ - (بلوغ الامانی)

নেককার পরহেযগার, আল্লাহ্-ভীরু ও পবিত্র চরিত্রের স্ত্রী— যে তার স্বামীর জন্যে সর্বাবস্থায় কল্যাণকামী, তার ঘরের রানী এবং তার আদেশানুগামী, তাকেই নেক চরিত্রের স্ত্রী মনে করতে হবে।

উপরোদ্ধৃত আয়াত ও হাদীস থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে, তা এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে তাক্ওয়া, পরহেযগারী, দ্বীনদারী ও উন্নত মর্যাদার চরিত্রই হচ্ছে মানুষের বিশিষ্টতা লাভের শ্রেষ্ঠ গুণ। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো গুণই এমন নয়, যার দরুন কোনো লোক অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হতে পারে। একথা যেমন নারীদের ব্যাপারে সত্য, তেমনি পুরুষদের ক্ষেত্রেও তা অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে প্রযোজ্য। তাই দ্বীনদার ও চরিত্রবতী মেয়েই বিয়ের জন্য সর্বাগ্রগণ্যা, বিশেষত মুসলিম পরিবারে তা-ই হওয়া উচিত। দ্বীনদার চরিত্রবতী কনে বাছাই ও বিয়ে করার জন্যে ইসলামে যেমন বলা হয়েছে

বরকে— বিবাহেচ্ছুক পুরুষকে, তেমনি বলা হয়েছে কনেকেও। এ সম্পর্কে 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে ফিকাহবিদদের সর্বসম্মত মতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

اَلْمَرْاَةُ تَخْتَارُ الزَّوْجَ لِلدِّيْنِ الْحَسَنِ وَالْخُلُقِ الْمُؤْسِرِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ فَاسِقًا -

নারী স্বামী গ্রহণ করবে তার উত্তম দ্বীনদারী ও উদার চরিত্রের জন্যে, সেই গুণ দেখে এবং সে কখনো ফাসিক ও ধর্মহীন ব্যক্তিকে বিয়ে করবে না।

দারিদ্র্য বিয়ের ব্যাপারে বাধা নয়

ওপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম নির্বিশেষে সকল স্ত্রী-পুরুষকেই বিধিসঙ্গত নিয়মে ও শরীয়তসম্মত পন্থায় বিয়ে করার জন্যে উৎসাহ দিয়েছে। আর যৌন উত্তেজনা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলে তখন বিয়ে করা ফরযের পর্যায়ে পৌঁছে যায় বলে ঘোষণা দিয়েছে।

কিন্তু অনেক সময় যুবক-যুবতীগণ কেবলমাত্র দারিদ্র্য কিংবা অর্থাভাবের কারণে বিয়ে করতে প্রস্তুত হতে চায় না। তারা মনে করে, বিয়ে করলে আর্থিক দায়িত্ব বেড়ে যাবে, সেই অনুপাতে রোজগার না হলে সে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অথবা বিয়ে করলে যে আর্থিক দায়িত্ব বাড়বে, তদ্দরুন জীবন মান নিচু হয়ে যাবে।

এসব কারণে তারা বিয়েকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এ মনোভাব— চিন্তার এই ধারা ও প্রকৃতি— আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। একে তো মানুষের রুজি-রোজগারের পরিমাণ কোনো স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় জিনিস নয়। যে আল্লাহ্ আজ একজনকে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন, সে আল্লাহ্ই আগামীকাল তাকে একশত বা এক হাজার টাকা দিতে পারেন। তাই অর্থাভাব যেন কখনোই বিয়ের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে, সেজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

اَنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ - (النور : ٣٢)

যদি তারা গরীব দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে তাদের ধনী করে দেবেন। বস্তুতই আল্লাহ্ প্রশস্ততাসম্পন্ন সর্বজ্ঞ।

ছেলে বা মেয়ে কিংবা তাদের অলী-গার্জিয়ানদের উভয়ের কিংবা কোনো এক পক্ষের দারিদ্র্য বিয়ের পথে বাধা হওয়ার আশংকা দূর করার জন্যে কুরআনের এ আয়াত স্পষ্ট ঘোষণা। এর অর্থ ঃ

لَايَمْنَعَنَ فَقْرُ الْخَاطِبِ اَوِالْمَخْطُوْبَةِ مِنَ الْمُنَاكِحَةِ فَاِنَّ فِىْ فَضْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ غَنِيَةٌ عَنِ الْمَالِ فَاِنَّهٗ غَادٍ

وَرَائِحٍ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ اَوْ وَعْدٌ مِّنْهُ سُبْحَانَهٗ بِالْاِغْنَاءِ لَكِنَّهٗ مَشْرُوْطٌ بِالْمَشِيَّةِ -

(محاسن التاويل : ج -١١، ص -٤٥١٧)

বিয়ের প্রস্তাব আসা ছেলে বা মেয়ের পারস্পরিক বিয়ের পথ দারিদ্র্য যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কেননা আল্লাহ্র মেহেরবানীতে রয়েছে অর্থবিমুখতা। এজন্যে যে, আল্লাহ্ সকাল-সন্ধ্যা যাকে চান অভাবিতপূর্ব উপায়ে রিযিক দান করেন। কিংবা এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করেছেন (দারিদ্রকে) ধনী করে দেয়ার। অবশ্য তা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন— আল্লাহ্র ইচ্ছার শর্তাধীন।

'আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন' বলার কারণ এই যে, বিয়ে করলেই স্বামী-স্ত্রী ধনী হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। কাজেই আল্লাহ্ কোথাও ওয়াদা খেলাফী করেছেন— একথা বলা যাবে না। কেননা কত স্বামী বা স্ত্রীই তো দুনিয়ায় এমন রয়েছে, যারা দরিদ্র, বিয়ে করা সত্ত্বেও তাদের দারিদ্র্য দূর হয়ে যায় নি।

তাহলে এ আয়াতের ঘোষণার অর্থ কি ?— কি এর প্রকৃত তাৎপর্য ? বিয়ের সাথে আর্থিক সঙ্গতির সম্পর্ক কি ? এর জবাবে বলা যায়, মানুষ সাধারণত কারণকেই বড় করে দেখে, কারণ বুঝেই নিশ্চিন্ত হয়। তারই ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সে কারণের মূলে যে ব্যাপারটি রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফিল হয়ে যায়। মানুষ মনে করে নিয়েছে যে, অধিক সন্তান হওয়াই বুঝি দারিদ্র্যের কারণ। আর কম সন্তান হলেই ধনের পরিমাণ বেড়ে যাবে। মানুষের এ অমূলক ধারণা বিদূরণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা উপরিউক্ত ঘোষণা প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, বিয়ে করলেই মানুষ আর্থিক দায়িত্ব-ভারে পর্যুদস্ত হবে— এমন কোনো কথা নেই; বরং এর উল্টোটারই সম্ভাবনা বেশি। আর তা হচ্ছে, অধিক সন্তান হলে অনেক সময় আল্লাহ্ তা'আলা তার ধন-মাল বাড়িয়ে দেন। এও দেখা গেছে যে, সন্তান সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে রোজগার বেশি হয়েছে, দারিদ্র্য দূরীভূত হয়ে গেছে! আসলে এ ব্যাপারটি আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। বিশেষত আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই যখন বলে দিয়েছেন যে, বিয়ে করলেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, তখন বুদ্ধিমান ও জাগ্রতমনা নারী-পুরুষ বিয়েকে আদৌ ভয় করবে না, করা উচিত নয়। তাহলে আয়াতের সহজ অর্থ দাঁড়ালো ঃ

إِنَّ النِّكَاحَ لَا يَمْنَعُهُمُ الْغِنٰى مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্র অনুগ্রহে বিয়ে ধন-মালের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেছেন ঃ

أَطِيْعُوا اللّٰهَ فِيْمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يَنْجِزُ لَكُمْ مَّا وَعَدَكُمْ مِّنَ الْغِنٰى -

(تفسير ابن كثير : ج -٣، ص- ٦ -٢)

তোমরা বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্র আদেশ পালনে তাঁর আনুগত্য করো। তা হলে ধনসম্পত্তি দানের যে ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা করেছেন তা তোমাদের জন্যে পূরণ করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ

اِلْتَمِسُوْا الْغِنٰى فِى النِّكَاحِ - (ايضا)

বিয়ে করে তোমরা ধনী হওয়ার আকাংক্ষা করো।

এই পর্যায়ে স্মরণ করা যেতে পারে, একজন সাহাবী ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, মোহ্রানা স্বরূপ দেবার মতো টাকা-পয়সা তো দূরের কথা-কোনো জিনিসই তাঁর কাছে ছিল না। একটি লোহার অঙ্গুরীয় দেবার মতো সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। ছিল শুধু তাঁর নিজের পরিধেয় একখানি বস্ত্র। তাকেও রাসূলে করীম (স) 'মোহরানা' স্বরূপ ধরে নিতে রাজি হলেন না। তা সত্ত্বেও সেই সাহাবীর বিয়ে সেই স্ত্রীলোকটির সাথেই করে দিলেন। আর 'মোহরানা'র ব্যবস্থা করে দিলেন এভাবে যে, সাহাবী যতখানি কুরআন মজীদ শিখেছিলেন, তা-ই তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষা দিবেন। আল্লামা ইব্নে কাসীর এই ঘটনার উল্লেখ করে তার পরে লিখেছেন ঃ

وَالْمَعْهُوْدُ مِنْ كَرَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلُطْفِهِ اَنْ يَّرْزُقَهٗ مَافِيْهِ كِفَايَةٌ لَهَا وَلَهٗ - (تفسير ابن كثير : ج -٣، ص-٧ -٢)

আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম দয়া-অনুগ্রহ সর্বজনবিদিত, তিনি তাঁকে এত পরিমাণ রিযিক দান করলেন যে, তার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেল।

অতএব কোনো মুসলিম যুবকেরই আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন অবিবাহিত কুমার জীবন যাপনে প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়। বরং আল্লাহর রিযিকদাতা হওয়া— আল্লাহ্র অফুরন্ত দয়া-অনুগ্রহ ও দানের ওপর অবিচল বিশ্বাস রাখা উচিত। কেননা সকল প্রাণীরই রিযিকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা নিজের ওপরে গ্রহণ করে নিয়েছেন। বলেছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا – (هود : ٦)

যমীনের উপর বিচরণশীল সব প্রাণীরই রিযিকের ভার একান্তভাবে আল্লাহ্র উপর।

আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণে ভীত লোকদের উৎসাহ বর্ধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ – (الطلاق : ٣)

আল্লাহ্ তাকে রিযিক দান করবেন এমন সব উপায়ে, যা সে ধারণা পর্যন্ত করতে পারে নি। আর বস্তুতই যে লোক আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে কাজ করবে, সেই লোকের জন্যেই আল্লাহ্ই যথেষ্ট হবেন।

উপস্থিত আর্থিক অনটন ও অসচ্ছলতা দর্শনে কোনো যুবক যেমন বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত করতে পারে, তেমনি কোনো গরীব যুবকের তরফ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এলে মেয়ে পক্ষ তা শুধু এ কারণেই প্রত্যাখ্যান করতে পারে। অথবা মেয়ে পক্ষ গরীব বলে তার মেয়েকে বিয়ে করতে নারাযও হতে পারে। এসব দিকে লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ – (التوبة : ٢٨)

তোমরা যদি দারিদ্র্যের ভয় করো, তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের ধনী করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বড়ই জ্ঞানী ও সুবিবেচক।

এ আয়াতের আর এক তরজমা হলোঃ 'তোমরা যদি বিয়ের পরে অধিক সন্তানের বোঝা চেপে বসবে বলে ভয় করো, তাহলে আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের নিশ্চিন্ত করে দেবেন। আল্লাহ্ সবই জানেন, তিনি সুবিবেচক।

বস্তুত কোনো গরীব লোক যদি বিয়ে করে, তবে কামাই-রোজগারে তার বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর এ ব্যাপারে তার স্ত্রী তার ওপর বোঝা না হয়ে বরং হবে দরদী সাহায্যকারিণী। আর সন্তান হলে তারাও তার অর্থোপার্জনের কাজে সাহায্যকারী হতে পারে। অনেক সময় স্ত্রীর ধনী নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য লাভও হতে পারে। সদিচ্ছার ওপর ফলাফল নির্ভর করে। আল্লাহ্ তা'আলার কথার প্রতি যার বিশ্বাস, আস্থা ও সদিচ্ছার অভাব থাকে, সে ছাড়া অপর কেউ দুর্ভোগে পড়তে পারে না। দৃঢ় বিশ্বাসই তাকে সফলতার পথে আল্লাহ্র সাহায্য লাভের উপযুক্ত করে দেবে।

মানব বংশের স্থিতি ও বৃদ্ধি এবং মনের স্বাভাবিক প্রশান্তি ও স্বস্তি একান্তভাবে নির্ভর করে স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনের ওপর। কুরআন মজীদ এ মিলনকে সমর্থন করেছে এবং তাকে জরুরী বলে ঘোষণা করেছেন। এ মিলন স্পৃহাকে অস্বীকার করা, উপেক্ষা করা কিংবা নির্মূল করে দেয়া কুরআনের দৃষ্টিতে মানবতার প্রতি এক চ্যালেঞ্জ, এক অমার্জনীয় অপরাধ সন্দেহ নেই।

কিন্তু যৌন মিলন সংস্থাপনের ব্যাপারে ইসলাম নারী-পুরুষকে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও বল্গাহারা করে ছেড়ে দেয়নি। বরং এজন্যে জরুরী সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে এবং নির্ধারিত করে দিয়েছে কতকটা বিধি-নিষিধ। কিছু কিছু নারী-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে এজন্যেই হারাম করে দিয়েছে ইসলাম। এ সীমা নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ বংশ, আত্মীয়তা-সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও পবিত্রতা, পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতা এবং সর্বোপরি নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এক উন্নত ও পবিত্র সমাজ পরিবেশ গঠন করার জন্যে একান্তই জরুরী। নারী-পুরুষের যৌন মিলনের সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষার জন্যে সর্ব প্রথম শর্ত হচ্ছে বিয়ে। কিন্তু সেই বিয়েকেও যথেচ্ছ হতে দেয়া যায় না কোনোক্রমেই। সমাজ-পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও স্থিতির জন্যে যেমন দরকার হচ্ছে নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌন-মিলনের, তেমনি জরুরী হচ্ছে ইসলাম আরোপিত এই সীমা, বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণকে পূর্ণ মাত্রায় ও বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষা করে চলা।

কুরআন মজীদ যেসব মেয়ে-পুরুষের মাঝে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন হারাম করে দিয়েছে, তার ভিত্তি হচ্ছে তিনটিঃ বংশ-সম্পর্ক, দুগ্ধপানের সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সম্পর্ক।

১. বংশ-সম্পর্কের কারণে মা-বাপের দিক দিয়ে যেসব আত্মীয়তার উদ্ভব হয় তা মোটামুটি সাতটি ঃ মা, ঔরসজাত কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, বোনঝি। যে-কোনো পুরুষের পক্ষেই তার এ ধরনের আত্মীয়া মহিলাকে বিয়ে করা চিরদিনের তরে হারাম। আর এ হারামের কারণ হচ্ছে এই বংশ-সম্পর্ক (النسب)। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ - (النساء : ٢٣)

বিয়ে করা হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের প্রতি তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, তোমাদের ভাইয়ের কন্যা এবং বোনের কন্যা।

মা বলতে এখানে এমন সব মেয়েলোককে বোঝায়, যার সাথে প্রকৃত মা এবং বাবার দিক দিয়ে জন্ম ও রক্তের সম্পর্ক রয়েছে আর এ সম্পর্কের সূচনা হয় দাদি ও নানি থেকে। অতএব তাদের বিয়ে করাও হারাম।

কন্যা বলতে এমন সব মেয়েও বোঝাবে, যাদের সাথে স্বীয় ঔরসজাত কন্যা বা পুত্রের দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে। আর বোনের মধ্যে শামিল সেসব মেয়েও, যার সাথে বাপ কিংবা মা অথবা উভয়ের সমন্বয়ে বোনের সম্পর্ক হতে পারে। ফুফু বলতে এমন মেয়ে লোকও বোঝায়, যে বাবার কি তার বাবার— মানে দাদার বোন।। আর 'খালা'র মধ্যে এমন সব মেয়েলোকও শামিল, যার সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে মা কিংবা দাদার দিক দিয়ে। বোনঝি বলতে এমন সব মেয়েই বোঝায়, যাদের মায়ের সাথে রক্তের দিক দিয়ে বোনের সম্পর্ক হতে পারে। এ মোট সাত পর্যায়ের মেয়েলোক ও পুরুষ লোক

পরস্পরের জন্যে মুহাররম। এদের পারস্পরিক বিয়ে হারাম। একথা সর্বজনসমর্থিত— কোনো মতভেদ নেই এতে। কেননা কুরআন حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ বলে এদেরকেই স্পষ্ট হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

২. দুধ পানের সম্পর্কেও কিছু সংখ্যক মেয়ে-পুরুষের পারস্পরিক বিয়ে হারাম। ছেলে বা মেয়ে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় যদি অপর কোনো মহিলার দুধ পান করে, তবে সে মহিলা হবে তার দুধ-মা, তার স্বামী হবে এর দুধ-বাপ। এ দুধ-মা ও বাপের সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন দুধ পানকারী পুরুষ বা নারীর জন্য হারাম, যেমন হারাম প্রকৃত মা বোনের সাথে বিয়ে। (بداية المجتهد جـ ٢، صـ ٣٢)

অনুরূপভাবে দুধ-বোনও হারাম। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে দুধ-মা ও দুধ-বোন উভয় সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ - (النساء : ٢٣)

এবং তোমাদের স্তনদায়িনী মা-দের এবং তোমাদের দুধ-বোনদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।

আল্লামা ইব্‌নে রুশদ আল-কুরতুবী এ পর্যায়ে লিখেছেন ঃ

وَاتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّ الرِّضَاعَ بِالْجُمْلَةِ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ اَعْنِىْ اَنَّ الْمُرْضِعَةَ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْاُمِّ فَتَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضِعِ هِىَ وَكُلُّ مَنْ يَّحْرُمُ عَلَى الْاِبْنِ مِنْ قِبَلِ اُمِّ النَّسَبِ - (بداية المجتهد : ج -٣، ص -٣٥)

মোটামুটিভাব বংশ সম্পর্কের কারণে যাকে বিয়ে করা হারাম, দুধ পানের কারণেও তাকে বিয়ে করা হারাম হওয়া সম্পর্কে সব ফিকাহ্‌বিদই সম্পূর্ণ একমত অর্থাৎ স্তনদায়িনী আপন মায়ের সমান পর্যায়ে গণ্য হবে। অতএব বংশের দিক দিয়ে ছেলের প্রতি হারাম যাকে যাকে বিয়ে করা, দুগ্ধদায়িনীর পক্ষেও সে সে হারাম।

দুধ বোন সম্পর্কে আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

দুধ-বোন সে, যাকে তোমার মা তোমার বাবার কাছে থেকে পাওয়া দুধ সেবন করিয়েছে, তা তোমার সাথে এক সঙ্গেই সেবন করুক, কি তোমার পূর্বে বা তোমার পরে— ছেলে হোক আর মেয়ে হোক। (تفسير فتح القدير جـ ١، صـ ٤٩)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন— হযরত রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ - (مسلم :ج -١، ض٤٦٦)

দুধ পানে সে সে হারাম হয়ে যায়, যে যে হারাম হয় জন্মগত সম্পর্কের কারণে।

এজন্যে হযরত আশেয়া (রা) সব সময় বলতেনঃ

حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُوْنَ مِنَ النَّسَبِ (مسلم : ج -١، ص -٨٦٧)

তোমরা দুধ পানের কারণে তাকে তাকে হারাম মনে করবে, যাকে যাকে হারাম মনে করো বংশের কারণে।

নবী করীম (স)-এর আর একটি কথা হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ - (مسلم : ج- ٢، ص- ٤٦٧)

রেহমী সম্পর্কের কারণে যে যে হারাম হয়, দুধ পানের দরুনও সে সে হারাম হয়।

বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়েও কোনো কোনো আত্মীয়ের সাথে বিয়ে সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়ে যায়। এ হারাম দু'প্রকারের। এক, স্থায়ী— যেমন স্ত্রীর মা, পুত্রের স্ত্রী, যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এমন স্ত্রীর কন্যা এবং পিতার স্ত্রী।

পিতার স্ত্রী সম্পর্কে কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ - (النساء : ٢٢)

তোমাদের পিতারা যাকে যাকে বিয়ে করেছে, তাকে তাকে তোমরা বিয়ে করো না।

এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বয়ং কুরআনেই বলা হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا وَسَآءَ سَبِيْلًا - (النساء : ٢٢)

পিতার বিয়ে করা স্ত্রীকে বিয়ে করা অত্যন্ত লজ্জাকর ও জঘন্য কাজ, গুনাহের ব্যাপার এবং বিয়ের খুবই খারাপ পথ।

আল্লামা শাওকানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

هٰذِهِ الصِّفَاتُ الثَّلَاثُ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ مِنْ اَشَدِّ الْمُحَرَّمَاتِ وَ اَقْبَحِهَا - (فتح القدير : ج-١، ص -٤٠٦)

(পিতার বিয়ে করা স্ত্রীকে পুত্রের বিয়ে করা সম্পর্কে) নিষেধ বাণীর যে তিনটি কারণ উদ্ধৃত হয়েছে, তা প্রমাণ করে যে, এ কাজ অত্যন্ত সাংঘাতিক রকমের হারাম ও ঘৃণিত কাজ।

আর পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে কুরআনের নিষেধবাণী হচ্ছে ঃ

حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ - (النساء : ٢٣)

তোমাদের আপন ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরও হারাম করা হয়েছে।

স্ত্রীদের মা হারাম হওয়ার আয়াত হচ্ছে ঃ

وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ - (النساء : ٢٣)

তোমাদের স্ত্রীদের মা'দেরও হারাম করা হয়েছে।

আর স্ত্রীর গর্ভজাত মেয়েকে বিয়ে করা হারাম হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে ঃ

وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ - (النساء : ٢٣)

এবং তোমাদের সেসব স্ত্রীদের— যাদের সাথে তোমাদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে— গর্ভজাত মেয়েরাও হারাম।

যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না হলে তাদের কন্যাকে বিয়ে করা হারাম নয়।

فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ - (النساء : ٢٣)

যদি বিয়ে করা স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত না করে থাকে, তবে তার কন্যাকে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই।

এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রুশদ আল-কুরতুবী লিখেছেন ঃ

فَهٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعِ اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى تَحْرِيْمِ اِثْنَيْنِ مِنْهُنَّ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَهُوَ تَحْرِيْمُ زَوْجَاتِ الْاٰبَاءِ وَالْاَبْنَاءِ وَوَاحِدَةٌ بِالدُّخُوْلِ وَ هِىَ اِبْنَةُ الزَّوْجَةِ- (بداية المجتهد : ج -٣. ص -٣٣)

এ চারজনের মধ্যে দুজন হারাম হয়ে যায় বিয়ের আক্‌দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে— তারা হচ্ছে পিতার স্ত্রী পুত্রের জন্যে ও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্যে, আর একজন হারাম হয় স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হলে পরে— সে হচ্ছে স্ত্রীর অপর এক স্বামীর নিকট থেকে নিয়ে আসা কন্যা।

আর দ্বিতীয় অস্থায়ী ও সাময়িক। যেমন স্ত্রীর বোন, স্ত্রীর ফুফু, খালা, ভাইঝি-বোনঝি ইত্যাদি। স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রীর এসব নিকটাত্মীয়কে বিয়ে করা ও একত্রে এক স্থায়ী স্ত্রীত্বে বরণ করা ইসলামে হারাম। এ কথার ভিত্তি হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ ঃ

وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ (النساء : ٢٣)

এবং দু'জন সহোদর বোনকে একত্রে স্ত্রীরূপে বরণ করা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ।

এ আয়াতের ভিত্তিতে ফিকাহ্‌বিদগণ নিম্নোক্ত মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন ঃ

اِنَّمَا يَحْرُمُ الْجَمْعَ بَيْنَ كُلِّ امْرَأ تَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ مُحَرَّمَةٌ - (بداية المجتهد : ج -٣، ص -٦٢)

যে দু'জন স্ত্রীলোকের পারস্পরিক আত্মীয়তার কারণে বিয়ে হারাম, তাদের দু'জনকে একজন স্বামীর স্ত্রীত্ব একত্রে বরণ করা হারাম।

এভাবে যেসব মেয়েলোককে বিয়ে করা একজন পুরুষের পক্ষে হারাম তাদের সংখ্যা দাঁড়াল নিম্নরূপ ঃ

(ক) বংশের ও রক্তের সম্পর্কের কারণে সাতজন। আর তারা হচ্ছে ঃ মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি ও বোনঝি।

(খ) বৈবাহিক ও দুগ্ধপানের কারণে মোট সাতজন। তারা হচ্ছে ঃ দুধ-মা, দুধ-বোন, স্ত্রীর মা, স্ত্রীর পূর্বপক্ষের কন্যা ও দুবোনকে একত্রে বিয়ে করা। এতদ্ব্যতীত পিতার স্ত্রী এবং ফুফু-ভাইঝিকে একত্রে বিয়ে করা। ইমাম তাহাভী বলেছেন ঃ

وَكُلُّ هٰذَا مِنَ الْحُكْمِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ - (فتح القدير : ج -١، ص -٤٠٨)

এ কয়জনকে বিয়ে করা যে-কোনো পুরুষের পক্ষে স্থায়ী ও সর্ববাদীসম্মতভাবে হারাম। এ বিষয়ে কারো কোনো মতভেদ নেই।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা সেসব স্ত্রীলোককে হারাম করে দিয়েছেন, যারা বিবাহিতা— যাদের স্বামী জীবিত ও বর্তমান। বলেছেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ - (النساء : ٢٤)

এবং স্বামীওয়ালী সুরক্ষিতা মহিলাদের বিয়ে করাও হারাম।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ هٰنَا ذَوَاتُ الْاَزْوَاجِ -

এখানে 'মুহসানাত' মানে সেসব মেয়েলোক, যাদের স্বামী বর্তমান— যারা বিবাহিতা।

যেসব মেয়েলোককে বিয়ে করা হারাম, তাদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করছেনঃ

وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ - (النساء :٢٤)

এ হারাম— মুহাররম-স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোকই বিয়ে করার জন্যে তোমাদের পক্ষে হালাল করে দেয়া হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের মাল-মোহরানা দিয়ে সুরক্ষিত বিবাহিত জীবন যাপনের লক্ষ্যে গ্রহণ করবে, উচ্ছৃঙ্খল যৌন লালসা পূরণের কাজে নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّهٗ يَحِلُّ لَهُمْ نِكَاحُ مَاسِوَى الْمَذْكُوْرَاتِ - (فتح القدير: ج-١، ص -٤١٣)

উপরে উল্লিখিত মহিলাদের ছাড়া অন্যান্য সব মেয়েলোক বিয়ে করা জায়েয— সম্পূর্ণ হালাল, তা এ আয়াতাংশ স্পষ্ট প্রমাণ করছে।

অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা চান যে, মুহাররম স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যান্য মেয়েলোকদের যাকেই গ্রহণ করা হোক বিয়ের জন্যে— বিয়ের মাধ্যমে রীতিমতো মোহরানা দিয়ে তাদের বিয়ে করা হোক। কেবল উচ্ছৃঙ্খল যৌন পরিতৃপ্তি লাভ ও লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যেন কেউ বিয়ে বন্ধনের বাইরে কোনো নারীকে স্পর্শ পর্যন্তও না করে।

কাফের ও আহলে কিতাব মেয়ে

কিন্তু এ ছাড়া আরো দু'শ্রেণীর মেয়ে বিয়ে করা সম্পর্কে কথা বলা এখনো বাকী রয়ে গেছে। এক কাফের মেয়ে, আর দ্বিতীয় মুশরেক ও আহলে কিতাব মেয়ে। কাফের মেয়ে যেমন মুসলমানদের জন্যে বিয়ে করা জায়েয নয়, তেমনি কাফের পুরুষের নিকট মুসলিম মেয়ে বিয়ে দেয়া। দ্বীনের পার্থক্যের কারণে এ ধরনের বিয়ে স্থায়ীভাবে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ - (الممتحنة : ١٠)

তোমরা মুসলমানরা কাফের মেয়েকে বিয়ের বন্ধনে বেধে রেখো না।

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ

هٰذَا بَيَانٌ لِاِمْتِنَاعِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْكَوَافِرِ -

এ আয়াতে সমস্ত কাফের মুশরেক মেয়ে বিয়ে করতে স্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

তিনি আরো লিখেছেন, পূর্বে কাফেররা মুসলিম মেয়ে বিয়ে করত আর মুসলিমরা করত কাফের মেয়ে। এ আয়াত দ্বারা এ উভয় বিয়েকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে ঃ

এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ - (الممتحنة : ١٠)

মুসলিম মেয়েরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষরাও অনুরূপভাবে হালাল নয় কাফের মেয়েদের জন্যে।

আর এর কারণ হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ الْمُؤْمِنَةَ لَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ - (تفسير فتح القدير: ج -٥ ،ص -٢٠٩)

এ আয়াতে প্রমাণ করছে যে, মু'মিন-মুসলিম মেয়ে কাফের পুরুষের জন্যে হালাল নয়।

আর প্রথমোক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

المعنى ان من كانت له امرأة كافرة - فليست له بامرأة لانقطاع عصمتها باختلاف الدين -

এর অর্থ এই যে, যে মুসলমানের স্ত্রী কাফের সে আর তার স্ত্রী থাকেনি। কেননা দ্বীন দুই হওয়ার কারণে এ দুয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।

আহলে কিতাব— ইহুদী ও নাসারা বা খ্রিস্টান-মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারটি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। এখানে তা পেশ করা যাচ্ছে।

আল্লামা আবূ বকর আল-জাস্‌সাস লিখেছেন ঃ

আহলে কিতাব মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। একটি মত হচ্ছে এই যে, আহলে কিতাবের আযাদ বংশজাত বা জিম্মী মেয়ে হলে তাদের বিয়ে করা মুসলিম পুরুষদের জন্যে জায়েয, এতে কোনো মতভেদ নেই। যদিও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) তা পছন্দ করেন না, মকরুহ মনে করেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّهٗ كَانَ لَا يَرٰى بَاْسًا بِطَعَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ وَ يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَائِهِمْ -

তিনি আহলে কিতাবের খানা খাওয়ায় কোনো দোষ মনে করতেন না, তবে তাদের মেয়ে বিয়ে করাকে মকরুহ্ মনে করতেন।

তাঁর সম্পর্কে অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ ইহুদী ও খ্রিস্টান মেয়ে বিয়ে করা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَ لَا اَعْلَمُ مِنَ الشِّرْكِ شَيْئًا اَعْظَمَ مِنْ اَنْ تَقُوْلَ رَبُّهَا عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ اَوْ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِ اللّٰهِ -

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের জন্যে মুশরেক মেয়ে বিয়ে করাকে স্পষ্ট ভাষায় হারাম করে দিয়েছেন। আর মরিয়ম পুত্র ঈসা কিংবা অপর কোনো আল্লাহ্‌র বান্দাকে রব্ব বলে মনে করা অপেক্ষা বড় কোনো শির্‌ক হতে পারে বলে আমার জানা নেই।

আর ইহুদী-নাসারাদের বিশ্বাস ও আকীদা এমনিই, তাই তারাও মুশরিকদের মধ্যে গণ্য। অতএব তাদের মেয়ে বিয়ে করাও জায়েয নয়।

ان اهل الكتاب من اهل الشرك لقوله تعالى وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ -

(عينى : ج -٢٠، ص -١٠٠)

কেননা আহলে কিতাবও মুশরেক। এজন্যে ইহুদীরা বলেছে ঃ উজাইর আল্লাহ্‌র পুত্র, আর খ্রিস্টানরা বলেছে ঃ ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র। যদিও বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন যে, এ আয়াত মনসুখ হয়ে গেছে।

মায়মুন ইবনে মাহরান হযরত ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আমরা এমন জায়গায় থাকি, যেখানে আহলে কিতাবের সাথে খুবই খোলা-মেলা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের মেয়ে বিয়ে করতে পারি ?

এর জবাবে তিনি নিম্নোক্ত দু'টি আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ -

এবং আহলে কিতাব বংশের সেসব চরিত্র-সতীত্বসম্পন্না মেয়ে (বিয়ে করা তোমাদের জন্যে জায়েয)।

এবং وَ لَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ -

এবং মুশরেক মেয়ে যতক্ষণ না ইসলাম কবুল করছে, ততক্ষণ তোমরা তাদের বিয়ে করো না।

প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব মেয়ে বিয়ে করা জায়েয বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতে মুশরেক মেয়ে বিয়ে করতে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। অন্য কথায়, তিনি এ ব্যাপারে নিজস্ব কোনো ফয়সালা শোনালেন না। শুধু আয়াত পড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়ে থাকলেন।

আল্লামা আবূ বকর লিখেছেন যে, একমাত্র হযরত ইবনে উমর ছাড়া সাহাবীগণের এক বিরাট জামা'আত যিম্মী আহলে কিতাবের মেয়ে বিয়ে করা জায়েয মনে করতেন। তাঁদের মতে দ্বিতীয় আয়াতটি কেবলমাত্র মুশরেকদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, সাধারণ আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নয়।

হাম্মাদ বলেন ঃ আমি হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা)-কে ইহুদী নাসারা মেয়ে বিয়ে করা জায়েয কিনা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন ঃ لاباس به— তাতে কোনো দোষ নেই। তাঁকে উপরিউক্ত দ্বিতীয় আয়াতটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে মূর্তিপূজক ও অগ্নিপূজক মেয়েদের সম্পর্কে নির্দেশ, তারা নিশ্চয়ই হারাম।

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) ফায়েলা বিনতে ফেরারা নাম্নী এক খ্রিস্টান মহিলা বিয়ে করেছিলেন। হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-ও এক সিরীয় ইহুদী মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। হাসান, ইবরাহীম নখয়ী ও শাবী প্রমুখ তাবেয়ী হাদীস-ফিকাহ্‌বিদও এ বিয়ে জায়েয বলে মনে করতেন।

কিন্তু এ পর্যায়ে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর একটি নির্দেশ চমক লাগিয়ে দেয়। হযরত হুযায়ফা (রা) এক ইহুদী মেয়ে বিয়ে করলে তিনি তাকে নির্দেশ পাঠালেন ঃ خَلِّ سَبِيْلَهَا 'তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে ত্যাগ করো।'

তখন হুযায়ফা (রা) প্রশ্ন করে পাঠালেন ঃ اَحَرَامٌ هِيَ 'ইহুদী মেয়ে বিয়ে করা কি হারাম ?'

তার জবাবে হযরত উমর (রা) লিখলেন ঃ

لَا وَلٰكِنِّىْ اَخَافُ اَنْ تُوَاقِعُوْا الْمُوْمِسَاتِ مِنْهُنَّ – (احكام القران للجصاص : ج -٢، ص -٣٩٧)

হারাম নয় বটে, কিন্তু আমি ভয় করছি— আহলে কিতাব বলে তোমরা যদি তাদের বিয়ে করো তাহলে তোমরা তাদের মধ্য থেকে বদ্‌কার ও চরিত্র-সতীত্বহীনা মেয়েই বিয়ে করে বসবে।

হযরত উমরের উপরোক্ত নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ এজন্যে যে, কুরআন মজীদে আহলে কিতাবের মধ্যে কেবলমাত্র المحصنات -দেরই বিয়ে করা জায়েয করা হয়েছে। আর তার জন্যে দুটি শর্ত অপরিহার্য। একটি হচ্ছে নাপাকীর জন্যে গোসল করা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যৌন অঙ্গকে পূর্ণরূপে সংরক্ষিত রাখা। কিন্তু আহলে কিতাবের কোনো মেয়ে বিয়ের পূর্বে তার যৌন অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করেছে, তা বাছাই করে নেয়া খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। আর দ্বিতীয়ত বিয়ের পর যৌন অঙ্গকে স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ব্যবহার করতে না দেয়ার প্রতি কোনো মেয়ের মনে দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, তা জানবার কি উপায় হতে পারে ? বিশেষত এ কারণে যে, আহলে কিতাব সমাজের লোকেরা এ ব্যাপারে কড়াকড়ি করার খুব বেশি পক্ষপাতী নয়। বরং তাদের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কারণে যৌন সংরক্ষণশীলতা নেই বললেই চলে।

এ দুটি দিক সম্পর্কে যদি নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব হয়, তাহলেই একজন ঈমানদার মুসলিমের পক্ষে একজন আহলে কিতাব মেয়েকে বিয়ে করা জায়েয হতে পারে। অন্যথায় তা সাধারণ কাফের মুশরেক মেয়েদের মতোই মুসলিমদের জন্যে চিরতরে হারাম। তিন আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী আহলে কিতাবরা মুশরেকদের মধ্যে গণ্য। তাই তাদের মেয়ে বিয়ে করাও হারাম।

বদল বিয়ে জায়েয নয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ - (بخاری، ابن ماحه)

নবী করীম (স) 'শেগার' বিয়ে নিষেধ করে দিয়েছেন।

'শেগার' বিয়ে কাকে বলে— তার ব্যাখ্যা করে হাদীসের বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ

وَالشِّغَرُ اَنْ يُّزَوِّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلٰى اَنْ يُّزَوِّ جَهُ الْاٰخَرُ اِبْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ - (بخاری، ابن ماجه)

'শেগার' বিয়ে হয় এভাবে যে, একজন অপরজনের নিকট নিজের মেয়ে বিয়ে দেবে এ শর্তে যে, সে তার মেয়ে তার নিকট বিয়ে দেবে, আর এ দুটি বিয়েতে কোনো মোহরানা দেয়া নেয়া হবে না।

আল্লামা 'বেন্দার' বলেছেন ঃ শেগার বিয়ের কথাবার্তা হয় এভাবে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে ঃ

زَوِّجْنِىْ اِبْنَتَكَ اُزَوِّجُكَ اِبْنَتِىْ -

তোমার মেয়েকে আমার নিকট বিয়ে দাও, আমি আমার মেয়েকে তোমার নিকট বিয়ে দেবো।

বাংলা ভাষায় আমরা এ ধরনের বিয়েকে বলে থাকি 'বদল বিয়ে'

'বদল বিয়ে'র নিষিদ্ধ ধরন হচ্ছে এই যে, একজন তার বোন কিংবা মেয়েকে অপর ব্যক্তির নিকট বিয়ে দেবে এ শর্তে যে, সেই অপর ব্যক্তি তার নিজের বোন কিংবা মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেবে এবং একজনের যৌন অঙ্গ অপর জনের বিয়ের মোহরানাস্বরূপ হবে। দুটি বিয়ের কোনোটিতেই আলাদাভাবে কোনো মোহরানাই ধার্য করা হবে না।

ইমাম রাফেয়ী বলেছেন ঃ

هٰذَا فِيْهِ تَعْلِيْقٌ وَ شَرْطٌ عَقْدَ فِىْ عَقْدٍ وَ تَشْرِيْكٌ فِى الْبُضْعِ - (عمدة القارى :ج -٢٠ ،ص- -١٠)

এ ধরনের বিয়েতে একটি বিয়েকে অপর একটি বিয়ের সাথে সম্পর্কিত করা হয়, একটির জন্যে অপরটি শর্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। আর যৌন অঙ্গে পরস্পরকে শরীক করা হয়। এ কারণে এ বিয়ে জায়েয নয়।

কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একজনের মেয়ে কিংবা বোনকে অপর জনের নিকট বিয়ে দেয়া এ শর্তে যে, সে তার মেয়ে কিংবা বোনকে তার নিকট বিয়ে দেবে— যেন একটি বিয়ে অপর বিয়ের বদল হয়— এ বিয়ে জায়েয এবং তাতে মহরে মিসল— সম-মানের মোহরানা দেয়া ওয়াজিব।

এ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদদের মত হচ্ছে ঃ

وهو منهى عنه نحلوه عن المهرفا وجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارا - (درالمختار : ج -٢ ،ص -٤٥٧)

'শেগার' বিয়ে নিষিদ্ধ শুধু এজন্যে যে, কেননা তাতে মোহরানা ধার্য করা হয় না। এ কারণে আমরা তাতে মহরে মিসল ওয়াজিব মনে করেছি। তাহলে তা আর 'শেগার' থাকবে না অর্থাৎ তখন তা নিষিদ্ধ নয়।

ইসলামের উপস্থাপিত পারিবারিক রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের দৃষ্টিতে বিয়ের প্রস্তাব বর কনে যে কারো পক্ষ থেকেই প্রস্তাব পেশ করতে কোনো লজ্জা-শরম বা মান-অপমানের কোনো কারণ হতে পারে না। এমন কি ছেলে কিংবা মেয়ের পক্ষও স্বীয় মনোনীত বর বা কনের নিকট সরাসরিভাবে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে, ইসলামী শরীয়তে এ ব্যাপারে কোনো বাধা তো নেই-ই, উপরন্তু হাদীসে এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে এ কাজ যে সঙ্গত তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

নবী করীম (স) জুলাইবাব নামক এক সাহাবীর জন্যে এক আনসারী কন্যার বিয়ের প্রস্তাব কন্যার পিতার নিকট পেশ করেন। কন্যার পিতা তার স্ত্রী অর্থাৎ কন্যার মা'র মতামত জেনে এর জবাব দেবেন বলে ওয়াদা করেন। লোকটি তার স্ত্রীর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে এ বিয়েতে স্পষ্ট অমত জানিয়ে দেয়। কন্যাটি আড়াল থেকে পিতামাতার কথোপকথন শুনতে পায়। তার পিতা যখন রাসূলের নিকট এ বিয়েতে মত নেই বলে জানাতে রওয়ানা হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মেয়েটি পিতামাতাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَرُدُّوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَمْرَهٗ - اِنْ كَانَ رَضِيَهٗ لَكُمْ فَانْكِحُوْهُ -

(مسند احمد مع بلوغ الامانى : ج -١٦، ص -١٤٧)

তোমরা কি রাসূলে করীম (স)-এর প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে চাও ? তিনি যদি বরকে তোমাদের জন্য পছন্দ করে থাকেন তবে তোমরা এ বিয়ে সম্পন্ন করো।

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, মেয়ে নিজে তার বিয়ের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মত ছিল এবং পিতামাতার নিকট তার মতামত যা গোপন ও অজ্ঞাত ছিল, যথাসময়ে সে তা জানিয়ে দিতে এবং নিজের পিতামাতার সামনে প্রস্তাবকে গ্রহণ করার জন্যে স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি দিতে কোনো দ্বিধাবোধ করেনি। আর এতে বস্তুতই কোনো লজ্জা-শরমের অবকাশ নেই।

হযরত উমরের কন্যা হাফসা (রা) বিধবা হলে পরে তাঁর পূনর্বিবাহের জন্যে তিনি [হযরত উমর (রা)] প্রথমে হযরত উসমানের সাথে সাক্ষাত করেন এবং হাফসাকে বিয়ে করার জন্যে তাঁর নিকট সরাসরি প্রস্তাব পেশ করেন। তখন হযরত উসমান (রা) বললেন ঃ এ সম্পর্কে আমার মতামত শীগগীরই জানিয়ে দেবো। কয়েকদিন পর তিনি বললেন ঃ আমি বর্তমানে বিয়ে করা সম্পর্কে চিন্তা করছি না। অতঃপর হযরত উমর (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট এই প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে মতামত জানানো থেকে বিরত থাকলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত নবী করীম (স) নিজেই নিজের জন্যে বিয়ের প্রস্তাব হযরত উমরের নিকট প্রেরণ করেন।

(বুখারী, ২য় খণ্ড, ৭৬৮ পৃ ঃ; মুসনাদে আহমাদ, ১৬ খণ্ড, ১৪৮ পৃ ঃ)

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, মেয়ে পক্ষও প্রথমেই বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে— এতে কোনো দোষ নেই। আর ছেলে পক্ষও— কিংবা ছেলে নিজেও বিয়ের প্রস্তাব প্রথমত কন্যা পক্ষের নিকট পেশ করতে পারে। শরীয়তে এতে কোনো আপত্তি নেই কিংবা কারো পক্ষেই কোনো লজ্জা-শরমেরও কারণ নেই।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ একদা একটি মেয়েলোক— সম্ভবত তার নাম লায়লা বিনতে কয়স ইবনুল খাতীম— রাসূলে করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে নিজেকে বিয়ের প্রস্তাব সরাসরিভাবে পেশ করেন। সে বলে ঃ

يَانَبِيَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيْ حَاجَةٌ ؟

হে রাসূল! আপনি আমাকে বিয়ে করার কোনো প্রয়োজন মনে করেন ?

হযরত আনাস যখন এ কথাটি বর্ণনা করছিলেন, তখন সেখানে তাঁর কন্যা উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ مَا كَانَ اَ قَلَّ حَيَاءَهَا —"মেয়েলোকটি কতই না নির্লজ্জ ছিল!"

অর্থাৎ একটি মেয়েলোক নিজে নিজেকে রাসূলের নিকট বিয়ে দেয়ার জন্যে পেশ করেছে শুনে আনাস-তনায়া উমাইনার বিশেষ বিস্ময় বোধ হয়েছে এবং এ কাজকে তিনি নির্লজ্জতার চরম বলে মনে করেছেন। তখন হযরত আনাস (রা) কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

هِيَ خَيْرٌ مِّنْكِ رَغِبَتْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا -

সে তোমার তুলনায় অনেক ভালো ছিল। সে রাসূলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং সে নিজেই নিজেকে রাসূলের নিকট বিয়ের জন্যে পেশ করেছিল।

হযরত সহল ইবনে সায়াদ সায়েদী বলেন ঃ

جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَهِبَ لَكَ نَفْسِيْ -

একটি মেয়েলোক রাসূলের নিকট এসে বলল ঃ আমি আপনার খেদমতে এসেছি এজন্যে যে, আমি নিজেকে আপনার নিকট সোপর্দ করব।

তখন নবী করীম (স) তার প্রতি উদার দৃষ্টিতে তাকালেন, পা থেকে মাথার দিকে দেখলেন। অনেক সময় ধরে তিনি নির্বাক হয়ে থাকলেন— কোন জবাব দিলেন না। তখন উপস্থিত একজন সাহাবী বুঝতে পারলেন যে, নবী করীম (স) স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করতে রাজি নহেন। তাই তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে রাসূল! এ মেয়েলোকটিতে আপনার যদি কোনো প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে অনুমতি দিন তাকে বিয়ে করার। (বুখারী, মুসলিম)

এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোনো মেয়ে যদি বিশেষ কোনো পুরুষের প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে তবে সে নিজেই ছেলের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। এতে না আছে কোনো দোষ, না লজ্জা-শরমের কোনো অবকাশ।

বিয়ের এক প্রস্তাবের ওপর নতুন প্রস্তাব দেয়া

তবে এ ব্যাপারে একটি বিশেষ সুস্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে, বিয়ের প্রস্তাবের ওপর আর একটি নতুন প্রস্তাব দেয়া। কোনো মেয়ে বা ছেলে সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, কোথাও তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে বা কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেছে, তাহলে সে প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় কোনো প্রস্তাবই এক্ষেত্রে উত্থাপন করা যেতে পারে না। কেননা এতে করে সমাজে অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতার মনোভাব এবং পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব সহজেই জেগে উঠতে পারে। আর তা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে খুবই মারাত্মক। এমনকি এতে করে ছেলে বা মেয়ের এমন ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে, যার ফলে তার বিয়েই চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এজন্যে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। রাসূলে করীম (স) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

لَا يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهٗ اَوْ يَاْذَنَ لَهٗ - (بخاری، مسلم)

তোমাদের কেউ যেন অপর ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাবের ওপর নতুন প্রস্তাব পেশ না করে, —যতক্ষণ না সে নিজেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে কিংবা তাকে নতুন প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি দেবে।

হাদীসটির উপরোদ্ধৃত ভাষা মুসলিম শরীফের। আর বুখারী শরীফে এ হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

لَايَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ -

কেউই তার ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাবের ওপর নতুন প্রস্তাব দেবে না— যতক্ষণ না সে বিয়ে করে ফেলে অথবা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلْمُؤْمِنُ اَخُوالْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَّبْتَاعَ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَذَرَ - (احمد، مسلم)

মু'মিন মু'মিনের ভাই। অতএব এক মু'মিনের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অপর মু'মিনের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করা হালাল হতে পারে না। অনুরূপভাবে এক ভাইয়ের দেয়া বিয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত না হতেই অপরের প্রস্তাব দেয়াও সঙ্গত নয়।

আল্লামা শাওকানী এ পর্যায়ে লিখেছেন ঃ

وَاسْتَدَلَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَلٰى تَحْرِيْمِ الْخِطْبَةِ الْخِطْبَةَ لِقَوْلِهٖ فِىْ اَوَّلِ الْحَدِيْثِ لَا يَحِلُّ -

(نيل الاوطار:ج ص -٢٣)

হাদীসের শুরুতে 'হালাল হবে না' বলার কারণে বিয়ের প্রস্তাবের ওপর নতুন প্রস্তাব দেয়া হালাল হবে না বলে এ হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

বিয়ের এক প্রস্তাবের ওপর নতুন অপর একটি প্রস্তাব দেয়া— এক প্রস্তাব সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পূর্বেই আর একটি প্রস্তাব পেশ করা যে ইসলামে জায়েয নয় বরং হারাম, এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ইজ্মা— পরিপূর্ণ ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে। (سبل السلام : ج- ٣، ص-١١١)

অবশ্য ইমাম খাত্তাবী বলেছেন ঃ এ নিষেধ শুধু নৈতিক শিক্ষা, শালীনতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মাত্র। অন্যথায় এ এমন হারাম কাজ নয়, যাতে করে বিয়েই বাতিল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দাউদ জাহেরী বলেছেন ঃ এরূপ করে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি বিয়ে করে ফেলে তবে সে বিয়েই বাতিল হয়ে যাবে। (معالم السنن : ج-٣، ص-١٩٤)

কিন্তু এ উক্তিতে যে বাড়াবাড়ি রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেয়ার অপকারিতা এবং তা নিষেধ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

سَبَبُ ذٰلِكَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا خَطَبَ اِمْرَاَةً وَرَكَنَتْ اِلَيْهِ ظَهَرَ وَجْهٌ لِصَلَاحِ مَنْزِلِهٖ فَيَكُوْنُ تَابِسِيَهٗ عَمَّا هُوَ بِسَبِيْلِهٖ وَ تَخِيْبِهٖ عَمَّا هُوَ يَتَوَ قَّعَهٗ اِسَاءَةٌ مَعَهٗ وَظُلْمًا عَلَيْهِ وَتَضْيِيْقًا بِهٖ - (حجة الله البالغة : ج - ١)

এর কারণ এই যে, এক ব্যক্তি যখন কোনো মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তখন সেই মেয়ের মনেও তার প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত হয় এবং এর ফলে এই উভয়ের

ঘর-সংসার গড়ে ওঠার উপক্রম দেখা দেয়। এ সময় যদি সে মেয়ের জন্যে অপর কোনো ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে, তাহলে প্রথম প্রস্তাবককে তার মনের বাসনায় ব্যর্থ মনোরথ করে দেয়া হয়, তার অধিকার থেকে তাকে করে দেয়া হয় বঞ্চিত। আর এতে করে তার প্রতি বড়ই অবিচার ও জুলুম করা হয়, তার জীবনকে করে দেয়া হয় সংকীর্ণ।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ আরো লিখেছেন ঃ "বিয়ের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব করা" সম্পর্কিত উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতেই আমাদের মত হচ্ছে যে, এ কাজ হারাম। ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফী মাযহাবের সব ফিকাহ্‌বিদেরই এ মত। 'আল-মিন্‌হাজ' কিতাবে বলা হয়েছে ঃ

ويحرم خطبته على خطبته من صرح باجابة الا باذنه او يتركه فان لم يجب ولم يرد لم يحرم فى الاظهر - (المسوى شرح الموطا : ج -٢، ص -١٠٤)

বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর তা যদি কবুল হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার ওপর অপর কারো প্রস্তাব দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। তবে উভয় পক্ষের অনুমতি নিয়ে নতুন প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। কিংবা সে প্রস্তাব যদি প্রত্যাহার করে, তাহলেও দেয়া যায়। আর যদি প্রথম প্রস্তাবের কোনো জবাব না দেয়া হয়ে থাকে, না প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন নতুন প্রস্তাব দেয়া বাহ্যত হারাম হবে না।

তবে ফিকাহ্‌র দৃষ্টিতে এখানে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয় প্রস্তাবকারীই যদি নেক চরিত্রের লোক হয় তবেই উপরিউক্ত নিষেধ প্রযোজ্য। আর প্রথম প্রস্তাবকারী যদি অসচ্চরিত্রের লোক হয় এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবকারী হয় দ্বীনদার ও নেক চরিত্রের তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব সম্পূর্ণ বৈধ ও সঙ্গত। (بداية المجتهد ج- ٢، ص- ٣)

ইবনে কাসেম মালিকী বলেছেন ঃ

اِنَّهٗ يَجُوْزُ الْخِطْبَةُ عَلٰى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ- (سبل السلام : ج- ٣ ،ص -١١٢)

ফাসিক ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাবের ওপর নতুন প্রস্তাব দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

আমীর হুসাইন আশ্‌-শিফা কিতাবে লিখেছেন ঃ

تَجُوْزُ الْخِطْبَةُ عَلٰى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ - (نبوى : ج -١ ،ص -٤٥٤)

প্রথম প্রস্তাবকারী যদি ফাসিক হয় তাহলে তার প্রস্তাবের ওপর নতুন প্রস্তাব দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

বিয়ের পূর্বে কনে দেখা

দাম্পত্য জীবনে মিল-মিশ, প্রেম-ভালোবাসা ও সতীত্ব-পবিত্রতার পরিশুদ্ধ পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্যে বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া উচিত বলে ইসলামে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম দলীল হচ্ছে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত বাণী ঃ

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ -

তোমরা বিয়ে করো সেই মেয়েলোক, যাকে তোমার ভালো লাগে— যে তোমার পক্ষে ভালো হবে।

ইমাম সুয়ূতী এ আয়াতের ভিত্তিতে দাবি করে বলেছেন ঃ

اِنَّ فِيْهَا اِشَارَةً اِلٰى حَلِّ النَّظْرِ قَبْلَ النِّكَاحِ لِاَنَّ الطِّيْبَ اِنَّمَا يُعْرَفُ بِهٖ- (روح المعانى : ج -٣، ص- ١٩٦)

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া সম্পূর্ণ হালাল। কেননা কোন্ মেয়ে পছন্দ কিংবা কোন্ মেয়ে ভালো হবে তা নিজের চোখে দেখেই আন্দাজ করা যেতে পারে।

এ পর্যায়ে নবী করীম (স) বলেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ - (ابوداؤد)

তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবে তখন তাকে নিজ চোখে দেখে তার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে, যেন তাকে ঠিক কোন আকর্ষণে বিয়ে করবে তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।

এ হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) অতঃপর বলেন ঃ

فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ اَتَخَبَّاءُ لَهَا حَتّٰى رَاَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِىْ اِلٰى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا - (ابو داؤد)

রাসূলের উক্ত কথা শুনে আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলাম। তারপর তাকে গোপনে দেখে নেয়ার জন্যে আমি চেষ্টা চালাতে শুরু করি। শেষ পর্যন্ত আমি তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাই, যা আমাকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে তাকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নিতে। অতঃপর তাকে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করি।

ইমাম আহমাদ বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত জাবির একটি গাছের ডালে গোপনে বসে থেকে প্রস্তাবিত কনেকে দেখে নিয়েছিলেন। (مسند احمد)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমা থেকে রাসূলে করীমের নিম্নোদ্ধৃত কথাটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا اُلْقِىَ فِىْ قَلْبِ امْرِىءٍ خِطْبَةُ امْرَاَةٍ فَلَا بَاْسَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهَا -

যখন কোনো পুরুষের মনে কোনো বিশেষ মেয়ে বিয়ে করার বাসনা জাগবে, তখন তাকে নিজ চোখে দেখে নেয়ায় কোনোই দোষ নেই।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, সভ্যতা-ভব্যতা ও শালীনতা সহকারে এবং শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে কনেকে বিয়ের পূর্বেই দেখে নেয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে করে তার ভাবী স্ত্রী সম্পর্কে মনের খুঁতখুঁতে ভাব ও সন্দেহ দূর হয়ে যাবে, থাকবে না কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ। শুধু তা-ই নয়, এর ফলে ভাবী বধূর প্রতি আকর্ষণ জাগবে এবং সেই স্ত্রীকে পেয়ে সে সুখী হতে পারবে।

হযরত মুগীরা ইব্‌ন শুবাহ (রা) তাঁর নিজের বিয়ের প্রসঙ্গ রাসূলে করীমের সমানে পেশ করলে তখন রাসূলে করীম (স) আদেশ করলেন ঃ

فَانْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمْ - (ترمذى باب ماجاء فى النظر)

তাহলে কনেকে দেখে নাও। কেননা তাকে বিয়ের পূর্বে দেখে নিলে তা তোমাদের মাঝে স্থায়ী প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টির অনুকূল হবে।

এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য। রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اِذَاخَطَبَ اَحَدُكُمُ الْمَرْاَةَ فَقَدَرَ اَنْ يَّنْظُرَ مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ اِلٰى زَوَاجِهَا فَلْيَفْعَلْ - (بلوغ المرام :ج -٣)

তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় তখন তার এমন কোনো কিছু দেখা যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় যা তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করবে, তবে তা তার অবশ্যই দেখে নেয়া কর্তব্য।

এভাবে বহু সংখ্যক রেওয়ায়েত হাদীসের কিতাবসমূহে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, একজন পুরুষ যে মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, সে তাকে বিয়ের পূর্বেই দেখে নিতে পারে। শুধু তাই নয়, রাসূলে করীম (স) এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন এবং না দেখে বিয়ে করাকে তিনি অপছন্দ করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً اَنَظَرْتَ اِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ اِلَيْهَا -

নবী করীম (স) বিবাহেচ্ছুক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি মেয়েটিকে দেখেছ ? সে বলল ঃ না, দেখিনি। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ যাও তাকে দেখে নাও।

এসব হাদীসকে ভিত্তি করে আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

فِيْهَا دَلِيْلٌ عَلَى اَنَّهُ لَا بَاسَ بِنَظْرِ الرَّجُلِ اِلَى الْمَرْاَةِ الَّتِىْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا -

(نيل الاوطار : ج -٦، ص - ٢٤٠)

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন পুরুষ যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, সে তাকে (বিয়ের পূর্বেই) দেখতে পারে— তাতে কোনো দোষ নেই।

তাউস, জুহরী, হাসানুল বাসরী, আওজায়ী, ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, শাফিয়ী, মালিক, আহমাদ ইব্‌নে হাম্বাল প্রমুখ মনীষী বলেছেন ঃ

يُبَاحُ النَّظْرُ اِلَى الْمَرْاَةِ الَّتِىْ يُرِيْدُ نِكَاحُهَا -

পুরুষ যে মেয়েলোকটিকে বিয়ে করতে চায়, সে তাকে দেখতে পারে।

এ পর্যন্ত যা বলা হলো তা সর্ববাদীসম্মত। এতে মনীষীদের মধ্যে কারো কোনো মতবিরোধ নেই— সকলেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।

কিন্তু এর পর প্রশ্ন থেকে যায়, কনেকে কতদূর দেখা যেতে পারে ? অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় দেখা যেতে পারে এজন্যে যে, মুখমণ্ডল দেখলেই কনের রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। আর হস্তদ্বয় গোটা শরীরের গঠন ও আকৃতি বুঝিয়ে দেয়। কাজেই এর বেশি দেখা উচিত নয়। ইমাম আওজায়ী বলেছেন ঃ

يُنْظَرُ اِلَيْهَا وَ يَجْتَهِدُ وَ يُنْظَرُ مِنْهَا مَوَاضِعُ اللَّحْمِ -

তার প্রতি তাকানো যাবে, খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা যাবে এবং তার মাংসপেশীসমূহও দেখা যাবে।

আর দাঊদ জাহেরী বলেছেন ঃ يُنْظَرُ اِلَى جَمِيْعِ بَدَنِهَا —'তার সর্বশরীর দেখা যাবে।"

ইবনে হাজম তো এতদূর বলেছেন ঃ يَجُوْزُ النَّظْرُ اِلَى فَرْجِهَا —'তার যৌন অঙ্গকেও দেখে নেয়া যেতে পারে।'

কিন্তু অপরাপর মনীষীর মতে ঃ

لَا يَجُوْزُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى عَوْرَتِهَا -

প্রস্তাবিত মেয়েটির লজ্জাস্থানসমূহ বিয়ের পূর্বে দেখা জায়েয নয়।

এভাবে বিষয়টি নিয়ে মনীষীদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার একটি কারণ রয়েছে, আর তা এই যে, এই পর্যায়ের হাদীসসমূহ শুধু দেখার অনুমতি অকাট্য ও সুস্পষ্টভাবে দেয় বটে, কিন্তু তার কোনো পরিমাণ, মাত্রা বা সীমা নির্দেশ করে না। তবে কনে সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় এবং বিয়ে করা না

করা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় যতখানি এবং যেভাবে দেখলে, ততখানি এবং সেভাবে দেখা অবশ্যই জায়েয হবে, সন্দেহ নেই।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আলী তনয়া উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন হযরত আলী কন্যাকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাকে দেখে নিতে পারেন। তখন এই 'দেখার' উদ্দেশ্যেই হযরত উমর উম্মে কুলসুমের পায়ের দিকের কাপড় তুলে ফেলে দিয়েছিলেন।

তার পরের প্রশ্ন, কনের অনুমতি ও জ্ঞাতসারে দেখা উচিত, কি অনুমতি ব্যতিরেকে ও অজ্ঞাতসারেই ? এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মত দেখা যায়। ইমাম মালিক বলেছেন ঃ

لَا يُنْظَرُ اِلَيْهَا اِلَّا بِاِذْنِهَا۔ لِاَنَّهٗ حَقٌّ لَهَا -

কনের অনুমতি ব্যতিরেকে তাকে দেখা যাবে না, তার প্রতি তাকানো যাবে না। কেননা তাকে দেখার জন্যে তার অনুমতি নেয়া তার অধিকার বিশেষ (বিনানুমতিতে দেখলে সে অধিকার ক্ষুণ্ন হয়)।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেছেন ঃ

سَوَاءٌ بِاِذْنِهَا اَوْبِلَا اِذْنِهَا اِذَا كَانَتْ مُسْتَتِرَةً -

কনে যদি বস্ত্রাচ্ছাদিতাই থাকে, তবে তার অনুমতি নিয়েই দেখা হোক কি বিনানুমতিতে, তার দুটিই সমান।

তবে এ সম্পর্কে রাসূলে করীমের একটি কথা স্পষ্ট পথ-নির্দেশ করে এবং তার দ্বারা মতবিরোধের অবসান হয়ে যায়। আবূ হুমাইদ সায়েদী বর্ণনা করেছেন ; রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهَا - اِذَا كَانَ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ وَاِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ - (طحاوى، مسند احم، بزار)

তোমাদের কেউ যখন কোনো মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, তখন তাকে দেখা তার পক্ষে দূষণীয় নয়। কেননা সে কেবলমাত্র এই বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার কারণেই তাকে দেখছে (অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়) যদিও সে স্ত্রীলোকটি কিছুই জানে না।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, কনেকে যদি দেখা হয় শুধু এজন্যে যে, তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবং এ দেখার মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, পছন্দ হলেই তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে, তবে সে দেখা যদি কনের অজ্ঞাতসারেও হয়, তবুও তাতে কোনো দোষ হবে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার বলে দেয়া ভালো। যদি কারো নিত্য নতুন যুবতী মেয়ে দেখা শুধু দর্শনসুখ লাভের বদরুচি হয়ে থাকে, তবে তাকে কোনো মেয়েকে দেখানো জায়েয নয়। এ সম্পর্কে ইসলামবিদ্‌দের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই ঃ

لَا يُنْظَرُ اِلَيْهَا تَلَذُّذًاوَّ شَهْوَةً وَ لَا لِرِيْبَةٍ -

কোনো মেয়েলোকের প্রতি যৌনসুখ লাভ, যৌন উত্তেজনার দরুন কিংবা কোনো সন্দেহ সংশয় মনে পোষণ করে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়।

এজন্যে ইমাম আহ্‌মাদ বলেছেন ঃ

يُنْظَرُ اِلَى الْوَجْهِ عَلٰى غَيْرِ طَرِيْقِ لَذَّةٍ وَلَهٗ اَنْ تُرَدِّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا مُتَاَ مِّلًا مَحَاسِنَهَا - (عمدة القارى)

কনের চেহারা ও মুখমণ্ডলের দিকে দেখা যাবে, তবে যৌনসুখ লাভের জন্যে নয়। এমন কি তার সৌন্দর্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি বারবার তাকানো যেতে পারে।

কোনো কোনো মনীষীর মতে কনের অজ্ঞাতসারেই তাকে দেখা উচিত, যেমন হযরত যাবির (রা) দেখেছিলেন। ইমাম শাফিয়ীর মতে বিয়ের প্রস্তাব রীতিমত পেশ করার পূর্বেই কনেকে দেখে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যেন প্রস্তাব কোনো কারণে ভেঙ্গে গেলে কোনো পক্ষের জন্যেই লজ্জা বা অপমানের কারণ না ঘটে। (عين ج -١، ص- ١، سبل السلام شرح بلوغ المرام :ج -٣ ،ص -١١١)

আর বরের নিজের পক্ষে যদি কনেকে দেখা আদৌ সম্ভব না হয়, তাহলেও অন্তত নির্ভ যোগ্য সূত্রে তার সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়ে সম্যক খোঁজ-খবর লওয়া বরের পক্ষে একান্তই আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে আপন আত্মীয়া স্ত্রীলোককে পাঠানো যেতে পারে তাকে দেখার জন্যে। হযরত আনাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এ সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী করীম (স) একটি মেয়েকে বিয়ে করার মনস্থ করেন। তখন তাকে দেখার জন্যে অপর একটি স্ত্রীলোককে পাঠিয়ে দেন এবং তাকে বলে দেন ঃ

شَمِّىْ عَوَارِضَهَا وَانْظُرِىْ اِلٰى عُرْقُوْبَيْهَا -

কনের মাড়ির দাঁত পরীক্ষা করবে এবং কোমরের উপরিভাগ পিছন দিক থেকে ভালোকরে দেখবে।

বলা বাহুল্য, দেহের এ দুটি দিক একজন নারীর বিশেষ আকর্ষনীয় দিক। দাঁত দেখলে তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-প্রতিভা সম্পর্ক স্পষ্ট ধারণা করা চলে। তার মুখের গন্ধ মিষ্টি না ঘৃণ্য তাও বোঝা যায়। আর পেছন দিক দিয়ে কোমরের উপরিভাগ একটি নারীর বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। এ সব দিক দিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে রাসূলে করীম (স) তাগিদ করেছেন। তার অর্থ, বিয়ের পূর্বে কনের এসব দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা করে নেয়া ভালো।

এ পর্যায়ে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক যে, কনে দেখার কাজ আনুষ্ঠানিক বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে সম্পন্ন করাই যুক্তিযুক্ত। আল্লামা আ-লূসী বলেছেন ঃ

وَاسْتَحْسَنَ كَثِيْرٌكَوْنَ هٰذَا النَّظْرِ قَبْلَ الْخِطْبَةِ حَتّٰى اِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ اِيْذَاءٍ بِخَلَافِ مَااِذَا تَرَكَهَا

بَعْدَ الْخِطْبَةِ كَمَا لَا يَخْفٰى - (روح المعانى : ج -٤، ص -١٩٦)

মনীষীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বেই কনে দেখার এই কাজটি সম্পন্ন করা উচিত বলে মনে করেছেন। দেখার পর পছন্দ না হলে তা প্রত্যাহার করবে। তাতে কারো মনে কষ্ট লাগবে না বা অসুবিধা হবে না। কিন্তু রীতিমত প্রস্তাব দেয়ার পর দেখে অপছন্দ হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করা হলে তার পরিণাম যে ভালো নয় তা সুস্পষ্ট।

বিয়ের পূর্বে কনে দেখা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী সবিস্তারে আলোচিত হলো। এ থেকে বোঝা গেল যে, বিয়ের পূর্বে কনে দেখা— যেত রকমের ও যেভাবেই হোক-না-কেন— সম্পূর্ণ বিধিসম্মত এবং জায়েয। কিন্তু এ দেখারও একটা সীমা থাকা বাঞ্ছনীয়। দেখার অনুমতি পেয়ে ইসলামের নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করার কোনো অধিকারই কারো থাকতে পারে না।

বিয়ের পূর্বে কনে দেখার অনুমতির সুযোগ নিয়ে কনের সাথে প্রেম চর্চা করা, নারী বন্ধু কিংবা পুরুষ বন্ধু সংগ্রহের অভিযান চালানো, আর দিনে রাতে ভাবী স্ত্রী (?)— কে নিয়ে যত্রতত্র নিরিবিলিতে পরিভ্রমণ করে বেড়ানো ও যুবতী নারীর সঙ্গ সন্ধানে মেতে ওঠা ইসলামে শুধু যে সমর্থনীয় নয় তাই নয়; নিতান্ত ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা হচ্ছে ইউরোপের আধুনিক বিজ্ঞান গঠিত বর্বর সমাজের ব্যভিচার প্রথা। ইউরোপীয় সভ্যতার দৃষ্টিতে বিয়ের পূর্বে শুধু কনে দেখাই হয় না, স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রেমের আদান-প্রদানও একান্তই জরুরী। বরং তা আধুনিক

সভ্যতার একটা অংশও বটে। এ সব না হলে বিয়ে হওয়ার কথাটাই সেখানে অকল্পনীয়। এ না হলে নাকি বিবাহোত্তর দাম্পত্য জীবনও মধুময় হতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজের এ বিকৃতি যুবক-যুবতীদের কোন রসাতলে ভাসিয়ে নিচ্ছে, তার কল্পনাও লোমহর্ষণের সৃষ্টি করে।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ব্যভিচার— ব্যভিচারের এক আধুনিকতম সংস্করণ। শুধু তাই নয়। বিয়ে পূর্বকালীন প্রেম ও যৌন মিলন মূল বিয়েকেই অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে দেয়। বিবাহোত্তর মিলন হয় বাসি ফুলের ন্যায় গন্ধহীন— কৌতুহলশূন্য। বস্তুত বিয়ে পূর্বকালীন প্রেম ও যৌন মিলন একটা মোহ— একটা উদ্বেলিত আবেগের বিষক্রিয়া। বিয়ের কঠিন বাস্তবতা সে মোহ ও উচ্ছ্বাসকে নিমেষে নিঃশেষ করে দেয় ঠুনকো কাঁচ পাত্রের মতো। এ সম্পর্কে একটি আরবী রূপকথার যথার্থতা অস্বীকার করা যায় না। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اَلزَّوَاجُ يُفْسِدُ الْحُبَّ -

বিয়ে বিয়ে-পূর্ব প্রেম-ভালোবাসাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়— ধ্বংস করে ফেলে।

বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখার এই অনুমতি, এই আদেশ— যে কোনো দৃষ্টিতেই বিচার করা হোক, সুষ্ঠু পারিবারিক জীবনের জন্যে ইসলামের এক মহা অবদান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনে-রাখা আবশ্যক যে, এই অনুমতি বা আদেশ কেবল মাত্র বিবাহেচ্ছু বরের জন্যেই নয়, এই অনুমতি প্রস্তাবিত কনের জন্যেও সমানভাবেই প্রযোজ্য। তারও অধিকার রয়েছে যে পুরুষটি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক তাকে দেখার। কেননা যে প্রয়োজনের দরুন এই অনুমতি, তা কনের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমানভাবে সত্য ও বাস্তব। হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

لَا تُزَوِّجُوْا بَنَاتِكُمْ مِنَ الرَّجُلِ الدَّمِيْمِ - فَاِنَّهُ يُعْجِبُهُنَّ مَا يُعْجِبُهُمْ مِنْهُنَّ - (فقه السنه : ج -٢، ص- ٢٥)

তোমরা তোমাদের কন্যাদের কুৎসিৎ অপ্রীতিকর পুরুষের নিকট বিয়ে দিও না। কেননা নারীর যেসব অংশ পুরুষের জন্যে আকর্ষণীয়, পুরুষের সে সব অংশই আকর্ষণীয় হয় কন্যাদের জন্যে। অতএব তাদেরও অধিকার রয়েছে বিয়ের পূর্বে ভাবী বরকে দেখার।

পরে প্রকাশিত ত্রুটির কারণে বিয়ে প্রত্যাহার

যথারীতি বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর স্বামী যদি নিশ্চিতরূপে জানতে পারে কিংবা প্রত্যক্ষ করতে পারে স্ত্রীর শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত এমন কোনো দোষ, যা বর্তমান থাকায় সে কিছুতেই স্ত্রীকে খুশী মনে গ্রহণ করতে রাজি হতে পারে না, তাহলে স্বামী কেবল এই অবস্থায় বিয়েকে প্রত্যাহার করতে পারে— শরীয়তে তাকে এ অধিকার দেয়া হয়েছে। চিরদিনের তরে এক দুর্বহ বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নেয়ার ও চাপিয়ে রাখার পরিবর্তে প্রথম অবস্থায়ই তা প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়। হযরত জায়দ ইবনে কায়াব (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً مِنْ بَنِىْ غِفَارٍ - فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ اَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بِيَاضًا فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ خُذِىْ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ وَلَمْ يَاْخُذْ بِمَا اَتَاهَا شَيْئًا - (مسند احمد)

রাসূলে করীম (স) বনী গিফার গোত্রের একটি মহিলাকে বিয়ে করে ফুলশয্যার সময় যখন তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং তার কাপড় উত্তোলন করে শয্যার ওপর বসলেন, তখন তিনি স্ত্রীলোকটির পাঁজরে শ্বেত রোগ দেখতে পেলেন। তিনি তখনই শয্যা থেকে উঠে গেলেন এবং বললেন ঃ 'তোমার কাপড় সামলাও।' অতঃপর তিনি তার থেকে নিজের দেয়া কোনো কিছুই গ্রহণ করলেন না।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, শ্বেত, কুষ্ঠ, পাগল ও মতিচ্ছিন্ন হওয়া এমন সব প্রচ্ছন্ন রোগ, যা স্বামী-স্ত্রী কারোর পক্ষেই তার নিকট সাহচর্যে আসার পূর্বে জানতে পারা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই বিয়ের পরই এসব রোগ কারো মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হলে তাদের বিয়ে আপনা থেকেই ভেঙ্গে যাবে।

হযরত আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবীদের থেকে এ সম্পর্কে যে কথাটি বর্ণিত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে ঃ

لَا تُرَدُّ النِّسَاءُ اِلَّا بِاَرْبَعَةِ عُيُوْبِ الْجُنُوْنُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالدَّاءُ فِى الْفَرْجِ –

(نيل الاوطار : ج -٢، ص -٢٩٩)

স্ত্রীদের চারটি দোষে বিয়ে ফেরত যেতে পারে— তা হচ্ছে পাগলামী, মতিচ্ছিন্ন হওয়া, কুষ্ঠ রোগ, শ্বেত রোগ এবং যৌন অঙ্গের কোনো রোগ।

বলা বাহুল্য, এ যেমন স্ত্রীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, তেমনি স্বামীর ব্যাপারেও। যারই মধ্যে তা দেখা দিক না কেন, অপরজনের পক্ষে সে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়া শরীয়তে জায়েয।

শাফিয়ী ফিকাহ্‌বিদদের কারো কারো মতে যে-কোনো পরে-প্রকাশিত ত্রুটির কারণে বিয়ে প্রত্যাহার করা ও স্ত্রীকে ফেরত দেয়া যেতে পারে। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম এই মতই সমর্থন করেছেন।

অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ বলেছেন ঃ

اِنَّ الزَّوْجَ لَايُرَدُّ الزَّوْجَةَ بِشَيْءٍ لِاَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهٖ وَالزَّوْجَةُ لَا تُرِدُّهٗ لِشَيْءٍ اِلَّا الْجَبُّ وَ الْعَنَةُ وَزَادَ مُحَمَّدٌ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ –

(نيل الاوطار:ج -٦، ص- ٢٩٩)

স্বামী কোনো কারণেই স্ত্রীকে প্রত্যাহার করতে পারে না। কেননা তার হাতেই রয়েছে তালাক দেয়ার ক্ষমতা। (সে ইচ্ছা করলে যে, কোনো সময় তালাক দিয়ে দিতে পারে বলে স্ত্রীকে প্রত্যাহার বা প্রত্যাখ্যানের কোনো মানে হয় না।) আর স্ত্রী স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কেবলমাত্র কোনো সংক্রামক রোগ ও সহবাসে অক্ষমতা, নপুংসতার দরুন। ইমাম মুহাম্মাদের মতে কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগের কারণেও প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

আল্লামা ইবনে রুশদ লিখেছেন ঃ

اِتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ عَلٰى اَنَّ الرَّدَّ يَكُوْنَ مِنْ اَرْبَعَةِ عُيُوْبٍ –

(بداية المجتهد : ج -٢، ص -٥٠)

উপরিউক্ত চার ধরনের ত্রুটির কারণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে— এ সম্পর্কে ইমাম মালিক ও শাফিয়ী সম্পূর্ণ একমত।

ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পিতামাতার দায়িত্ব

ছেলেমেয়ের জৈবিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও জৈবিক প্রয়োজন পূরণ তথা সুষ্ঠু লালন-পালনের যেমন দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতার, তেমনি তাদের যৌন প্রয়োজন পূরণ করে তাদের নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্বও পিতামাতার। এজন্যে বিয়ের বয়স হলেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক এবং এ দায়িত্ব প্রধানত তাদের পিতামাতার আর তাদের অবর্তমানে অন্য অভিভাবকের।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ وَلَدَ لَهٗ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهٗ وَاَدَبَهٗ فَاِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ - فَاِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَاَصَابَ اِثْمًا فَاِنَّمَا اِثْمُهٗ عَلٰى اَبِيْهِ - (بيهقى فى شعب الايمان)

যার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তার উচিত তার জন্যে ভালো নাম রাখা এবং তাকে ভালো আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া। আর যখন সে বালেগ— পূর্ণ বয়স্ক ও বিয়ের যোগ্য হবে, তখন তাকে বিয়ে দেয়া কর্তব্য। কেননা বালেগ হওয়ার পরও যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা করা না হয়, আর এ কারণে সে কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার গুনাহ তার পিতার ওপর বর্তাবে।

এ হাদীসে প্রথমত ছেলেমেয়ের ভালো নাম রাখা ও তাকে ভালো আদব-কায়দা শেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার পরই বলা হয়েছে যে, ছেলে সন্তান— ছেলে বা মেয়ে— বালেগ হলে অনতিবিলম্বে যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা করা না হয়, তার বিয়ের ব্যাপারে যদি পিতামাতা-অভিভাবক কোনোরূপ অবহেলা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করে আর তার ফলে তার বিয়ে বিলম্বিত হওয়ার দরুন যদি তার দ্বারা কোনো গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়, তাহলে সে গুনাহের দায়িত্ব থেকে পিতামাতা বা অভিভাবক কিছুতেই রেহাই পেতে পারে না। মওলানা ইদরীস কান্ধেলুভী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اى حزاء اثمه عليه لقصيره -

অর্থাৎ তার গুনাহের শাস্তি তার পিতাকে ভোগ করতে হবে। কেননা এই ব্যাপারটি তারই ত্রুটি ও অবহেলার দরূন হতে পেরেছে।

অতঃপর লিখেছেন ঃ

وهو محمول على الزجز والتهد يد للمبا لغة والتاكيد - (التعليق الصبيح :ج -٤، ص -٢٠)

এ হাদীস থেকে ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে অবহেলা করার জন্যে পিতার প্রতি অতিরিক্ত শাসন, ধমক ও কঠোর বাণী জানা যায় এবং এ সম্পর্কে যথেষ্ট তাগিদ রয়েছে বলেও বোঝা যায়।

হযরত উমর ও আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

فِى التَّوْرٰةِ مَكْتُوْبٌ مَنْ بَلَغَتْ اِبْنَتُهٗ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَاَصَابَتْ اِثْمًا فَاِثْمُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ - (بيهقى فى شعب الايمان)

তওরাত কিতাবে লিখিত রয়েছে, যার কন্যা বারো বছর বয়সে পৌঁছেছে আর তখনো যদি তার বিয়ের ব্যবস্থা না করে, এর ফলে যদি সে কোনো গুনাহ্ করে বসে তবে এ গুনাহ্ তার পিতার ওপর বর্তাবে।

এ দুটি হাদীস থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সন্তান বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর সেই সঙ্গে বয়স্ক ছেলেমেয়েরও কর্তব্য হচ্ছে এজন্যে নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করা।

এ পর্যায়ে হাদীসে আরো কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে রাসূলে করীম (স) পিতামাতাকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهٗ وَخُلُقَهٗ فَزَوِّجُوْهُ - اِنْ لَا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ - (ترمذى)

তোমাদের নিকট যদি এমন কোনো বর বা কনের বিয়ের প্রস্তাব আসে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্রকে তোমরা পছন্দ করো, তাহলে তাঁর সাথে বিয়ে সম্পন্ন করো। যদি তা না করো, তাহলে জমিনে বড় বিপদ দেখা দেবে এবং সুদূরপ্রসারী বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।

অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে বর বা কনের শুধু দ্বীনদারী ও চরিত্রই প্রধানত ও প্রথমত লক্ষণীয় জিনিস। এ দিক দিয়ে বর বা কনেকে পছন্দ হলে ও যোগ্য বিবেচিত হলে অন্য কোনো দিকে বড় বেশি দৃষ্টিপাত না করে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন করা কর্তব্য। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ এসব দিক দিয়ে যোগ্য বর বা কনে পাওয়া সত্ত্বেও যদি তোমরা তার বিয়ের ব্যবস্থা না কর— তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন করতে রাজি না হও, তাহলে তার পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হবে। আর সে খারাপ পরিণামের রূপ হচ্ছে ভয়ানক বিপদ ও ব্যাপক বিপর্যয়। এর ব্যাখ্যা করে মওলানা ইদ্‌রীস কান্ধেলুভী লিখেছেন ঃ

اِنْ لَمْ تُزَوِّجُوْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهٗ بَلْ نَظَرْتُمْ اِلٰى صَاحِبِ مَالٍ وَجَاهٍ كَمَا هُوَ شَيْمَةُ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا يَبْقٰى اَكْثَرُ النِّسَاءِ بِلَازَوْجٍ وَالرِّجَلُ بِلَا زَوْجَةٍ فَيَكْثُرُ الزِّنٰى وَتَقَعُ الْفِتْنَةُ - (التعليق الصبيح :ج -٤،ص -٦)

যার দ্বীনদারী তোমরা পছন্দ করো, সে ছেলের বা মেয়ের সাথে যদি তোমরা বিয়ে সম্পন্ন না করো বরং তোমাদের দৃষ্টি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে ধন-মাল ও সম্মান সম্ভ্রম সম্পন্ন কোনো বর বা কনের সন্ধানে যেমন দুনিয়াদার লোকেরা করে থাকে— তাহলে বহুসংখ্যক মেয়ে স্বামীহীনা এবং বহু সংখ্যক পুরুষ স্ত্রীহীনা অবিবাহিত হয়ে থাকতে বাধ্য হবে। আর এরই ফলে জ্বেনা-ব্যভিচার ব্যাপক হয়ে দেখা দেবে এবং সমাজে দেখা দেবে নানারূপ ফিত্‌না-ফাসাদ ও বিপদ-বিপর্যয়।

বিয়ের বয়স

ছেলে বা মেয়ের বিয়ের জন্যে কোনো বয়স-পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে কি ? কত বয়স হলে পরে ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেয়া যেতে পারে, আর কত বয়স পূর্ণ না হলে বিয়ে দেয়া উচিত হতে পারে না আধুনিক যুগের সমাজ-মানসে এ এক জরুরী জিজ্ঞাসা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ছেলে ও মেয়ের বিয়ের জন্যে একটা বয়স পরিমাণ আইনের সাহায্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, এত বয়স না হলে ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দেয়া চলবে না, এ সম্পর্কে ইসলামের অভিমত কি ?

এই পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা)-র নিম্নোক্ত উক্তি থেকে কিছুটা পথের সন্ধান লাভ করা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِيْنَ وَبَنٰى بِىْ وَاَنَا اِبْنَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ - (مسلم :ج -١،ص -٤٥١)

রাসূলে করীম (স) আমাকে বিয়ে করেন যখন আমার বয়স মাত্র ছয় বছর, আর আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধেন যখন আমি নয় বছরের মেয়ে।

অপর এক হাদীসে এক সাহাবীর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

تَزَوَّجَهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعَ سِنِيْنَ - (نبوى شرح مسلم : ج-١، ص -٤٥٦)

রাসূলে করীম (স) হযরত আয়েশাকে বিয়ে করেন, যখন তাঁর বয়স নয়।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ ﷺ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَهِىَ صَغِيْرَةٌ وَ كَانَ عُمْرَهَا سِتُّ سِنِيْنَ - (عينى :ج - ٢٠ ص- ٧٧)

নবী করীম (স) হযরত আয়েশাকে বিয়ে করেছিলেন যখন তিনি ছোট্ট ছিলেন, তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর।

নবী করীম (স) নিজে যখন হযরত আয়েশাকে ছয় কিংবা নয় বছর বয়সে বিয়ে করলেন তখন এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলামে ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্য কোনো নিম্নতম বয়স নির্ধারণ করা হয়নি। যে-কোনো বয়সের ছেলেমেয়েকে যে-কোনো সময় অনায়াসেই বিয়ে দেয়া যেতে পারে।

এই পর্যায়ে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী মনীষী ইবনে বাত্তালের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ اَنَّهٗ لَايَجُوْزُ لِلْاٰبَاءِ تَزْوِيْجُ الصِّغَارِ مِنْ بَنَاتِهِمْ وَ اِنْ كُنَّ فِى الْمَهْدِ اِلَّا اَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ لِاَزْوَاجِهِنَّ الْبِنَاءُ بِهِنَّ اِلَّا اِذَا صَلُحْنَ لِلْوَطْءِ وَاحْتَمَلْنَ الرِّجَالَ - (عينى: ج -٢٠، ص -٧٨)

ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পিতার পক্ষে তার ছোট্ট বয়সের মেয়েদের বিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয— বৈধ, যদিও সে মেয়ে দোলনায় শোয়া শিশুই হোক না কেন। তবে তাদের স্বামীদের পক্ষে তাদের নিয়ে ঘর বাঁধা কিছুতেই জায়েয হবে না, যতক্ষণ তারা যৌন সঙ্গম কার্যের জন্যে পূর্ণ যোগ্য এবং পুরুষ গ্রহণ ও ধারণ করার সামর্থ্যসম্পন্না না হচ্ছে।

ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

اجمع المسلمون على تزويجه بنته الصغيرة - (نبوى: ج -١، ص -٤٥٦)

পিতার পক্ষে তার ছোট্ট মেয়েকে বিয়ে দেয়া জায়েয হওয়া সম্পর্কে সমস্ত মুসলমানই একমত হয়েছে।

তবে এ ব্যাপারে কোনো বয়স নির্দিষ্ট করা চলে না এজন্যে যে, সব মেয়েই স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সমান হয় না, হয় বিভিন্ন রকমের ও প্রকারের। এমন কি বংশ-গোত্র, পারিবারিক জীবন-মান ও আবহাওয়ার পার্থক্যের দরুনও এদিক দিয়ে মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। এজন্যে কোনো এক নীতি বা কোনো ধরাবাঁধা কথা এ ব্যাপারে বলা যায় না। তাই বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

وَاَحْوَالُهُنَّ فِىْ ذٰلِكَ مُخْتَلِفٌ فِىْ قَدْرِ خَلْقِهِنَّ وَطَاقَتِهِنَّ - (ص : ٧٨)

মেয়েদের জন্মগত পরিমিতি ও স্বাস্থ্যগত সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং ক্ষমতা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

অতএব ঠিক কত বয়সে যে মেয়েদের বিয়ে দেয়া উচিত আর কত বয়সে নয়, তা নির্দিষ্ট করে বলা এবং এজন্যে কোনো বয়স নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

তাছাড়া বিয়ে বলতে কি বোঝায়, তাও ভেবে দেখা দরকার। কেননা 'বিয়ে' বলতে যদি স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলন ও তদুদ্দেশ্যে ঘর বাঁধা বোঝায়, তাহলে তা যে ছেলেমেয়ের পূর্ণ বয়স্ক (বালেগ) হওয়ার পূর্বে আদৌ সম্ভব হতে পারে না, তা' বলাই বাহুল্য। আর যদি বিয়ে বলতে শুধু আকদ্ ও ঈজাব-কবুলমাত্র বোঝায় তাহলে তা যে কোনো বয়সেই হতে পারে। এমন কি দোলনায় শোয়া বা দুগ্ধপোষ্য শিশুরও হতে পারে তার পিতার নেতৃত্বে। ইসলামী শরীয়তে এ বিয়ে নিষিদ্ধ নয় এবং এতে অশোভনও কিছু নেই।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামবিদ ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী লিখেছেন ঃ

ذَهَبَتِ الْاَرَاءُ الْاِجْتِهَادِيَةُ فِى الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ وَغَيْرِ هَاالٰى صِحَّةِ زَوَاجِ الصِّغَارِ مِمَّنْ هُمْ دُوْنَ سَنِّ الْبُلُوْغِ - (المراة بين الفقه والقانون :ص -٥٧)

চারটি মাযহাবের ইজতিহাদী রায় এই যে, 'বালেগ' হয়নি— এমন ছোট ছেলেমেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও বৈধ।

কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা এবং নবী করীম (স)-এর যুগে ও তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে উপরিউক্ত কথার যৌক্তিকতা ও প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য।

অবশ্য কিছু সংখ্যক ফিকাহ্‌বিদ; যেমন— ইবনে শাবরামাতা ও আল-বাতী উপরিউক্ত কথার বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে ছোট বয়সের ছেলেমেয়ের কোনো রকম বিয়েই আদৌ জায়েয নয়। আর তাদের অভিভাবকগণ তাদের পক্ষ থেকে উকীল হয়ে যেসব বিয়ে সম্পন্ন করে থাকে, তা সম্পূর্ণ বাতিল, তাকে বিয়ে বলে ধরাই যায় না।

বস্তুত শরীয়তে বিয়ের আদেশ এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান উপদেশ এই শেষোক্ত মতকেই সমর্থন করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েকে বিয়ে দেয়ার বাস্তব কোনো ফায়দাই নেই, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বরং অনেক ক্ষেত্রে ছোট বয়সের বিয়ে ছেলেমেয়েদের নিজেদের জীবনে কিংবা উভয় পক্ষের অলী-গার্জিয়ানদের জীবনে নানা প্রকারের জটিলতারই সৃষ্টি করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কেননা বিবাহিত ছেলেমেয়ে বড় হয়ে নিজেদেরকে এমন এক বিয়ের বন্ধনে বন্দী-দশায় দেখতে পায়, যে বিয়েতে তাদের কোনো মতামত নেয়া হয়নি। আবার অনেক বিবাহিত ছেলেমেয়ে বড় ও বয়স্ক হওয়ার পর মন-মেজাজ ও স্বভাব-চরিত্রে পরস্পরে এমন পার্থক্য দেখতে পায়, যাতে করে দাম্পত্য জীবনের প্রতি তারা কোনো আকর্ষণই বোধ করতে পারে না। ফলে উভয় পক্ষের গার্জিয়ানদের মধ্যেও যথেষ্ট তিক্ততা এবং শেষ পর্যন্ত পরস্পরে প্রবল বিরোধ ও প্রকাশ্য শত্রুতা দেখা দেয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

প্রাচীনকালে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার পতন ও ভাঙ্গনের পর এমন এক সময় ছিল, যখন ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের কোনো মতামত নেয়া হতো না, আর তা ব্যক্ত করার জন্যেও অনুকূল পরিবেশ বর্তমান ছিল না। ফলে এ কাজ অলী-গার্জিয়ানরাই নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার হিসেবে একান্তভাবে নিজেদের মতে এ কাজ সম্পন্ন করত। শেষ পর্যন্ত তারা এ কাজ ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ছোট বয়সকালেই সম্পন্ন করে ফেলতে শুরু করল। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের কাজকে 'খুব ভালো কাজ' বলে কখনোই ঘোষণা করেনি, না পারিবারিক ও দাম্পত্য সুখ-শান্তির দৃষ্টিতে এ কাজ কখনো কল্যাণকর হতে পারে। ছোট বয়সের বিয়েতে ছেলেমেয়েদের জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ

করা গেছে, তদ্দরুন এর প্রতি বর্তমান সমাজ-মানসে অতি যুক্তিসঙ্গতভাবেই তীব্র ঘৃণা ও প্রতিরোধ জেগে উঠেছে। এ কাজকে আজ কেউই ভালো ও শোভনীয় বা সমর্থনীয় মনের করতে পারছে না।

কিন্তু তাই বলে বিয়ের একটা বয়স নির্দিষ্ট করা এবং তার পূর্বে বিয়ে অনুষ্ঠানকে আইনের জোরে নিষিদ্ধ করে দেয়া, এমন কি যদি কেউ তা করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিযুক্ত জেল-জরিমানার দণ্ডে দণ্ডিত করা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ইসলামী শরীয়তে ছোট বয়সে ছেলেমেয়েকে বিয়ে দিতে হুকুম করা হয়নি কিংবা সে জন্যে উৎসাহও দেয়া হয়নি। কিন্তু এ কাজ যদি কোনো পিতা— গার্জিয়ান করেই— করা অপরিহার্য বলে মনে করে নানা বৈষয়িক বা সামাজিক কারণে, তাহলে তাকে জেল-জরিমানার দণ্ডে দণ্ডিত করার আইন প্রণয়নের অধিকার ইসলামী শরীয়তে কাউকেই দেয়া হয়নি।

বস্তুত ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিকোণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। ইসলাম ব্যাপারটিকে উন্মুক্ত রেখে গিয়েছে এবং সমাজ-সংস্থার শান্তি-শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে তাই থাকা উচিত সর্বত্র। বিয়ে-শাদী সম্পর্কে ইসলামের সাধারণ আদেশ উপদেশ দাবি করে যে, পূর্ণ বয়সে ও কার্যত যৌন-সঙ্গমে সক্ষম হওয়ার পরই বিয়ে সম্পন্ন হওয়া উচিত। তবে তার পূর্বে বিয়ে অনুষ্ঠান করাকে নিষেধও করা হয়নি। কেননা ব্যাপারটি পিতা ও সমাজের সাধারণ অবস্থার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে যদি কোনো পিতা বা দাদা তার মেয়ে বা নাতনীকে ছোট বয়সে— বালেগা হওয়ার পূর্বেই বিয়ে দিয়ে দেয় আর বালেগা হওয়ার পর যদি সে স্বামী তার পছন্দ না হয় তাহলে সে সেই বিয়েকে অস্বীকার করতে পারবে— শরীয়তে তার অবকাশ রয়েছে। ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন ঃ

وَقَالَ اَهْلُ الْعِرَاقِ لَهَا الْخِيَارُ اِذَا بَلَغَتْ -

ইরাকী ফকীহ্গণ বলেছেন, ছোট্ট বয়সে বিয়ে দেয়া মেয়ে বালেগা হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অধিকার রাখে। (নববী শরহে মুসলিম)

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

وَقَالَ الْاَوْزَاعِىُّ وَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاٰخَرُوْنَ مِنَ السَّلَفِ يَجُوْزُ لِجَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ وَيَصِحُّ لَهَا الْخِيَارُ اِذَا بَلَغَتْ اِلَّا اَبَايُوْسُفَ - (ايضًا)

ইমাম আওযায়ী, আবূ হানীফা ও পূর্ববর্তী ফকীহ্গণ বলেছেন, ছোট্ট মেয়ে বিয়ে দেয়া সব কর্তৃপক্ষের জন্যেই জায়েয। তবে সে যখন বালেগা হবে, তখন সে বিয়ে রক্ষা করা কি ভেঙ্গে দেয়ার পূর্ণ ইখ্তিয়ার তার নিজের। ইমাম আবূ ইউসুফ অবশ্য এ থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

এমতাবস্থায় ছোট্ট মেয়ে বিয়ে দেয়ার অনুমতি থাকায় মেয়েদের জন্যে কোনো ক্ষতিকারক হবে না। বালেগা হলে পরে তার বিয়ের প্রকৃত মালিক তো সে নিজেই। ইচ্ছা হলে ভেঙ্গে দিতে পারে। বিয়ের জন্যে ছেলেমেয়ের কোনো বয়স নির্দিষ্ট করে দিয়ে ইসলাম পিতা বা গার্জিয়ানকে একটা বিশেষ বাধ্যবাধকতার মধ্যে বেঁধে দেয়নি। এ হচ্ছে বিশ্বমানবতার প্রতি ইসলামের বিশেষ অনুগ্রহ।

তাই একথা বলা যায় যে, বিয়ের কোনো বয়স নির্দিষ্ট করে দেয়া, তার পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ এবং তার জন্যে দণ্ড দান করা ইসলামের পরিপন্থী। মানবীয় নৈতিকতার দৃষ্টিতেও এ কাজ অত্যন্ত অসমীচীন। ইসলামের কোনো ফিকাহ্বিদই এ বিষয়টি সমর্থন করেন নি। বরং এ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় সমাজ-আদর্শ এবং সেখান থেকেই এর অনুকূলে মতবাদ ও আইনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও রাষ্ট্রে। এ হচ্ছে ইউরোপের সাংস্কৃতিক গোলামীর এক লজ্জাকর দৃষ্টান্ত।

বর-কনের পারস্পরিক বয়স পার্থক্য

বর-কনের পারস্পরিক বয়স পার্থক্য ও সামঞ্জস্য সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। এ সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, সাধারণভাবে এ দুয়ের বয়সে খুব বেশি পার্থক্য হওয়া উচিত নয়। তাতে দাম্পত্য জীবনে অনেক ধরনের দুঃসমাধ্য জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এ হচ্ছে সাধারণ অবস্থার কথা। আর ইসলামে এ সাধারণ অবস্থার প্রতিই দৃষ্টি রেখে বলা হয়েছে যে, বর-কনের বয়স সাধারণত সমান-সমান হলেই ভালো হয়। নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের একটি অধ্যায় রচিত হয়েছে এ ভাষায়ঃ

بَابٌ تَزَوُّجُ الْمَرْاَةِ بِمِثْلِهَا فِىْ السِّنِّ -

সমান-সমান বয়সে বর-কনের বিয়ের অধ্যায়।

এবং এর পরে হযরত ফাতিমা (রা)-কে হযরত আলী (রা)-র নিকট বিয়ে দেয়ার প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে পিতা বা অলীকে বলা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের মেয়েকে বয়সের দিক দিয়ে সাম স্যপূর্ণ নয়, এমন লোকের কাছে বিয়ে না দেয়। এজন্যে ফিকাহ্‌বিদগণ তাগিদ করে বলেছেন ঃ

وَ لَا يُزَوِّجُ اِبْنَتَهُ الشَّابَّةَ شَيْخًا كَبِيْرًا وَ لَا رَجُلًا دَمِيْمًا -

পিতা বা অলী যেন তার যুবতী মেয়েকে খুনখুনে বুড়ো বা কুৎসিৎ চেহারার লোকের নিকট বিয়ে না দেয়।

তবে সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এ ব্যাপারেও ব্যতিক্রম হতে পারে। কেননা দুনিয়ার সব পুরুষই এক রকম হয় না। অনেক বয়স্ক লোকও এমন হতে পারে— হয়ে থাকে, যারা পূর্ণ স্বাস্থ্যবান, সামর্থ্যবান ও দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম। আর অনেক বুড়োও স্বীয় যুবতী স্ত্রীকে প্রেম-ভালোবাসা, যৌন সুখ-তৃপ্তি ও আনন্দ-উৎসাহের মাদকতায় অনেক যুবকের তুলনায় অধিক মাতিয়ে রাখতে পটু হয়ে থাকে। হযরত আয়েশার বয়স যখন ছয় বছর, তখন নবী করীম (স)-এর সাথে তাঁর বিয়ের আক্‌দ্‌ হয়েছিল এবং নবী করীম (স) তাঁকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিলেন যখন তাঁর বয়স হয়েছিল নয় বছর, একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে! আর রাসূলে করীমের বয়স ছিল এ সময় পঞ্চাশের উর্ধ্বে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এতদুভয়ের দাম্পত্য জীবনের সুখ ও আনন্দের কথা বিশ্বের সকল যুবতীর আদর্শ হয়ে রয়েছে।

কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার উপস্থিত কোনো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে যদি এরূপ কাজ করা হয়, তাহলে তার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হতে বাধ্য। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু ও বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজে এর দৃষ্টান্ত কিছু মাত্র বিরল নয়। অনেক খুনখুনে বুড়ো— যে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনে আদৌ সামর্থবান নয়, তার নিকট যুবতী মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয় বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সার বিনিময়ে, ফলে সে মেয়ে বুড়ো স্বামীর নিকট দাম্পত্য সুখলাভে বঞ্চিতা থাকে। তখন সে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করতে শুরু করে অথবা পাপের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের বিয়েকে যদিও স্পষ্ট ভাষায় হারাম করে দেয়নি, কিন্তু শরীয়তের ঘোষিত দাম্পত্য জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে অনায়াসেই বলা যায় যে, এরূপ কাজ অত্যন্ত আপত্তিকর ও অভিসম্পাতের ব্যাপার। কোনো কোনো ফিকাহ্‌বিদ অবশ্য এ ধরনের বিয়েকে হারাম মনে করেন। 'কাল্‌ইউবী' আল-মিনহাজ গ্রন্থের টীকায় লিখেছেন ঃ

وَيَصِحُّ اَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ الصَّغِيْرَةَ بِهٰؤُلَاءِ - (عجوز واعمى)

وَاِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ قَالَهُ الْجُمْهُوْرُ - (للمراة بين الفقه وَالقانون ص -٦٤)

ছোট মেয়েকে বৃদ্ধ ও অন্ধ প্রভৃতির নিকট বিয়ে দেয়া যদিও শুদ্ধ; কিন্তু এরূপ বিয়ে করা তার পক্ষে হারাম। অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদই একথা বলেছেন।

হযরত আয়েশা (রা) পূর্বে অবিবাহিত মেয়ে বিয়ে করার গুরুত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে একদা নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ للّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْنَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيْهِ شَجَرَةٌ قَدْ اُكِلَ مِنْهَا وَ وَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُوْكَلْ مِنْهَا فِىْ اَيِّهَا كُنْتَ تَرْتِعُ بِعَيْرِكَ -

হে রাসূল, আপনি যদি কোনো চারণভূমিতে জন্তু-জানোয়ার নিয়ে অবতীর্ণ হন, আর সেখানে এমন গাছ দেখতে পান, যার পাতা খাওয়া হয়ে গেছে এবং এমন গাছ পান যা থেকে এখনো কিছু খাওয়া হয়নি, তাহালে তখন আপনি আপনার উটকে কোন গাছ থেকে পাতা খাওয়াতে চাইবেন ?

এ জবাবে নবী করীম (স) বললেন ঃ

فِىْ الَّتِىْ لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا -

খাওয়াব সেই গাছ থেকে, যার থেকে এখনো কিছু খাওয়া হয়নি।

হাদীস বর্ণনাকারী নিজেই বলেন, একথার মানে তিনি নিজেই সেই গাছ, যা থেকে পূর্বে 'খাওয়া' হয়নি অর্থাৎ নবী করীম (স) কেবলমাত্র হযরত আয়েশা (রা)-কেই বাকারা (কুমারী) অবস্থায় বিয়ে করেছেন। এ বিয়ের পূর্বে তাঁর কোনো বিয়ে হয়নি, তাঁকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) একদা হযরত আয়েশাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

لَمْ يَنْكِحِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا غَيْرَكِ - (بخارى، باب نكاح الابكر)

নবী করীম (স) আপনাকে ছাড়া 'বাকারা' কুমারী অবস্থায় আর কাউকে বিয়ে করেন নি।

'বাকারা'— পূর্বে বিয়ে হয়নি এমন মেয়ে অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায়। তাকে কেউ স্পর্শ করেনি, তার ঘ্রাণ কেউ গ্রহণ করেনি, তার মুখের ও বুকের মধু কেউ ইতিপূর্বে আহরণ করে নেয়নি। সবই যথাযথ পুঞ্জীভূত রয়েছে। কাজেই এ ধরনের মেয়ে বিয়ে করার জন্যে ইসলামে উৎসাহ দান করা হয়েছে।

এজন্যে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ فَاِنَّهُنَّ اَعْذَابُ اَفْوَاهًا وَ اَنْتَقُ اَرْحَمًا وَ اَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ - (ابن ماجه)

পূর্বে বিয়ে হয়নি— এমন (বাকারা) মেয়ে বিয়ে করাই তোমাদের উচিত হবে। কেননা এ ধরনের মেয়েরা মিষ্টিমুখ ও মিষ্টভাষিণী, পবিত্র যৌনাঙ্গসমন্বিতা ও অল্পে তুষ্ট হয়ে থাকে।

হাফেয ইবনে কাইয়্যেম লিখেছেন ঃ

وَكَانَ ﷺ يُحَرِّصُ اُمَّتَهٗ عَلَى النِّكَاحِ الْاَبْكَارِ الْحَسَنَاتِ ذَوَاتَ الدِّيْنِ - (زاد المعاد :ج -٣، ص- ١٤٦)

নবী করীম (স) তাঁর উম্মতকে পূর্বে-অবিবাহিতা সুন্দরী ও দ্বীনদার স্ত্রী গ্রহণের জন্যে সব সময় উৎসাহ দিতেন।

একথা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তা হচ্ছে, বিয়ে শুদ্ধ হওয়া এবং তারই আবার হারাম হওয়া— এ দুয়ের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বুড়োদের নিকট যুবতী বা ছোট্ট বয়সের মেয়েকে বিয়ে দিলে বিয়ে শুদ্ধ হবে বটে; তবে এরূপ বিয়ে করা এ ধরনের বুড়োদের পক্ষে হারাম কাজের তুল্য হবে, এই হচ্ছে ফিকাহ্‌বিদ্‌দের পূর্বোক্ত কথার তাৎপর্য।

কিন্তু যেহেতু এ ধরনের বিয়ে হারাম হওয়া সত্ত্বেও অনেক খুনখুনে বুড়ো টাকার অহংকারে যুবতী মেয়েকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে আর অনেক গরীব পিতাও টাকার লোভে পড়ে নিজের কাঁচা বয়সের মেয়েকে বুড়ো বরের নিকট বলি দিতেও দ্বিধা বোধ করে না, তাই আইনের সাহায্যে এ কাজ বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জুড়ি গ্রহণের ব্যাপারে বর-কনের প্রতি উপদেশ

ইসলামী শরীয়তে ছেলে বা মেয়েকে তার নিজের জুড়ি গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্যে কিছু কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি জরুরী কথা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

প্রথমত বলা হয়েছে, পূর্বে অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ে বাছাই করে নিতে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, নবী করীম (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ هَلْ نَكَحْتَ —তুমি কি বিয়ে করেছ ? জবাবে আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সাইয়েবা' না 'বাকারা'— মানে পূর্বে-বিবাহিতা মেয়ে বিয়ে করেছ, না পূর্বের অবিবাহিতা কোনো মেয়ে ? তখন আমি বললাম, 'সাইয়েবা' বিয়ে করেছি। তখন তিনি বললেন ঃ

فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ -

বাকারা অর্থাৎ কোনো পূর্বে-অবিবাহিতা মেয়েকে কেন বিয়ে করলে না ? তাহলে তুমি তাকে নিয়ে আনন্দের খেলায় মত্ত হতে পারতে, আর সেও তোমাকে নিয়ে।

মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীসটির ভাষা ঃ

فَهَلَّا بِكْرٌ اتُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا -

'বাকারা' মেয়ে বিয়ে করলে না কেন ? তাহলে পারস্পরিক আনন্দ-স্ফূর্তি ও হাসি খুশীতে জীবন কাটাতে পারতে।

এ কথার জবাবে হযরত জাবির 'সাইয়েবা' বিয়ে করার কারণ রাসূলের খেদমতে বর্ণনা করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, রাসূলে করীম (স) সাধারণত এমন মেয়ে বিয়ে করাই পছন্দ করেন, যার পূর্বে কোনো বিয়ে হয়নি। আরবী ভাষায় 'বাকারা' বা 'বাকেরা' বলা হয় এমন মেয়েকে ঃ

اَلَّتِىْ لَمْ يُسْبَقْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا وَطْئٌ - (بلوغ الامانى :ج -١٦، ص -١٤٦)

যার পূর্বে বিয়ে হয়নি, কেউ তার স্বামী হয়নি এবং কারোর সাথেই হয়নি কোনো যৌন সম্পর্ক স্থাপন।

আর 'সাইয়েবা' হচ্ছে এর বিপরীত অর্থাৎ যার বিয়ে হয়েছিল। যার স্বামী ছিল এবং তার সাথে যৌন সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল।

তার মানে হচ্ছে দ্বীনদারীর সঙ্গে রূপ ও সৌন্দর্যের লাভের জন্যে চেষ্টা করাও আবশ্যক।

কিন্তু উপরের কথা থেকে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মেয়েকে বিয়ে করা বুঝি ইসলামের দৃষ্টিতে অনুচিত বা নাজায়েয। কেননা তা আদৌ ঠিক নয়। নবী করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই বিধবা ও পরিত্যক্তা মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে শান্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করেছেন।

বিশেষত প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধার দৃষ্টিতে অনেক সময় 'বাকারা' মেয়ের পরিবর্তে 'সাইয়েবা' মেয়েকে বিয়ে করা অধিকতর যুক্তিবহ। রাসূলে করীম (স)-এর কাছ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া

গিয়েছে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহর ব্যাপারটিই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে যখন রাসূলে করীম (স) বিয়ে করেছ কিনা এং কি ধরনের মেয়ে বিয়ে করেছ জিজ্ঞেস করলেন তখন জবাবে তিনি বললেন, 'সাইয়েবা'— 'পূর্ব-বিবাহিতা মেয়ে।' রাসূলে করীম (স) এ ব্যাপারে কিছুটা আপত্তি ও নিরুৎসাহ প্রকাশ করলে তখন তার কারণ প্রদর্শনস্বরূপ হযরত জাবির (রা) বললেন ঃ

قُتِلَ أَبِىْ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ وَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلٰكِنْ إِمْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتُقِيْمُ عَلَيْهِنَّ - (مسند احمد مع بلوغ الامانى : ج -١٦، ص- ١٤٧)

আমার পিতা ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং রেখে গেছেন সাতটি কন্যা। এমতাবস্থায় তাদের সাথে এনে এমন আর একটি মেয়েকে একত্র করা আমি পছন্দ করিনি, (যে হবে সংসার-অনভিজ্ঞা, যে নিজ হাতে কাজ কর্ম করবে না— করতে পারবে না। বরং দরকার ছিল এমন এক বয়স্কা মেয়েলোকের, যে তাদের (পিতার কন্যাদের) চুল আঁচড়ে দেবে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ-কর্ম করে দেবে।

এ বিবরণ শুনে নবী করীম (স) বললেন ঃ أَصَبْتَ 'তুমি ঠিকই করেছ।' অপর এক বর্ণনায় রাসূলের জবাব ছিল ঃ نَعَمْ - مَا رَأَيْتَ 'হ্যাঁ, তুমি যা ভালো মনে করেছ তা ঠিকই হয়েছে।' (মুসনাদে আহমাদ)

নবী করীম (স) বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এই পর্যায়ে আর একটি উপদেশ দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে অধিক সন্তানবতী ও অধিক প্রেমময়ী মেয়েলোক বিয়ে করা।

এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ

إِنِّىْ أَصَبْتُ إِمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَ إِنَّهَا لَا تَلِدُ فَأَتَزَوَّجُهَا ؟

উচ্চ বংশজাত ও সুন্দরী একটি মেয়ে পেয়েছি, কিন্তু দোষ হচ্ছে এই যে, সে সন্তান প্রসব করে না (বন্ধা), তাকে কি আমি বিয়ে করব ?

জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ 'না।' লোকটি তার পরও দুই-তিনবার এসে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে এবং প্রত্যেকবারই তিনি নিষেধ করেন। শেষবারে রাসূল (স) বললেন ঃ

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ وَالْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ - (ابوداؤد، نسائى)

তোমরা বিয়ে করবে প্রেম-ভালোবাসাময়ী ও অধিক সন্তানবতী মেয়েলোককে। কেননা আমি তোমাদের বিপুল সংখ্যা নিয়ে গৌরব করব।

অপর একটি বর্ণনায় রাসূলের কথাটির ভাষা এই ঃ

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (فقه السنة)

তোমরা বিয়ে করো অধিক প্রেম-প্রীতিসম্পন্না ও বেশি সংখ্যক সন্তান দাত্রী মেয়ে। কেননা আমি কেয়ামতের দিন অন্যান্য নবীর মুকাবিলায় তোমাদের বিপুল সংখ্যা নিয়ে গৌরব করব।

বিয়ের মতামত জ্ঞাপনের অধিকার

বিয়ের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়ার যে ব্যবস্থা ইসলামে করা হয়েছে, তা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে পুরুষের পক্ষে ভাবী স্ত্রী এবং মেয়েদের পক্ষে ভাবী স্বামীকে বাছাই করার— মনোনীত করার স্থায়ী অধিকার রয়েছে। কুরআন মজীদে পুরুষদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ - (النساء : ٣)

অনন্তর তোমরা বিয়ে করো যেসব মেয়েলোক তোমাদের জন্যে ভালো হবে ও ভালো লাগবে।

আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী লিখেছেন ঃ

اَىْ مَنْ طِبْنَ لِنُفُوْسِكُمْ مِّنْ جِهَةِ الْجَمَالِ وَالْحُسْنِ اَوِ الْعَقْلِ اَوِالصَّلَاحِ مِنْهُنَّ -

(محاسن التا ويل : ج -٤، ص -١١٠٤)

অর্থাৎ রূপ-সৌন্দর্য, জ্ঞান-বুদ্ধি ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও কল্যাণ ক্ষমতার দিক দিয়ে যে সব মেয়ে তোমাদের নিজেদের জন্যে ভালো বিবেচিত হবে— মনমতো হবে, তোমরা তাদের বিয়ে করো।

অথবা এর অর্থ ঃ

فَانْكِحُوا الطَّيِّبَاتِ لَكُمْ - (الكشاف : ج -١، ص- ٢٤٢)

তবে বিয়ে করো সেসব মেয়ে, যারা তোমাদের জন্যে পাক-পবিত্র, যারা তোমাদের জন্যে হালাল, নিষিদ্ধ নয়, যারা তোমাদের জন্যে হবে কল্যাণকর ও পবিত্র।

এ আয়াতে বিয়ের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত বিয়ে করবে সেসব মেয়েলোক, যা হালাল, মুহাররম নয়। কেননা কতক মেয়েলোককে যেমন রক্তের সম্পর্কের নিকটাত্মীয়া ও ভিন্ন ধর্মের মেয়েলোক— বিয়ে করা শরীয়াত স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ তাদের ছাড়া প্রায় সব মেয়েলোকই এমন যাদের মধ্য থেকে যে-কাউকে বিয়ে করা যেতে পারে।

আর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এই যে, বিয়ের জন্যে একটি মেয়েলোক হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং তাকে অবশ্য দুটি দিক দিয়ে যোগ্য হতে হবে। প্রথম দিক এই যে, সে নিজে হবে পবিত্র, চরিত্রবতী, কল্যাণময়ী। সর্বদিক দিয়ে ভালো। আর দ্বিতীয় দিক এই যে, যে পুরুষ তাকে বিয়ে করবে, তার জন্যেও সে হবে প্রেমময়ী, কল্যাণময়ী সর্বগুণে গুণান্বিতা ও তার মনমত মনোনীত। এ ধরনের মেয়ে বাছাই করে বিয়ে করারই নির্দেশ দেয়া হয়েছে উপরোক্ত আয়াতে। আর এসব কথা নিহিত রয়েছে আয়াতের مَاطَابَ لَكُمْ শব্দের মধ্যে। অন্যথায় শুধ فَانْكِحُوْا النِّسَاءَ —'মেয়েলোক বিয়ে করো' বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। এ জন্যে শায়খ মুহাম্মদ নববী এ আয়াতের তাফসীর লিখেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

اَىْ فَتَزَوَّجُوْا مَنِ اسْتَبْطَأَ بَتْهَا نُفُوْسُكُمْ وَمَالَتْ اِلَيْهَا قُلُوْبُكُمْ مِنَ الْاَجْنَبِيَاتِ -

(تفسير مراح لبيد : ج -١،ص -١٣٩)

অর্থাৎ অপরিচিতা বা সম্পর্কহীনা মেয়েলোকদের মধ্যে যাদের প্রতি তোমাদের মন আকৃষ্ট হয় এবং যাদের পেলে তোমাদের দিল সন্তুষ্ট, আনন্দিত হবে ও যাদের ভালো বলে গ্রহণ করতে পারবে, তোমরা তাদেরকেই বিয়ে করো।

উপরন্তু বিভিন্ন তাফসীরে এ আয়াতটির নাযিল হওয়ার যে উপলক্ষ বর্ণিত হয়েছে, সে দৃষ্টিতেও আয়াতটির উপরোক্ত অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ আয়াতের শানে নুজুল হচ্ছে— লোকেরা বাপ-দাদার লালিতা-পালিতা ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে করত শুধু তাদের রূপ-যৌবন ও ধন-মালের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। ফলে বিবাহিত জীবনে তার প্রতি দেখাত মনের বিরাগ, উপেক্ষা ও অযত্ন। কেননা মেয়েটিকে মনের আকর্ষণে ও ভালো লাগার কারণে বিয়ে করা হয়নি, করা হয়েছে অন্যসব জিনিস— রূপ, যৌবন ও ধনমাল সামনে রেখে, সেগুলো অবাধে ভোগ করার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে। এ কারণে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি যে জুলুম ও অবিচার হতো, তারই নিরসন ও বিদূরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এ

নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই যাকে বিয়ে করা হচ্ছে, তার নিজস্ব গুণ-গরিমার কারণেই তাকে বিয়ে করা উচিত। অপর কোনো লক্ষ্য থাকা উচিত নয় বিয়ের পেছনে। বস্তুত নিছক টাকা পয়সা লাভ কিংবা একজন নারীর নিছক রূপ-যৌবন-ভোগের লালসায় পড়ে যেসব বিয়ে সংঘটিত হয়, তা কিছু কাল যেতে না যেতেই কিংবা লক্ষ্যবস্তুর ভোগ-সম্ভোগে তৃপ্তি লাভের পরই সে বিয়ে ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। এর বাস্তব দৃষ্টান্তের কোনো অভাব নেই আমাদের সমাজে।

পূর্বেই বলেছি, কনে বাছাই করার যে অধিকার এ আয়াতে পুরুষদের দেয়া হয়েছে, তা কেবল পুরুষদের জন্যেই একচেটিয়া অধিকার নয়। বরং পুরুষদের ন্যায় কনেরও অনুরূপ অধিকার রয়েছে ‘বর’ বাছাই করার। দুনিয়ার সব জিনিসই— দু’চার পয়সার পণ্যদ্রব্য— যখন ভালো করে তাড়িয়ে-বাজিয়ে ও ছাঁটাই-বাছাই করে খরিদ করা হয়, তখন বিয়ের মতো একটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সারা জীবনের ব্যাপার খুব সহজেই সম্পন্ন হওয়া ও হতে দেয়া উচিত হতে পারে না। বরং যথাসম্ভব জানা-শুনা করে, খবরা খবর নিয়ে দেখে-শুনে ও ছাঁটাই-বাছাই করেই এ কাজ সম্পন্ন হওয়া নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর। আর এর অধিকার কেবল পুরুষদেরই একচেটিয়াভাবে হতে পারে না। এ অধিকার তাদের ন্যায় নারীদেরও অবশ্যই থাকতে হবে এবং ইসলাম তা দিয়েছে। পুরুষ যেমন নিজের দিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করবে কনেকে, তেমনি কনেরও উচিত অনুরূপভাবে বুঝে-শুনে একজনকে স্বামীরূপে বরণ করা। এজন্যে বিবাহেচ্ছু নর-নারীর ইচ্ছা, পছন্দ ও মনোনয়ন এবং সন্তোষে অভিমত বা সমর্থন ব্যক্ত করার গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। ইসলামী শরীয়তেও উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েকে অন্যান্য কাজের ন্যায় বিয়ের ব্যাপারেও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। পিতামাতা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয় লেকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ অবশ্যই দেবে; কিন্তু তাদের মতই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ও একমাত্র শক্তি (only factor) হতে পারে না। তারা নিজেদের ইচ্ছেমতোই ছেলেমেয়েদেরকে কোথাও বিয়ে করতে বাধ্য করতেও পারে না। বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে তাদের সুস্পষ্ট মত ছাড়া সম্পন্ন হতেই পারে না। নবী করীম (স) এই পর্যায়ে যে ঘোষণা দিয়েছেন তা যেমন খুব স্পষ্ট, তেমনি অত্যন্ত জোরালো।

তিনি বলেছেন ঃ

لَا تُنْكَحُ الْاَيِمُّ حَتّٰى تُسْتَاْ مَرَ وَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تَسْتَاذَنَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا

قَالَ اَنْ تَسْكُتَ - (بخارى، مسلم)

পূর্বে বিবাহিত এখন জুড়িহীন ছেলেমেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে এবং পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে স্পষ্ট অনুমতি পাওয়া যাবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, “হে রাসূল, তার অনুমতি কিভাবে পাওয়া যাবে” ? তখন তিনি বললেন, জিজ্ঞেস করার পর তার চুপ থাকাই তার অনুমতি।

এ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْوَلِىَ لَا يُجْبِرُ الثَّيِّبَ وَ لَا الْبِكْرَ عَلَى النِّكَاحِ فَالثَّيِّبُ تُسْتَاْمَرُ وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ -

(عينى :ج - ٢،ص- ١٢٨)

অলী পূর্বে বিবাহিত ও অবিবাহিত ছেলেমেয়েকে কোনো নির্দিষ্ট ছেলেমেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারে না। অতএব পূর্বে বিবাহিত ছেলেমেয়ের কাছ থেকে বিয়ের জন্যে রীতিমত আদেশ পেতে হবে এবং অবিবাহিত বালেগ ছেলেমেয়ের কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি নিতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে এতদূর বলেছেন যে, কোনো পূর্ণ বয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্না মেয়ে অলীর অনুমতি ব্যতিরেকেই নিজ ইচ্ছায় কোথাও বিয়ে করে বসলে সে বিয়ে অবশ্যই

শুদ্ধ হবে। যদিও ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে অলীর অনুমতির অপেক্ষায় সে বিয়ে মওকুফ থাকবে। আর ইমাম শাফিয়ী, মালিক ও আহমাদ বলেছেন ঃ

لَايَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ اَصْلًا -

কেবলমাত্র মেয়ের অনুমতিতেই বিয়ে সম্পন্ন হতে পারে না।

কেননা রাসূলে করীম (স) অন্যত্র বলেছেন ঃ

لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ -

অলীর অনুমতি ছাড়া বিয়েই হতে পারে না।

কিন্তু পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা তাদের এ মত খণ্ডিত হয়ে যায়। বিশেষত এই শেষোক্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম বুখারী ও ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন ঃ

لَمْ يَصِحَّ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ يَغْنِىْ فِىْ اِشْتِرَاطِ الْوَلِى -

অলীর মত ছাড়া বিয়ে হতে পারে না। এ ধরনের শর্তের কোনো হাদীসই সহীহ্ নয়।

আর তিরমিযী শরীফে এই পর্যায়ে যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -

(عينى : ج -٢٠، ص- -١٢)

যে মেয়েলোকই অলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে, তার বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল।

এ হাদীসটি ইমাম জুহরী থেকে বর্ণিত হয়েছে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে শুদ্ধ নয়। এ হাদীস সম্পর্কে ইবনে জুরাইজ মুহাদ্দিস ইমাম জুহ্‌রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি জবাবে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে অস্বীকার করেছেন। এ কারণে এ হাদীস শুদ্ধ নয় এবং এর ভিত্তিতে ছেলেমেয়ের বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অলীর অনুমতিকে শর্ত করা ও তাছাড়া বিয়ে হতে পারে না বলে মত ঠিক করা বা ফতোয়া দেয়া কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইমাম 'তিরমিযী' যদিও এ হাদীসটিকে উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ هذا حديث حسن 'এ খুবই উত্তম হাদীস' কিন্তু মূল বর্ণনাকারী ইমাম জুহরীই যখন এ হাদীসটিকে অস্বীকার করেছেন, তখন এ নিয়ে কোনো কথা বলা ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।

এ হাদীসের সমর্থনে মুসলিম শরীফে আরো অন্তত দুটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তা হচ্ছে ঃ

اَ لْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُسْتَاْذَنُهَا فِىْ نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا - (مسلم)

পূর্বে বিবাহিত ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের বিয়ে সম্পর্কে মত জানানোর ব্যাপারে তাদের অলীর চেয়েও বেশি অধিকারসম্পন্ন। আর পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিকট তাদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামত অবশ্যই জানতে চাওয়া হবে এবং তাদের চুপ থাকাই তাদের অনুমতির নামান্তর।

আর দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে ঃ

اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَاْذِ نُهَا اَبُو هَا وَاِذْا نُهَا صُمَاتُهَا - (مسلم)

পূর্বে বিবাহিত ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের বিয়েতে মত জানানোর ব্যাপারে তাদের অলী অপেক্ষাও বেশি অধিকার রাখে। আর পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিকট তাদের পিতা বিয়ের মত জানতে চাইলে, তবে তাদের চুপ থাকাই তাদের অনুমতিজ্ঞাপক।

হাদীসসমূহের ভাষা, শব্দ, সুর ও কথা বিশেষ লক্ষণীয়। বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীলোকদেরকে মতামত জ্ঞাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন নি; বরং তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছ, পছন্দ-অপছন্দ ও মতামতকে পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাদের মরজী ছাড়া কোনো পুরুষের সাথে জবরদস্তি তাদের বিয়ে দেয়া ইসলামী শরীয়তে আদৌ জায়েয নয়।

এ ব্যাপারে অলী-গার্জিয়ানদের কর্তব্য হচ্ছে ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামত জেনে নেয়া এবং তারপরই বিয়ের কথাবার্তা চালানো বা চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

কিন্তু ইসলামে যেখানে মেয়ের মতের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে, সেখানে তাদের স্বাভাবিক লজ্জা-শরমকেও কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ন হতে দেয়া হয়নি। এজন্যে পূর্বে বিয়ে হয়নি— এমন মেয়ের (বাকারার) অনুমতি দানের ক্ষেত্রে চুপ থাকাকেও 'মত' বলে ধরে নেয়া হয়েছে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী লিখেছেন ঃ

وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ لَايَجُوْزُ لِلْوَلِيِّ اِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ وَاِذَا اسْتَاذَا نَهَا فَسَكَتَتْ اَوْضَحِكَتْ فَهُوَ اِذْنٌ - (المسوى: ج -١، ص -١٠٦)

ইমাম আবূ হানীফার মতে পূর্বে-অবিবাহিতা পূর্ণ বয়স্কা মেয়েকে অলীর মতে বিয়ে করতে বাধ্য করা অলীর পক্ষে জায়েয নয়। তাই তার কাছে যখন অনুমতি চাওয়া হবে, তখন যদি সে চুপ থাকে কিংবা হেসে ওঠে তাহলে তার মত আছে ও অনুমতি দিচ্ছে বলে বোঝা যাবে।

কিন্তু পূর্বে বিয়ে হওয়া (সাইয়েবা) মেয়ের পুনর্বিবাহের প্রশ্ন দেখা দিলে তখন সুস্পষ্ট ভাষায় তার কাছ থেকে এজন্যে আদেশ পেতে হবে।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

اِنَّهَا اَحَقُّ اَى شَرِيْكَةٌ فِى الْحَقِّ بِمَعْنٰى اَنَّهَا لَاتُجْبَرُ وَهِىَ اَيْضًا اَحَقُّ فِىْ تَعْيِيْنِ الزَّوْجِ - (نبوى :ج -١، ص -٤٥٥)

পূর্বে বিবাহিতা মেয়ে মত জানাবার ব্যাপারে বেশি অধিকারসম্পন্না— এ কথার অর্থ এই যে, মত জানানোর অধিকারে সেও শরীক রয়েছে। আর তার মানে, তাকে কোনো বিয়েতে রাজি হতে জোর করে বাধ্য করা যাবে না; স্বামী নির্বাচন নির্ধারণে সে-ই সবচেয়ে বেশি অধিকারী।

এ ব্যাপারে মেয়ের মতের গুরুত্ব যে কতখানি, তা এক ঘটনা থেকে স্পষ্ট জানতে পারা যায়। হযরত খানসা বিনতে হাজাম (রা)-কে তাঁর পিতা এক ব্যক্তির নিকট বিয়ে দেন। কিন্তু এ বিয়ে খানসার পছন্দ হয় না। তিনি রাসূলের দরবারে হাযির হয়ে বললেন ঃ

اِنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ - (بخارى)

তাঁর পিতা তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন, তিনি পূর্ব বিবাহিত; তিনি এ বিয়ে পছন্দ করেন না।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ঃ فَرَدَّ نِكَاحَهَا রাসূলে করীম (স) তাঁর এ কথা শুনে তাঁর বিয়ে প্রত্যাহার ও বাতিল করে দেন।

ইমাম আবদুর রাজ্জাক এ ঘটনাটিকে অন্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা হচ্ছে, একজন আনসারী খান্‌সাকে বিয়ে করেন। তিনি ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হন, অতঃপর তাঁর বাবা তাঁকে অপর এক ব্যক্তির নিকট বিয়ে দেন। তখন তিনি রাসূলের দরবারে হাযির হয়ে বললেন ঃ

اِنَّ اَبِىْ اَنْكَحَنِىْ وَ اِنَّ عَمَّ وَلَدِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ -

আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিয়েছেন অথচ আমার সন্তানের চাচাকেই আমি অধিক ভালোবাসি (তার সাথেই আমি বিয়ে বসতে চাই)।

তখন নবী করীম (স) তাঁর বিয়ে ভেঙ্গে দেন।

এ পর্যায়ে আর একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। হযরত জাবির বলেন ঃ

اِنَّ رَجُلًا زَوَّجَ اِبْنَتَهُ بِكْرًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا - (نسائی)

এক ব্যক্তি তার 'বাকেরা' মেয়েকে বিয়ে দেন তার বিনানুমতিতে। পরে সে নবী করীমের নিকট হাজির হয় ও অভিযোগ দায়ের করে। ফলে নবী করীম (স) তাদের বিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَنْكَحَهَا اَبُوْ هَاوَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - (ابوداؤد، ابن ماجه)

একটি পূর্বে-অবিবাহিতা মেয়েকে তার পিতা এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল, যাকে সে পছন্দ করে না। পরে রাসূলে করীম (স) সে মেয়েকে বিয়ে বহাল রাখা না-রাখা সম্পর্কে পূর্ণ ইখতিয়ার দান করেন।

অপর একটি ঘটনা থেকে জানা যায়, চাচাতো ভাইয়ের সাথে পিতা কর্তৃক বিয়ে দেয়া কোনো মেয়ে রাসূলের দরবারে হাযির হয়ে বলল ঃ

اِنَّ اَبِيْ زَوَّجَنِيْ اِبْنَ اَخِيْهِ يَرْفَعُ بِيْ خَسِيْسَتَهُ -

আমার পিতা আমাকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। সে নীচ শ্রেণীর লোক; আমাকে বিয়ে করে তার নীচতা দূর করতে চায়।

এ অবস্থায় রাসূলে করীম (স) তাকে বিয়ে বহাল রাখা না-রাখার স্বাধীনতা দান করেন। তারপরে মেয়েলোকটি বলে ঃ

فَاِنِّيْ قَدْ اَجَزْتُ مَا صَنَعَ اَبِيْ-

আমি তো পিতার করা বিয়েতেই অনুমতি দিয়েছি।

কিন্তু তবু এ অভিযোগ নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হলো ঃ

وَلٰكِنَّ اَرَدْتُ اَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ اَنَّ لَيْسَ لِلْاٰبَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ - (مسند احمد، ابن ماجه)

আমি চাই যে, মেয়েলোকেরা একথা ভালো করে জেনে নিক যে, বিয়ের ব্যাপারে বাপদের কিছুই করণীয় নেই।

এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বয়স্কা মেয়েদের বিয়েতে তাদের নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও পছন্দ-অপছন্দ হচ্ছে শেষ কথা। পিতা বা কোনো অলীই কেবল তাদের নিজেদেরই ইচ্ছায় বিয়ে করতে কোনো মেয়েকে বাধ্য করতে পারে না। এজন্যে রাসূলে করীম (স) সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

اِسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِيْ اَبْضَاعِهِنَّ - (مسند احمد :ج -٢٠، ص- ١٥٨)

মেয়েদের বিয়েতে তাদের কাছ থেকে তোমরা আদেশ পেতে চেষ্টা করো।

ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারেও এই নির্দেশই প্রযোজ্য ও কার্যকর। হাদীসে এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِيْ نَفْسِهَا فَاِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ اَذِنَتْ وَاِنْ اَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ - (مسند احمد : ج -٢٦، ص- ١٥٨)

ইয়াতীম মেয়ের কাছ থেকে তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে স্পষ্ট আদেশ পেতে হবে। জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি চুপ থাকে, তবে সে অনুমতি দিয়েছে বলে বুঝতে হবে। আর সে যদি অস্বীকার করে, তবে তাকে জোরপূর্বক বাধ্য করা যাবে না।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَاتُنْكَحُ الْيَتِيْمَةُ اِلَّا بِاِذْنِهَا - (ابودؤد)

ইয়াতীম মেয়েকে তার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেয়া যেতে পারে না।

এ হলো সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ইসলামের মৌলিক বিধান ও দৃষ্টিকোণ। নারী পুরুষের জীবনের বৃহত্তর ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বিয়ে। ইসলাম তাতে উভয়কে যে অধিকার ও আজাদি দিয়েছে, তা বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিপুল অবদান, সন্দেহ নেই। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান অধঃপতিত ও বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজে ছেলেমেয়েদের এ অধিকার ও আজাদি বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। এর অপর একটি দিক বর্তমানে খুবই প্রাবল্য লাভ করেছে। আধুনিক ছেলেমেয়েরা তাদের বিয়ের ব্যাপারে বাপ-মা-গার্জিয়ানদের কোনো তোয়াক্কাই রাখে না। তাদের কোনো পরোয়াই করা হয় না। 'বিয়ে নিজের পছন্দেই ঠিক' এ কথার সত্যতা অস্বীকার করা হচ্ছে না, তেমনি একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আধুনিক যুবক-যুবতীরা যৌবনের উদ্দাম স্রোতের ধাক্কায় অবাধ মেলামেশার গড্ডালিকা প্রবাহে পড়ে দিশেহারা হয়ে যেতে পারে এবং ভালো-মন্দ, শোভন-অশোভন বিচারশূন্য হয়ে যেখানে-সেখানে আত্মদান করে বসতে পারে। তাই উদ্যম-উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ বিচার-বিবেচনারও বিশেষ প্রয়োজন। কেননা বিয়ে কেবলমাত্র যৌন প্রেরণার পরিতৃপ্তির মাধ্যম নয়; ঘর, পরিবার, সন্তান, সমাজ, জাতি ও দেশ সর্বোপরি নৈতিকতার প্রশ্নও তার সাথে গভীরভাবে জড়িত। তাই বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়ের পিতা বা অলীর মতামতের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। ইমাম নববী উপরোক্ত হাদীসের ব্যখ্যায় যে মত দিয়েছেন, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ لَفْظَةَ اَحَقُّ هنَا لِلْمُشَارَكَةِ مَعْنَاهُ اِنَّ لَهَا فِيْ نَفْسِهَا فِى النِّكَاحِ حَقًّا وَلِوَلِيِّهَا حَقًّا وَحَقُّهَا اَوْكَدُ مِنْ حَقِّهِ فَاِنَّهُ لَوْ اَرَادَ تَزْوِيْجَهَا كُفُوًا وَامْتَنَعَتْ لَمْ تُجْبَرْ وَلَوْ اَرَادَتْ اَنْ تَتَزَوَّجَ كُفُوًا فَامْتَنَعَ الْوَلِىُّ اُجْبَرَ -

(نبوى : ج -١، ص -٤٥٥)

হাদীসে উক্ত 'সবচেয়ে বেশি অধিকারী' কথাটিতে শরীকদারী রয়েছে। তার মানে, মেয়ের নিজের বিয়ের ব্যাপারে যেমন তার অধিকার রয়েছে, তেমনি তার অলীরও অধিকার রয়েছে। তবে পার্থক্য এই যে, মেয়ের অধিকার অলীর অধিকার অপেক্ষা অধিক তাগিদপূর্ণ ও কার্যকর। তাই অলী যদি কোনো কুফু'তেও মেয়ের বিয়ে দিতে চায়, আর সে মেয়ে তা গ্রহণ করতে রাজি না হয়, তাহলে তাকে জোর করে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু মেয়ে নিজে যদি কোনো কুফু'তে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে; কিন্তু অলী তাতে বাধ্য না হয়; তাহলে অলী তাকে তা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে পারে।

কেননা সাধারণত অলী-পিতা-দাদা নিজেদের ছেলেমেয়ের কখনো অকল্যাণকামী হতে পারে না। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পিতামাতার মতের গুরুত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না।

মতবিরোধের মীমাংসা

ইমাম নববীর উপরে উদ্ধৃত কথার শেষাংশ অবশ্য পূর্ব-বিবাহিত ছেলেমেয়ের ব্যাপারে স্বীকার করে নেয়া মুশকিল। অলীর মতে ও ছেলেমেয়ের মতে বিয়ের ব্যাপারে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে তখন অলীর মতের ওপর ছেলেমেয়ের মতকেই প্রধান্য দেয়া যুক্তিযুক্ত— যদি তা ভালো পাত্র বা

পাত্রীর সাথে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। কেননা বিয়ে হচ্ছে তার, অলীর নয়। আর বিয়ের বন্ধনজনিত যাবতীয় দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হবে, অলীকে নয়। কুরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। বলা হয়েছে ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - (البقرة : ٢٣٤)

তাদের ইদ্দত পূর্ণ হলে পরে তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে শরীয়ত মুতাবিক ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, সেজন্যে তোমরা— অলী-গার্জিয়ানদের কিংবা সমাজপতিদের কোনো দায়িত্ব নেই (কিছুই করণীয় নেই)।

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

اِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْاَةُ اَوْمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا اَنْ تَتَزَيَّنَ وَ تَتَصَنَّعَ وَ تَعَرَّضَ لِلتَّزْوِيْجِ - (الفتح القدير : ج- ١، ص -٢٢٣)

যখন কোনো মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হবে কিংবা তার স্বামী মারা যাওয়ার কারণে বিধবা হবে, তখন ইদ্দত উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সে যদি সুসাজে সজ্জিতা হয়, দেহে রং লাগায়, আর বিয়ের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ও কথাবার্তা চালায়, তবে তাতে তার কোনো দোষ হবে না।

এ আয়াত পূর্বে-বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের তাদের নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে শরীয়ত মুতাবেক যে-কোনো স্থানে, যে কোনো পাত্রের সাথে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করার অধিকার দিচ্ছে।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান তাঁর তাফসীরে এ আয়াতের নীচে লিখেছেন ঃ

وَاحْتَجَّ اَصْحَابُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ لِاَنَّ اِضَافَةَ الْفِعْلِ اِلَى الْفَاعِلِ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْمُبَاشِرَةِ - (فتح البيان : ج -١، ص : ٣٠٨)

ইমাম আবূ হানীফার সঙ্গী-সাথী ও তাঁর মাযহাবের আলেমগণ এই আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন যে, অলী ছাড়াও বিয়ে হতে পারে। কেননা আয়াতে 'মেয়েরা যে কাজ করে' বলা হয়েছে। তার মানে, শরীয়ত মুতাবেক যে-কোনো 'কাজ' করার তাদের জন্যে অনুমতি আছে।

আল্লামা ইবনে রুশদ লিখেছেন ঃ

وقال ابو حنيفة وزفر والشعبى والزهرى اذا عقدت المرأة نكا حها بغير ولى وكان كفواجار -
(بداية المجتهد : ج -٢، ص -٨)

ইমাম আবূ হানীফা, যুফর, শা'বী ও জুহ্‌রী বলেছেন ঃ একজন মেয়েলোক যখন তার বিয়ে অলী ছাড়াই সম্পন্ন করে ফেলে এবং তা কুফু অনুযায়ী হয় তবে তা অবশ্যই জায়েয বিয়ে হবে।

এমতাবস্থায় দুই ধরনের দলীলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের পন্থা এই হতে পারে যে, যেসব হাদীসে 'অলী ছাড়া বিয়ে হতেই পারে না' বলা হয়েছে, তার মানে হবে ঃ

لَا نِكَاحَ عَلٰى وَجْهِ الْمَسْنُوْنِ -

সুন্নত তরীকা মতো বিয়ে অলীর মত ছাড়া হতে পারে না।

আর যেসব দলীল থেকে প্রমাণিত হয় যে, মেয়ের নিজের ইচ্ছায় বিয়েতে অলী বাধা দিতে পারে, তার মানে হবে সেই বিয়ে, যা মেয়ে করতে চাইবে কুফু'র বাইরে। মওলানা সানাউল্লাহ্ পানীপতি লিখেছেন ঃ

فثبت بهذا ان مباشرة المرأة غيرقا دحة فى النكاح انما القادح حق الولى المستفاد من قوله صلى الله عيه وسلم الايم احق بنفسها من وليها وحق الولى الاعتراض فى غير الكفو دفعا للعار -

(تفسير المظهرى : ج -١، ص- ٣١٩)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের ব্যাপারে পূর্বে বিবাহিতা মেয়ের মতের প্রতিবন্ধক কিছু হতে পারে না। প্রতিবন্ধক হতে পারে কেবল অলীর অধিকার, যা রাসূলের হাদীস 'পূর্ব-বিবাহিতা মেয়েরা তাদের নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার অলীর তুলনায় অধিক অধিকারী' থেকে জানা গেছে। আর অলীর অধিকার হচ্ছে কুফূ'র বাইরে বিয়ে হতে থাকলে শুধু আপত্তি জ্ঞাপন, যেন সামাজিক লজ্জা অপমান থেকে বাঁচা যায়।

তাহলে সুষ্ঠুরূপে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার একমাত্র পথ এই যে, অলী নিজেই মেয়ের বিয়ের জন্যে উদ্যোগী হবে। মেয়ের নিজস্ব কোনো মত— কোনো দৃষ্টি যদি থাকে, আর তাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তির কারণ না থাকে, তাহলে সে অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন করে দেবে। কোনো ছেলের সাথে বিয়েতে রাজি না হলে তার ওপর কোনো প্রকারেই জোর প্রয়োগ করা চলবে না। প্রসিদ্ধ ফিকাহ্‌বিদ ইমাম সরখ্‌সী রচিত 'আল-মব্‌সূত' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে ঃ

বিয়ের সময় মেয়ের অনুমতি নিতে হবে। কেননা তার কোনো অভ্যন্তরীণ রোগ বা দৈহিক কোনো অসুবিধা থাকতে পারে। অথবা তার মন অন্য কারো দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে। এরূপ অবস্থায় তার মত না নিয়ে বিয়ে দিলে সে তার স্বামীর ঘর সুষ্ঠুরূপে করতে পারবে না। তখন সে মেয়ে বিপদে পড়ে যাবে, কেননা তার মন অন্যত্র বাধা রয়েছে। আর প্রেমের রোগ অপেক্ষা বড় রোগ কিছু হতে পারে না। (৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৭)

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্‌লভী এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

اِعْلَمْ اَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ اَنْ يُّحْكَمَ فِى النِّكَاحِ النِّسَاءَ خَاصَّةً لِنُقْصَانِ عَقْلِهِنَّ وَسُوْءِ فِكْرِهِنَّ فَكَثِيْرٌ مَّا لَا يَهْتَدِيْنَ الْمُصْلِحَةَ وَلِعَدَمِ حِمَايَةِ الْحَسَبِ مِنْهُنَّ غَالِبًا فَرُبَّمَا رَغِبْنَ فِىْ غَيْرِ الْكُفَّ وَفِىْ ذٰلِكَ عَارٌ عَلٰى قَوْمِهَا فَوَجَبَ اَنْ يُّجْعَلَ لِلْاَ وْلِيَاءِ شَىْءٌ مِّنْ هٰذَا الْبَابِ لِتَسُدَّ الْمُفْسِدَةُ - (حجة البالغة : ج-٢)

জেনে রাখো, বিয়ের ব্যাপারে কেবলমাত্র মেয়েদেরকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী বানানো সঙ্গত নয়। কেননা তাদের বুদ্ধি অসম্পূর্ণ, চিন্তা-বিবেচনা দুর্বল। অনেক সময় তারা ভালো দিকটি জানতেই পারে না। সামাজিক মর্যাদার দিকেও তাদের প্রায়ই লক্ষ্য থাকেনা। তাতে করে অনেক সময় তারা অনুপযুক্ত ক্ষেত্রেই মন দিয়ে বসে আর তাতে সমাজের লোকদের অনেক লজ্জা-অপমানের কারণ হতে পারে। এজন্যে এ ব্যাপারে অলীর কিছুটা দখল থাকা বাঞ্ছনীয়, যেন উপরোক্ত আশঙ্কার পথ বন্ধ করা যায়।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

لَا يَجُوْزُ اَيْضًا اَنْ يُّحْكَمَ الْاَوْلِيَاءَ فَقَطْ لِاَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُوْنَ مَاتَعْرِفُ الْمَرْاَةُ مِنْ نَفْسِهَا وَ لِاَنَّ حَارَّ الْعَقْدِ وَمَارَهُ رَاجِعَانِ اِلَيْهَا -

তাই বলে কেবল অলীর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হওয়াও জায়েয নয়। কেননা মেয়েরা তাদের নিজেদের বিষয় যতটা বুঝে ততটা তারা বুঝে না এবং বিশেষ করে যখন বিয়ের ভালো-মন্দ ও সুখ-দুঃখ পরিণামে তাদেরই ভোগ করতে হয়।

বিয়ে একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে— যারা সমাজেরই লোক— বিবাহিত হয়ে পরস্পরে মিলে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, কাজেই তাদের ঐক্য ও মিলন সৃষ্টি ও সুষ্ঠু মিলিত জীবন যাপনের পশ্চাতে সমাজের আনুকূল্য ও সমর্থন-অনুমোদন একান্তই অপরিহার্য। এ কারণে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে গোপনে নারী-পুরুষের মিলনকে স্পষ্ট অসমর্থন জানানো হয়েছে। পুরুষদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ - (النساء : ٢٤)

বিবাহের বন্ধনে বন্দী হয়ে স্ত্রী গ্রহণ করবে, জ্বেনাকারী হিসেবে নয়।

মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ - (لنساء : ٢٥)

বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুরুষদের সাথে মিলিত হবে, জ্বেনাকারিণী কিংবা গোপনে প্রণয়-বন্ধুতাকারিণী হয়ে নয়।

প্রথম আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

فَكَاَنَّهٗ سُبْحَانَهٗ اَمَرَ هُمْ بِاَنْ يَّطْلُبُوْا بِاَ مْوَالِهِمِ النِّسَاءَ عَلٰى وَجْهِ النِّكَاحِ لَاعَلٰى وَجْهِ السِّفَاحِ -

(الفتح القدير : ج -١، ص -٤٠٤)

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে প্রকারান্তরে মুসলিমদের আদেশ করেছেন যে, তারা মেয়েদের মোহরানা দিয়ে বিয়ে করে গ্রহণ করবে, জ্বেনা-ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়।

আর দ্বিতীয় আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

আরববাসীরা জ্বেনা-ব্যভিচারের প্রচার হলে খুবই আপত্তি করত, দোষের মনে করত, কিন্তু গোপন বন্ধুত্ব গ্রহণে কোনো আপত্তি তাদের ছিল না। ইসলাম এসে এসব কিছুর পথ বন্ধ করে দিয়েছে। (ঐ)

আল্লামা 'জুজাজ' বলেছেন ঃ

اَلْمُسَافِحَةُ اَنْ تُقِيْمَ اِمْرَاَةٌ مَعَ رَجُلٍ عَلَى الْفُجُوْرِ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيْجٍ صَحِيْحٍ -

(احكام القران : ج- ١، ص -٤٠٤)

কোনো বিশুদ্ধ বিয়ে ব্যতিরেকে যৌন চর্চার উদ্দেশ্যে কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষের সাথে একত্র বসবাস করে, তবে তাকেই বলা হয়, 'মুসাফিহাত' আর তা সুস্পষ্ট হারাম।[১]

---

১. এই দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী লিখেছেনঃ
জাহিলিয়াতের যুগে ব্যভিচারী মেয়েরা ছিল দু'ধরনের। কেউ প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচার করত এবং কেউ গোপন-বন্ধুত্ব ও প্রণয়-প্রীতি হিসেবে করত। আর তারা নিজেদের বুদ্ধিতেই প্রথম প্রকারের ব্যভিচারকে হারাম ও দ্বিতীয় প্রকারের ব্যভিচারকে হালাল মনে করত।

কজেই একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে পরস্পরের সাথে কেবল বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমেই মিলিত হতে পারে এবং এ বিয়ের মাধ্যমে মিলিত হওয়ার বিষয়ে সমাজের লোকদেরকে জানতে হবে, তার প্রতি তাদের সমর্থনও থাকতে হবে। আর এজন্যে দরকার হচ্ছে মিলনকারী নারী-পুরুষের বিয়ে এবং সে বিয়ে গোপনে অনুষ্ঠিত হলে চলবে না, হতে হবে প্রকাশ্যে, সকলকে জানিয়ে, সমাজের সমর্থন নিয়ে। এজন্যে ইসলামের বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রচার হওয়ার অনুকূলে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং গোপন বিয়েকে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর ফারূকের সম্মুখে এমন এক বিয়ের ব্যাপার পেশ করা হয়, যার অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র একজন পুরুষ ও একজন মেয়েলোক উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন ঃ

هٰذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَ لَا اُجِيْزُهٗ وَلَوْكُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ - (مؤطا امام مالك)

এ তো গোপন বিয়ে এবং গোপন বিয়েকে আমি জায়েয মনে করি না। আমি তার অনুমতিও দিচ্ছি না। এ ব্যাপারটি পূর্বে আমার নিকট এলে আমি এ ধরনের বিয়েকারীদের 'রজম' করার হুকুম দিতাম।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اكثر اهل العلم على ان النكاح لاينعقد الابينة ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضو راحالة العقد -

(المسوى : ج-٢، ص -١٠٧)

অধিকাংশ ইসলামবিদের মতে অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কোনো বিয়ে প্রমাণিত হতে পারে না, আর তা অনুষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ না তাতে বিয়ের সময় সাক্ষিগণ উপস্থিত থাকবে।

বিয়ের অনুষ্ঠান যাতেকরে ব্যাপক প্রচার লাভ করে তার নির্দেশ এবং তার উপায় বলতে গিয়ে রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اَعْلِنُوْا هٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِىْ الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ - (ترمذى)

এ বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচার করো এবং সাধারণত এর অনুষ্ঠান মসজিদে সম্পন্ন করো, আর এ সময় একতারা বাদ্য বাজাও।

বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রচার সম্পর্কিত আদেশ স্পষ্ট ও অকাট্য। এর ব্যতিক্রম হলে সে বিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। আর প্রচার অনুষ্ঠানের জন্যে মসজিদে বিয়ে সম্পন্ন করতে আদেশ করেছেন। বিয়ের অনুষ্ঠান মসজিদে করা যদিও ওয়াজিব নয়; কিন্তু সুন্নত— ভালো ও পছন্দনীয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা মসজিদ হচ্ছে মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র। মহল্লার ও আশেপাশের মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার মসজিদে জমায়েত হয়ে থাকে। এখানে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে তারা সহজেই এতে শরীক হতে পারে, আপনা-আপনিই জেনে যেতে পারে অমুকের ছেলে আর অমুকের মেয়ে আজ বিবাহিত হচ্ছে ও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। এতে করে সামাজিক সমর্থন সহজেই লাভ করা যায়।

এছাড়া মসজিদ হচ্ছে অতিশয় পবিত্র স্থান, বিয়েও অত্যন্ত পবিত্র কাজ। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ্র ইবাদতের জায়গা, বিয়েও আল্লাহ্র এক অন্যতম প্রধান ইবাদত, সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত, বিয়ে অনুষ্ঠানের সময় 'দফ'[১] বা একতারা বাদ্য বাজাতে বলা হয়েছে। এ বাদ্য নির্দোষ। রাসূলে করীম (স) বিয়ে অনুষ্ঠানের সময় এ বাধ্য বাজানোর শুধু অনুমতিই দেন নি, সুস্পষ্ট নির্দেশও

১. دف টি ইংরেজী হচ্ছে Tambourine খঞ্জনি বা তম্বুরা।

দিয়েছেন। যদিও তা বাজানো ওয়াজিব নয়; কিন্তু সুন্নত— অতি ভালো তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না। বিশেষত এজন্যে যে, নবী করীম (স) চুপেচাপে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হওয়াকে আদৌ পছন্দ করতেন না। এমনি এক বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) লোকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

فَهَلْ بَعَثْتُمْ جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّى - (نيل الاوطار :ج -٦، ص -٨ ٣٣)

তোমরা সে বিয়েতে কোনো মেয়ে পাঠাও নি, যে বাদ্য বাজাবে আর গান গাইবে ?

এসব হাদীসের আলোচনা করে ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

وَفِى هٰذَا الْحَدِيْثِ اِعْلَانُ النِّكَاحِ بِالدُّفِّ وَالْغِنَاءِ الْمُبَاحِ وَفِيْهِ اِقْبَالُ الْاِمَامِ اِلَى الْعُرْسِ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ لَهْوٌ مَالَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْمُبَاحِ - (ايضا)

এ হাদীস থেকে 'দফ্' বাজিয়ে ও নির্দোষ গান গেয়ে বিয়ের প্রচার করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সমাজপতিরও উচিত বিয়ে অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া, যদিও তাতে আনন্দ-উৎসব ও খেল-তামাসাই হোক না কেন— যদি তা শরীয়তের জায়েয সীমালংঘন করে না যায়।

রুবাই বিন্তে মুওয়ায (রা) বলেন ঃ আমার যখন বিয়ে হচ্ছিল, তখন নবী করীম (স) আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমার বিছানায় আসন গ্রহণ করলেন। তখন ছোট ছোট মেয়েরা 'দফ্' বাজাচ্ছিল আর গান করছিল। এই সময় একটি মেয়ে গায়িকা গান বন্ধ করে বলল ঃ 'সাবধান, এখানে নবী করীম (স) উপস্থিত হয়েছেন, কাল কি হবে, তা তিনি জানেন।' একথা শুনে নবী করীম (স) বললেন ঃ

دَعِىْ هٰذِه وَقُوْلِىْ بِالَّذِى كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ - (بخارى)

এসব কথা ছাড়ো, বরং তোমরা যা বলছিলে, তাই বলতে থাকো।

اشتغل بالاشعار التى تتعلق بالمغازى والشجاعة -

তোমরা যুদ্ধ-সংগ্রাম ও বীরত্বের কাহিনী সম্বলিত যেসব গীত-কবিতা পাঠ করছিলে ও গাইতেছিলে, তা-ই করতে লেগে যাও।

এসব হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে অনুষ্ঠানে প্রচারের উদ্দেশ্যে একতারা বাদ্য বাজানো আর এ উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নির্দোষ, ঐতিহাসিক কাহিনী ও জাতীয় বীরত্বব্যক গীত-গজল গাওয়া শরীয়তের খেলাফ নয়। কিন্তু তাই বলে এমন সব গীত-গান গাওয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারে না যাতে অন্যায়-অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার হয়, যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি অন্ধ আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কেননা এ ধরনের গান-গজল বিয়ের সময়ও হারাম, যেমন হারাম সাধারণ সময়ে। এ সম্পর্কে মূলনীতি হচ্ছে ঃ

যেসব গান-গজল-বাজনা-আনন্দানুষ্ঠান সাধারণ সময়ও হারাম, তার অধিকাংশই হারাম বিয়ের অনুষ্ঠানেও। কেননা এ সম্পর্কে যে নিষেধাবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ 'দফ্' বাজানো সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

وفى ذالك مصلحة وهى ان النكاح والسفاح لما تفقا فى قضا الشهوة ورضا الرجل والمرأة وجب ان يؤ مر بشيء يتحقق به الفرق بينهما بادى الرأى بحيث لايبقى لاحد فيه كلام ولا خفاء -

(حجة الله البالغة :ج -٢)

একতারা বাদ্য বাজানোর জন্যে আদেশ করার মূলে একটি ভালো দিক রয়েছে। তা এই যে, বিয়ে এবং গোপন বন্ধুত্ব-ব্যভিচার উভয় ক্ষেত্রেই যখন যৌন স্পৃহার পরিতৃপ্তি ও নর-নারী উভয়ের সম্মতি সমানভাবে বর্তমান থাকে, তখন উভয়ের মধ্যে প্রথম দৃষ্টিতেই পার্থক্য করার মতো কোনো জিনিসের ব্যবস্থা করার আদেশ দেয়া একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেন বিয়ে সম্পর্কে কারো কোনো কথা বলবার না থাকে এবং না থাকে কোনো গোপনীয়তা।

নবী করীম (স) নারী-পুরুষের হারাম মিলন ও হালাল মিলনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে বিয়ের সময় দফ বাজাতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِى النِّكَاحِ (مسند احمد : ج- ١٦، ص -٢١٣)

হালাল বিয়ে ও হারাম যৌন মিলনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে একতারা বাজনার বাদ্য ও বিয়ে অনুষ্ঠানের শব্দ ও ধ্বনি।

আল্লামা আহ্মদুল বান্না এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

السنة ان يكون بضرب دف وغناء مباح ونحو ذلك - (بلوغ الامانى : ج -١٦، ص- ٢١٣)

সুন্নত তরীকা হচ্ছে বিয়ের সময় দফ বাজানো, নির্দোষ গান গাওয়া ও এ ধরনের অন্যান্য কাজ।

হাদীসে বিয়ের শব্দ প্রচারের যে কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ তিনি বলেছেন ঃ

وَالْمُرَادُ بِالصَّوْتِ هِنَا الْغِنَاءُ بِالْكَلَامِ الْمُبَاحِ -

শব্দ করার অর্থ হচ্ছে নির্দোষ কথা সম্বলিত গান-গীতি গাওয়া।

আল্লামা ইসমাঈল কাহ্লানী সনয়ানী লিখেছেন ঃ

বিয়ের প্রচারের আদেশ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। প্রচার করা— গোপন বিয়ের বিপরীত। এ সম্পর্কে বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তার সনদ সম্পর্কে কিছু কথা থাকলেও সব হাদীস থেকেই মোটামুটি একই কথা জানা যায় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করে দেয়। আর 'দফ্— একতারা বাদ্য বা ঢোল— বাজানো জায়েয এজন্যে যে, বিয়ের অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যাপারে এটা অতিশয় কার্যকর।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ اللَّهْوِ فِىْ وَلِيْمَةِ النِّكَاحِ كَضَرْبِ الدُّفِّ وَشَبْهِ وَخَصَّتِ الْوَلِيْمَةُ بِذٰلِكَ لِيُظْهِرَ النِّكَاحَ وَيَنْتَشِرَ فَتَثْبَتُ حُقُوْقُهُ وَحُرْمَتُهُ - (عمدة القارى : ج -٢٠، ص -١٥٠)

বিয়ে অনুষ্ঠানে 'ঢোল' খঞ্জনি বাজানো ও অনুরূপ কোনো বাদ্য বাজানো জায়েয হওয়া সম্পর্কে সব আলেমই একমত। আর বিয়ে অনুষ্ঠানের সাথে তার বিশেষ যোগের কারণ হচ্ছে এই যে, এতে করে বিয়ের কথা প্রচার হবে ও এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর তার ফলেই বিয়ে সংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইমাম মালিক বলেছেন ঃ

لَابَأْسَ بِالدُّفِّ وَالْكَبَرَ فِى الْوَلِيْمَةِ لِاَنِّىْ اَمْرَهٗ خَفِيْفًا وَ لَا يَنْبَغِىْ ذٰلِكَ فِىْ غَيْرِ الْعُرْسِ - (ايضا)

বিয়ের অনুষ্ঠানে ঢোল ও তবলা বাজানোত কোনো দোষ নেই। কেননা আমরা মনে করি, তার আওয়াজ খুব হালকা, আর বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়া অপর ক্ষেত্রে তা জায়েয নয়।

ইমাম মালিককে বাঁশী বাজিয়ে আনন্দ-স্ফূর্তি করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন ঃ

اِنْ كَانَ كَبِيْرًا مُشْتَهِرًا فَاِنِّى اَكْرَهُهُ وَاِنْ كَانَ خَفِيْفًا فَلَا بَاْسَ بِذٰلِكَ - (ايضا)

তার আওয়াজ যদি বিকট ও প্রচণ্ড হয়, চারদিককে প্রকম্পিত ও আলোড়িত করে তোলে, তাহলে তা আমি পছন্দ করি না— মাকরূহ মনে করি। পক্ষান্তরে সে আওয়াজ যদি ক্ষীণ হয় তবে তাতে দোষ নেই।

কুরজা ইবনে কায়াব আনসারী ও আবূ মাসউদ আনসারী বলেন ঃ

اِنَّهٗ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ -

বিয়ের অনুষ্ঠানে বাদ্য ও বাঁশী বাজিয়ে আনন্দ-স্ফূর্তি করার অনুমতি দিয়েছেন আমাদের।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স)-এর বাদ্য বাজানো সংক্রান্ত অনুমতি ফরয-ওয়াজিব কিছু নয়। কিন্তু তবুও এর যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। আর এ ব্যাপারে ধর্মীয় গোঁড়ামীও যেমন সমর্থনীয় নয়, তেমনি অশ্লীল নাচ-গানের আসর জমানো, ভাড়া করা কিংবা বাড়ির যুবক-যুবতীদের সীমালংঘনকারী আনন্দ-উল্লাস এবং তার মধ্যে যৌন-উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী কাজের অনুষ্ঠান কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বর্তমানে মুসলিম সমাজ আধুনিকতার সয়লাবে যেভাবে ভেসে চলেছে, তা অনতিবিলম্বে রোধ করা না গেলে জাতীয় ধ্বংস ও অধোগতি অবধারিত হয়ে দেখা দেবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বিয়ের সময় বর-কনেকে সাজানো

বিয়ের সময় বর ও কনেকে নতুন চাকচিক্যময় পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করা এবং ছেলেমেয়ের গায়ে হলুদ মাখা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ জায়েয। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) একদিন রাসূলে করীমের খেদমতে হাজির হলেন ঃ

وَبِهٖ اَثَرُ صَفْرَةٍ —এবং তখন তাঁর গায়ে হলুদের চিহ্ন লাগানো ছিল।

রাসূলে করীম (স) তার কারণ জিজ্ঞেস করলে হযরত ইবনে আওফ জানালেন ঃ

اِنَّهٗ رَخَّصَ لَنَا فِى اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ -

তিনি আনসার বংশের এক মহিলাকে বিয়ে করেছেন (এবং এ বিয়েতে লাগানো হলুদের রং-ই তাঁর গায়ে লেগে রয়েছে)। (বুখারী)

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের সময় বর ও কনে— ছেলে ও মেয়ে— উভয়কেই সাজানো এবং তাদের গায়ে হলুদ লাগানো প্রাচীনকালেও— রাসূলের ও সাহাবীদের সমাজেও— প্রচলিত ছিল। হলুদ, জাফরান ইত্যাদি যে কোনো জিনিস দিয়েই বর-কনের শরীর রঙীন করা যেতে পারে এবং এর সঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহারেরও অনুমতি রয়েছে। কেননা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এসব লাগিয়ে রাসূলের সম্মুখে হাযির হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর এ কাজকে অপছন্দ করেন নি, সেজন্যে তিরস্কারও করেন নি। এ সম্পর্কে ইসলামের মনীষীদের মত হচ্ছে এই ঃ

مَنْ كَانَ يَنْكِحُ يَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِصُفْرَةٍ عَلَامَةَ الْعُرُوْسِ وَالسُّرُوْرِ -

যে লোক বিয়ে করবে, সে যেন বিয়ে ও আনন্দ-উৎসবের নিদর্শনস্বরূপ হলুদ বর্ণের রঙীন কাপড় পরিধান করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

اَحْسَنُ الْاَلْوَانِ كُلِّهَا الصُّفْرَةُ -

সমস্ত রং ও বর্ণের মধ্যে হলুদ বর্ণই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর।

এর কারণস্বরূপ তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত বাক্যাংশ পাঠ করেছিলেন ঃ

صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ - (البقرة : ٦٩)

উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ সম্পন্ন, যার রঙ চকচকে, দর্শকদের মনকে আনন্দে উৎফুল্ল করে দেয়।

এখানে পরিচ্ছন্ন ও চকচকে হলুদ বর্ণকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, যা দেখলে চোখ ঝলসে যায়, রঙের সৌন্দর্য দেখে দর্শক মুগ্ধ-বিমোহিত হয়।

রাসূলে করীম (স) নিজে কি সব রং পছন্দ করতেন, এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আনাস (রা) বলেছেন ঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ فَاَنَا اَصْبَغُ بِهَا وَاُحِبُّهَا -

নবী করীম (স) হরিৎ বর্ণ লাগাতেন, আমিও তা-ই লাগিয়ে থাকি এবং তা-ই আমি পছন্দ করি, ভালোবাসি।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার ইমাম জুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوْا يَتَخَلَّقُوْنَ وَلَا يَرَوْنَ بِهٖ بَاْسًا -

সাহাবায়ে কিরাম হলুদ বর্ণের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং তাতে কোনো দোষ দেখতেন না।

ইবনে সুফিয়ান বলেন ঃ

هٰذَ اَجَائِزٌ عِنْدَ اَصْحَابِنَا فِى الثِّيَابِ دُوْنَ الْجِسْمِ - (عمدة القارى : ج ٢٠، ص-١٤٣)

এ রঙ কাপড়ে ব্যবহার করা আমাদের মনীষীদের মতে জায়েয, দেহ ও শরীরের লাগানো নয়।

অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা, শাফিয়ী ও তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের মতে কাপড়ে কিংবা দাঁড়িতে জাফরানের রঙ লাগানো মাকরূহ।

দেন-মোহর

বিয়েতে দেন-মোহর বা 'মহরানা' অবশ্য দেয় হিসেবে ধার্য করার এবং তা যথারীতি আদায় করার জন্যে ইসলামে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 'এনায়া' গ্রন্থে 'মহরানা' বলতে কি বোঝায় তার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

اِنَّهٗ اِسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِىْ يَجِبُ فِىْ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ فِىْ مُقَابِلَةِ الْبُضْعِ اِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ اَوْ بِالْعَقْدِ -
(ردالمختار على الدر المختار : ج -٢، ص -٤٥٢)

দেনমোহর বলতে এমন অর্থ-সম্পদ বোঝায়, যা বিয়ের বন্ধনে স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের অধিকার লাভের বিনিময়ে স্বামীকে আদায় করতে হয়, হয় বিয়ের সময়ই তা ধার্য হবে, নয় বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কারণে তা আদায় করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব হবে।

বিয়ের ক্ষেত্রে মহরানা দেয়া ফরয বা ওয়াজিব। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً - (النساء :٢٤)

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে যৌন-স্বাদ গ্রহণ করো, তার বিনিময়ে তাদের 'মহরানা' ফরয মনে করেই আদায় করো।

তাফসীরের কিতাবে এ আয়াতের তরজমা করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

ای من تمتعتم به من المنكو حات بالجماع فاعطو هن مهور هن كاملة فريضة من الله عليكم ان تعطوا المهرتاما - (محاسن التاويل : ج -٥، ص -١١٨٧)

অর্থাৎ তোমরা পুরুষরা বিবাহিতা স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম কার্য সম্পাদন করে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ, তার বিনিময়ে তাদের প্রাপ্য মহরানা পুরাপুরি তাদের নিকট আদায় করে দাও, আদায় করো এ হিসেবে যে, তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَانْكِحُوْ هُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - (النساء : ٢٥)

এবং মেয়েদের অলি-গার্জিয়ানের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে করো এবং তাদের 'মহরানা' প্রচলিত নিয়মে ও সকলের জানামতে তাদেরকেই আদায় করে দাও।

এ আয়াতদ্বয়ে বিয়ের ক্ষেত্রে দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। এজন্যে 'মহরানা' হচ্ছে বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার একটি জরুরী শর্ত। প্রথম আয়াতে আজাদ ও স্বাধীনা মহিলাকে বিয়ে করা সম্পর্কে নির্দেশ এবং দ্বিতীয় আয়াতে দাসী বিয়ে করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর দু'জায়গায়ই বিয়ের বিনিময়ে মহরানা দেয়ার স্পষ্ট নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ جَعَلَ الصَّدَّاقَ عِوَضًا وَ اَجْرَاهُ مَجْرٰى سَائِرِ اَعْوَاضِ الْمُعَامِلَاتِ الْمُتَقَابِلَاتِ .... فَوَجَبَ اَنْ يَّخْرَجَ بِهٖ عَنْ حُكْمِ النِّحَلَ اِلٰى حُكْمِ الْمُعَاوِضَاتِ - (احكام القرن : ج -١، ص -٣١٧)

মহান আল্লাহ্ মহরানাকে বিনিময় স্বরূপ ধার্য করেছেন এবং যাবতীয় পারস্পরিক বিনিময়সূচক ও একটা জিনিসের মুকাবিলায় আর একটা জিনিস দানের কারবারের মতোই ধরে দিয়েছেন।

অতএব এটাকে স্বামীর 'অনুগ্রহের দান' মনে না করে একটার বদলে একটা প্রাপ্তির মতো ব্যাপার মনে করতে হবে। অর্থাৎ মহরানার বিনিময়ে স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ব্যবহারের অধিকার লাভ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَا لِكُمْ - (النساء : ٢٤)

এবং মুহাররম মেয়েদের ছাড়া আর সব মহিলাকেই তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করবে তোমাদের ধন-মালের বিনিময়ে।

ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ

اباح الله الحكيم الفروج بالا موال والا حصان دون السفاح وهو الزنا وهذ ايدل على وجوب الصداق فى النكاح - (احكام القران : ج-١، ص -٣٨٧)

আল্লাহ্ মহান হুকুমদাতা স্ত্রীর যৌন অঙ্গ ব্যবহার হালাল করেছেন ধন-মালের বিনিময়ে ও বিয়ের মাধ্যমে পবিত্রতা রক্ষার্থে, জেনার জন্যে নয়। আর একথা প্রমাণ করে যে, বিয়েতে মহরানা দেয়া ওয়াজিব অর্থাৎ ফরয।

কুরআনে আবার বলা হয়েছে ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْ هُنَّ اُجُوْرَهُنَّ .

এবং মুসলমান ও আহ্‌লি কিতাব বংশের সতীত্ব-পবিত্রতাসম্পন্না মহিলারাও তোমাদের জন্যে হালাল, যখন তোমরা তাদের মহ্‌রানা আদায় করে বিয়ে করবে।

অন্যত্র এ কথারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ -

তোমরা যদি সে মহিলাদের বিনিময়— মহ্‌রানা— দিয়ে বিয়ে করো, তবে তোমাদের কোনো গুনাহ্‌ হবে না।

এ আয়াত দুটি উদ্ধৃত করে ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ

فِيْهِ بِاَنْ يَّجِبَ فِىْ كُلِّ نَوْعٍ مِّنْهُ حَتّٰى اَنَّهٗ لَوْسَكَتَ فِى الْعَقْدِ عَنْهُ لَوَجَبَ بِالْوَطْئِ -

(احكام القران : ج -١، ص -٣٩٧)

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহ্‌রানা দেয়া সকল বিয়েতে ও সকল অবস্থায়ই ওয়াজিব (ফরয)। এমনকি আক্‌দ-এর সময় যদি ধার্য করা নাও হয় তবুও সে স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন হওয়ার সাথে সাথে মহ্‌রানা দেয়া ওয়াজিব (ফরয) হয়ে যাবে।

শুধু তা-ই নয়, মহ্‌রানা আদায় করতে হবে অন্তরের সন্তোষ ও সদিচ্ছা সহকারে এবং মেয়েদের জন্যে আল্লাহ্‌র দেয়া এক নেয়ামত মনে করে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً -

এবং স্ত্রীদের প্রাপ্য মহ্‌রানা তাদের আদায় করে দাও আন্তরিক খুশীর সাথে ও তাদের অধিকার মনে করে।

আয়াতে উদ্ধৃত نِحْلَةً শব্দের অর্থ ব্যাপক। তার একটি মানে হচ্ছে عن العوض কোনো বিনিময় ও বদ্‌লা ব্যতিরেকেই কিছু দিয়ে দেয়া। আয়াতের আর একটি অর্থ হচ্ছে ঃ

طَيِّبُوْا نَفْسًا بِالصَّدَاقِ -

মহ্‌রানা দিয়ে মনকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ করে নাও, মহ্‌রানা দেয়ার জন্যে মনের কুণ্ঠা কৃপণতা দূর করো।

আর এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে ঃ

عَطِيَّةٌ مِّنَ اللّٰهِ - —আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ দান।

কেননা জাহিলিয়াতের যুগে হয় মহ্‌রানা ছাড়াই মেয়েদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যেত, নয় মহ্‌রানা বাবদ যা কিছু আদায় হতো তা সবই মেয়েদের বাপ বা অলি-গার্জিয়ানরাই লুটে পুটে খেয়ে নিত। মেয়েরা বঞ্চিতাই থেকে যেত। এজন্যে ইসলামে যেমন মহ্‌রানা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি এ জিনিসকে একমাত্র মেয়েদেরই প্রাপ্য ও তাদের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এতে বাপ বা অলী-গার্জিয়ানের কোনো হক নেই বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত মহ্‌রানা যখন মেয়েদের জন্যে আল্লাহ্‌র বিশেষ দান, তখন তা আদায় করা স্বামীদের পক্ষে ফরয এবং স্বামীদের ওপর তা হচ্ছে স্ত্রীদের আল্লাহ্‌র নির্ধারিত অধিকার।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই তো উভয়ের কাছে থেকে যৌন সুখ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকে। 'মহ্‌রানা' যদি এরই 'বিনিময়' হয় তাহলে তা কেবল স্বামীই কেন দেবে স্ত্রীকে, তা কি স্বামীদের ওপর অতিরিক্ত 'জরিমানা' হয়ে যায় না?

এর জবাবে বলা যায়, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, স্বামী বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রীর ওপর এক প্রকারের কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব লাভ করে থাকে। স্বামী স্ত্রীর যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর স্ত্রী নিজেকে— নিজের দেহমন, প্রেম-ভালবাসা, যাবতীয় সম্পদ-ঐশ্বর্য— একান্তভাবে স্বামীর হাতে সোপর্দ করে দেয়। এর বিনিময়স্বরূপই মহরানা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেননা ঃ

فَلَا تَصُوْمُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلَا تَحُجُّ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَلَا يُفَارِقُ مَنْزِلَهَا اِلَّا بِاِذْنِهٖ -

অতঃপর স্ত্রী স্বামীর মত ও অনুমতি না নিয়ে— না নফল রোযা রাখবে, না হজ্জ করবে। আর না তার ঘর ছেড়ে কোথাও চলে যাবে।

শাফিয়ী মাযহাবের আলেমগণ মহরানার তাৎপর্য ব্যখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

اَلنِّكَاحُ عَقْدُ مُعَاوِضَةٍ اِنْعَقَدَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَلٌ عَنْ صَاحِبِهٖ وَمَنْفَعَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهٖ عُوْضٌ عَنْ مَنْفَعَةِ الْاٰخَرِ وَالصَّدَاقُ زِيَادَةٌ فَرَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى الزَّوْجِ لِمَا جَعَلَ لَهٗ فِى النِّكَاحِ مِنَ الدَّرَجَةِ - (احكام القران لابن العربى : ج- ١، ص -٣١٧)

বিয়ে হবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিনিময়মূলক একটি বন্ধন। বিয়ের পর একজন অপরজনকে নিজের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। প্রত্যেক অপরজনের থেকে যেটুকু ফায়দা লাভ করে, তাই হচ্ছে অপর জনের ফায়দার বিনিময়— বদল। আর মহরানা হচ্ছে এক অতিরিক্ত ব্যবস্থা। আল্লাহ্ তা'আলা তা স্বামীর ওপর অবশ্য দেয়— ফরয করে দিয়েছেন এজন্যে যে, বিয়ের সাহায্যে সে স্ত্রীর ওপর খানিকটা অধিকারসম্পন্ন মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে।

অতএব বিয়ের আকদ্ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ই মহরানা নির্ধারণ এবং তার পরিমাণের উল্লেখ একান্তই কর্তব্য। নবী করীম (স) অত্যন্ত জোরের সাথে বলেছেন ঃ

اِنَّ اَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ يُّوَفّٰى بِهٖ مَااسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ - (مسند احمد)

বিয়ের সময় অবশ্য পূরণীয় শর্ত হচ্ছে তা, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীর যৌন অঙ্গ নিজের জন্যে হালাল মনে করে নাও।

—আর তা হচ্ছে মহরানা বা দেন-মোহর।

বিয়ের পর স্ত্রীকে কিছু না দিয়ে তার কাছে যেতেও নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। হযরত আলী (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে বিয়ে করার পর তাঁর নিকটে যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন নবী করীম (স)—

مَنَعَهٗ حَتّٰى يُعْطِيَهَا شَيْئًا - (ابو داؤد)

তাকে কোনো জিনিস না দেয়া পর্যন্ত তাঁর নিকট যেতে তাঁকে নিষেধ করলেন।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

اَمَرَهٗ لِتَقْدِيْمِ شَيْءٍ مِنْهُ كَرَامَةً لِلْمَرْاَةِ وَتَاْنِيْسًا - (نيل الاوطار:ج- ٦، ص- ٣١٩)

নবী করীম (স) স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার মনকে স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে কিছু-না-কিছু আগে-ভাগে দেবার জন্যে স্বামীকে আদেশ করেছেন।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, বিয়ের সময় দেন-মোহর ছাড়া অপর এমন কোনো শর্ত আরোপ করা চলবে না, যা শরীয়তের বিরোধী।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا تَشْتَرِطُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا - (مسند احمد باب الشرط)

কোনো মহিলা তার বিয়ের জন্যে তারই অপর এক বোনকে তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করতে পারবে না।

বুখারী শরীফে এ হাদীসটির পূর্ণ ভাষণ নিম্নরূপ ঃ

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَاقُدِّرَ لَهَا -

কোনো মেয়েলোকের জন্যে তার অপর এক বোনকে তালাক দেয়ার দাবি করা— যেন সে তার ভোগের পাত্র সে নিজের জন্যে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারে— হালাল নয়। কেননা সে তা পাবেই, যা তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।[১]

'তার অপর এক বোন' বলতে আপন সহোদরাও হতে পারে, অনাত্মীয় কোনো মেয়েলোকও হতে পারে। কেননা সে তার আপন সহোদরা বোন না হলেও মুসলিম হিসেবে সে তার দ্বীনী বোন অর্থাৎ কোনো পুরুষ— যার স্ত্রী রয়েছে— যদি অপর কোনো মেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, মেয়ে সে বিয়েতে রাজি হয়ে পুরুষটিকে একথা বলতে পারবে না যে, তোমার আগের (মানে বর্তমান) স্ত্রীকে আগে তালাক দাও, তারপর আমাকে বিয়ে করো। এরূপ শর্ত আরোপ করার তার কোনো অধিকার নেই। সে ইচ্ছে করলে এ বিয়ের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু একজনের বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করা এবং সে তালাক হয়ে যাওয়ার পর তার নিকট বিয়ে বসতে রাজি হওয়ার কারো অধিকার থাকতে পারে না। এরূপ শর্ত আরোপ করা ইসলামী শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। রাসূলে করীম (স) এ পর্যায়ে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ - (مسند احمد)

আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই— এমন কোনো শর্ত আরোপ করা হলে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হবে।

মহরানা না দিয়ে স্ত্রীর নিকট গমন করাই অবাঞ্ছনীয়। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী যখন হযরত ফাতিমাকে বিয়ে করলেন, তখন নবী করীম (স) তাঁকে বললেন ঃ

أَعْطِهَا شَيْئًا - (ابوداؤد)

তুমি ওকে কিছু একটা দাও।

হযরত ইবনে উমর বললেন ঃ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتّٰى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْكَثُرَ -

কোনো মুসলমানেরই মহরানা বাবদ কম বা বেশি কিছু অগ্রিম না দিয়ে তার স্ত্রীর নিকট গমন করা জায়েয নয়।

---

১. ইবনে হাবীব বলেছেন ঃ

حصل العلماء هذا النهى على الندب فلو فعل ذالك لم ينسخ النكاح - (عينى :ج -٢٠، ص -١٤٣)

মনীষিগণ এ নিষেধকে অবশ্য পালনীয় মনে করেন না; বরং এ কাজ বাঞ্ছনীয়-ও মনে করেন না। তা সত্ত্বেও এরূপ শর্ত যদি কেউ আরোপ করেই, তবে তাতে তার বিয়ে ভেঙ্গে যাবে না— যদিও ইবনে বাত্তাল এ কথার ওপর জোর আপত্তি জানিয়েছেন।

মালিক ইবনে আনাস বলেছেন ঃ

لَا يَدْخُلُ حَتّٰى يَقَدِّمَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا اَدْنَاهُ رُبْعُ دِيْنَارٍ اَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ سَوَاءٌ فُرِضَ لَهَا اَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْضٌ - (معالم اسنن : ج -٣، ص -٢١٥)

স্ত্রীকে তার মহরানার কিছু-না-কিছু না দিয়ে স্বামী যেন তার নিকট গমন না করে। মহরানার কম-সে-কম পরিমাণ হলো একটি দীনারের এক চতুর্থাংশ কিংবা তিন দিরহাম। বিয়ের সময় এ পরিমাণ নির্দিষ্ট হোক আর নাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না।

দেন-মোহরের পরিমাণ কি হওয়া উচিত, ইসলামী শরীয়তে এ সম্পর্কে কোনো অকাট্য নির্দেশ দেয়া হয়নি, নির্দিষ্টভাবে কোনো পরিমাণও ঠিক করে বলা হয়নি। তবে একথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক স্বামীর-ই কর্তব্য হচ্ছে তার আর্থিক সামর্থ্য ও স্ত্রীর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেয়া। আর মেয়ে পক্ষেরও তাতে সহজেই রাজি হয়ে যাওয়া উচিত। এ ব্যাপারে শরীয়ত উভয় পক্ষকে পূর্ণ আজাদি দিয়েছে বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্লভী যা লিখেছেন, তা নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে ঃ

নবী করীম (স) মহরানার কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেন নি এ কারণে যে, এ ব্যাপারে লোকদের আগ্রহ-উৎসাহ ও ঔদার্য প্রকাশ করার মান কখনো এক হতে পারে না। বরং বিভিন্ন যুগে, দুনিয়ার বিভিন্ন স্তরের লোকদের আর্থিক অবস্থা এবং লোকদের রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, কার্পণ্য ও উদারতার ভাবধারায় আকাশ-ছোঁয়া পার্থক্য হয়ে থাকে। বর্তমানেও এ পার্থক্য বিদ্যমান। এজন্যে সর্বকাল যুগ-সমাজ স্তর, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রুচি-উৎসাহ নির্বিশেষে প্রযোজ্য হিসেবে একটি পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া বাস্তব দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেমন করে কোনো সুরুচিপূর্ণ দ্রব্যের মূল্য সর্বকালের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না— দেয়া অবৈজ্ঞানিক ও হাস্যকর। কাজেই এর পরিমাণ সমাজ, লোক ও আর্থিক মানের পার্থক্যের কারণে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে। তবে শুধু শুধু এবং পারিবারিক আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে এর পরিমাণ নির্ধারণে বাড়াবাড়ি ও দর কষাকষি করাও আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। তার পরিমাণ এমন সামান্য ও নগণ্যও হওয়া উচিত নয়, যা স্বামীর মনের ওপর কোনো শুভ প্রভাবই বিস্তার করতে সমর্থ হবে না। যা দেখে মনে হবে যে, মহরানা আদায় করতে গিয়ে স্বামীকে কিছুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি, সেজন্যে তাকে কোনো ত্যাগও স্বীকার করতে হয়নি।

শাহ দেহলভীর মতে, দেন-মোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে এবং সেজন্যে সে রীতিমত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে তার পরিমাণ এমনও হওয়া উচিত নয়, যা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এজন্যে নবী করীম (স) একদিকে গরীব সাহাবীকে বললেন ঃ

اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ -

কিছু-না-কিছু দিতে চেষ্টা করো। আর কিছু না পার, মহরানা বাবদ অন্তত লোহার একটি আঙ্গুরীয় দিতে পারলেও সেজন্যে অবশ্য চেষ্টা করবে।

আর যে নিঃস্ব দরিদ্র সাহাবী তাও দিতে পারেন নি, তাঁকে তিনি বলেছেন ঃ

قَدْ زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ - (مسند احمد : ج- ١٦، ص -١٧١)

কুরআন শরীফের যা কিছু তোমার জানা আছে, তা তুমি তোমার স্ত্রীকে শিক্ষা দেবে— এই বিনিময়েই আমি মেয়েটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।

এ ধরনের মহরানার সম্পর্কে ফিকাহবিশারদ মকহুল বলেছেন ঃ

لَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

এ ধরনের মহরানার বিনিময়ে বিয়ে সম্পন্ন করার ইখতিয়ার রাসূলে করীম (স)-এর পরে আর কারো নেই।

ফিকাহ্‌বিদ লাইস বলেছেন ঃ

لَا يَجُوْزُ هٰذَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - (احكام القران للجصاص :ج -٢، ص -١٧١)

রাসূলের তিরোধানের পর এই ধরনের মহরানা নির্দিষ্ট করার অধিকার আর কারো নেই।

ইবনে জাওজী বলেছেন ঃ ইসলামের প্রথম যুগে স্বাভাবিক দারিদ্র্যের কারণে প্রয়োজনবশতই এ ধরনের মহরানা নির্দিষ্ট করা জায়েয ছিল। কিন্তু এখন তা জায়েয নয়।

একটি হাদীস থেকে জানা যায়, এক জোড়া জুতার বিনিময়ে অনুষ্ঠিত বিয়েকেও রাসূলে করীম (স) বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মেয়েলোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি মহরানা বাবদ যা পেয়েছ, তাতে বিয়ে করতে কি তুমি রাজি আছ ?' সে বলল, 'হ্যাঁ'। তখন রাসূলে করীম (স) সে বিয়েতে অনুমতি দান করেছিলেন।

অপরদিকে কুরআন মজীদে এই মহরানা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا - (النساء : ٢٠)

এবং তোমরা মেয়েদের এক-একজনকে 'বিপুল পরিমাণ' ধন-সম্পদ মহরানা বাবদ দিয়ে দিয়েছ।

এ আয়াতের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ মহরানা বাবদ দেয়া জায়েয প্রমাণিত হচ্ছে। হযরত উমর (রা) উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন এবং মহরানা বাবদ দিয়েছিলেন চল্লিশ হাজার দিরহাম। চল্লিশ হাজার দিরহাম তদানীন্তন সমাজে বিরাট সম্পদ। নবী করীম (স) স্বয়ং হযরত উম্মে হাবীবাকে মহরানা দিয়েছিলেন চারশত দীনার— চার শতটি স্বর্ণমুদ্রা। এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁর মহরানার পরিমাণ ছিল আটশ' দীনার। (احكام القران لابن العربى- ج١، ص ٣٦٤)

এ আলোচনা থেকে একদিকে যেমন জানা যায় মহরানার সর্বনিম্ন পরিমাণ, অপর দিকে জানা যায় সর্বোচ্চ পরিমাণ। ইসলামী শরীয়তে এ দু'ধরনের পরিমাণই জায়েয।

কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে বিপুল পরিমাণে মহরানা ধার্য করা হতো। পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে কন্যাপক্ষ খুবই চাপ দিত। ফলে দুপক্ষের মধ্যে নানারূপ দর কষাকষি ও ঝগড়াঝাটি হতো। এর পরিণামে সমাজে দেখা দিত নানা প্রকারের জটিলতা। বর্তমানেও মুসলিম সমাজে মহরানা ধার্যের ব্যাপারে অনুরূপ অবস্থাই দেখা দিয়েছে। বলা যেতে পারে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির চরমোন্নতির এ যুগে পুরাতন জাহিলিয়াত নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এখন নতুন করে স্মরণ করা আবশ্যক বোধ হচ্ছে নবী করীম (স)-এর পুরাতন বাণী। বলেছেন ঃ

خَيْرُ الصَّدَاقِ اَيْسَرُهٗ - (ابو داؤد، حاكم)

সবচেয়ে উত্তম পরিমাণের মহরানা হচ্ছে তা, যা আদায় করা খুবই সহজসাধ্য।

এজন্যে একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে অবস্থাভেদে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিমাণের মধ্যে সহজ দেয় একটা পরিমাণ বেঁধে দেয়া এবং এ ব্যাপারে কোনো পক্ষ থেকে অকারণ বাড়াবাড়ি করা কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়।

মহরানা বাঁধার মান মধ্যম পর্যায়ে আনার প্রচেষ্টা রাসূলে করীম (স)-এর সময় থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা ভুল দৃষ্টি যেন মুসলমানদের মধ্যে থেকেই গিয়েছে। হযরত উমর ফারূক (রা) পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। তিনি একদা মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে লোকদের নসীহত করছিলেন এবং মহরানা সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছিলেন ঃ

اَلَا لَا تَغْلُوْا صُدَاقَ النِّسَاءِ .... فَاِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرِمَةً فِى الدُّنْيَا اَوْ تَقْوٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَانَ اَوْلَا كُمْ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ مَا اَصْدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَاَةً مِّنْ نِسَائِهٖ وَلَا مِنْ بَنَاتِهٖ اَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ اَوْ قِيَةٍ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتَلِىْ بِصَدَقَةِ اِمْرَاتِهٖ حَتّٰى تَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِىْ نَفْسِهٖ - (ترمذى)

সাবধান হে লোকেরা, স্ত্রীদের মহরানা বাঁধতে গিয়ে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি করো না। মনে রেখো, মহরানা যদি দুনিয়ায় মান-সম্মান বাড়াত কিংবা আল্লাহ্‌র নিকট তাকওয়ার প্রমাণ হতো, তাহলে অতিরিক্ত মহরানা বাঁধার কাজ করার জন্যে রাসূলে করীমই ছিলেন তোমাদের অপেক্ষাও বেশি অধিকারী ও যোগ্য। অথচ তিনি তাঁর স্ত্রীদের ও কন্যাদের মধ্যে কারো মহরানাই বারো 'আউকিয়া' (চার শ' আশি দিরহাম কিংবা বড়জোর একশ' কুড়ি টাকা)-র বেশি ধার্য করেন নি। মনে রাখা আবশ্যক যে, এক-একজন লোক তার স্ত্রীকে দেয় মহরানার দরুন বড় বিপদে পড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজের স্ত্রীকে শত্রু বলে মনে করতে শুরু করে।

এমনি এক ভাষণ শুনে উপস্থিতদের মধ্য থেকে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন ঃ

يُعْطِيْنَا اللّٰهُ وَتُحَرِّ مُنَا اَنْتَ ؟ نَهَيْتَ النَّاسَ اَنْ يَّزِيْدُوْا فِىْ مَهْرِ النِّسَاءِ عَلٰى اَرْبَعَمِا ئَةِ دِرْهَمٍ ... اَمَا سَمِعْتَ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَاٰتَيْتُمْ اِحْدَ هُنَّ قِنْطَارًا -

আল্লাহ্ তো আমাদের দিচ্ছেন, আর তুমি হারাম করে দিচ্ছ ? তুমি লোকদেরকে মেয়েদের মহরানার পরিমাণ চারশ' দিরহামের বেশি বাঁধতে নিষেধ করছো ?...... তুমি কি শোননি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

তোমরা তোমাদের এক এক স্ত্রীকে মহরানা দিচ্ছ বিপুল পরিমাণে ?

তখন হযরত উমর (রা) বললেন ঃ

اِمْرَاَةٌ اَصَابَتْ وَاَمِيْرٌ اَخْطَاءَ -

একজন মেয়েলোক ঠিক বলতে পারল; কিন্তু ভুল করল একজন রাষ্ট্রনেতা।

বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْا كُلُّ النَّاسِ اَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ - (احكام القران لابن العربى :ج -١، ص- ٢٦٥)

হে আল্লাহ্ মাফ করে দাও, — সব লোকই কি উমরের তুলনায় অধিক সমঝদার ?

অপর বর্ণনায় হযরত উমরের কথাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

كُلُّ اَحَدٍ اَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ حَتّٰى النِّسَاءَ -

প্রত্যেকটি ব্যক্তিই উমরের অপেক্ষা বেশি ফিকাহ্‌বিদ— এমনকি মেয়ে লোকরা পর্যন্ত।

বাহ্যত মনে হয়, হযরত উমর (রা) অধিক পরিমাণে মহরানা বাঁধার কাজকে নিষেধ করা থেকে ফিরে গিয়েছেন। বস্তুত হযরত উমরের কথার অর্থ এই ছিল না যে, তিনি অধিক পরিমাণে মহরানা ধার্য করাকে হারাম মনে করতেন, আর তাকে হারাম করে দেওয়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং বলা যায়,

তিনি অধিক পরিমাণে মহরানা ধার্য করা ভালো মনে করতেন না। বস্তুত মহরানা পরিমাণের কোনো সর্বোচ্চ পরিমাণ নেই, এ কথার ওপরই মনীষীদের ইজমা হয়েছে।

(تفسير المظهرى : ج-٢، سورة النساء ص -٥١)

কাজেই শরীয়তে না সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, না সর্বোচ্চ পরিমাণ। যার পক্ষে যতটুকু আদায় করা সহজসাধ্য, তার সেই পরিমাণই ধার্য করা উচিত।[১] তার চেয়ে কম করা যেমন স্বামীর উচিত নয়, তেমনি তার চেয়ে বেশি করতে চেষ্টা করাও উচিত নয় মেয়ে পক্ষের।

কোনো কোনো সাহাবী ও তাবেয়ীন নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে মহরানার একটা সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ

لَا مَهْرَ اَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ -

দশ দিরহাম পরিমাণের কমে মহরানা হতে পারে না।

শা'বী, ইবরাহীম নখ্য়ী ও অন্যান্য তাবেয়ীও এ মতই প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ, জুফর, হাসান ইবনে জিয়াদেরও এই মত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রা), হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব ও আতা প্রমুখ ফকীহ্ বলেছেন ঃ

يَجُوْزُ النِّكَاحُ عَلٰى قَلِيْلِ الْمَهْرِ وَكَثِيْرِهِ -

বিয়ে কম পরিমাণ মহরানায়ও শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ হয়ে বেশি পরিমাণ মহরানায়ও।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এক 'নাওয়াত' পরিমাণ স্বর্ণ মহরানা বাবদ দিয়েছিলেন। তার মূল্য বড়জোর তিন দিরহাম মাত্র। আর কেউ বলেছেন পাঁচ, কেউ বলেছেন দশ দিরহাম। ইমাম মালিক বলেছেন ঃ

اَقَلُّ الْمَهْرِ رُبْعُ دِيْنَارٍ - (احكام القران للجصاص :ج-٢، ض -١٧٠)

নিম্নতম মহরানার পরিমাণ হচ্ছে এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ।

পূর্বেই বলেছি, এসব হচ্ছে ইসলামের বিশেষজ্ঞ মনীষীদের নিজস্ব মতামত ও নিজস্ব ইজতিহাদ। এর মূলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র কোনো অকাট্য দলীল নেই।

আসলে বিয়েতে দেন-মোহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে একটা কিছু বেঁধে দেয়ার উদ্দেশ্যে নয়। বরং যা কিছু ধার্য করা হবে তা একদিকে যেমন স্ত্রীর প্রাপ্য আল্লাহ্‌র দেয়া অধিকার, অপরদিকে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ স্ত্রীর অঙ্গের অধিকার হালাল করার একটি পুরস্কারও বটে। অতএব তা ধার্য করতে হবে তাকে ঠিক ঠিকভাবে ও যথাসময়ে স্ত্রীর নিকট আদায় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানও এর একটা বিশেষ লক্ষ্য। কিন্তু শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে যদি একটা বিরাট পরিমাণ বেঁধেও দেয়া হয় কিংবা স্বামীকে তা স্বীকার করে নিতে বাধ্যও করা হয়, অথচ তা যদি সঠিকভাবে আদায়ই না করা হয়, তাহলে স্ত্রীর কার্যত কোনো ফায়দাই তাতে হয় না। আর পরিমাণ যদি এত বড় হয় যে, তা আদায় করা স্বামীর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, তাহলে তার পরিমাণ পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। স্বামী যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে মেয়ে পক্ষের অসম্ভব দাবির নিকট মাথা নত করে দিয়ে তাদের মর্জি মতো বড় পরিমাণের মহরানা স্বীকার করে নেয়, আর মনে মনে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত করে রাখে যে, কার্যত সে তার কিছুই আদায় করবে না, তা হলেও ব্যাপারটি একটি বড় রকমের প্রতারণার পর্যায়ে পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আদায় করার নিয়ত না থাকা সত্ত্বেও একটা বড় পরিমাণের মহরানা মুখে স্বীকার করে নেয়া

---

১. তবে সহজ হওয়ার অর্থও নিশ্চয়ই এই নয় যে, মহরানার পরিমাণটা এতই সামান্য হবে যে, মনে হবে সে ভিখারীকে ভিক্ষা দিচ্ছে। বস্তুত শরীয়তে মহরানা যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার পরিমাণটাও তেমনি গণনার যোগ্য হওয়া উচিত।

যে কত বড় গুনাহ তা রাসূলে করীম (স)-এর উদ্ধৃত বাণী থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلٰى اَقَلِّ مِنَ الْمَهْرِ اَوْ كَثُرَ وَلَيْسَ فِىْ نَفْسِهٖ اَنْ يُّوَدِّىَ اِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ -

যে লোক কোনো মেয়েকে কম বেশি পরিমাণের মহরানা দেয়ার ওয়াদায় বিয়ে করে অথচ তার মনে স্ত্রীর সে হক আদায় করার ইচ্ছা থাকে না, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে ব্যভিচারীরূপে দাঁড়াতে বাধ্য হবে।

হযরত সুহাইব ইবনে সানান (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

أَيُّمَا رَجُلٍ اَصْدَقَ اِمْرَأَةً صُدَاقًا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَا يُرِيْدُ اَدَاءَهٗ اِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللّٰهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ هُوَازَانٍ - (مسند احمد)

যে-লোক তার স্ত্রীর জন্যে কোনো মহরানা ধার্য করবে অথচ আল্লাহ্ জানেন যে, তা আদায় করার কোনো ইচ্ছাই তার নেই, ফলে আল্লাহ্র নামে নিজের স্ত্রীকেই প্রতারিত করল এবং অন্যায়ভাবে ও বাতিল পন্থায় নিজ স্ত্রীর যৌন অঙ্গ নিজের জন্যে হালাল মনে করে ভোগ করল, সে লোক আল্লাহ্র সাথে ব্যভিচারী হিসাবে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হবে। (بلوغ الامانى-ج ١٦، ص ١٢٥)

দান— জেহাজ

ছেলেমেয়ের বিবাহ উপলক্ষে মেয়ে পক্ষ থেকে দান— জেহাজ দেয়ার প্রশ্নটিও ইসলামে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ পর্যায়ে দুটি প্রশ্ন বিচার্য। একটি হচ্ছে ইসলামে দান-জেহাজের রীতি প্রচলিত কিনা, আর দ্বিতীয় তার পরিমাণ কি হওয়া উচিত।

দান— জেহাজের রেওয়াজ যে ইসলামে রয়েছে এবং শরীয়তে তা অসমর্থিতও নয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাদীস গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায়, জেহাজ বা যৌতুক দেয়ার রেওয়াজ রাসূলে করীম (স)-এর যুগেও বর্তমান ছিল এবং নবী করীম (স) নিজে তাঁর কন্যাদের বিয়ের সময় যৌতুক দান করেছেন। হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ

جَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى ﷺ فَاطِمَةَ فِىْ خَمِيْلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ اِدْمٍ حَشْوُهَا لِيْفُ الْاِذْخِرِ - (مسندا حمد)

রাসূলে করীম (স) ফাতিমাকে যৌতুক হিসেবে দিয়েছিলেন একটি পাড়ওয়ালা কাপড়, একটি পানির পাত্র, আর একটি চামড়ার তৈরী বালিশ— যার মধ্যে তীব্র সুগন্ধিযুক্ত ইযখির খড় ভর্তি ছিল।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) এই কয়টি জিনিস ছাড়াও দুটি যাঁতা এবং পাকা মাটির একটি পাত্র ফাতিমা (রা)-কে জেহাজ হিসেবে দিয়েছিলেন।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে আল্লামা আহমাদুল বান্না লিখেছেন ঃ

فِىْ اَحَادِيْثِ الْبَابِ دَلَالَةٌ عَلَى الْاِقْتِصَادِ فِى الْجِهَازِ وَعَدَمِ التَّوَسُّعِ فِيْهِ وَ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى قَدْرِ الْحَاجَةِ كُلِّ زَمَنٍ بِحَسْبِهٖ - (بلوغ الامانى : ج -١٦، ص -١٧٧)

এ পর্যায়ের যাবতীয় হাদীস প্রমাণ করে যে, জেহাজ দানের ব্যাপারে মধ্যম নীতি অবলম্বন করা এবং তাতে বিপুল প্রাচুর্যের বাহুল্য না করা বরং প্রত্যেক যুগের দৃষ্টিতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করা আবশ্যক।

বস্তুত যৌতুক দেয়া কনের পিতা বা গার্জিয়ানের কর্তব্য। কিন্তু তাতে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, প্রাচুর্য ও আতিশয্য করা ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষত এ ব্যাপারে মানুষ প্রাচুর্য ও বাহুল্য দেখায় শুধু নাম ডাক আর খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে— এ উদ্দেশ্যে যে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সকলে জানতে পারবে যে, অমুকে তার কন্যাকে এত শত বা এত হাজার টাকার জিনিসপত্র যৌতুক হিসেবে দিয়েছে।

তবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মেয়েকে বিয়ে দিলে সাময়িকভাবে এবং হঠাৎ করে সে পিতার ঘর-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ নতুন মানুষের সঙ্গে নিতান্তই অপরিচিত পরিবেশে এক নতুন ঘর ও সংসার রচনা করতে শুরু করে। এ সময় তার সংসার গঠনে বহু রকমের জিনিসপত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়া অবশ্যম্ভাবী। এ এক সংকটময় সময় বলতে হবে। কাজেই কন্যার পিতা যদি জরুরী কিছু জিনিসপত্র দিয়ে নিজ কন্যার সংসার গঠনে বাস্তবভাবে সাহায্য করে, তবে তা মেয়ের প্রতি কল্যাণই শুধু হবে তা না, পিতার এক কর্তব্যও পালিত হবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, দান— জেহাজ যেমন পিতার অবস্থানুপাতে মধ্যম মানের ও মাঝামাঝি পর্যায়ের হওয়া উচিত, কোনো বাড়াবাড়ির অবকাশ দেয়া উচিত নয়, তেমনি তা বিয়ের শর্ত হিসেবে দাবি করে নেয়ার ব্যাপারও নয়। বর্তমান সময় সেকালের হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও দাবি ও শর্ত করে যৌতুক আদায়ের একটা মারাত্মক প্রচলন ব্যাপক ও প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। আজকের বিবাহেচ্ছু বা বিবাহোপযোগী যুবকদের মধ্যে যত বেশি সম্ভব যৌতুক আদায়ের একটা লজ্জাকর প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এর ফলে অনেক ঠিক করা-বিয়েও শুধু যৌতুকের পরিমাণ নিয়ে দর-কষাকষি হওয়ার কারণে ভেঙে যেতে দেখা যাচ্ছে। আর বহু বিবাহোপযোগী মেয়ের বিয়ে হতে পারছে না শুধু এ কারণে যে, মেয়ের পিতা ছেলের বা ছেলে পক্ষের দাবি অনুযায়ী যৌতুক দেয়ার সামর্থ্য রাখে না। অনেক ছেলে জোর করে, মেয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, এমন কি অনেক সময় তালাক দেয়ার ভয় দেখিয়েও যৌতুক আদায় করে। বাবার নিকট থেকে দাবি অনুযায়ী যৌতুক আনতে না পারার দরুন কত নব বিবাহিতাকে যে প্রাণও দিতে হয়েছে ও হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে পিতারও চরম উপেক্ষা কিংবা অনমনীয় মনোভাব দেখা যায়। সামর্থ্য থাকলেও আর মেয়ের নতুন সংসারের জন্যে প্রয়োজন হলেও কিছু দিতে পিতা রাজি হয় না।

হযরত হাফসা (রা) রাসূলের অন্যান্য বেগমের সাথে একত্রিত হয়ে একদিন রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নানা জিনিস দাবি করেন। তাতে রাসূলে করীম (স) খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত উমর ফারূক (রা) একথা শুনতে পেয়ে দ্রুত হাফসার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ

لَا تُرَاجِعِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا تَسْأَلِيْهِ شَيْئًا وَاسْأَلِيْنِىْ مَا بَدَالَكِ – (احكام القران لابن العربى : ج -٣، ص -١٥٠٧)

তুমি রাসূলের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবে না এবং তাঁর কাছে কখনই কিছু চাইতে পারবে না (সহীহ্ হাদীসের শব্দ— যা তাঁর কাছে নেই তা চাইতে পারবে না।), বরং তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা আমার নিকটই চাবে।

এ ঘটনা দান— জেহাজ সম্পর্কে ইসলামী আদর্শবাদী ব্যক্তির জন্যে এক উজ্জ্বল ও গৌরবদীপ্ত দৃষ্টান্ত পেশ করছে।

বিয়ে অনুষ্ঠান প্রচারের দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে ওয়ালীমার জিয়াফত করা। এ অনুষ্ঠান মেয়ে পক্ষেরও যেমন করা উচিত, তেমনি করা উচিত ছেলে পক্ষেরও। নিজেদের ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের একত্রিত করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। ইসলামে এ ওয়ালীমা-জিয়াফতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাসূলে করীম (স) ওয়ালীমার রীতি ইসলামী সমাজে বিশেষভাবে চালু করেছেন।

'ওয়ালীমা' শব্দের আসল অর্থ হল একত্রিত করা। কেননা একজন পুরুষ ও একজন মেয়ের বিবাহিত জীবনে মিলিত হওয়ার উপলক্ষে নিকটাত্মীয়দের একত্রিত করা হয় এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে 'ওয়ালীমা'।

আর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়ালীমার জিয়াফত বলতে বোঝায় ঃ

وَهِيَ طَعَامٌ يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ يُدْعَى اِلَيْهِ النَّاسُ -

বিয়ে-অনুষ্ঠানের সময়কালীন আয়োজিত খানা, যার জন্যে লোকদের দাওয়াত দেয়া হয়।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বিয়ে করলে পরে রাসূলে করীম (স) তাকে বলেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ - (بخاری، مسلم)

আল্লাহ্ এ কাজে তোমাকে বরকত দিন। এখন তুমি একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমার জিয়াফত করো।

রাসূলে করীম (স) নিজে যখন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বিয়ে করলেন, তখন তিনি একটি বকরী জবাই করে ওয়ালীমার জিয়াফত করেছিলেন। সে সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) বলেছেন ঃ

اَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَنٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَ لَحْمًا - (بخاری)

রাসূলে করীম (স) যখন যায়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করে ঘর বাঁধলেন, তখন তিনি লোকদের রুটি ও গোশ্ত খাইয়ে পরিতৃপ্ত করে দিয়েছিলেন।

তিনি যখন হযরত সফীয়া (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন, তখন খেজুর দিয়ে এই ওয়ালীমার জিয়াফত করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (স) খায়বর ও মদীনার মাঝখানে একাদিক্রমে তিন রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। তার মধ্যে একদিন সঙ্গীয় সব সাহাবীদের ওয়ালীমার দাওয়াত দিলেন। এ দাওয়াতে না ছিল গোশ্ত না ছিল রুটি। বরং রাসূলে করীম (স) সকলের সামনে খেজুর ছড়িয়ে দিলেন। হযরত সফীয়ার সাথে বিয়ের ওয়ালীমা এমনি অনাড়ম্বরভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। (نیل الاوطار - ج ٦، ص ٣٢١)

ওয়ালীমা সম্পর্কে কুরআন মজীদেও তাগিদ রয়েছে। সূরা আন-নিসা'য় বলা হয়েছে ঃ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ —'তোমরা তোমাদের অর্থ-সম্পদের বিনিময়েই স্ত্রী গ্রহণ করতে চাবে।' বিয়ের পরে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানের নির্দেশও এরই মধ্যে রয়েছে বলে মনে করতে হবে। কেননা 'ওয়ালীমা' বিয়ে উপলক্ষেই হয়ে থাকে এবং তাতে অর্থ ব্যয় হয়।

রাসূলে করীম (স) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে যে ওয়ালীমার জিয়াফত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে আল্লামা সান্‌য়ানী কাহলানী লিখেছেন ঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى وُجُوْبِ الْوَلِيْمَةِ فِى الْعُرْسِ - (سبل السلام : ج -٣، ص -١٥٢)

এ নির্দেশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়েতে ওয়ালীমার জিয়াফত করা ওয়াজিব।

হযরত আলী (রা) যখন বিবি ফাতিমার সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

لَا بُدَّ لِلْعُرُوْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ - (مسند احمد)

এ বিয়েতে ওয়ালীমা অবশ্যই করতে হবে।

একথা থেকে ওয়ালীমা সম্পর্কে পূর্বোক্ত মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম তাবরানী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত ঘোষণা বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلْوَلِيْمَةُ حَقٌّ وَ سُنَّةٌ فَمَنْ دُعِىَ وَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصٰى -

ওয়ালীমা করা হচ্ছে একটা অধিকারের ব্যাপার, একান্তই কর্তব্য। ইসলামের স্থায়ী নীতি। অতএব যাকে এ জিয়াফতে শরীক হওয়ার দাওয়াত দেয়া হবে, সে যদি তাতে উপস্থিত না হয়, তাহলে সে নাফরমানী করল।

ইমাম বায়হাকী বলেছেন ঃ

لَا اَعْلَمُ اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوَلِيْمَةَ - (سبل السلام : ج- ٣، ص -١٥٣)

রাসূলে করীম (স) বিয়ে করে ওয়ালীমার জিয়াফত করেন নি— এমন ঘটনা আমার জানা নাই।

এ থেকেও ওয়ালীমা করা যে ওয়াজিব, তাই প্রমাণিত হচ্ছে।

ওয়ালীমা জিয়াফতের আকার কি হবে, কত হবে তাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ, তা শরীয়তে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। তবে একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, ব্যক্তির সামর্থ এবং তার মনের উদারতা অকৃপণতা অনুপাতেই তা করতে হবে। আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

اِنَّ الشَّاةَ اَقَلُّ مَا يَجْزِئْ بِهَا فِى الْوَلِيْمَةِ عَلَى الْمُوْسِرِ -

সচ্ছল অবস্থার লোকের পক্ষে একটি বকরী জবাই করে খাওয়ানোই হচ্ছে ওয়ালীমার কম-সে-কম পরিমাণ।

তবে নবী করীম (স) যে বকরীর চাইতেও কম মূল্যের জিনিস দিয়ে ওয়ালীমার জিয়াফত করেছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা কাযী ইয়াজ লিখেছেন ঃ

اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّهٗ لَاحَدَّ لِاَكْثَرَ مَايُوْلَمُ بِهٖ وَ اَمَّا اَقَلُّهٗ فَكَذٰلِكَ وَ مَهْمَا تَيَسَّرَ اَجْزَاَ وَالْمُسْتَحَبُّ اَنَّهَا عَلٰى قَدْرِ حَالِ الزَّوْجِ - (نيل الاوطار : ج -٦، ص- ٣٢٣)

ওয়ালীমার জিয়াফতে কত বেশি খরচ করা হবে, এ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই বলেই বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন। আর কমেরও কোনো শেষ পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যায় না। যার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব ও সহজ, তা করাই যথেষ্ট। তবে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুপাতেই যে এ কাজে অর্থ ব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাতে সন্দেহ নেই।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ইবনে বাত্তালের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ

وَهِيَ عَلَى قَدْرِ الْاِمْكَانِ وَالْوُجُوْبُ لِاِعْلَانِ النِّكَاحِ - (عمدة القارى : ج -٢٠، ص -١٥٤)

ওয়ালীমার জিয়াফত করা স্বামীর আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী হওয়া উচিত এবং তা করা ওয়াজিব বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রচারের উদ্দেশ্যে।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী লিখেছেন ঃ

وَفِىْ ذٰلِكَ مَصَالِحُ كَثِيْرَةٌ -

ওয়ালীমার জিয়াফত করায় অনেক প্রকারের কল্যাণ ও যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে।

এরপর তিনি দুটো কল্যাণের উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে ঃ

اَلتَّلَطُّفُ بِاِشَاعَةِ النِّكَاحِ ...... اِذْ لَا بُدَّ مِنَ الْاِشَاعَةِ لِئَلَّا يَبْقٰى مَحَلٌّ لِوَهْمِ الْوَاهِمِ فِىْ النَّسَبِ -

এতে করে খুব সুন্দরভাবে বিয়ের প্রচার হয়ে যায়। ....কেননা বিয়ের প্রচার হওয়া এ কারণেও জরুরী যে, তাদের কোনো সন্তান হলে তার সদজাত হওয়া ও তার বংশ সাব্যস্ত হওয়ায় কোনো সন্দেহকারীর সন্দেহ করার কোনো অবকাশই যেন না থাকে।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, স্ত্রী এবং তার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের প্রতি শুভেচ্ছা ও সদাচরণ প্রকাশ করা। তিনি বলেছেন ঃ

فَاِنْ صَرَفَ الْمَالَ لَهَا وَجَمَعَ النَّاسَ فِىْ اَمْرِهَا يَدُلُّ عَلٰى كَرَامَتِهَا عَلَيْهِ وَكَوْنِهَا ذَاتَ بَالٍ عِنْدَهٗ -

(حجة الله البا القتبع - ٢)

নববধুর জন্যে স্বামী যদি অর্থ খচর করে ও তার জন্যে লোকদের একত্রিত করে, তবে তা প্রমাণ করবে যে, স্বামীর নিকট তার খুবই মর্যাদা রয়েছে এবং সে তার স্বামীর নিকট রীতিমত সমীহ করার যোগ্য।

এবং এ করে স্বামী এমন এক নেয়ামত লাভ করেছে বলে শোকরিয়া আদায় করেছে, যা সে ইতিপূর্বে কখনো লাভ করেনি। এ কারণে তার মনে অনাবিল আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত পুলক বোধ করছে। এজন্যেই সে এত অর্থ খরচ করছে আর এসব তারই জন্যে।

এর ফলে নববধূর মনেও জাগবে পরম পুলক, স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম-ভালোবাসা। আর এর দরুন উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের সাথেও পরম মাধুর্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

ইসলামে বিয়ে উপলক্ষে ওয়ালীমার জিয়াফতের গুরুত্ব এতখানি যে, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে এ দাওয়াত কবুল না করার ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। বরং এ দাওয়াতে হাজির হওয়াকে শরীয়তে ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا اُدْعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ - (مسند احمد)

তোমাদের কেউ যদি বিয়ের ওয়ালীমায় নিমন্ত্রিত হয়, তবে সে যেন সে দাওয়াত কবুল করে ও উপস্থিত হয়।

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ اِلٰى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا - (بخارى، مسلم)

তোমাদের কেউ ওয়ালীমার দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হলে সে যেন অবশ্যই তাতে যায়।

হযরত জাবির বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِذَ ادُعِیَ اَحَدُکُمْ اِلٰی طَعَامٍ فَلْیُجِبْ فَاِنْ شَاءَ طَعَمَ وَ اِنْ شَاءَ تَرَکَ – (احمد، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجه)

তোমাদের কেউ কোনো খাবার দাওয়াতে নিমন্ত্রিত হলে তার সেখানে অবশ্যই যাওয়া উচিত, তারপরে খাওয়া তার ইচ্ছাধীন।

হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

وَمَنْ لَمْ یَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَی اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ – (بخاری، مسلم)

যে লোক ওয়ালীমার দাওয়াতে শরীক হয় না, সে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে।

হযরত ইবনে উমর বণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَجِیْبُوْا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِیْتُمْ لَهَا – (بخاری، مسلم)

ওয়ালীমার দাওয়াতে যদি তোমরা নিমন্ত্রিত হও তবে অবশ্যই তাতে শরীক হবে।

এসব হাদীস থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, ওয়ালীমার দাওয়াত হলে তা কবুল করা এবং তাতে শরীক হওয়া প্রত্যেকটি মুসলমানের পক্ষে ওয়াজিব। কোনো কোনো ফিকাহ্‌বিদ ওয়ালীমার দাওয়াত এবং সাধারণ খাবার দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মধ্যে ইবনে আবদুল বার্‌র্, কাযী ইয়াজ ও ইমাম নববী একমত হয়ে রায় দিয়েছেন যে, বিয়ে-ওয়ালীমার দাওয়াতে হাজির হওয়া ওয়াজিব। আর শাফিয়ী ও হাম্বলী মতের অধিকাংশ মনীষীর মতে এ হচ্ছে ফরযে আইন। আবার কেউ কেউ 'ফরযে কিফায়া'ও বলেছেন। ইমাম শাফিয়ীর মতে তা ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে কোনো 'রুখছাত' নেই। কেননা হাদীসে যেখানে কথাটির বারবার তাগিদ এসেছে, সেভাবে অপর কোনো ওয়াজিব কাজ সম্পর্কেই বলা হয়নি। (سبل السلام : ج-٣، ص-١٥٣-نيل الاوطار - ج -٦، ص-٣٢٦)

ওয়ালীমার যিয়াফতে কি ধরনের লোক দাওয়াত করা হবে, এ সম্পর্কে হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِیْمَةِ تُدْعٰی لَهَا الْاَغْنِیَاءُ وَ تُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ – (بخاری، مسلم)

সেই ওয়ালীমার খানা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম, যেখানে কেবল ধনী লোকদেরকেই দাওয়াত দেয়া হবে। আর গরীব লোকদেরকে বাদ দেয়া হবে।

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِیْمَةِ یَمْنَعُهَا مَنْ یَّاْتِیْهَا وَیُدْعٰی اِلَیْهَا مَنْ یَّاْبَاهَا – (مسلم)

ওয়ালীমার সেই খানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট, যেখানে যারা আসবে তাদের তো নিষেধ করা হবে বা দাওয়াত দেয়া হবে না, আর দাওয়াত দেয়া হবে কেবল তাদের, যারা তা কবুল করে না বা আসবে না।

এ হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হলো যে, ওয়ালীমার জিয়াফতে বেছে বেছে কেবল ধনী লোকদেরই দাওয়াত দেয়া আর গরীব ফকীরদের দাওয়াত না দেয়া মহা অন্যায়। বরং কর্তব্য হচ্ছে, গরীব-ধনী নির্বিশেষে যতদূর সম্ভব সব শ্রেণীর আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা। যেখানে কেবলমাত্র ধনী বন্ধু বা আত্মীয়দের দাওয়াত দেয়া হয় আর গরীবদের জন্যে প্রবেশ নিষেধ করে দেয়া হয়, সেখানকার খানায় আল্লাহ্‌র কোনো রহমত-বরকত হতে পারে না। বরং সেই খানা হয়ে যায় নিকৃষ্টতম। এজন্যে যে, আল্লাহ্‌র নিকট তো গরীব-ধনীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; কিন্তু ওয়ালীমার দাওয়াতকারী ব্যক্তি বিয়ে

করে, কিংবা নিজের ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্ফূর্তিতে মেতে গিয়ে গরীব-ধনীর মাঝে আকাশ-ছোঁয়া পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

বিয়ের উৎসবে আর ওয়ালীমার জিয়াফতে কেবল যে বয়স্ক পুরুষদেরই দাওয়াত করা হবে, এমন কথাও ঠিক নয়। বরং তাতে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য থেকে মেয়েলোক ও শিশুদেরও নিমন্ত্রণ করতে হবে,— করা কিছুমাত্র দোষের নয়। বরং সাত্যি কথা এই যে, এ উপলক্ষে মেয়েদের শিশুদের বাদ দেয়া খুবই আপত্তিকর। নিম্নোদ্ধৃত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে ও ওয়ালীমার উৎসবে মেয়েলোক ও শিশুদেরও দাওয়াত দেয়া খুবই সঙ্গত। হযরত আনাস ইবনে মালিক বলেন ঃ

اَبْصَرَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ تَمْتَنًا فَقَالَ لَهُمْ اَنْتُمْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ -

(بخارى)

নবী করীম (স) এক বিয়ের উৎসবে বহু মেয়েলোক ও ছেলেপেলে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকতে দেখলেন। তিনি তাদের দেখে খুবই আনন্দ বোধ করে তাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশার্থে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন এবং তিনি তাদের জন্যে দো'আ করতে গিয়ে বললেন ঃ 'তোমরাই তো আমার নিকট সবার তুলনায় অধিকতর প্রিয়জন।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

وَفِيْهِ اِسْتِحْسَانُ شُهُوْدِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لِلْاَعْرَاسِ لاَنَّهَا شَهَادَةٌ لَهُمْ عَلَيْنَا وَمُبَالِغَةٌ فِىْ الْاِعْلَانِ بِالنِّكَاحِ -

(عمدة القارى : ج -٢٠، ص -١٦٢)

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিয়ের উৎসবাদিতে মেয়েলোক ও শিশুদের উপস্থিত হওয়া বা করা খুবই ভালো ও পছন্দনীয়। কেননা এসব উৎসবই তো হচ্ছে আমাদের পরস্পরের নিকট আসার উপলক্ষ। আর এ কাজে বিয়ের প্রচারকার্যও পুরামাত্রায় সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

ওয়ালীমার জিয়াফত কখন করা হবে— বিয়ে অনুষ্ঠানের সময়, না তার পরে, কিংবা নব দম্পতির ফুল-শয্যা বা মধুমিলনের রাতে, এ সম্পর্কে নানা মতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মালিকী মাযহাবে কেউ কেউ বলেছেন, ওয়ালীমা বিয়ে অনুষ্ঠানের সময় অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কারো মতে মধুমিলনের পরে। ইমাম মাওয়ার্দীর মতে তা হওয়া উচিত মধুমিলনের রাতে। এর দলীল হিসেবে তিনি হযরত আনাসের নিম্নোদ্ধৃত উক্তির উল্লেখ করেছেন ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْبَحَ عُرُوْسًا بِزَيْنَبَ فَدَعَا الْقَوْمَ - (بخارى)

নবী করীম (স) হযরত জয়নবের সাথে মধুমিলনের রাত যাপনের পর সকালের দিকে লোকদের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

দাম্পত্য জীবনের শর্ত

স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন— মাধুর্যময় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে ইসলামে কতগুলো জরুরী বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তার বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাচ্ছে।

প্রেম ভালোবাসা

বিয়ের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও মনের পরম প্রশান্তি লাভই হচ্ছে বিয়ের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কেননা এ জিনিস মানুষ মাত্রেই প্রয়োজন— স্বভাবের ঐকান্তিক দাবি। পুরুষ ও নারী উভয়ের এক নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হলেই বিপরীত লিঙ্গ (opposite sex) সম্পন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার এক তীব্র ইচ্ছা ও বাসনা স্বতঃস্ফূতভাবে জেগে ওঠে। উভয়ের দেহমনে যৌবনের সর্বপ্লাবী জোয়ারের সৃষ্টি হয়। তখন যৌন মিলনের অপেক্ষাও প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা লাভের জন্যে নর নারীর মন অধিকতর উদ্দাম হয়ে ওঠে। এ কারণে ঠিক এই সময়েই ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করার তাগিদ করা হয়েছে ইসলামী শরীয়তে। আর এ বিয়েকে কুরআন মজীদে 'প্রেম-ভালোবাসার জীবন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত বিয়ের প্রকৃত বন্ধন হচ্ছে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন। এ বন্ধন শিথিল হলে অন্য হাজারো বন্ধন ছিন্ন হতে কিছুমাত্র বিলম্ব লাগবে না। এ কারণে পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টিও তাকে স্থায়িত্ব ও গভীরতা দানের জন্যে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।

একটি নর ও একটি নারীর বিবাহ-সূত্রে একত্রিত হয়ে সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন যাপনকেই বলা হয় দাম্পত্য জীবন। দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশ, ভিন্ন পরিবার ও পরিবেশের লোক, পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, একজনের নিকট অপরজন সম্পূর্ণ নতুন— আনকোরা। প্রত্যেকের মন-মগজ-চিন্তা-ভাবনা, স্বভাব-অভ্যাস পরস্পর থকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকারের। সাধারণত এ-ই হয়ে থাকে এবং এ-ই স্বাভাবিক। অনেক সময় এসব দিক দিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরাট পার্থক্যও হতে পারে— হয়ে থাকে। এ দুজনের মধ্যে পূর্ণ মিলন ও সামঞ্জস্য স্থাপন— দুজনকে 'একজনে' পরিণতকরণই হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কাজ প্রথম সাক্ষাতেই সম্ভব হওয়া সুদূরপরাহত। তাছাড়া নারী ও পুরুষের চিন্তাশক্তির ভারসাম্যে পূর্ণ সমঞ্জস হয়ে যাওয়াও প্রায় অসম্ভব। উভয়ের প্রকৃতি ও মেজাজ এমন পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক, যার দরুন এদের মিলেমিশে জীবন কাটানো অসম্ভব বলে প্রথমত মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এসব দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে কতগুলো জরুরী বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে। নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন উভয়ের জন্যে কিছু কিছু অধিকার এবং তা যেমন স্বামীর জন্যে অবশ্য পালনীয়, তেমনি স্ত্রীর পক্ষেও।

আমরা এখানে প্রথমে স্বামীর কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করছি। কিন্তু তার আগে ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীতে গভীর একাত্মবোধ জাগ্রত হওয়া যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রথমত লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের জন্যে زوج 'যাওজ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা আহমাদ মুস্তফা আল্-মারাগী লিখেছেন ঃ

وَالزَّوْجُ يَطْلِقُ عَلَى الذَّكَرَ وَالْاَنْثٰى ... وَ اَصْلُهُ الْعَدَدُ الْمُكَوَّنُ مِنْ شَيْئَيْنِ اتَّحَدَا وَصَارَ شَيْئًا وَّاحِدًا فِى

الْبَاطِنِ وَ اِنْ كَانَا شَيْئَيْنِ فِى الظَّاهِرِ وَسُمِّىَ بِهٖ كُلٌّ مِّنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى اَنَّ مِنْ مُقْتَضَى الْفِطْرَةِ اَنْ يَّتَّحِدَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهٖ وَالْمَرْأَةُ بِبَعْلِهَا بِتَمَازُجِ النُّفُوْسِ وَ وَحَدِ الْمُصْلِحَةِ حَتّٰى يَكُوْنَ كُلٌّ مِّنْهُمَا كَاَنَّهٗ عَيْنُ الْاٰخِرِ - (تفسير المراغى :ج -٢، ص -١٩٠)

'যাওজ' শব্দটি পুরুষ নারী উভয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে— এর আসল অর্থ এমন একটি সংখ্যা যা এমন দুটি জিনিসের সমন্বয়ে রচিত ও গঠিত যেখানে সে দুটি জিনিসই একাকার হয়ে রয়েছে এবং বাহ্যত তারা দুটি হলেও মূলত ও প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পরের সাথে মিলেমিশে একটিমাত্র জিনিসে পরিণত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী— উভয়ের জন্যে। ব্যবহার করা হচ্ছে একথা বোঝাবার জন্যে যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী তার স্বামীর সাথে অন্তরের গভীর একাত্মপূর্ণ ভাবধারা ও ভেদহীন কল্যাণ কামনার সাহায্যে একাকার হয়ে থাকবে, তা-ই হচ্ছে স্বাভাবিকতার ঐকান্তিক দাবি। তারা একাকার হবে এমনভাবে যে, একজন ঠিক অপরজনে পরিণত হবে।

ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি হওয়া খবুই স্বাভাবিক। আর এ সুযোগে শয়তান পরস্পরের মনে নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে কম চেষ্টা করে না। আর এরই ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরতে কিছু বিলম্ব হয় না। বিশেষ করে এজন্যেও অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মেয়েরা সাধারণতই নাজুক স্বভাবের হয়ে থাকে। অল্পতেই রেগে যাওয়া, অভিমানে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চলা হয়ে ওঠা নারী চরিত্রের বিশেষ দিক। মেয়েদের এ স্বাভাবিক দুর্বলতা কিংবা বৈশিষ্ট্যই বলুন— আল্লাহ্র খুব ভালোভাবেই জানা ছিল। তাই তিনি স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا - (النساء-١٩)

তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভালোভাবে ব্যবহার ও বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিসকে অপছন্দ করছ, অথচ আল্লাহ্ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দেবেন।

মওলানা সানাউল্লাহ পানিপত্তী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার ও তাকে নিয়ে ভালোভাবে বসবাস করার মানে হচ্ছে কার্যত তাদের প্রতি ইনসাফ করা, তাদের হক-হকুক রীতিমত আদায় করা এবং কথাবার্তায় ও আলাপ-ব্যবহারে তাদের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন। আর তারা তাদের কুশ্রীতা কিংবা খারাপ স্বভাব-চরিত্রের কারণে যদি তোমাদের অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের জন্যে ধৈর্য ধারণ করো, তাদের না বিচ্ছিন্ন করে দেবে, না তাদের কষ্ট দেবে, না তাদের কোনো ক্ষতি করবে।

(تفسير المظهرى : ج - ٢، ص-٥)

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ আয়াতে স্বামীদেরকে এক ব্যাপক হেদায়েত দেয়া হয়েছে। স্বামীদের প্রতি আল্লাহ্র প্রথম নির্দেশ হচ্ছে ঃ তোমরা যাকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলে, যাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে তার প্রতি সব সময়ই খুব ভালো ব্যবহার করবে, তাদের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে। আর প্রথমেই

যদি এমন কিছু দেখতে পাও যার দরুন তোমার স্ত্রী তোমার কাছে ঘৃণার্হ হয়ে পড়ে এবং যার কারণে তার প্রতি তোমার মনে প্রেম-ভালোবাসা জাগার বদলে ঘৃণা জেগে ওঠে, তাহলেই তুমি তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করো না। বুদ্ধির স্থিরতা ও সজাগ বিচক্ষণতা সহকারে শান্ত থাকতে ও পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টিত হবে। তোমাকে বুঝতে হবে যে, কোনো বিশেষ কারণে তোমার স্ত্রীর প্রতি যদি তোমার মনে ঘৃণা জেগে থাকে, তবে এখানেই চূড়ান্ত নৈরাশ্যের ও চিরবিচ্ছেদের কারণ হয়ে গেলো না। কেননা হতে পারে, প্রথমবারে হঠাৎ এক অপরিচিতা মেয়েকে তোমার সমগ্র মন দিয়ে তুমি গ্রহণ করতে পারো নি। তার ফলেই এই ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে কিংবা তুমি হয়তো একটি দিক দিয়েই তাকে বিচার করেছ এবং সেদিক দিয়ে তাকে মনমতো না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছ। অথচ তোমার বোঝা উচিত যে, সেই বিশেষ দিক ছাড়া আরো সহস্র দিক এমন থাকতে পারে, যার জন্যে তোমার মনের আকাশ থেকে ঘৃণতর এ পুঞ্জিত ঘনঘটা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তুমি তোমার সমগ্র অন্তর দিয়ে তাকে আপনার করে নিতে পারবে। সেই সঙ্গে একথাও বোঝা উচিত যে, কোনো নারীই সমগ্রভাবে ঘৃণার্হ হয় না। যার একটি দিক ঘৃণার্হ, তার এমন আরো সহস্র গুণ থাকতে পারে, যা এখনো তোমার সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে নি। তার বিকাশ লাভের জন্যে একান্তই কর্তব্য। এ কারণেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ – (مسلم، مسند احمد)

কোনো মুসলিম পুরুষ যেন কোনো মুসলিম মহিলাকে তার কোনো একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশীও হয়ে যেতে পারে।

কেননা, কোনো নারীই সম্পূর্ণরূপে খারাবীর প্রতিমূর্তি হয় না। কিছু দোষ থাকলে অনেকগুলো গুণও তার থাকতে পারে। সেই কারণে কোনো কিছু খারাপ লাগলে অমনি অস্থির, চঞ্চল ও দিশেহারা হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার অপরাপর ভালো দিকের উন্মেষ ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয়া এবং সেজন্যে অপেক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য। আল্লামা আহমাদুল বান্না এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

والمعنى ان شان المؤمن ان لايبغض المؤمنة بعضا كليا يحمله على فراقها بل ينبغى له ان يغفر سيئتها الحسنتها وتيغاض عمايكره بما يحب كئان تكون سيئة الخلق لكنها دينية او جميلة او عفيفة او رفيقة به – (بلوغ الامانى : ج- ١٦، ص -٢٣٤)

এ হাদীসের মানে হচ্ছে এই যে, কোনো মু'মিনের উচিত নয় অপর কোনো মু'মিন স্ত্রীলোক সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় ঘৃণা পোষণ করা, যার ফলে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কারণ দেখা দিতে পারে। বরং তার কর্তব্য হচ্ছে মেয়েলোকটির ভালো গুণের খাতিরে তার দোষ ও খারাবী ক্ষমা করে দেয়া আর তার মধ্যে ঘৃণার্হ যা আছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করা; বরং তার প্রতি ভালোবাসা জাগাতে চেষ্টা করা। হতে পারে তার স্বভাব-অভ্যাস খারাপ; কিন্তু সে বড় দ্বীনদার কিংবা সুন্দরী রূপসী বা নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পন্না অথবা স্বামীর জন্যে জীবন সঙ্গিনী।

আল্লামা শাওকানী এ হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

فِيْهِ الْاِرْشَادُ اِلٰى حُسْنِ الْعُشْرَةِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْبُغْضِ لِلزَّوْجَةِ بِمُجَرَّدِ كَرَاهَةِ خُلُقٍ مِّنْ اَخْلَا قِهَا فَاِنَّهَا لَا تَخْلُوْ مَعَ ذٰلِكَ عَنْ اَمْرٍ يَرْضَاهُ مِنْهَا – (نيل الاوطار: ج -٦، ص -٣٥٩)

এ হাদীসে স্ত্রীদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার ও ভালোভাবে বসবাস করার নির্দেশ যেমন আছে, তেমনি তার কোনো এক অভ্যাস স্বভাবের কারণেই তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে নিষেধও করা

হয়েছে। কেননা তার মধ্যে অবশ্যই এমন কোনো গুণ থাকবে, যার দরুন সে তার প্রতি খুশী হতে পারবে।

এজন্যে নবী করীম (স) স্বামীদের স্পষ্ট নসীহত করেছেন। বলেছেন ঃ

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ وَاِنَّ اَعْوَجُ شَيْءٍ فِىْ الضِّلْعِ اَعْلَاهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَّرْتَهُ وَ اِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ - (بخارى، باب الوصاه بالنساء)

তোমরা স্ত্রীদের সাথে সব সময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্যে আমার এ নসীহত কবুল করো। কেননা নারীরা জন্মগতভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোরপূর্বক তাকে সোজা করতে যাও, তবে তুমি তাকে চূর্ণ করে দেবে। আর যদি তাকে অমনি ছেড়ে দাও তবে সে সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। অতএব বুঝে-শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার আমার এ উপদেশ অবশ্যই গ্রহণ করবে।

এ হাদীসের মানে বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

اُوْصِيْكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاقْبَلُوْا وَصِيَّتِىْ فِيْهِنَّ فَاِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ - (عمدة القارى : ج-٢٠،ص-١٦٦)

আমি মেয়েলোকদের প্রতি ভালো ব্যবহার করার জন্যে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা তাদের সম্পর্কে আমার দেয়া এ নসীহত অবশ্যই কবুল করবে। কেননা তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে।

মেয়েলোকদের 'হাড়' থেকে সৃষ্টি করার মানে কি ?-বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

استعير الضلع للعوج اى خلقن خلقا فيه اعواجاج فكانهن خلقن من اصل معوج فلا يتهيا الانتفاع بهن الابمدار تهن الصبر على اعوجاجهن - (ايضا)

'পাঁজর থেকে সৃষ্টি' কথাটা বক্রতা বোঝার জন্যে রূপক অর্থে বলা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে যে, মেয়েদের এমন এক ধরনের স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে বক্রতা— বাঁকা হওয়া অর্থাৎ মেয়েদের এক বাঁকা মূল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব তাদের দ্বারা কোনোরূপ উপকারিতা লাভ করা সম্ভব কেবল তখনি, যদি তাদের মেজাজ স্বভাবের প্রতি পূর্ণরূপে সহানুভূতি সহকারে লক্ষ্য রেখে কাজ করা হয় এবং তাদের বাঁকা স্বভাবের দরুন কখনো ধৈর্য হারানো না হয়। (ঐ)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلْمَرْاَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَ اِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ - (بخارى)

মেয়েলোক পাঁজরের হাড়ের মতো। তাকে সোজা করতে চাইবে তো তাকে চূর্ণ করে ফেলবে, আর তাকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলে তার স্বাভাবিক বক্রতা রেখেই ব্যবহার করবে।

এ হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, নারীদের স্বভাবে বক্রতা স্বভাবগত ও জন্মগত। এ বক্রতা সম্পূর্ণরূপে দূর করা কখনো সম্ভব হবে না। তবে তাদের আসল প্রকৃতিকে বজায় রেখেই এবং তাদের স্বভাবকে যথাযথভাবে থাকতে দিয়েই তাদেরকে নিয়ে সুমধুর পারিবারিক জীবন গড়ে তোলা যেতে পারে, সম্ভব তাদের সহযোগিতায় কল্যাণময় সমাজ গড়া। আর তা হচ্ছে, তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে অত্যন্ত দরদ, নম্রতা ও সদিচ্ছাপূর্ণ ব্যবহার করা এবং তাদের মন রক্ষা করতে শেষ সীমা পর্যন্ত যাওয়া ও যেতে রাজি থাকা।

আল্লামা শাওকানী এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন ঃ

মেয়েলোকদের পাঁজরের বাঁকা হাড়ের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, اِنَّهَا مُعَوَّجَةُ الْاَخْلَاقِ لَاتَسْتَقِيْمُ اَبَدًا মেয়েরা স্বভাবতই বাঁকা, তাদের সোজা ও ঋজু করা সম্ভব নয়। যদি কেউ তাকে ঠিক করতে চেষ্টা করে, তবে সে তাকে ভেঙে-চুরে ফেলবে, নষ্ট করবে। আর যে তাকে যেমন আছে তেমনিই থাকতে দেবে, সে তার দ্বারা অশেষ কল্যাণকর কাজ করাতে পারবে, ঠিক যেমন পাঁজরের হাড়। তাকে বানানোই হয়েছে বাঁকা, তাকে সোজা করতে যাওয়ার মানে তাকে ভেঙে ফেলা— চূর্ণ করা। আর যদি তাকে বাঁকাই থাকতে দেয়া হয়, তবে তা দেহকে সঠিক কাজে সাহায্য করতে পারে। শেষ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন ঃ

وَالْحَدِيْثُ فِيْهِ الْاِرْشَادُ اِلٰى مُلَاطِفَةِ النِّسَاءِ وَالصَّبْرِ عَلٰى مَالَا يَسْتَقِيمُ مِنْ اَخْلَاقِهِنَّ وَالتَّنْبِيْهِ عَلٰى اَنَّهُنَّ خُلِقْنَ عَلٰى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِىْ لَا يُفِيْدُ مَعَهَا التَّأْدِيْبُ وَ لَا يَنْجَعُ عِنْدَ هَاالنُّصْحُ فَلَمْ يَبْقِ اِلَّا الصَّبْرُ وَالْمُحَا سَنَةُ وَتَرَكُ التَّاْ نِيْبُ وَالْمُحَاشِنَةُ –

(نيل الاوطار :ج -٦، ص -٣٥٨)

এ হাদীসে নির্দেশ করা হয়েছে যে, মেয়েলোকদের সাথে সব সময়ই ভালো ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। তাদের স্বভাব-চরিত্রে বক্রতা থাকলে (সেজন্যে) অসীম ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। আর সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, মেয়েরা এমন এক স্বভাবের সৃষ্টি, যাকে আদব-কায়দা শিখিয়ে অন্যরকম কিছু বানানো সম্ভব নয়। স্বভাব-বিরোধী নসীহত উপদেশও সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই ধৈর্য ধারণ করে তার সাথে ভালো ব্যবহার করা, তাকে ভর্ৎসনা করা এবং তার সাথে রূঢ় ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বর্জন করা ছাড়া পুরুষদের গত্যন্তর নেই।

নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর এ উক্তিতে তাদের অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এই কথা বলে তাদের অপমান করা হয়নি, না এতে তাদের প্রতি কোনো খারাপ কটাক্ষ করা হয়েছে। এ ধরনের কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী সমাজের জটিল ও নাজুক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে পুরুষ সমাজকে অত্যধিক সতর্ক ও সাবধান করে তোলা। এ কথার ফলে পুরুষরা নারীদের সমীহ করে চলবে, তাদের মনস্তত্ত্বের প্রতি নিয়ত খেয়াল রেখেই তাদের সাথে আচার-ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এ কারণে পুরুষদের কাছে নারীরা অধিকতর আদরণীয়া হবে। এতে তাদের দাম বাড়ল বৈ কমল না একটুকুও।

আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ নারীদের এ বাঁকা স্বভাব দেখে তাদের এমনি ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, বরং ভালো ব্যবহার ও অনুকূল পরিবেশ দিয়ে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা পাওয়াই পুরুষদের কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, নারীদের প্রতি ভালো ব্যবহার করা সব সময়ই প্রয়োজন, তাহলেই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হবে। সেই সঙ্গে মেয়েদের অনেক 'দোষ' ক্ষমা করে দেয়ার গুণও অর্জন করতে হবে স্বামীদের। খুটিনাটি ও ছোটখাটো দোষ দেখেই চটে যাওয়া কোনো স্বামীরই উচিত নয়।

নারী সাধারণত একটু জেদী হয়ে থাকে। নিজের কথার ওপর অটল হয়ে থাকা ও একবার জেদ উঠলে সবকিছু বরদাশত করা নারী-স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা খুঁতখুঁতে মেজাজেরও হয়ে থাকে। কাজেই পুরুষ যদি কথায় কথায় দোষ ধরে, আর একবার কোনো দোষ পাওয়া গেলে তা শক্ত করে ধরে রাখে— কোনোদিন তা ভুলে যেতে রাজি না হয়, তাহলে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যটুকুই শুধু নষ্ট হবে না— তার স্থিতিও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

তার কারণ, নারীদের এই স্বভাবগত দোষের দিক ছাড়া তার ভালো ও মহৎ গুণের দিকও অনেক

রয়েছে। তারা খুব কষ্টসহিষ্ণু, অল্পে সন্তুষ্ট, স্বামীর জন্যে জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করতে সতত প্রস্তুত। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও সন্তান লালন-পালনের কাজ নারীরা— মায়েরা যে কতখানি কষ্ট সহ্য করে সম্পন্ন করে থাকে, পুরুষদের পক্ষে তার অনুমান পর্যন্ত করা সহজ নয়। এ কাজ একমাত্র তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। ঘর-সংসারের কাজ করায় ও ব্যবস্থাপনায় তারা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত, একান্ত বিশ্বাসভাজন ও একনিষ্ঠ। তাই বলা যায়, তাদের মধ্যে দোষের দিকের তুলনায় গুণের দিক অনেক গুণ বেশি।

একজন ইউরোপীয় চিন্তাবিদ পুরুষদের লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ

গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসবজনিত কঠিন ও দুঃসহ যন্ত্রণার কথা একবার চিন্তা করো। দেখো, নারী জাতি দুনিয়ায় কত শত কষ্ট ব্যথা-বেদনা ও বিপদের ঝুঁকি নিজেদের মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকে। তারা যদি পুরুষের ন্যায় ধৈর্যহীনা হতো, তাহলে এতো সব কষ্ট তারা কি করে বরদাশ্‌ত করতে পারত ? প্রকৃত পক্ষে বিশ্বমানবতার এ এক বিরাট সৌভাগ্য যে, মায়ের জাতি স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু, তাদের অনুভূতি পুরুষদের মতো নাজুক ও স্পর্শকাতর নয়। অন্যথায় মানুষের এসব নাজুক ও কঠিন কষ্টকর কাজের দায়িত্ব পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ক্ষমাশীলতা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও স্থায়িত্বের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। যে স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করতে পারে না, ক্ষমা করতে জানে না, কথায় কথায় দোষ ধরাই যে স্বামীর স্বভাব, শাসন ও ভীতি প্রদর্শনই যার কথার ধরন, তার পক্ষে কোনো নারীকে স্ত্রী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে স্থায়ীভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে না। স্ত্রীদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি ক্ষমাসহিষ্ণুতা প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে ঃ

يَـآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا

فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (التغابن : ١٤)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের সম্পর্কে সাবধান! তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা করো, তাদের ওপর বেশি চাপ প্রয়োগ না করো বা জোরজবরদস্তি না করো এবং তাদের দোষ-ত্রুটিও ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনে রাখবে, আল্লাহ্ নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

নবী করীম (স) তাঁর স্ত্রীদের অনেক বাড়াবাড়িই মাফ করে দিতেন। হযরত উমর ফারূকের বর্ণিত একদিনের ঘটনা থেকে তা বাস্তবভাবে প্রমাণিত হয়।

হযরত উমর (রা) একদিন খবর পেলেন, নবী করীম (স) তাঁর বেগমগণকে তাঁদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে তালাক দিয়েছেন। তিনি এ খবর শুনে খুব ভীত হয়ে রাসূলের নিকট উপস্থিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি আপনার বেগমদের তালাক দিয়েছেন ? রাসূল (স) বললেন ঃ না। পরে রাসূল (স) তাঁর সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা বলেছেন। —বুখারী

এ হাদীসকে ভিত্তি করে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

وَفِيْهِ الصَّبْرُ عَلَى الزَّوْجَاتِ وَالْاِغْضَاءِ عَنْ خَطْئِهِنَّ وَالصَّفْحِ عَمَّا يَقَعُ مِنْهُنَّ مِنْ زَلَلٍ فِىْ حَقِّ الْمَرْءِ دُوْنَ مَا

يَكُوْنُ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ - (عمدة القارى : ج - ٢٠، ص - ٣ - ١)

এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীদের পীড়ন ও বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করা, তাদের দোষ-ত্রুটির প্রতি বেশি গুরুত্ব না দেয়া এবং স্বামীর অধিকারের পর্যায়ে তাদের যা কিছু

অপরাধ বা পদস্খলন হয়, তা ক্ষমা করে দেয়া স্বামীর একান্তই কর্তব্য। তবে আল্লাহ্র হক আদায় না করলে সেখানে ক্ষমা করা যেতে পারে না।

স্ত্রীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলবে না

ইসলামে নারীদের কোনোরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে তাদের বিব্রত করে তুলতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে তাদের অবসর দিতে হবে— প্রস্তুতির জন্যে সময় দিতে হবে। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ করে রাতের বেলা বাড়িতে উপস্থিত হলে স্ত্রী নিজেকে অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করতে পারে। এজন্যে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا طَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ اَهْلَهُ لَيْلًا - (بخاری)

তোমাদের কেউ যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাড়িতে অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে আসে, তাহলে পূর্বে খবর না দিয়ে রাতের বেলা হঠাৎ করে বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া উচিত নয়।.

হযরত জাবির (রা) বললেন ঃ 'আমরা এক যুদ্ধে রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। পরে যখন আমরা মদীনায় ফিরে এলাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ঘরে চলে যেতে ইচ্ছা করল। কিন্তু নবী করীম (স) বললেন ঃ

اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلًا لِكَيْ تَمْشِطَ الشَّعْثَةَ وَتَسْتَحِدَّ الْغَيْبَةَ - (بخاری، مسلم)

কিছুটা অবসর দাও। রাতে ঘরে ফিরে যেতে পারবে। এই অবসরে তোমাদের স্ত্রীরা প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জা করে নেবে, গোপন অঙ্গ পরিচ্ছন্ন করবে এবং তোমাদের গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারবে।

মেয়েরা সাধারণত অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকে, তাদের মাথায়ও হয়ত ঠিক মতো চিরুণী করা হয় না। প্রয়োজনীয় সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত হয়েও তারা সব সময় থাকে না। বিশেষত স্বামীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে মেয়েরা নিজেদের সাজ-সজ্জার ব্যাপারে খুবই অসতর্ক হয়ে পড়ে। নবী করীম (স) সাহাবিগণকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘদিন পরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেও সঙ্গে সঙ্গেই সকলকে নিজের নিজের ঘরে ফিরে যেতে দিলেন না। তাদের প্রত্যাবর্তনের খবর সকলের জানা হয়ে গেছে। স্ত্রীরা নিজের নিজের স্বামীকে সাদরে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারছে এই অবসরে। এ দৃষ্টিতে রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত কথার তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। স্বামীর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কারণে স্ত্রী হয়ত ময়লা দেহ ও মলিন বসন পরে রয়েছে। তার মাথার চুলও হয়ত আঁচড়ানো হয়নি। এরূপ অবস্থায় স্বামী যখন তাকে দেখতে পাবে দীর্ঘদিনের বিরহের পর, তখন স্বামী যে নিরাশ ও নিরানন্দের বেদনায় মুষড়ে পড়বে এবং স্ত্রীও যে এরূপ অবস্থায় দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পরও অন্তরঢালা আনন্দ সহকারে স্বামীকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিতা হবে, তা বুঝতে পারা দুনিয়ার স্বামী ও স্ত্রীদের পক্ষে কঠিন নয়। বস্তুত এর দরুন স্বামীদের মন স্ত্রীর প্রতি বিরূপ ও তিক্ত-বিরক্ত হয়ে যেতে পারে, আর স্ত্রীর মনও স্বামীর কাছে ছোট হয়ে যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী কারো মন খারাপ হয়ে যাবার কোনো কারণ যাতে না ঘটতে পারে, এজন্যেই রাসূলে করীম (স) সাহাবীদের উক্তরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যথায় যারা সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে, তাদের জন্যে এ রকম কিছু করণীয় নেই।

স্ত্রীদের ওপর জুলুম অত্যাচার করা নিষেধ

স্ত্রীদের প্রতি অত্যাচার জুলুম করা তো দূরের কথা, বারে বারে তালাক দিয়ে আবার ফেরত নিয়ে স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া ও দাম্পত্য জীবনকে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا - (البقرة : ٢٣١)

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নানাভাবে কষ্টদান ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখ না। যে লোক এরূপ করবে, সে নিজের ওপরই জুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে খেলনার বস্তুতে পরিণত করো না। (সূরা বাকারা ঃ ৩৩)

যদিও আরবে প্রচলিত কুসংস্কার— স্ত্রীকে বারবার তালাক দিয়ে বারবার ফেরত নেয়ার রেওয়াজ নিষিদ্ধ করে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল; কিন্তু স্ত্রীকে কোনো প্রকার অকারণ কষ্ট দেয়া বা তার ক্ষতি করা যে নিষেধ, তা এ আয়াত থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। আয়াত থেকে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, নিজের স্ত্রীকে যে লোক কষ্ট দেবে, জুলুম-পীড়ন করবে, পরিণামে তার নিজের জীবনই নানাভাবে জর্জরিত হয়ে উঠবে, সে নিজেই কষ্ট পাবে, তার দাম্পত্য জীবনই দুঃসহ তিক্ততায় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখলে যে শান্তিপূর্ণ সুখময় জীবন যাপন সম্ভব, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে। দুনিয়ায় তার প্রতি একদিকে যেমন আল্লাহ্‌র অসন্তোষ জেগে উঠবে, তেমনি জনগণ ও স্ত্রীলোকদের সমাজেও তার প্রতি জাগবে রুদ্র রোষ ও ঘৃণা।

বস্তুত স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি ও মধুর ব্যবহার করা এবং তাদের কোনোরূপ কষ্ট না দিয়ে শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তার স্ত্রীকে অকারণ জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, ক্ষতিগ্রস্থ করতে চেষ্টিত হয়, তবে সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ্‌র গজব পড়ার যোগ্য হবে। আল্লামা আ-লুসীর মতে তার নিজের কষ্ট ও ক্ষতি হবে।

بان فوت على نفسه منافع الدين من الثواب الحاصل على حسن المعاشرة منافع الدنيا من عدم رغبة النساء به بعد لاشتهاره بهذ الفعل القبيح - (روح المعانى : ج -١، ص -١٤٢)

এভাবে যে, সে মধুর পারিবারিক জীবন যাপনের ফলে লভ্য সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে বলে সে দ্বীনের ফায়দা হারাবে আর দুনিয়ার ফায়দা হারাবে এভাবে যে, তার এ বীভৎস কাজের প্রচার হয়ে যাওয়ার কারণে নারী সমাজ তার প্রতি বিরূপ ও বিরাগভাজন হয়ে পড়বে।

নবী করীম (স) তাঁর নিজের ভাষায় স্ত্রীদের মারপিট করতে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন। বলেছেন ঃ

لَا تَضْرِبَنَّ ظَعِيْنَتَكَ ضَرْبَكَ اَمَيَّتَكَ - (ابوداؤد)

তোমার স্ত্রী— অঙ্কশায়িনীকে এমন নির্মমভাবে মারধোর করো না, যেমন করে তোমরা মেরে থাকো তোমাদের ক্রীতদাসীদের।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জামায়াতা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ

لَا يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَتَهٗ جَلْدَ الْعَبْدَ ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِىْ اٰخِرِ الْيَوْمِ - (بخارى : ج -٢، ص -٤ -٧)

তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসদের মারার মতো না মারে, আর মারধোর করার পর দিনের শেষে তার সাথে যেন যৌন সঙ্গম না করে।

অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে যৌন-সঙ্গম করা তো এক স্বাভাবিক কাজ, কিন্তু স্ত্রীকে একদিকে মারধোর করা আর অপরদিকে সেদিনই তার সাথে যৌন সঙ্গম করা অত্যন্ত ঘৃণার্হ কাজ। এ দুয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

وفيه استبعاد وقوع الا مرين من العاقل ان يبالغ فى ضرب امراته ثم يجامعها فى بقية يومه او ليلته ذلك ان المضا جعة انما تستحسن مع ميل النفس والرغبة والمضروب غالبا ينفر من ضاربه- (عمدة القارى : ج -٢٠، ص- ١٩٣)

স্ত্রীকে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করা এবং সে দিনের বা সে রাতেরই পরবর্তী সময়ে তারই সাথে যৌন সঙ্গম করা— এ দুটো কাজ এক সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব হতে পারে না— হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত বাণীতে সেই কথাই বোঝানো হয়েছে। আর তারও কারণ এই যে, যৌন সঙ্গম সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ হতে পারে যদি তা মনের প্রবল ঝোঁক ও তীব্র অদম্য আকর্ষণের ফলে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রহৃতের মন প্রহারকারীর প্রতি যে ঘৃণা পোষণ করে, তা সর্বজনবিদিত।

বস্তুত স্ত্রীকে মারধোর না করা, তার ত্রুটিবিচ্যুতি যথাসম্ভব ক্ষমা করে দেয়া ও তার প্রতি দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই অতি উত্তম নীতি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বয়ং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) এই নীতি ও চরিত্রেই ভূষিত ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمْرَاَةً لَهُ وَ لَا خَادِمًا قَطٌّ وَ لَا ضَرَبَ بِيَدِهِ قَطٌّ لَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ تَنْتَهِكْ مَحَارِمَ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمْ لِلّٰهِ - (نسائى)

রাসূলে করীম (স) তাঁর কোনো স্ত্রীকে কিংবা কোনো চাকর-খাদেমকে কখনো মারধোর করেন নি— না তাঁর নিজের হাত দিয়ে, না আল্লাহ্র পথে। তবে যদি কেউ আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ করে, তবে সেই আল্লাহ্র জন্যে তার প্রতিরোধ গ্রহণ করতেন। (سبل السلام : ج-٣، ص-١٦٤)

স্ত্রীদের মারধোর করা, গালাগাল করা এবং তাদের সাথে কোনোরূপ অন্যায় জুলুম জাতীয় আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করে রাসূলে করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

لَا تَضْرِبُوْ هُنَّ وَ لَا تَقْبَحُوْ هُنَّ - (ابوداؤد)

তোমরা স্ত্রীদের আদৌ মারধোর করবে না এবং তাদের মুখমণ্ডলকে কুশ্রী ও কদাকার করে দিও না।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

لَا تَضْرِبُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ - (ابوداؤد)

আল্লাহ্র দাসীদের তোমরা মারধোর করো না।

লক্ষণীয় যে, স্ত্রীদেরকে এখানে 'আল্লাহ্র দাসী' বলা হয়েছে, পুরুষদের বা স্বামীদের দাসী নয়। তাই তাদের অকারণ মারধোর করা কিংবা তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার কোনো অধিকার স্বামীদের নেই।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

وَ لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَ لَا تَقْبَحْ وَ لَا تَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ - (ابودؤد)

তোমরা স্ত্রীদের মুখের ওপর মারবে না, মুখমণ্ডলের ওপর আঘাত দেবে না, তাদের মুখের শ্রী বিনষ্ট করবে না, অকথ্য ভাষায় তাদের গালাগাল করবে না এবং নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাদের বিচ্ছিন্নাবস্থায় ফেলে রাখবে না।

তবে কি স্ত্রীদের মারধোর করা আদৌ জায়েয নয় ? উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম খাত্তাবী লিখেছেন ঃ

وَ فِيْ قَوْلِهِ وَ لَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ الضَّرْبِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ اِلَّا اَنَّهُ ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ - (معالم السنن : ج -٣، ص -٢٢١)

রাসূলের 'মুখের ওপর মারবে না' উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুখমণ্ডল ব্যতীত দেহের অন্যান্য অংশের ওপর স্ত্রীকে মারধোর করা সঙ্গত। তবে শর্ত এই যে, তা মাত্রায় বেশি, সীমালংঘনকারী ও অমানুষিক মার হতে পারবে না।

ওপরে উদ্ধৃত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল কাহলানী বুখারী লিখেছেনঃ

وَ فِي الْحَدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلٰى جَوَازِ ضَرْبِ الْمَرْأَةِ ضَرْبًا خَفِيْفًا - (سبل السلام : ج -٣، ص -١٦٤)

হাদীসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীকে খুব হালকাভাবে সামান্য মারধোর করা জায়েয।

কিন্তু স্ত্রীকে মারধোর করা কখন ও কি কারণে করা সংগত ?.....এ পর্যায়ে প্রথমে কুরআন মজীদের নিম্নোদ্ধৃত আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। আয়াতটি হলো ঃ

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا - (النساء : ٣٤)

আর যেসব স্ত্রীলোকের অনানুগত্য ও বিদ্রোহের ব্যাপারে তোমরা ভয় করো, তাদের ভালোভাবে বুঝাও, নানা উপদেশ দিয়ে তাদের বিনয়ী বানাতে চেষ্টা করো। পরবর্তী পর্যায়ে মিলন-শয্যা থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখ। আর (শেষ উপায় হিসেবে) তাদের মারো। এর ফলে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের ওপর অন্যায় ব্যবহারের নতুন কোনো পথ খুঁজে বেড়িও না। .... নিশ্চয় আল্লাহ্ই হচ্ছেন সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।

এ আয়াতে দুনিয়ার মুসলিম স্বামীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। 'ভয় করা' মানে জানতে পারা অথবা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যে, স্ত্রী স্বামীকে মানছে না, অথচ স্বামীকে মেনে চলাই স্ত্রীর কর্তব্য। এরূপ অবস্থায় স্বামী কি করবে, তা-ই বলা হয়েছে এ আয়াতে। এখানে প্রথমে বলা হয়েছে স্ত্রীকে ভালোভাবে বোঝাতে, উপদেশ দিতে ও নসীহত করতে, একথা তাকে জানিয়ে দিতে যে, স্বামীকে মান্য করে চলা, স্বামীর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলাই নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। অন্যথায় তার ইহকালীন দাম্পত্য জীবন ও পারিবারিক জীবন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে যাবে, আর পরকালেও তাকে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, অমান্যকারী স্ত্রীকে মিলন-শয্যা থেকে সরিয়ে রাখা— তার সাথে যৌন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা। অন্য কথায় তাকে না শয্যা-সঙ্গী বানাবে, না তার সাথে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখবে। আর তৃতীয়ত বলা হয়েছে তাকে মারধোর করতে। কিন্তু এ মারধোর সম্পর্কে একথা স্পষ্ট যে, তা অবশ্যই শিক্ষামূলক হতে হবে মাত্র। ক্রীতদাস ও জন্তু-জানোয়ারকে যেমন মারা হয়, সে রকম মার দেয়ার অধিকার কারো নেই।[১]

---

১. 'ফতোয়ায়ে কাজীখান'-এ বলা হয়েছে ঃ

للزوج ان يضرب المرأة على اربعة منها ترك الزينة اذا اراد الزوج الزينة والثانية ترك الاجابة اذا اراد الجماع وهى طاهرة والثالثة ترك الصلوة .... والرابعة الخروج عن منزله بغير اذنه - (بذل المجهود : ج -٣، ص -٤٤)

কিন্তু এ সব কয়টি কাজ স্বামী এক সঙ্গে করবে, কিংবা একটার পর একটা প্রয়োজনানুপাতে করবে।........ আয়াতের ধরণ ও বাচনভঙ্গী দেখে বাহ্যত সব কয়টি কাজ এক সঙ্গে করারই অনুমতি রয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু বিবেক ও সুস্থ বুদ্ধির নির্দেশ এই যে, এই কয়টি কাজ এক সঙ্গে একই সময় করবে না, ক্রমিক নীতিতে ও প্রয়োজনানুপাতে একটির পর একটি করবে। কিন্তু এ কাজ করার অনুমতিই দেয়া হয়েছে স্ত্রীকে অনুগতা বানাবার উদ্দেশ্যে। নিছক কষ্ট বা শাস্তি দেয়াই এর লক্ষ্য নয়। কাজেই একটি একটি করে তার সফলতা যাচাই করবে। তা ব্যর্থ হলে পরেরটা করবে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র পরিচয় দিয়ে যা বলা হয়েছে, তার মানে আল্লামা শাওকানীর ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

اشارة الى الازواج بخفض الجناح ولين الجانب اى وان كنتم تقد رون عليهن فاذكروا قدرة الله عليكم فانها فوق كل قدرة والله بالمرصاد لكم - (فتح القدير : ج ، ص -٤٢٥

আয়াতে স্বামীদের বলা হয়েছে স্ত্রীদের জন্যে ভালোবাসার বাহু বিছিয়ে দিতে, পার্শ্ববিনম্র করতে অর্থাৎ তোমরা স্বামীরা যদি স্ত্রীদের প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করার ক্ষমতা রাখ, তাহলেও তোমাদের উচিত তোমাদের ওপর স্থাপিত আল্লাহ্‌র অসীম ও অতুলনীয় ক্ষমতার কথা স্মরণ করা। কেননা তা হচ্ছে সর্বক্ষমতার ঊর্ধ্বে— অধিক। মনে রেখ, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছেন।[১]

স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে একথা বলে দুনিয়ার স্বামীদের বিশেষভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, যেন তারা নারী অবলার প্রতি কোনোরূপ দুর্ব্যবহার ও অন্যায়-অত্যাচার করতে সাহসী না হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বামীকে মেনে নেয়, স্বামীর সাথে মিলমিশ রক্ষা করে বসবাস করতে রাজি হয় এবং তা-ই করে, তাহলে স্বামীর কোনো অধিকার নেই তার ওপর কোনোরূপ অত্যাচার করার, তাকে একবিন্দু কষ্ট ও জ্বালাতন দেয়ার! আয়াতের শেষাংশে কোনো উপযুক্ত কারণ ব্যতীত স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার যে কতদূর অন্যায় তার দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, তারা যদিও অবলা, দুর্বল, তোমাদের জুলুম-পীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করার সাধ্য যদিও তাদের নেই; তোমাদের অত্যাচারের

স্বামী স্ত্রীকে চারটি অবস্থায় বা চারটি কারণে মারতে পারে। এক, স্বামীর ইচ্ছা ও নির্দেশ সত্ত্বেও স্ত্রী যদি সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করে। দুই, স্বামী যৌন সঙ্গমের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সেজন্যে প্রস্তুত না হওয়া তার পবিত্র ও হায়যমুক্ত থাকা সত্ত্বেও। তৃতীয়, স্ত্রী যদি নামায তরক করে এবং চতুর্থ, স্ত্রী যদি স্বামীর বিনানুমতিতে ঘর থেকে বাইরে চলে যায়।

১. আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই মনে হয় যে, স্ত্রীকে মারবার ব্যাপারে যতদূর সম্ভব হালকা ভাব অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়ায-নসীহত, বোঝানো-সমঝানোর আদেশ দিয়েছেন সর্ব প্রথম। তারপরে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে মিলন-শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা ও শেষ পর্যায়ে মারবার কাথা বলেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর মতে এর তাৎপর্য হচ্ছে ঃ

تنبيه يجرى مجرى التصريح فى انه مهما حصل الغرض بالطريق الاخف وجب الاكتفابه ولم يجز الاقدام على الطريق الاشق -

একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া যে, অপেক্ষাকৃত হালকা শাসনে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে পরে তাতেই ক্ষান্ত করা উচিত এবং তার পরও অধিকতর কঠোর নীতি অবলম্বনে অগ্রসর হওয়া কিছুতেই জায়েয নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ভিত্তেতে বলেছেন ঃ

يهجر ها فى المضجع فان اقبلت والا فقد اذن الله لك ان تضربها ضربا غير مبرح ولا تسكر لها عظما فان اقبلت والا فقد احل الله لك منها الفدية - (محاسن التاويل : ج -٤ ،ص -١٢٢٢)

প্রথমে তাকে মিলন-শয্যা থেকে সরিয়ে দেবে, এতে যদি সে মেনে যায় ভলো, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন তাকে মারবার; কিন্তু সে মার নির্দয় অমানুষিক হবে না। মারের চোটে তার হাড় ভেঙ্গে দিতে পারবে না। এতে যদি সে ফিরে আসে ভালো কথা; অন্যথায় তুমি তার কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করে তাকে তালাক দিয়ে দিতে পারো।

প্রতিশোধ গ্রহণ করতে তারা যদিও অক্ষম; কিন্তু তোমাদের ভুললে চলবে না যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন প্রবল পরাক্রান্ত, শ্রেষ্ঠ, শক্তিমান; তিনি অবশ্যই প্রত্যেক জালিমের জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং সেজন্যে কঠোর শাস্তিদান করবেন। অতএব তোমরা শক্তিমান বলে স্ত্রীদের ওপর অন্যায়ভাবে ও অকারণ জুলুম করতে উদ্যত হবে, তা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহার ঈমানের লক্ষণ

স্ত্রীদের ওপর অন্যায়ভাবে, অকারণে ও উঠতে-বসতে আর কথায়-কথায় কোনোরূপ দুর্ব্যবহার বা মারধোর করতে শুধু নিষেধ করেই ক্ষান্ত করা হয়নি, ইসলাম আরো অগ্রসর হয়ে স্ত্রীদের প্রতি সক্রিয়ভাবে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বামীদেরকে।

এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াত ঃ

وَ عَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

স্ত্রীদের সাথে যথাযথভাবে খুব ভালো ব্যবহার করবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাসেমী লিখেছেন ঃ

صَاحِبُوْ هُنَّ بِالْاِ نْصَافِ فِى الْفِعَلِ وَالْاِجْمَالِ فِى الْقَوْلِ حَتّٰى لَا تَكُوْنُوْا سَبَبَ النُّشُوْزِ اَوْسُوْءِ الْخُلُقِ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ حِيْنَئِذٍ - (محاسن التاويل : ج- ٤، ص- -١١٥)

স্ত্রীদের সাথে কার্যত ইনসাফ করে আর ভালো ও সম্মানজনক কথা বলে একত্রে বসবাস করো যেন তোমরা স্ত্রীদের বিদ্রোহ বা চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে না বসো। এ ধরনের কোনো কিছু করা তোমাদের জন্যে আদৌ হালাল নয়।

আল্লামা আ-লুসী লিখেছেন ঃ

خالقوهن بالمعروف وهو مالا ينكره الشرع والمروة - (روح المعانى : ج -٤، ص - ٢٤٣)

তাঁদের সাথে ভালোভাবে ব্যবহার করো। আর 'ভালোভাবে' মানে এমনভাবে যা শরীয়ত ও মানবিকতার দৃষ্টিতে অন্যায় নয়— খারাপ নয়।

এ 'ভালোভাবে' কথার মধ্যে এ কথাও শামিল ঃ

ان لايضربها ويسىء الكلام معها ويكون منبسط الوجه لها - (ايضا)

স্ত্রীকে মারধোর করবে না, তার সাথে খারাপ কথাবার্তা বলবে না এবং তাদের সাথে সদা হাসিমুখে ও সন্তুষ্টচিত্তে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে।

তাফসীরকারদের মতে এ আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি ঘরের কাজ-কর্ম করতে অক্ষম হয় বা তাতে অভ্যস্ত না হয়, তাহলে স্বামী তার যাবতীয় কাজ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। (تفسير محاسن التاويل، روح المعانى)

স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা পূর্ণ ঈমান ও চরিত্রের লক্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ - (ترمذى)

যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, নিষ্কলুষ সে সবচেয়ে বেশি পূর্ণ ঈমানদার। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভালো।

অপর এক হাদীসে স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসূলে করীম (স)-এর নিজের ভূমিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَ اَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ وَ اِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَادْعُوْالَهٗ -

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লোক সে, যে তার পরিবার ও স্ত্রী-পরিজনের পক্ষে ভালো। আর আমি আমার নিজের পরিবারবর্গের পক্ষে তোমাদের তুলনায় অনেক ভালো। তোমাদের সঙ্গী-স্ত্রী বা স্বামী— যদি মরে যায়, তাহলে তার কল্যাণের জন্যে তোমরা অবশ্যই দো'আ করবে।

হযরত আবূ যুবাব (রা) বলেন, একদা নবী করীম (স) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ

لَاتَضْرِبُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ —তোমরা আল্লাহ্‌র দাসীদের মারধোর করো না।

তখন হযরত উমর ফারূক (রা) রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ

ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ -

আপনার এ কথাটি শুনে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের ওপর খুবই বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে।

তখন নবী করীম (স) তাদেরও মারবার অনুমতি দিলেন। একথা জানতে পেরে বহু সংখ্যক মহিলা রাসূলের ঘরে এসে উপস্থিত হলো এবং তারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অভিযোগ পেশ করলো। সব কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন ঃ

لَقَدْ طَافَ بِاٰلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ اُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ - (ابوداود)

বহু সংখ্যক মহিলা মুহাম্মদের পরিবারবর্গের নিকট এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে গেছে। মনে হচ্ছে, এসব স্বামী তোমাদের মধ্যে ভালো লোক নয়।

অন্য কথায় ঃ

بَلْ خِيَارُكُمْ مَنْ لَا يَضْرِبُهُنَّ وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُنَّ وَيُوَدُّ بِهِنَّ وَ لَا يَضْرِبُهُنَّ ضَرْبًا شَدِيْدًا يُؤَدِّيْ اِلٰى شِكَايَتِهِنَّ -

বরং তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক হচ্ছে তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের মারপিট করে না; বরং তাদের অনেক কিছুই তারা সহ্য করে নেয়। (অথবা বলেছেন) তাদের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা পোষণ করে, তাদের কঠিন মার মারে না এবং তাদের অভাব-অভিযোগগুলো যথাযথভাবে দূর করে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক উপহার বিনিময়

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রেম-ভালোবাসার স্থায়িত্ব ও গভীরতা বিধানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হচ্ছে পারস্পরিক উপহার-উপঢৌকন বিনিময়। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে মাঝে-মধ্যে নানা ধরনের চিত্তাকর্ষক দ্রব্যাদি দেয়া। স্ত্রীরও যথাসাধ্য তাই করা উচিত। যার যে রকম সম্বল ও সামর্থ্য, সেই অনুপাতে যদি পরস্পরে উপহার-দ্রব্যের আদান-প্রদান হয়, তাহলে তার ফলে পারস্পরিক আকর্ষণ, কৌতুহল ও হৃদয়াবেগ বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি থাকবে সদা সন্তুষ্ট। এজন্যে রাসূলে করীম (স)-এর একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ সব সময় স্মরণে রাখা কর্তব্য। তা হলো ঃ تَهَادُوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ তোমরা পরস্পর উপহার-উপঢৌকনের আদান-প্রদান করো। দেখবে, এর ফলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে— পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

تَهَادُوْا فَانَّ الْهَدْيَةَ تَذْهَبُ وَغْرِ الصَّدْرِ - (ترمذى، احمد)

তোমরা পরস্পরে হাদিয়া-তোহ্ফার আদান-প্রদান করবে, কেননা হাদিয়া-তোহ্ফা দিলের ক্লেদ ও হিংসা-দ্বেষ দূর করে দেয়।

এর কারণ সুস্পষ্ট। মানুষের দিলে ধন-মালের মায়া খুবই তীব্র ও গভীর। তা যদি কেউ অন্য কারো নিকট থেকে লাভ করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার মন তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, আকৃষ্ট হয় এবং মাল-সম্পদ দানকারীর মনও ঝুকে পড়ে তার প্রতি, যাকে সে তা দান করল।

(باوغ الامانى شرح مسند احمد -ج -١٥ ص- ١٦١)

ইবরাহীম ইবনে ইয়াজীদ নখ্য়ী বলেছেন ঃ

هِبَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَهِبَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا جَائِزَةٌ -

পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীকে উপহার দান খুবই বৈধ কাজ। তিনি আরো বলেছেন ঃ

اِذَا وَهَبَتْ لَهُ اَوْ وَهَبَ لَهَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَطِيَّتُهُ -

স্ত্রী যদি স্বামীকে কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীকে কোনো উপহার দেয়, তবে তা তাদের প্রত্যেকের জন্যে হবে তার পাওয়া দান।

কিন্তু এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ হলো, কেউই অপরের দেয়া উপহার ফেরত নিতে বা দিতে পারবে না। ইবরাহীম নখ্য়ী বলেছেন ঃ

وَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنْ يَّرْجِعَ فِىْ هِبَتِهِ -

এ দুয়ের কারোর পক্ষেই তার নিজের দেয়া উপহার ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয বলেছেন, 'এভাবে উপহার আদান-প্রদান করলে কেউই কারোরটা ফিরিয়ে দেবে না, ফিরেয়ে নেবে না।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

لَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَ لَا الزَّوْجَةُ عَلٰى الزَّوْجِ فِيْمَا وَهَبَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخِرِ -

(عمدة القارى : ج -١٣، ص -١٤٨)

স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে যা কিছু একবার দিয়ে দিয়েছে, তা ফেরত নেয়া কারো পক্ষেই জায়েয নয়।

ইবনে বাত্তাল বলেছেন ঃ কারো কারো মতে স্ত্রী তার দেয়া জিনিস ফিরিয়ে নিলেও নিতে পারে; কিন্তু স্বামী তার দেয়া উপহার কিছুতেই ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মান-অভিমান অনেক সময় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব করে। অনেক সময় তা সীমাতিক্রম করে যায়। অনেক সময় কথার কাটাকাটি ও তর্ক-বিতর্কেও পরিণত হয়ে পড়ে। রাসূলে করীম (স)-এর দাম্পত্য জীবনেও তা লক্ষ্য করা গিয়েছে। হযরত উমরের বেগম একদিন হযরত উমরকেই বললেন ঃ

فَوَ اللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ لِيُرَاجِعْنَهُ وَ اِنَّ اِحْدَا هُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلَ - (بخارى)

আল্লাহ্‌র কসম, নবীর বেগমরা পর্যন্ত তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন। এমন কি তাঁদের এক-একজন রাসূলকে দিনের বেলা ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত অভিমান করে থাকেন।

তখন হযরত উমর (রা) চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ও সত্যাসত্য জানতে চাইলেন। জবাবে হাফসা হ্যাঁ-সূচক উক্তি করলেন। হযরত উমর এর পরিণাম ভয়াবহ মনে করে কন্যাকে সাবধান করে দিলেন ও বললেন ঃ

لَا تَسْتَكْثِرِى النَّبِىَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِىْ شَىْءٍ وَلَا تَهْجُرَ بِهِ وَسَلِىْ مَا بَدَالَكِ - (بخارى)

সাবধান! তুমি রাসূলের নিকট বেশি বেশি জিনিস পেতে চাইবে না। তাঁর কথায় মুখের ওপর জবাব দেবে না, রাগ করে কখনো তাঁকে ত্যাগ করবে না। আর তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে তা আমার নিকট চাইবে।

فيه بذل الرجل المال لا بنته لتحسين عشرة زوجها لان ذالك صيانة لعرضه وعرضها وبذل المال فى صيانة العرض واجب وفيه تعريض الرجل لا بنته بترك الاستكثار من الزوج واذا كان ذلك يؤذيه ويحرجه - (عمدة القارى : ج -٢٠، ص- ٣ -١)

নিজের কন্যার দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্যে অর্থ ব্যয় করার একটা নির্দেশ এতে নিহিত রয়েছে। আর এ হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই মর্যাদা রক্ষার ব্যাপার এবং এ উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য। জামাতার নিকট মেয়ে বেশি বেশি জিনিস চাইলে তার কষ্ট হতে পারে মনে করে কন্যার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হওয়ারও নিদর্শন এতে রয়েছে।

ইবাদত-বন্দেগী ও কৃচ্ছ্র সাধনা অনেক প্রশংসার কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু তা করতে গিয়ে স্ত্রীর অধিকার হরণ করা, তার পাওনা যথারীতি ও পুরাপুরি আদায় না করা, তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করা নিশ্চয়ই বড় গুনাহ। নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا - (بخاری)

নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার ওপর একটা অধিকার রয়েছে।

কেবল স্ত্রীর অধিকার স্বামীর ওপর, সে কথা নয়, স্বামীরও অধিকার রয়েছে স্ত্রীর ওপর। আল্লামা বদরুদ্দীন এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ حَقٌّ عَلَى الْاٰخِرِ - (عمدة القاری : ج -٢٠، ص -١٨٨)

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে প্রত্যেকের ওপর।

স্বামীর উপর স্ত্রীর যা কিছু অধিকার, তার মধ্যে একটি হচ্ছে তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন। আর সাধারণভাবে তার প্রাপ্য হচ্ছে ঃ

اَنْ تَطْعِمْهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَااِذَا اكْتَسَيْتَ - (ابوداؤد)

তাকে খাবার দেবে যখন যেমন তুমি নিজে খাবে এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দেবে, যেমন মানের পোশাক তুমি নিজে গ্রহণ করবে।

এ হাদীসের তাৎপর্য মওলানা খলীলুর রহমান লিখেছেন নিম্নরূপ ঃ

ای یجب علیك اطعام الزوجة وکسوتها عند قدرتك علیهما لنفسك - (بزل المجهود : ج -٣، ص-٤٤)

স্ত্রীর খোরাক ও পোশাক যোগাড় করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য, যখন সে নিজের জন্যে এগুলোর ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে।

আল্লামা আল-খাত্তাবী লিখেছেন ঃ

فی هذا ایجاب النفقة والکسوة لها ولیس فی ذلك حد معلوم وانما هو علی المعروف وعلی قدر وسع الزوج وجدته واذا جعله النبی صلعم حقا لها فهو لازم للزوج حضراوغاب وان لم یجده فی وقته کان دینا علیه الی ان یودیه الیها کسائرا الحقوق الواجبة - (معالم السنی : ج- ٢، ص -٢٢١)

এ হাদীস স্ত্রীর খোরাক-পোশাকের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব করে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই, প্রচলন মতোই তা করতে হবে, করতে হবে স্বামীর সামর্থ্যানুযায়ী। আর রাসূলে করীম (স) যখন একে 'অধিকার' বলেছেন তখন তা স্বামীর অবশ্য আদায় করতে হবে— সে উপস্থিত থাক, কি অনুপস্থিত। সময়মতো তা পাওয়া না গেলে তা স্বামীর ওপর অবশ্য দেয় ঋণ হবে— যেমন অন্যান্য হক-অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে।

এতদ্ব্যতীত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়াও স্ত্রীর একটি অধিকার স্বামীর ওপর এবং তা স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর প্রতি। স্বামী যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়, তবে তাতে স্ত্রীর

মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যাওয়া স্বাভাবিক। কেননা তাতে প্রমাণ হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মন জয় করার জন্যে বিশেষ যত্ন নিয়েছে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারেই সে স্ত্রীর নিকট হাজির হয়েছে। অপরিচ্ছন্ন ও মলিন দেহ ও পোশাক নিয়ে স্ত্রীর নিকট যাওয়া স্বামীর একেবারেই অনুচিত। স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর ইচ্ছানুরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও সে অবস্থায়ই স্বামীর নিকট যাওয়া। এজন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, সাবান ও অন্যান্য জরুরী প্রসাধন দ্রব্য সংগ্রহ করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। হযরত ইবনে আব্বাস এ পর্যায়ে একটি নীতি হিসেবে বলেছেন ঃ

إِنِّيْ لَأُحِبُّ اَنْ اَتَزَيَّنَ لِلْمَرْاَةِ كَمَا اُحِبُّ اَنْ تَتَزَيَّنَ لِيْ - (ابن جرير، ابن حاتم)

আমি স্ত্রীর জন্যে সাজসজ্জা করা খুবই পছন্দ করি, যেমন পছন্দ করি স্ত্রী আমার জন্যে সাজসজ্জা করুক।

স্ত্রীর বিপদে সহানুভূতি প্রদর্শন

স্ত্রীর বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে তার প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থা করা স্বামীরই দায়িত্ব। বস্তুত স্ত্রী সবচেয়ে বেশী দুঃখ পায় তখন, যখন তার বিপদে-শোকে তার স্বামীকে সহানুভূতিপূর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখতে পায় না অথবা স্ত্রীর যখন কোন বিপদ হয়, শোক হয় কিংবা রোগ হয়, তখন স্বামীর মন যদি তার জন্যে দ্রবীভূত না হয়, বরং তখন স্বামীর মন মৌমাছির মতো অন্য ফুলের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়, তখন বাস্তবিকই স্ত্রীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কোনো অবধি থাকে না। এজন্যে নবী করীম (স) স্ত্রীর প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতিপূর্ণ হবার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এর সাধারণ নিয়ম হিসেবে বলেছেন ঃ

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ (رياض الصالحين)

যে লোক নিজে অপরের জন্যে দয়াপূর্ণ হয় না, সে কখনো অপরের দয়া-সহানুভূতি লাভ করতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ক্ষেত্রে এ কথা অতীব বাস্তব। এজন্যে স্ত্রীদের মনের আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বামীর একান্তই কর্তব্য।

এ প্রসঙ্গে হযরত উমর ফারূকের একটি ফরমান স্মরণীয়। তিনি এক বিরহিণী নারীর আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখতে পেয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। তখন তিনি তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

كم اكثر ما تصبر المراة عن زوجها -

মেয়েলোক স্বামী ছাড়া বেশির ভাগ কদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারে ?

হযরত হাফসা বললেন ঃ اربعة اشهر — 'চার মাস।' তখন হযরত উমর বললেন ঃ

لا احبس احدا من الجيوش اكثر من ذالك -

সৈন্যদের মধ্যে কাউকে আমি চার মাসের অধিক বাইরে আটকে রাখব না।

رواه مالك عن عبد الله بن دينار - (محاسن التاويل : ج -٣، ص -٥٨٠)

তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে সব সেনাধ্যক্ষকে লিখে পাঠালেন ঃ

لَا يَتَخَلَّفُ الْمُتَزَوِّجُ عَنْ اَهْلِهٖ اَكْثَرَ مِنْهَا -

এই (চার মাসের) অধিক কাল কোনো বিবাহিত ব্যক্তিই তার স্ত্রী-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে।

এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, স্ত্রীর মনের কামনা-বাসনা ও আন্তরিক ভাবধারার প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। আর স্ত্রীদের পক্ষে স্বামীহারা হয়ে বেশি দিন ধৈর্য ধরে থাকা সম্ভব নয়— এ কথা তার কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে ঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ج فَاِنْ فَآءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - (البقرة :٢٢٦-٢٢٧)

যেসব লোক তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে কসম খেয়ে বসে যে, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ইত্যাদি করবে না, তাদের জন্যে মাত্র চার মাসের মেয়াদ অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে তারা যদি ফিরে আসে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমা মার্জনাকারী ও অতিশয় দয়াবান। আর তারা যদি তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে আল্লাহ্ সব শোনেন ও সব জানেন।

এ আয়াতে 'ঈলা' সম্পর্কে ফয়সালা দেয়া হয়েছে। ঈলা (الايلاء) শব্দের অর্থ হচ্ছে, الامتناع باليمين 'কসম করে কোনো কাজ না করা— 'কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকা' আর ইসলামী শরীয়তের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে ঃ

اَلْاِ مْتِنَاعُ بِالْيَمِيْنِ مِنْ وَطْوِ الزَّوْجَةِ -

কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করা— স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করা থেকে বিরত থাকা।

আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করার কিরা করবে তাদের জন্যে চার মাসের অবসর। এ চার মাস অতিবাহিত হবার পরে হয় সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তাকে ফিরিয়ে নেবে, আর না হয় তালাক দিয়ে তাকে চিরতরে বিদায় করে দেবে।

(تفسير فتح القدير للشوكانى : ج -١،ص -٢٠٧، محاسن التاويل : ج -٣ ص -٥٨٠)

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعاللضرار عن الزوجة وقدكان اهل الجاهلية يؤ لون الشنة والسنتين واكثر من ذلك يقصدون بذلك ضرارالنساء - (فتح القدير : ج -١، ص -٢٠٧)

আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর ক্ষতি হয় এমন কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই মেয়াদের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। জাহিলিয়াত যুগে লোকেরা এক বছর, দুই বছর কি ততোদিক কালের জন্য 'ঈলা' করত আর তাদের উদ্দেশ্য হতো স্ত্রীলোককে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এসব ক্ষতি-লোকসানের পথ বন্ধ করার এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের কথাগুলো বলে দিয়েছেন।

স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ না করা

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার হচ্ছে এই যে, সে স্ত্রীর গোপন কথা অপরের নিকট প্রকাশ করে দেবে না। নবী করীম (স) তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছেন এ ধরনের কোনো কথা প্রকাশ করতে। বলেছেন ঃ

اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةَ الرَّجُلُ يُفْضِيْ اِلٰى اِمْرَاَتِه وَتُفْضِيْ اِلَيْهِ ثُمَّ يُنْشِرُ سِرَّهَا -

(مسلم، مسند احمد)

যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় ও স্ত্রী মিলিত হয় তার স্বামীর সাথে, অতঃপর সে তার স্ত্রীর

গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়— প্রচার করে, সে স্বামী আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

অর্থাৎ স্বামী যাবতীয় গোপন বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, তার সাথে যৌন মিলন সম্পন্ন করে, স্ত্রী নিজকে— নিজের পূর্ণ সত্তা— দেহ ও মনকে স্বামীর নিকট উন্মুক্ত করে দেয়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর যাবতীয় গোপন বিষয় অবহিত হয়ে তা অপর লোকের নিকট প্রকাশ করে দেয়, তবে তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না। আর আল্লাহ্র দৃষ্টিতেও এ ব্যক্তির মর্যাদা নিকৃষ্টতম হতে বাধ্য। কেননা এর মতো হীন ও জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। ইমাম নববীর মতে এ কাজ হচ্ছে হারাম।

তিনি উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন ঃ

فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَحْرِيْمٌ اِفْشَاءُ الرَّجُلِ مَا يَجْرِىْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ امْرَاَتِهٖ مِنْ اُمُوْرِالْاِ سْتِمْتَاعِ -

(نسووى، شرج مسلم : ج-١)

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে যৌন-সম্ভোগ সম্পর্কিত গোপন বিষয় ও ঘটনা প্রকাশ করা এ হাদীসে সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

একদিন রাসূলে করীম (স) নামাযের পরে উপস্থিত সকল সাহাবীকে বসে থাকতে বললেন এবং প্রথমে পুরুষদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ اِذَا اَتٰى اَهْلَهٗ اَغْلَقَ بَابَهٗ وَاَرْخٰى سَتْرَهٗ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ بِاَهْلِىْ كَذَا وَ فَعَلْتُ بِاَهْلِىْ كَذَا فَسَكَتُوْا -

তোমাদের মধ্যে এমন পুরুষ কেউ আছে নাকি, যে তার স্ত্রীর নিকট আসে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়, তারপর বের হয়ে এসে লোকদের সাথে কথা বলে ও বলে দেয় ঃ আমি আমার স্ত্রীর সাথে এই করেছি, এই করেছি ? ......হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন— এ প্রশ্ন শুনে সব সাহাবীই চুপ থাকলেন।

তারপরে মেয়েদের প্রতি লক্ষ্য করে তাদের নিকট প্রশ্ন করলেন ঃ

هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ -

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি, যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন রহস্যের কথা প্রকাশ করে ও অন্যদের বলে দেয় ?

তখন এক যুবতী মেয়ে বলে উঠল ঃ

اَىِ اللّٰهُ اِنَّهُمْ يَتَحَدَّ ثُوْنَ وَاِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّ ثْنَ -

আল্লাহ্র শপথ, এই পুরুষরাও যেমন সে কথা বলে দেয়, তেমনি এই মেয়েরাও তা প্রকাশ করে।

তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

هَلْ تَدْرُوْنَ مَا مِثْلُ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ وَ شَيْطَانٌ لَقٰى اَحَدُهُمَا صَالِحِبَهٗ بِالسِّكَّةِ فَقَضٰى حَاجَتَهٗ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ - (احمد، ابوداؤد، نسائى، ترمذى)

তোমরা কি জানো, এরূপ যে করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, সে যেন একটি শয়তান, সে তার সঙ্গী শয়তানের সাথে রাজপথের মাঝখানে সাক্ষাত করলো, অমনি সেখানে ধরেই তার দ্বারা নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল। আর চারদিকে লোকজন তাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকল।

এ পর্যায়ে দুটি হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

اَلْحَدِيْثَانِ يَدُلَّانِ عَلٰى تَحْرِيْمِ اِفْشَاءِ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِمَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ اُمُوْرِ الْجِمَاعِ -

(نيل الاوطار : ج- ٦، ص-٣٥١)

এ দুটি হাদীসই প্রমাণ করছে যে, স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গম কার্য প্রসঙ্গে যত কিছু এবং যা কিছু ঘটে থাকে, তার কোনো কিছু প্রকাশ করা— অন্যদের কাছে বলে দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার আদান-প্রদান হয়, হয় পারস্পরিক মনের গোপন কথা বলাবলি। একজন তো অকৃত্রিম আস্থা ও বিশ্বাস নিয়েই অপর জনকে তা বলেছে, এখন যদি কেউ অপর কারো কথা কিংবা যৌন-মিলন সংক্রান্ত কোনো রহস্য অন্য লোকদের কাছে বলে দেয়, তা হলে একদিকে যেমন বিশ্বাস ভঙ্গ হলো অপরদিকে লজ্জার কারণ ঘটল। এই কারণে ইসলামের এ কাজকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

বস্তুত একজন যদি তাদের স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার কথা বাইরের কোনো লোক— নারী বা পুরুষকে— বলে দেয়, তাহলে শ্রোতার মনে সেই স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর যদি কেউ যৌন সঙ্গম কার্যের বিবরণ অন্য লোকের সামনে প্রকাশ করে, তাহলে তার গোপনীয়তা বিলুপ্ত হয়, গুপ্ত ব্যাপারাদি উন্মুক্ত ও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কোনো নেকবখ্‌ত স্ত্রীর দ্বারাও যেমন এ কাজ হতে পারে না, তেমনি কোনো আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তির দ্বারাও এ কাজ সম্ভব নয়। বিশেষভাবে মেয়েরাই এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে থাকে বলে কুরআনে তাদের গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ -

তারা অতিশয় বিনীতা, অনুগতা অদৃশ্য কাজের হেফাযতকারিণী— আল্লাহ্‌র হেফাযতের সাহায্যে।

স্ত্রীর খোরপোশ সরবরাহের দায়িত্ব স্বামীর

স্ত্রীর শোভনীয় মান অনুপাতে খোরপোশ নিয়মিত সরবরাহ করা স্বামীরই কর্তব্য, যেন সে নির্লিপ্তভাবে স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে পারে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتَاهُ اللّٰهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتَاهَا -

(الطلاق : ٧)

যে লোককে অর্থ-সম্পদে সাচ্ছন্দ্য দান করা হয়েছে, তার কর্তব্য সেই হিসেবেই তার স্ত্রী-পরিজনের জন্যে ব্যয় করা। আর যার আয়-উৎপাদন স্বল্প পরিসর ও পরিমিত, তার সেভাবেই আল্লাহ্‌র দান থেকে খরচ করা কর্তব্য। আল্লাহ প্রত্যেকের ওপর তার সামর্থ্য অনুসারেই দায়িত্ব অর্পন করে থাকেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

فيه الامرلا هل السعة بان يو سعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم ومن كان رزقه بمقدار القوت اومضيق ليس بوسع فلينفق ما اعطاء الله من الرزق ليس عليه غير ذلك -

(فتح القدير : ج-٥، ص- ٢٣٩)

এ আয়াতে আদেশ করা হয়েছে সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে যে, তারা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রীদের জন্যে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য অনুপাতে বহন করবে। আর যাদের রিযিক নিম্নতম প্রয়োজন মতো কিংবা সংকীর্ণ, সচ্ছল নয়, তারা আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক অনুযায়ীই খরচ করবে। তার বেশি করার কোনো দায়িত্ব তাদের নেই।

স্ত্রীদের জন্যে খরচ বহনের কোনো পরিমাণ শরীয়তে নির্দিষ্ট আছে কিনা— এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ

انها غير مقدرة بالشرع بل مغوض الى الاجتهاد و يعتبر بحال الزوجين فيجب على الموسر للموسرة نفقة المؤ سرين على العسر للمعسرة اقل الكفايات - (تفسير المظهرى : ج- ص -٣٣١)

স্ত্রীর ব্যয়ভারের কোনো পরিমাণ শরীয়তে নির্দিষ্ট নয়, বরং তা বিচার-বিবেচনার ওপরই নির্ভর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের অবস্থা বিবেচনীয়। সচ্ছল অবস্থার স্ত্রীর জন্যে সচ্ছল অবস্থার স্বামী সচ্ছল লোকদের উপযোগী ব্যয় বহন করবে। অনুরূপভাবে অভাবগ্রস্ত স্ত্রীর জন্যে অভাবগ্রস্ত স্বামী ভরণ-পোষণের নিম্নতম দায়িত্ব পালন করবে।

উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশ প্রমাণ করছে যে, সামর্থ্যের বেশি কিছু করা স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফারও এই মত। আল্লামা ইবনুল হুম্মান লিখেছেন ঃ স্বামী যদি গরীব হয়, আর স্ত্রী হয় সচ্ছল অবস্থার, তাহলে স্বামী গরীব লোক উপযোগী ভরণ-পোষণ দেয়ার জন্যে দায়িত্বশীল। কেননা স্ত্রী নিজে সচ্ছল অবস্থার হলেও সে যখন গরীব স্বামী গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে, তখন সে প্রকারান্তরে গরীবলোক-উপযোগী খোরপোশ গ্রহণেও রাজি হয়েছে বলতে হবে।

পক্ষান্তরে স্বামী যদি সচ্ছল অবস্থার হয়, আর যদি স্ত্রী হয় গরীব অবস্থার, তাহলে সে সচ্ছল লোক উপযোগী ব্যয়ভার লাভ করতে পারবে।

স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়ার কথা কুরআন থেকে প্রমাণিত। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছন ঃ আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী— উৎবা-কন্যা— রাসূলে করীম (স)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَّحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِنِىْ مَاكْفِيْنِىْ وَ وَلَدِىْ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ -

হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার স্বামী আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি; সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ দেয় না, তবে আমি তাকে না জানিয়ে প্রয়োজন মতো গ্রহণ করে থাকি। এ কাজ জায়েয কিনা?

তখন নবী করীম (স) তাকে বললেন ঃ

خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوْفِ - (بخارى، مسلم)

সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী তোমার ও তোমার সন্তানাদির প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ তুমি গ্রহণ করতে পারো।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আবূ সুফিয়ান সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন ছিল, রাসূলে করীম (স) জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কেবলমাত্র কৃপণতার কারণে নিজ স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার প্রয়োজন পরিমাণ ভরণ-পোষণ দিত না। সেই কারণে রাসূলে করীম (স) তার স্ত্রীকে প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (تفسير المظهرى : ج-١، ص-٣٣١)

ইমাম শাফিয়ীর মতে এই পরিমাণ শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট বলে এ ব্যাপারে বিচার-বিবেচনার কোনো অবকাশ নেই। আর এ ব্যাপারে স্বামীর অবস্থানুযায়ীই ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্ত্রীর যদি খাদেম-চাকরের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে স্বামীর সামর্থ্য থাকলে খাদেম-চাকর যোগাড় করে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। এ ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদগণ সম্পূর্ণ একমত। ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেনঃ

يَجِبُ عَلَى الْمُعْسِرِ اَيْضًا نَفْقَةُ خَادِمٍ -

একাধিক খাদেম-চাকরের খরচ বহন করা অসচ্ছল অবস্থার স্বামীর জন্যেও ওয়াজিব হবে।

একজন খাদেম-চাকরের প্রয়োজন হলে তাও সংগ্রহ করা ও খরচ বহন করা স্বামীর কর্তব্য কিনা— এ সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদগণ একমত নন। ইমাম মালিকের মতে দুই বা তিনজন খাদেমের প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর কর্তব্য। আর ইমাম আবূ ইউসুফ বলেছেন ঃ

عَلَيْهِ نَفْقَةُ خَادِمِيْنَ فَقَطْ - اَحَدُهُمَا لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِ وَالْاٰخَرُ لِمَصَالِحِ الْخَارِجِ -

(تفسير المظهرى : ج ص -٣٣٢)

এমতাবস্থায় স্বামীর কর্তব্য হবে শুধু দুজন খাদেমের ব্যবস্থা করা ও খরচ বহন করা। তাদের একজন হবে ঘরের ভিতরকার জরুরী কাজ-কর্ম করার জন্যে। আর অপরজন হবে ঘরের বাইরের জরুরী কাজ সম্পন্ন করার জন্যে।

গরীব ও অসচ্ছল স্বামীদের সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতের পরই বলেছেনঃ

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا - (الطلاق : ٧)

আল্লাহ্ অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের পক্ষে অবশ্যই সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য সৃষ্টি করে দেবেন।

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটিও পাঠ আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেনঃ

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا - (البقرة : ٢٣٣)

সন্তানের পিতার কর্তব্য হচ্ছে প্রসূতির খাবার ও পরার প্রচলিত মানে ব্যবস্থা করা। কোনো ব্যক্তির ওপরই তার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপানো যেতে পারে না।

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

هٰذِهِ النَّفْقَةُ وَالْكِسْوَةُ الْوَاجِبَتَانِ عَلَى الْاَبِ بِمَا يَتَصَارَفُهُ النَّاسُ لَا يُكَلِّفُ مِنْهَا اِنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وَسْعِهٖ وَطَاقَتِهٖ لَا مَا يَشِقُّ عَلَيْهِ - (فتح القدير: ج- ١، ص -٨ ٢١)

সন্তান ও স্ত্রীর ব্যয়ভার, খোরাক ও পোশাক সংগ্রহ ও ব্যবস্থা করা সন্তানের পিতার পক্ষে ওয়াজিব। আর তা করতে হবে সাধারণ প্রচলন অনুযায়ী— যা লোকেরা সাধারণত করে থাকে। এ ব্যাপারে কোনো পিতাকেই তার শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে— তার পক্ষে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে— এমন মান বা পরিমাণ তার ওপর চাপানো যাবে না।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন-পালন করা স্ত্রীর কাজ; আর তার ও তার সন্তানের ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব স্বামীর। এর ফলে

স্ত্রীরা খোর-পোশের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এর প্রভাব তাদের মনে ও জীবনে সুদূরপ্রসারী হবে। রাসূলে করীম (স) স্বামীদের লক্ষ্য করে তাই এরশাদ করেছেন ঃ

اِنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَ طَعَا مِهِنَّ - (ترمذى)

স্ত্রীদের খাবার ও পরার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করবে।

অর্থাৎ কেবলমাত্র মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের বদলে সহানুভূতিমূলক নীতি গ্রহণ করবে।

আলোচনার সারকথা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীতে অতি স্বাভাবিকভাবেই কর্মবন্টন করে দেয়া হয়েছে। যে যৌন মিলনের সুখ ও মাধুর্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমানভাবে ভোগ করে, তার সুদূরপ্রসারী পরিণতি কেবল স্ত্রীকেই ভোগ করতে হয় প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী। পুরুষকে তার কোনো ঝুঁকিই গ্রহণ করতে হয় না। এ হচ্ছে এক স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। কাজেই স্ত্রী প্রকৃতির এই দাবি পূরণে সতত প্রস্তুত থাকবে, আর স্বামী তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্যে দায়ী হবে। মূল ব্যাপারে সমান অংশীদারিত্বের এটা অতি স্বাভাবিক দাবি।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর চলতি নিয়মে কেবল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দেওয়াই দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে স্বামীর তওফীক অনুযায়ী তারও বেশি এবং অতিরিক্ত হাত খরচাও স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়া স্বামীর কর্তব্য; যেন স্ত্রী নিজ ইচ্ছা, বাসনা-কামনা ও রুচি অনুযায়ী সময়ে-অসময়ে খরচ করতে পারে। এতে করে স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, আস্থা ও নির্ভরশীলতা অত্যন্ত দৃঢ় ও গভীর হবে। স্বামী সম্পর্কে তার মনে জাগবে না কোনো সংশয়, উদ্বেগ বা বীতরাগ। (فقه الاسلام للخطيب)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনে অক্ষমই হয়ে পড়ে, তাহলে তখন ইসলামী সরকার সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। নবী করীম (স)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, সে তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে পারে না, এমতাবস্থায় কি করা যেতে পারে? তখন নবী করীম (স) বলেছিলেন ঃ

يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا- —এ দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফরূক (রা) তাঁর খিলাফতকালে সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন প্রধানের প্রতি ফরমান পাঠিয়েছিলেন এই বলে ঃ

اِنْ يُنْفِقُوْا اَوْ يُطَلِّقُوْا -

হয় তারা তাদের স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করবে, না হয় তাদের তালাক দিয়ে দেবে।

কিন্তু স্বামীর দৈন্য ও আর্থিক অনটনের সময় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা কতখানি সমীচীন এবং রাসূলে করীম (স) ও উমর ফারূকের উক্ত কথারই বা তাৎপর্য কি, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি মত এই— হ্যাঁ, এরূপ অবস্থায়— যখন স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষমতা রাখে না তখন— বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে উভয়কেই মুক্ত করে দেয়া সমীচীন। হযরত আলী, হযরত উমর ফারূক, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবী, বহু সংখ্যক তাবেয়ী, ফিকাহবিদ এবং ইমাম মালিক, শাফিয়ী ও ইমাম আহমাদ প্রমুখ ফকীহ্‌র এই মত বলে জানা গেছে। দলীল হিসেবে তাঁরা যেমন পূর্বোক্ত কথা দুটির

উল্লেখ করেছেন, তেমনি ইসলামের স্থায়ী ও সর্বজনস্বীকৃত لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ "না, কারো ক্ষতি করা হবে, না কাউকে অপর কারো ক্ষতি করতে দেয়া হবে"— এই মূলনীতিও পেশ করেছেন অর্থাৎ অসচ্ছল ও অভাব-অনটনের সময় স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে দৈন্য ও দুঃখ-দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য করা কোনো ইনসাফের কথা হতে পারে না। এ ছাড়া আরও একটি কথা রয়েছে, আর তা হচ্ছে এই যে, মূলত স্ত্রীর সাথে সহবাস ও যৌন সঙ্গম হচ্ছে স্ত্রীর যাবতীয় খরচ বহনের বিনিময়। কাজেই বিনিময়ের দুটি জিনিসের মধ্যে একটির অনুপস্থিতিতে অপরটির উপস্থিতি ধারণা করা যায় না। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর অবশ্য ইখতিয়ার থাকা উচিত— হয় সে অভাবগ্রস্ত স্বামীর সাথে নিজ ইচ্ছায় থাকবে, আর থাকতে না চাইলে বিবাহ্-বিচ্ছেদ করে তার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

এঁদের আরও দুটি দলীল রয়েছে। একটি এই যে, ক্রীতদাসকে খেতে-পরতে দিতে না পারলে রাসূলে করীম (স) নির্দেশ দিয়েছেন তাকে বিক্রয় করে দিতে। তাহলে স্ত্রীকে খেতে পরতে না দিতে পারলে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়া হবে না কেন ? আর যদি স্বামী নপুংসক হয়ে যায়, তাহলে তাদেরও বিয়ে-বিচ্ছেদ করে স্ত্রীর মুক্তির পথ প্রশস্ত করাই ইসলামের আইন। খেতে পরতে দিতে না পারা স্বামীর নপুংসকতার শামিল, তখনও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিই স্বাভাবিক।

তাঁদের দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াতাংশ ঃ

فَامْسَاكٌ بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -

হয় যথাযথ নিয়মে ও ভালোভাবে স্ত্রীকে রাখবে, নয় ভালোভাবে ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাকে ছেড়ে দেবে।

এ আয়াতের ভিত্তিতে তাঁরা বলেন যে, স্ত্রীকে খাওয়া-পরা না দিয়ে রাখা নিশ্চয়ই মারুফ ভাবে রাখা নয়। বরং এরূপ অবস্থায় পড়ে থাকতে স্ত্রীকে বাধ্য করা হলে তদপেক্ষা অধিক কষ্টদান ও ক্ষতি সাধন আর কিছু হতে পারে না।

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় মত হচ্ছে, স্বামীর অভাব-অনটনের সময় স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য করা কিংবা বিচার বিভাগের সাহায্যে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো অত্যন্ত মর্মান্তিক কাজ সন্দেহ নেই। এ মতের অনুকূলে আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণী পেশ করা হয়। তিনি বলেছেন ঃ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ ط لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا - (الطلاق :۷)

যার রিযিক পরিমিত হয়ে পড়েছে সে যেন আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ্ একজনকে ততটাই দায়িত্ব দেন, যতটার সম্পদ তিনি তাকে দিয়েছেন।

এ আয়াত অনুযায়ী অভাবের সময় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সংগ্রহের ব্যাপারে স্বামীর আদৌ কোনো দায়িত্ব থাকে না। কাজেই কোনো সময় তা না দিতে পারলে সেজন্যে যে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে কিংবা তাকে তালাক দিতে বাধ্য করা হবে— এমন কোনো কথাই হতে পারে না। হযরত আয়েশা ও হাফ্সা (রা) যখন রাসূলে করীম (স)-এর নিকট নিজেদের খরচের দাবি জানিয়েছিলেন, তখন হযরত আবূ বকর (আয়েশার পিতা) ও হযরত উমর (হাফসার পিতা) অত্যন্ত ক্রোধ এবং রাগ প্রকাশ করেছিলেন ও নিজ নিজ কন্যাকে রাসূলের সামনেই মারধোর করতে চেয়েছিলেন। অথচ দাবি অনুযায়ী খরচ দিতে না পারায় তাঁরা কেউই রাসূলের নিকট তালাকের দাবি করেন নি। (سبل السلام شرح المرام ج-۳ ص ۲٦٤)

এ প্রসঙ্গে শেষ কথা এই যে, পারিবারিক যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব ইসলামী শরীয়তে কেবল স্বামীর ওপরই অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে এ অধিকার দেয়া হয়নি যে, সে স্বামীকে সর্বাবস্থায়ই খোরপোশের বিশেষ একটা নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে চলতে বাধ্য করবে। পূর্বোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে স্বামী তার সামর্থ্য ও আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী যে কোনো একটি মান (Standard) রক্ষার জন্যে

দায়ী মাত্র। কোনো বিশেষ মান রক্ষার জন্যে— তাও আবার সকল অবস্থায়— তাকে দায়ী করা হয়নি।

পারিবারিক জীবনের আর্থিক দায় সম্পর্কিত এ সম্যক আলোচনা সম্বন্ধে এ কথা সুস্পষ্ট ভাষায়ই বলা যায় যে, ইসলামের এ ব্যবস্থা স্বভাব ও প্রকৃতি-ব্যবস্থার স্থায়ী নিয়মের সাথে পুরোপুরি সমঞ্জস। তা সত্ত্বেও যে সব স্বামী স্ত্রীদের বাধ্য করে তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপার্জনের দায়িত্বও পালন করতে কিংবা যারা স্ত্রীদেরকে সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও লালন-পালনের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি দিয়ে পুরুষের মতোই অর্থোপার্জনের যন্ত্ররূপে খাটাতে ইচ্ছুক, তারা যে স্বভাব ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না।

নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ

এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম (স)-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যাচ্ছে। এ হাদীসে তিনি স্ত্রীলোকদের প্রকৃতিগত এক মৌলিক দুর্বলতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখে চলবার জন্যে স্বামীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَ يَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَارَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ - (بخاری، باب كفران العشير)

মেয়েলোক সাধারণত স্বামীদের অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে এবং তাদের অনুগ্রহকে করে অস্বীকার। তুমি যদি জীবন ভরেও কোনো স্ত্রীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, আর কোনো এক সময় যদি সে তার মর্জী-মেজাজের বিপরীত কোনো ব্যবহার তোমার মাঝে দেখতে পায় তাহলে তখনি বলে ওঠে ঃ 'আমি তোমার কাছে কোনোদিনই সামান্য কল্যাণও দেখতে পাইনি।'

রাসূলের এ কথা থেকে একদিকে যেমন নারীদের এক মৌলিক প্রকৃতিগত দোষের কথা জানা গেল, তেমনি এ হাদীস স্বামীদের জন্যেও এক বিশেষ সাবধান বাণী। স্বামীরা যদি নারীদের এ প্রকৃতিগত দোষের কথা স্মরণ না রাখে, তাহলেই পারিবারিক জীবনে অতি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এজন্যে পুরুষদের অবিচল নিষ্ঠা ও অপরিসীম ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে পারিবারিক জীবনের মাধুর্য ও মিলমিশকে অক্ষুণ্ন রাখা পুরুষদেরই কর্তব্য।

এ পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাসূলে করীম (স)-এর সেই ফরমান, যা তিনি বিদায় হজ্জের বিরাট সমাবেশে মুসলিম জনতাকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছিলেন। আবূ দায়ূদের বর্ণনা মতে সে ফরমানের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِى النِّسَاءِ فَاِنَّكُمْ اَخَذْتُمُوْهُنَّ بِاَمَانَةِ اللّٰهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ وَ اِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ لَّا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ اَحَدً تَكْرَهُوْنَهُ - (ابوداؤد، مسلم، كتاب الحج)

হে মুসলিম জনতা! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহ্কে অবশ্যই ভয় করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহ্র কালেমার সাহায্যে তাদের দেহ ভোগ করাকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিয়েছ। আর তাদের ওপর তোমাদের জন্যে এ অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, সে কোনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তির দ্বারা তোমাদের দুজনের মিলন-শয্যাকে মলিন ও দলিত কলংকিত করবে না।

এই শেষ বাক্যের অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, স্ত্রীরা ভিন্ন পুরুষকে স্বামীর শয্যায় গ্রহণ করবে না বরং-

لَا تَأْذَنْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّدْ خُلَ مَنَازِلَ الْاَزْوَاجِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّأْذَنَ لَهَا - (بذل المجهود: ج -٣، ص - ١٥٥)

স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীর ঘরে অপর কাউকে প্রবেশ করতে পর্যন্ত দেবে না।

গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ

পারিবারিক— এমন কি সামাজিক ও জাতীয়— রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের গুরুতর ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা এবং তার নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার মতামত গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু করা দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ের যাতীয় বিষয়ে ঘরোয়া পরামর্শ অনেক সময়ই সার্বিকভাবে কল্যাণকর হয়ে থাকে। এবং তাতে করে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ঐকান্তিক আস্থা-বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। আর স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর মনে ভালোবাসা ও আন্তরিক আনুগত্যমূলক ভাবধারা গভীরতর হয়। শুধু তা-ই নয়, ঘরের মেয়েলোকদের নিকটও যে অনেক সময় ভালো ভালো বুদ্ধি পাওয়া যায়, পাওয়া যায় জটিল বিষয়াদির সুষ্ঠু সমাধানের শুভ পরামর্শ, তাও তার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়ে পড়ে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মতের ভিত্তিতে গুরুতর কাজসমূহ সম্পন্ন করাও সম্ভব হয় অতি সহজে এবং অনায়াসে। কুরআন মজীদে এ কারণেই স্ত্রীর সাথে সর্ব ব্যাপারেই পরামর্শ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার বড় প্রমাণ এই যে, সন্তানকে কতদিন দুধ পান করানো হবে তা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا - (البقرة : ٢٣٣)

স্বামী ও স্ত্রী যদি পরস্পর পরামর্শ ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোনো দোষ হবে না তাদের।

আল্লামা আহ্মাদুল মুস্তফা আল-মারাগী এ আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেন ঃ

وَهَاَنْتَ اِذَا تَرْعٰى اِرْشَادَ الْقُرْاٰنَ اِلٰى اِسْتِعْمَالِ الْمُشْوِرَةِ فِىْ اَدْنٰى الْاَعْمَالِ لِتَرْبِيَةِ الْوَلَدِ وَلَمْ يُبِحْ لِاَحَدِ الْوَالِدَيْنِ الْاِ سْتِبْدَادُ بِذٰلِكَ دُوْنَ الْاٰخَرِ فَمَا لَكَ بِاَجَلِّ الْاَعْمَالِ خَطَرًا وَاَعْظَمِهَا فَائِدَةً -
(المراغى : ج -٢ ص - ١٨٨)

কুরআন মজীদ সন্তান পালনের মতো অতি সাধারণ ব্যাপারেও পরামর্শ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং পিতামাতার একজনকে অপর জনের ওপর জোর-জবরদস্তি করার অনুমতি দেয়া হয়নি— এ কথা যদি তোমরা চিন্তা ও লক্ষ্য করো, তাহলে গুরুতর বিপজ্জনক ও বিরাট কল্যাণময় কাজ-কর্ম ও ব্যাপারসমূহে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব সহজেই বুঝতে পারবে।

রাসূলে করীম (স)-এর জীবনে এ পর্যায়ের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম অহী লাভ করার পর তাঁর হৃদয়ে যে ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল, তার অপনোদনের জন্যে তিনি ঘরে গিয়ে স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা (রা)-এর নিকট সব অবস্থার বিবরণ দান করেন। বলেছিলেন ঃ

لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِىْ -

আমি এই ব্যাপারে নিজের সম্পর্কে বড় ভীত হয়ে পড়েছি।

এ কথা শুনে জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বলেছিলেন ঃ

كَلَّا وَاللّٰهِ مَا يَخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلَ الرِّحْمَ وَتَحْمِلَ الْكَلَّ وَتَكْسِبَ الْمَعْدُوْمَ وَتُقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَلَا يُسَلِّطَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الشَّيَاطِيْنَ وَالْاَوْهَامَ وَالْاُ مُرَاءَ اَنَّ اللّٰهَ اَخْتَارَكَ لِهِدَايَةِ قَوْمِكَ -

(نورالیقین فی سیرة المرسلین :ص -٢٦)

আল্লাহ্ আপনাকে কখ্খনই এবং কোনোদিনই লজ্জিত করবেন না। কেননা আপনি তো ছেলায়ে (আত্মীয়তার সম্পর্ক)-র রেহ্মী রক্ষা করেন, অপরের বোঝা বহন করে থাকেন, কপদর্কহীন গরীবদের জন্যে আপনি উপার্জন করেন, মেহমানদারী রক্ষা করেন, লোকদের বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করে থাকেন, এজন্যে আল্লাহ্ কখনই শয়তানদের আপনার ওপরে জয়ী বা প্রভাবশালী করে দেবেন না। কোনো অমূলক চিন্তা-ভাবনাও আপনার ওপর চাপিয়ে দেবেন না। আর এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার জাতির লোকজনের হেদায়েতের কার্যের জন্যেই বাছাই করে নিয়েছেন।

হযরত খাদীজার এ সান্ত্বনা বাণী রাসূলে করীম (স)-এর মনের ভার অনেকখানি লাঘব করে দেয়। আর এ ধরনের অবস্থায় প্রত্যেক স্বামীর জন্যে তার প্রিয়তমা ও সহানুভূতিসম্পন্না স্ত্রীর আন্তরিক সান্ত্বনাপূর্ণ কথাবার্তা অনেক কল্যাণ সাধন করে থাকে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কা গমন ও বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করা সম্ভব হলো না, তখন রাসূলের সঙ্গে অবস্থিত চৌদ্দশ সাহাবী নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ সময়ে রাসূল (স) তাঁদেরকে এখানেই কুরবানী করতে আদেশ করেন। কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে তাঁর এ নির্দেশ পালনের কোনো আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। এ অবস্থা দেখে রাসূলে করীম (স) বিস্মিত ও অত্যন্ত মর্মাহত হন। তখন তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে অবস্থানরতা তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে সব কথা খুলে বললেন। তিনি সব কথা শুনে সাহাবাদের এ অবস্থার মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন ঃ

اُخْرُجْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَابْدَآهُمْ بِمَا تُرِيْدُ فَاِذَا رَاوُكَ فَعَلْتَ اِتَّبَعُوْكَ -

(نور الیقین فی سیرة سید المرسلین ص -١٩١)

হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি নিজেই বের হয়ে পড়ুন এবং যে কাজ আপনি করতে চান তা নিজেই শুরু করে দিন। দেখবেন, আপনাকে সে কাজ করতে দেখে সাহাবিগণ নিজ থেকেই আপনার অনুসরণ করবেন এবং সে কাজ করতে লেগে যাবেন।

এহেন গুরুতর পরিস্থিতিতে বাস্তবিকই হযরত উম্মে সালমার পরামর্শ বিরাট ও অচিন্ত্যপূর্ব কাজ করেছিল। এমনিভাবে সব স্বামীই তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে এ ধরনের কল্যাণময় পরামর্শ লাভ করতে পারে তাদের সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে।

স্ত্রীর কর্তব্য ও অধিকার

স্ত্রীদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলাম পুরুষদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে পেশ করা হয়েছে অর্থাৎ পুরুষদের যা যা কর্তব্য স্ত্রীদের প্রতি, তাই হচ্ছে স্ত্রীদের অধিকার পুরুষদের ওপর। এক্ষণে আলোচনা করা হবে— স্ত্রীলোকদের ওপর পুরুষদের অধিকার— অন্য কথায় পুরুষদের প্রতি স্ত্রীদের কর্তব্য। বস্তুত একজনের যা কর্তব্য অপরের প্রতি, তাই হচ্ছে অপর

জনের অধিকার তার প্রতি। উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্তব্য যা তাই হচ্ছে উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার।

আইনের পূর্ণতার দৃষ্টিতে বিচার করলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একদেশদর্শী, একপেশে ও একতরফা আইন বা বিধান কখনো পূর্ণ আইন হতে পারে না, পারে না তা সমগ্র মানবতার প্রতি কল্যাণকর হতে। যে আইন কেবল একচেটিয়াভাবে পুরুষের অধিকার ও কর্তৃত্বের কথা বলে, স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে যা নির্বাক কিংবা এর বিপরীত— যে আইন কেবল স্ত্রীদের অধিকারের কথা বলে, পুরুষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দেয় না, তা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই কারণেই ইসলাম এ ধরনের একপেশে ও একদেশদর্শী বিধান নয়।

এতে সন্দেহ নেই যে, নারী জন্মগতভাবেই দুর্বল, স্বাভাবিক আবেগ উচ্ছ্বাসের দিক দিয়ে ভারসাম্যহীন, দৈহিক আকার-আঙ্গিকের দৃষ্টিতেও পুরুষের তুলনায় ক্ষীণ ও নাজুক, কোমল ও বলহীন। এজন্যে নারীর প্রতি অধিকার অনুগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিদান এবং অধিক প্রেম ভালোবাসা পোষণ অপরিহার্য। কিন্তু তাই বলে তাদের পক্ষে উপযুক্ত ও জরুরী দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা থেকে তাদের নিষ্কৃতি দেয়া যেতে পারে না। কেননা তাহলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জীবন— সমষ্টিগত জীবন— অত্যন্ত তিক্ত ও কষ্টপূর্ণ হতে বাধ্য।

স্ত্রী ঘরের রাণী

পুরুষ ও নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও দৈহিক-আঙ্গিকের স্বাভাবিক পার্থক্যের কারণে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কর্মবন্টনের নীতি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা হয়েছে। পুরুষকে করা হয়েছে কামাই-রোজগার ও শ্রম-মেহনতের জন্যে দায়িত্বশীল আর স্ত্রীকে করা হয়েছে ঘরের রাণী। পুরুষের জন্যে কর্মক্ষেত্র করা হয়েছে বাইরের জগত আর নারীর জন্যে ঘর। পুরুষ বাইরের জগতে নিজের কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে যেমন করবে কামাই-রোজগার, তেমনি গড়বে সমাজ-রাষ্ট্র, শিল্প ও সভ্যতা। আর নারী ঘরে থেকে একদিকে করবে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা, অপরদিকে করবে গর্ভ ধারণ, সন্তান প্রসব, লালন-পালন ও ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার কাজ। এজন্যে নারীদের সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

وَالْمَرَاةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا - (بخارى)

এবং নারী— স্ত্রী— তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, কর্ত্রী।

এ হাদীসের راع শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

وَالرَّاعِىْ هُوَالْحَافِظُ الْمُؤْتَمِنُ الْمُلْتَزِمُ صَلَاحَ مَاقَامَ عَلَيْهِ وَمَا هُوَ تَحْتَ نَظَرِهٖ فَكُلٌّ مَنْ كَانَ تَحْتَ نَظَرِهٖ شَىْءٌ فَهُوَ مَطْلُوْبٌ بِالْعَدْلِ فِيْهِ وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهٖ فِىْ دِيْنِهٖ وَدُنْيَاهُ وَ مُتَعَلِّقَاتِهٖ فَاِنْ وَفٰى مَاعَلَيْهِ مِنَ الرِّعَايَهِ حَصُلَ لَهُ الْحَظُّ الْاَ وْفَرُ وَالْجَزَاُ الْاَ كْبَرُ وَاِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ طَلَبَهٗ كُلٌّ اَحَدٍ مِّنْ رَعْيَتِهٖ بِحَقِّهٖ -

(عمدة القارى : ج-٦، ص - ١٩٠)

راع হচ্ছে হেফাযতকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, আমানতদার, দায়িত্বের অধীন সব জিনিসের কল্যাণ সাধনের জন্যে একান্ত বাধ্য। যে ব্যক্তির দায়িত্বেই যে কোনো জিনিস দেয়া হবে, এমন প্রত্যেকেরই তেমন প্রত্যেকটি জিনিসে সুবিচার ও ইনসাফ করা এবং তার দ্বীনী ও দুনিয়াবী কল্যাণ সাধন করাই

বিশেষ লক্ষ্য। এখন যার ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে যদি তা পুরোপুরি পালন করে, তবে সে পূর্ণ অংশই লাভ করল, অধিকারী হলো বিরাট পুরস্কার লাভের আর যদি তা না করে, তবে দায়িত্বের প্রত্যেকটি জিনিসই তার অধিকার দাবি করবে।

আর দীর্ঘ হাদীসের ওপরে উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন ঃ

وَ رِعَايَةُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّدْبِيْرِ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَالنُّصْحُ لَهٗ وَالْاَمَانَةُ فِىْ مَالِهٖ وَفِىْ نَفْسِهَا -

(ايضا : ص -١٩١)

আর 'স্ত্রী স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীলা' হওয়ার মানে, স্বামীর ঘরের সুন্দর ও পূর্ণ ব্যবস্থাপনা করা, স্বামীর কল্যাণ কামনা ও তাকে ভালো কাজের পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া এবং স্বামীর ধনমাল ও তার নিজের ব্যাপারে পূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বাসপরায়ণতা রক্ষা করাই স্ত্রীর কর্তব্য।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের কথা নিম্নোক্ত হাদীসে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ لَكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَاَمَّا حَقُّكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَّنْ تَكْرَهُوْنَ وَ لَا يَاْذَنَّ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ -

(ابن ماجه، ترمذى)

তোমাদের জন্যে তোমাদের স্ত্রীদের ওপর নিশ্চয়ই অধিকার রয়েছে, আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্যেও রয়েছে তোমাদের ওপর অধিকার। তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে স্থান দেবে না যাকে তোমরা পছন্দ করো না। তোমাদের ঘরে এমন লোককেও প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না, যাদের তোমরা পছন্দ করো না বলে নিষেধ করো।

আর তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হচ্ছে, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ খুবই উত্তমভাবে বহন করবে!

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যসম্পন্ন এ দাম্পত্য জীবন যে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ এবং এ জীবনে স্ত্রীর যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী লিখেছেন ঃ

اِنَّ الْاِرْتِبَاطَ الْوَاقِعَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ اَعْظَمَ الْاِرْتِبَاطَاتِ الْمُنْزَلِيَّةِ بَاَسْرِهَا وَ اَكْثَرُهَا نَفْعًا وَ اَتَمُّهَا حَاجَةً اِذَا السُّنَّةِ عِنْدَ طَوَائِفِ النَّاسِ عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ اَنَّ تَعَاوُنَةَ الْمَرْأَةِ فِىْ اِسْتِيْفَاءِ الْاِرْتِفَاقَاتِ وَ اَنْ تَتَكَفَّلَ لَهٗ بِتَهِيَّةِ الطُّعْمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ وَ اَنْ تَخْزَنَ مَا لَهٗ وَتَحْضَنَ وَلَدَهٗ وَتَقُوْمَ فِىْ بَيْتِهٖ مَقَامَهٗ عِنْدَ غَيْبَتِهٖ -

(حجة الله البالغة -٢ باب حقوق الزوجيه)

দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক, সম্বন্ধ ও মিলনই হচ্ছে পারিবারিক জীবনের বৃহত্তম সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ফায়দা সর্বাধিক, প্রয়োজন পূরণের দৃষ্টিতে তা অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেননা আরব অনারবের সকল পর্যায়ের লোকদের মধ্যে স্থায়ী নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্ত্রী সকল কল্যাণময় কাজে-কর্মে স্বামীর সাহায্যকারী হবে, তার খানাপিনা প্রস্তুতকরণ ও কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখার

ব্যাপারে সে হবে স্বামীর ডান হাত, তার মাল-সম্পদের রক্ষাণাবেক্ষণ ও তার সন্তানদের লালন-পালন করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে সে তার ঘরের স্থলাভিষিক্ত ও দায়িত্বশীলা।

ঘরের অভ্যন্তর ভাগের যাবতীয় ব্যাপারের জন্যে প্রথমত ও প্রধানত স্ত্রীই দায়ী। তারই কর্তৃত্বে যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হবে। এখানে তাকে দেয়া হয়েছে এক প্রকারের স্বাধীনতা। স্বামীর ঘর কার্যত তার নিজের ঘর, স্বামীর জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ স্ত্রীর হেফাযতে থাকবে। সে হবে তার আমানতদার, অতন্দ্র প্রহরী। কিন্তু স্বামীর ঘরের কাজকর্ম কি স্ত্রীকে তার নিজের হাতে সম্পন্ন করতে হবে? এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজমের একটি উক্তি দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন ঃ

لَا يَلْزِمُهَا اَنْ تَخْدَمَ زَوْجَهَا فِىْ شَىْءٍ اَصْلًا لَافِىْ عِجِيْنَ وَلَافِىْ طَبَخٍ وَلَا كَنَسَ وَغَزَلَ وَلَا غَيْرَ ذٰلِكَ - (عمدة القارى : ج -٢٠، ص -١٩٢)

স্বামীর খেদমত করা— কোনো প্রকারের কাজ করে দেয়া মূলত স্ত্রীর কর্তব্য নয়, না রান্না-বান্নার আয়োজন করার ব্যাপারে; না রান্না করার ব্যাপারে; না সূতা কাটা; কাপড় বোনার ব্যাপারে; না কোনো কাজে।

ফিকাহ্‌বিদগণ এর কারণস্বরূপ বলেছেন ঃ

لِاَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الْبَضْعِ فَلَا يَمْلِكُ غَيْرَهَا مِنْ مَّنَا فِعِهَا - (محاسن التاويل : ج - ٣)

কেননা বিয়ের আক্‌দ হয়েছে স্ত্রীর সাথে যৌন ব্যবহারের সুখ ভোগ করার জন্যে। অতএব স্বামী তার কাছ থেকে অপর কোনো ফায়দা লাভ করার অধিকারী হতে পারে না।

অথচ আবূ সওর বলেছেন ঃ

عَلَيْهَا اَنْ تَخْدَمَهُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ -

সব ব্যাপারে স্বামীর খেদমত করাই স্ত্রীর কর্তব্য।

ইবনে হাজমের 'মূলত কর্তব্য নয়' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কোনো কাজ মূলত কর্তব্যভুক্ত না হলেও অনেক সময় তা না করে উপায় থাকে না। এজন্য আমরা রাসূল (স)-এর সময়কার ইসলামী সমাজে দেখতে পাই— স্ত্রীরা ঘরের যাবতীয় কাজ-কর্ম রীতিমত করে যাচ্ছে। নিজেদের হাতেই সব কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে, ঘরের কাজ-কর্ম করতে গিয়ে নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করছে, তবু সে কাজ ত্যাগ করেনি, কাজ করতে অস্বীকৃতিও জানায়নি। বলেনি— আমি কোনো কাজ করতে পারব না। রাসূল-তনয়া হযরত ফাতিমা (রা) ঘরের যাবতীয় কাজ করতেন, চাক্কি বা যাঁতা চালিয়ে গম পিষতেন, নিজ হাতে রুটি পাকাতেন। এ কাজে তাঁর খুবই কষ্ট হতো। এজন্যে একদিন তিনি তাঁর স্নেহময় পিতার কাছে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। হযরত আসমা (রা) তাঁর স্বামীর সব রকমের খেদমত করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

كُنْتُ اَخْدِمُ الزُّبَيْرَ رَضَى اللّٰهُ عَنْهُ - (عمدة القارى :ج -٢٠، ص -١٩٢)

আমি আমার স্বামী জুবাইরের সব রকমের খেদমত করতাম।

রাসূলে করীম (স)-এর যুগে ইসলামী সমাজের স্ত্রীরা স্বামীর খেদমত করতেন— এ কথা ঠিক। হযরত ফাতিমাও যখন নিজ হাতে যাঁতা চালিয়ে আটা তৈরী করতেন, আটা পিষে রুটি তৈয়ার করতেন ও আগুনের তাপ সহ্য করে রুটি পাকাতেন, তখন অপর যে কোনো স্ত্রীর পক্ষে তা অকরণীয় হতে পারে না। বরং সবার জন্যেই তা অনুসরণীয়। নিজের ঘরের কাজ করা কোনো স্ত্রীর পক্ষেই অপমান কিংবা লজ্জার কারণ হতে পারে না। ইমাম মালিক এতোদূর বলেছেন যে, স্বামী বিশেষ ধনী লোক না

হলে স্ত্রীর কর্তব্য তার ঘরের যাবতীয় কাজ যতদূর সম্ভব নিজের হাতে আঞ্জাম দেয়া— সে স্ত্রী যতবড় ধনী বা অভিজাত ঘরের কন্যাই হোক না কেন।

কুরআনের আয়াত ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

স্ত্রীদের সেই সব অধিকারই রয়েছে স্বামীদের ওপর, যা স্বামীদের রয়েছে স্ত্রীদের ওপর।

প্রমাণ করে যে, স্বামী যেমন স্ত্রীর জন্যে প্রাণপাত করে, স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর জন্যে কষ্ট স্বীকার করা। ইমাম ইবনে তাইমিয়াও এরূপে ফতোয়া দিয়েছেন। আবূ বকর ইবনে শায়বা ও আবূ ইসহাক জাওজেজানীর মতও তা-ই। হাদীসে আরো স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে এর স্বপক্ষে। বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضٰى عَلٰى اِبْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَتِهِ الْبَيْتَ وَعَلٰى عَلِيٍّ مَاكَانَ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْعَمَلِ - (الجوزجانى محاسن التاويل :ج -٣، ص- ٥٨٥)

নবী করীম (স) তাঁর কন্যা ফাতিমার ওপর তাঁর ঘরের মধ্যকার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং হযরত আলীর ওপর দিয়েছিলেন ঘরের বাইরের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব।

জিদ্ ও হঠকারিতা পরিহার

স্ত্রীলোকদের প্রায় সকলেরই একটি সাধারণ দোষ হচ্ছে জিদ ও হঠকারিতা। এ দোষ থেকে যথাসম্ভব তাদের মুক্ত থাকতে চেষ্টা করতে হবে। কেননা দেখা গেছে, কোনো সামান্য ব্যাপারও তাদের মরজী ও মন-মেজাজের বিপরীত ঘটলেই তারা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। তখন তারা যে কোনো বিপর্যয় ঘটাতে ক্রটি করে না। আর এতে করে পারস্পরিক সম্পর্কও খারাপ হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বামীর মন তার দোষে তিক্ত বিরক্ত হয়ে যায় খুব সহজেই।

অবশ্য অপরিহার্য কোনো ব্যাপার হলে স্ত্রীর কর্তব্য অপরিসীম ধৈর্য সহকারে স্বামীকে বোঝানো, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রেম-ভালোবাসার অমৃত ধারায় স্বামীর মনের সব কালিমা ধুয়েমুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। তার বদলে রাগ করে, মুখ ভার করে, তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটি করে গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা তার কখনও উচিত নয়। স্বামীকে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ দেখতে পেলে যথাসম্ভব শান্ত ও নরম হয়ে যাওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। আর নিজেদের মনের ঝাল মেটানো যদি অপরিহার্যই হয়ে পড়ে, তাহলে তা অপর এক সময়ের জন্যে অপেক্ষায় রেখে দেবে, পরে এমন এক সময় এবং এমনভাবে তা করবে, যাতে করে পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুমাত্র তিক্ত হয়ে উঠবে না।

স্বামীর বাড়াবাড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্ত্রীর খুব সতর্কতার সাথেই কাজ করা, কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্ত্রীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা নিজের সম্ভ্রম-মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে ফেটে পড়া কোনোমতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। স্বামীর কাছে কিছুটা ছোট হয়েও যদি পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা যায়, তবে স্ত্রীর তাই করা কর্তব্য। কেননা তাতেই তার ও গোটা পরিবারের কল্যাণ নিহিত। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা এ পর্যায়েই এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ - (النساء : ١٢٨)

কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর বদমেজাজী ও তার প্রতি প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা-অবহেলা দেখতে পায় আর তার পরিণাম ভালো না হওয়ার আশংকা বোধ করে, তাহলে উভয়ের যে কোনো শর্তে

সমঝোতা করে নেওয়ায় কোনো দোষ নেই। বরং সব অবস্থায়ই সমঝোতা-সন্ধি-মীমাংসাই অত্যন্ত কল্যাণময়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

لفظ عام يقتضى ان الصلح الذى تسكن اليه النفوس ويزول به الخلاف على الا طلاق او خير من الغرفة اومن الخصومة (فتح القدير: ج -١،ص- ٤٨٣)

আয়াতে সাধারণ অর্থে কথাগুলো বলা হয়েছে। এভাবে বলার কারণে বোঝা যায় যে, যে সমঝোতার ফলেই উভয়ের মনের মিল হতে পারে, পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায় তাই মোটামুটিভাবে অনেক উত্তম কাজ কিংবা তা অতীব উত্তম বিচ্ছেদ হওয়া থেকে, বেশি উত্তম ঝগড়া-ফাসাদ থেকে।

সহাস্যবদনে স্বামীর অভ্যর্থনা

এ পরিপ্রেক্ষিতে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী যখনই বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসে, তখন স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে হাসিমুখে ও সহাস্যবদনে তাকে অভ্যর্থনা করা— স্বাগতম জানানো। কারণ স্ত্রীর স্মিতহাস্যে বিরাট আকর্ষণ রয়েছে, তার দরুণ স্বামীর মনের জগতে এমন মধুভরা মলয়-হিল্লোল বয়ে যায় যে, তার হৃদয় জগতের সব গ্লানিমা-শ্রান্তি-ক্লান্তি জনিত সব বিষাদ-ছায়া সহসাই দূরীভূত হয়ে যায়। স্বামী যত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়েই ঘরে ফিরে আসুক না কেন এবং তার হৃদয় যত বড় দুঃখ, কষ্ট ও ব্যর্থতায়ই ভারাক্রান্ত হোক না কেন, স্ত্রীর মুখে অকৃত্রিম ভালোবাসাপূর্ণ হাসি দেখতে পেলে সে তার সব কিছুই নিমেষে ভুলে যেতে পারে।

কাজেই যে সব স্ত্রী স্বামীর সামনে গোমরা মুখ হয়ে থাকে, প্রাণখোলা কথা বলে না স্বামীর সাথে, স্বামীকে উদার হৃদয়ে ও সহাস্যবদনে বরণ করে নিতে জানে না বা করে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ঘর ও পরিবারকে— নিজেদেরই একমাত্র আশ্রয় দাম্পত্য জীবনকে ইচ্ছে করেই জাহান্নামে পরিণত করে, বিষায়িত করে তোলে গোটা পরিবেশকে। রাসূলে করীম (স) এ কারণেই ভালো স্ত্রীর অন্যতম একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ - (ابن ماجه)

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয় (স্বামী স্ত্রীকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে)।

স্বামীর গুণের স্বীকৃতি

স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, তার জন্যে সাধ্যানুসারে উপহার-উপঢৌকন নিয়ে আসে, তার সুখ-শান্তির জন্যে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর এসব কাজের দরুণ আন্তরিক ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। অন্যথায় স্বামীর মনে হতাশা জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্যে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلٰى اِمْرَاَةٍ لَا تَشْكُرُ زَوْجَهَا - (نسائى)

আল্লাহ্ তা'আলা এমন স্ত্রীলোকের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন না, যে তার স্বামীর ভালো ভালো কাজের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না।

এ শুকরিয়া যে সব সময় মুখে ও কথায় জ্ঞাপন করতে হবে, এমন কোনো জরুরী শর্ত নেই। শুকরিয়া জ্ঞাপনের নানা উপায় হতে পারে। কাজে-কর্মে, আলাপে-ব্যবহারে স্বামীকে বরণ করে নেয়ার ব্যাপারে স্ত্রীর মনের কৃতজ্ঞতা ও উৎফুল্লতা প্রকাশ পেলেও স্বামী বুঝতে পারে— অনুভব করতে পারে

যে, তার ব্যবহারে তার স্ত্রী তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ এবং সে তার জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করছে, তা সে অন্তর দিয়ে স্বীকার করে।

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এগারো জন স্ত্রীলোকের এক বৈঠকের উল্লেখ রয়েছে। তাতে প্রত্যেক স্ত্রীই নিজ নিজ স্বামী সম্পর্কে বর্ণনা দানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং তার পরে প্রত্যেকেই তা পরস্পরের নিকট বর্ণনা করে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর খুবই প্রশংসা করে। এ প্রশংসা করা যে অন্যায় নয় বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় তা এ থেকে সহজেই বোঝা যায়। তাই এ সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

وَمِنْهَا مَدْحُ الرَّجُلِ فِىْ وَجْهِهِ بِمَا فِيْهِ اِذَا عَلِمَ اَنَّ ذٰلِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ لَهٗ وَ لَا مُغَيِّرٍ نَفْسَهٗ -

(عمدة القارى : ج -٢٠، ص -١٧٨)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর সম্মুখে তার প্রশংসা করা— বিশেষত যখন জানা যাবে যে, তার দরুন তার মেজাজ বিগড়ে যাবে না— তার মন দুষ্ট হবে না— সঙ্গত কাজ।

যৌন মিলনের দাবি পূরণ

যৌন মিলনের দাবি এক স্বাভাবিক দাবি। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সমান। কিন্তু এ ব্যাপারে নারী সব সময় Passive—নিশ্চেষ্ট, অনাগ্রহী ও অপ্রতিরোধীও। পুরুষই এক্ষেত্রে অগ্রসর, active অর্থাৎ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সেজন্যে যৌন মিলনের ব্যাপারে সাধারণত স্বামীর তরফ থেকেই আসে আমন্ত্রণ। তাই এ ব্যাপারে স্বামীর দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা কখনই স্ত্রীর পক্ষে উচিত হতে পারে না। বরং প্রেম-ভালোবাসার দৃষ্টিতে স্বামীর যে কোনো সময়ের এ দাবিকে সানন্দ চিত্তে, সাগ্রহে ও সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করা— মেনে নেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর বাণী সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন ঃ

اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهٗ لِحَاجَتِهٖ فَلْتَأْتِهٖ وَ اِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ - (ترمذى)

স্বামী যখন নিজের যৌন প্রয়োজন পূরণের জন্যে স্ত্রীকে আহবান জানাবে, তখন সে চুলার কাছে রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে কাজে অমনি তার প্রস্তুত হওয়া উচিত।

অপর হাদীসে এর চেয়েও কড়া কথা উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاَبَتْ اَنْ تَجِىْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ - (بخارى)

স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আহবান করে (যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে), তখন যদি সে সাড়া না দেয়— অস্বীকার করে, তাহলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

'হাদীসটি' থেকে বাহ্যত মনে হয় যে, এ ঘটনা যখন রাত্রী বেলা হয়, তখনই ফেরেশতারা অস্বীকারকারী স্ত্রীর ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে; কিন্তু আসলে কেবল রাতের বেলার কথাই নয়, দিনের বেলাও এরূপ হলে ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষিত হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু যৌন মিলনের কাজ সাধারণত রাতের বেলাই সম্পন্ন হয়ে থাকে, এ জন্যে রাসূলে করীম (স) রাতের বেলার কথা বলেছেন। মূলত এ কথা রাত ও দিন— উভয় সময়ের জন্যেই প্রযোজ্য।

অপর এক হাদীসে এ কথাটি অধিকতর তীব্র ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। তা এই ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَّدْعُوْ اِمْرَأَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهَا فَتَابٰى عَلَيْهِ اِلَّا كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا - (مسلم)

যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীকে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে তার শয্যায় ডাকবে, তখন যদি স্ত্রী তা অমান্য করে— যৌন মিলনে রাজি হয়ে তার কাছে না যায়, তবে আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট— ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

অনুরূপ আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا بَاتَتِ الْمَرْاَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تَرْجِعَ - (بخارى)

স্ত্রী যদি তার স্বামীর শয্যা ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে যতক্ষণে সে তার স্বামীর কাছে ফিরে না আসবে, ফেরেশতাগণ তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।

আর একটি হাদীস হচ্ছে ঃ

ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ وَ لَا يَصْعَدُ لَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ - اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَالسَّكْرَانُ حَتّٰى يَصْحُوْ وَالْمَرْاَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتّٰى يَرْضٰى - (مسلم، ابن خزيمه، ابن حبان)

তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উত্থিত হয় না তাদের কোনো নেক কাজও। তারা হচ্ছে ঃ পলাতক ক্রীতদাস— যতক্ষণ না মনিবের নিকট ফিরে আসবে, নেশাখোর, মাতাল— যতক্ষণ না সে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হবে এবং সেই স্ত্রী, যার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট— যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

ইবনে জাওজীর 'কিতাবুন্ নিসা'য় উদ্ধৃত অপর এক হাদীসে আরো বিস্তৃত কথা বলেছেন— হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُغَلِّسَةَ اَمَّا الْمُسَوِّفَةُ فَهِيَ الْمَرْاَةُ الَّتِيْ اِذَا رَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ سَوْفَ وَالْمُغَلِّسَةُ هِيَ الَّتِيْ اِذَا اَرَادَهَا زَوْجُهَا قَالَتْ اِنِّيْ حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ -
(عمدة القارى : ج -٢، ص -٥ -١)

রাসূলে করীম (স) 'মুস্বিফা' ও 'মুগ্লিসা'র ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। 'মুস্বিফা বলতে বোঝায় সেই নারী, যাকে তার স্বামী যৌন মিলনে আহবান জানালে সে বলে ঃ 'এই শীগ্গিরই আসছি।' আর 'মুগলিসা' হচ্ছে সেই স্ত্রী, যাকে তার স্বামী যৌন মিলনে আহবান জানালে সে বলে 'আমার হায়েয হয়েছে', অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ঋতু অবস্থায় নয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে স্ত্রীর স্বাস্থ্য, মানসিক অবস্থা ও ভাবধারার প্রতি পুরাপুরি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বামী যদি নিতান্ত পশু হয়ে না থাকে, তার মধ্যে থেকে থাকে মনুষ্যত্বসূলভ কোমল গুণাবলী, তাহলে সে কিছুতেই স্ত্রীর মরজী-মনোভাবের বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি করে যৌন মিলনের পাশবিক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে যাবে না। সে অবশ্যই স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত মানবিক সুবিধা-অসুবিধার, আনুকূল্য-প্রতিকূলতা সম্পর্কে খেয়াল রাখবে এবং খেয়াল রেখেই অগ্রসর হবে।

উপরে উদ্ধৃত হাদীসসমূহ সম্পর্কে ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

هٰذَا دَلِيْلٌ عَلٰى تَحْرِيْمِ اِمْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِهٖ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ - (شرح المسلم : ج -١، ص -٤٦٤)

এ সব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো প্রকার শরীয়তসম্মত ওযর বা কারণ ছাড়া স্বামীর শয্যায় স্থান গ্রহণ থেকে বিরত থাকা স্ত্রীর পক্ষে হারাম।

স্ত্রীর কোনো শরীয়তসম্মত ওযর থাকলে স্বামীকে অবশ্যই এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। ফিকাহ্‌বিদগণ এজন্যে বলেছেন ঃ

لَوْتَضَرَّرَتْ مِنْ كَثْرَةِ جِمَاعَةٍ لَمْ يَجُزِ الزِّيَادَةُ عَلٰى قَدْرِ طَاقَتِهَا - (درالمختارباب القسم)

অধিক মাত্রায় যৌন সঙ্গম যদি স্ত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহলে তার সামর্থ্যের বেশি যৌন সঙ্গম করা জায়েয নয়।

অবশ্য রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর এ ধরনের কামনা-বাসনা বা দাবি যথাযথভাবে পূরণের জন্যে সতত প্রস্তুত হয়ে থাকা। এ প্রস্তুত হয়ে থাকার গুরুত্ব নানা কারণে অনস্বীকার্য। এমনকি রাসূলে করীম (স)-এর ফরমান অনুযায়ী স্বামীর বিনানুমতিতে নফল রোযা রাখাও স্ত্রীর পক্ষে জায়েয নয়। তিনি বলেছেন ঃ

لَا تَصُوْمُ الْمَرْاَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - (بخارى)

স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখবে না।

কেননা রোযা রাখলে স্ত্রী স্বামীর যৌন মিলনের দাবি পূরণে অসমর্থ হতে পারে, আর স্বামীর এ দাবিকে কোনো সাধারণ কারণে অপূর্ণ রাখা স্ত্রীর উচিত নয়।

ইসলামে এসব বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কেবলমাত্র এজন্যে যে, সমাজের লোকদের পবিত্রতা, অকলংক চরিত্র ও দাম্পত্য জীবনের অপরিসীম তৃপ্তি ও সুখ-শান্তি, প্রেম-ভালোবাসা ও মাধুর্য রক্ষার জন্যে এ বিষয়গুলো অপরিহার্য।

আর এ কারণেই নবী করীম (স) ও সাহাবায়ে কিরাম-এর যুগে স্ত্রীগণ তাঁদের স্বামীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। স্বামীদের একবিন্দু অসন্তুষ্টি বা মনোকষ্ট তাঁরা সইতে পারতেন না। এমন কি, কোনো স্বামীর প্রত্যাখ্যানও তার স্ত্রীর এ কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করাতে পারত না। হাদীসে ও সাহাবীদের জীবন চরিতে এ পর্যায়ের ভূরি ভূরি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আল্লাহ্‌র ইবাদত আদায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা

আল্লাহ্‌র দ্বীন পালনের জন্যে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে পরস্পরকে উৎসাহ দান। ইসলামের ফরয ওয়াজিব ইবাদত এবং শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহ্‌কাম পালনের জন্যে তো একজন অপরজনকে প্রস্তুত ও উদ্বুদ্ধ করবেই। এ হচ্ছে প্রত্যেকেরই দ্বীনী কর্তব্য। কিন্তু তা ছাড়াও সুন্নত এবং নফল ইবাদতের জন্যেও তা করা ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য। এ সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর দু'-তিনটি বাণী এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهٗ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ - رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ -

(ابوداؤد، نسائى، ابن ماجه عن ابى هريرة)

আল্লাহ্ যে পুরুষকে রহমত দান করবেন, সে রাতের বেলা জেগে ওঠে নামায পড়বে এবং তার স্ত্রীকেও সেজন্যে সজাগ করবে। স্ত্রী ঘুম ছেড়ে উঠতে অস্বীকার করলে তার মুখে পানি ছিঁটিয়ে দেবে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ রহমত দান করবেন সেই স্ত্রীকে, যে রাতের বেলা জেগে উঠে নিজে নামায পড়বে এবং সে তার স্বামীকেও সেজন্যে জাগাবে; স্বামী উঠতে না চাইলে মুখে পানি ছিঁটিয়ে দেবে।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهٗ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلِّيَا وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِىْ الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ - (ابودؤد، نسائى، ابن ماجه)

পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে রাতের বেলা জাগাবে এবং দুজনেই নামায পড়বে— আলাদা আলাদাভাবে এবং দুরাকাত নামায একত্রে পড়বে, আল্লাহ্ এ স্বামী-স্ত্রীকে আল্লাহ্র যিক্রকারী পুরুষ-নারীদের মধ্যে গণ্য করবেন।

স্বামী পরিচর্যায় মহিলা সাহাবী

হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে নবী করীম (স)-এর ভালোবাসা ইতিহাসে দৃষ্টান্তমূলক। হযরত আয়েশা (রা) একদিন হাতে রৌপ্য নির্মিত দস্তানা পরেছিলেন। নবী করীম (স) এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আয়েশা, তোমার হাতে কি পরেছ? তিনি বললেন ঃ আপনার সন্তুষ্টির জন্যে এ দস্তানা পরিধান করেছি। হযরত আয়েশা রাসূলের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাপড়-চোপড় তিনি নিজ হাতে ধুয়ে সাফ করে দিতেন, তাঁর পোশাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন, তাঁর মিস্ওয়াক শুকনো থাকলে তিনি তা চিবিয়ে মুখের লালায় ভিজিয়ে মসৃণ করে দিতেন এবং সেটাকে তিনি নিজের হেফাযতে রাখতেন। তিনি নিজ হাতে রাসূলের চুলে দাঁড়িতে চিরুনী করে দিতেন। বুখারী ও অন্যান্য হাদীসে তার অকাট্য প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত খাওলা (রা) একদা হযরত আয়েশার খেদমতে হাযির হয়ে বললেন ঃ আমি প্রতি রাতে সুসাজে সজ্জিতা হয়ে আল্লাহরই ওয়াস্তে স্বামীর জন্যে দুলহিন সেজে তার কাছে উপস্থিত হই, তারই পাশে গিয়ে শয়ন করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারিনি— সে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। হযরত আয়েশার জবানীতে রাসূলে করীম (স) এ কথা শুনে বললেন ঃ তাকে বলো, সে যেন তার স্বামীর আনুগত্য ও মনস্তুষ্টি সাধনেই সতত ব্যস্ত থাকে।

এ ধরনের সমাজ-পরিবেশের ফলে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা গভীর ও অসীম হয়ে যায়। একজন অপরজনের জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। স্বয়ং রাসূলে করীম (স)-এর সাথে তাঁর বেগমদের প্রেম-ভালোবাসা ছিল বর্ণনাতীত। হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাসূলের জন্যে— জিন্দেগীর মিশনের জন্যে রাসূল হিসেবে তাঁর কঠিন দায়িত্ব পালনে তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পদ নিঃশেষ খরচ করে দিয়েছিলেন। আর সেজন্যে তিনি কোনোদিন এতটুকু আফসোসও প্রকাশ করেন নি। বরং নবী করীম (স) যদি কখনও সে বিষয়ে কথা তুলতেন, তাহলে তিনি নিজেই রাসূলকে সান্ত্বনা দিতেন।

রাসূলে করীম (স)-এর মহিলা সাহাবিগণ প্রায় সকলেই এই একই ভাবধারায় মহিমান্বিত ছিলেন। হযরতের কন্যা জয়নব তাঁর স্বামীকে বন্দীশালা থেকে মুক্তিদানের জন্যে নিজের কণ্ঠের বহু মূল্যের হার ফিদিয়া-বিনিময় মূল্য-হিসেবে দিয়েছিলেন ও তাকে মুক্ত করেছিলেন।

এসব ঘটনা হতে নিঃসন্দেহ বোঝা যায় যে, ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর জীবনকে এক উত্তম প্রেম-ভালোবাসার মাধুর্যপূর্ণ ভাবধারায় সঞ্জীবিত দেখতে চায়। কেননা প্রেম-ভালোবাসা, পারস্পরিক

আদর-যত্ন ও সোহাগ না হলে দাম্পত্য জীবন আর বিয়ের বন্ধন যে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়, তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

পারিবারিক জীবনের সংস্থা

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে ইসলামের পারিবারিক সংস্থার কাঠামো ও ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সহজেই করা যেতে পারে। নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতা, নানাবিধ দৈহিক অসুবিধা এবং পুরুষের তুলনায় তার দৈহিক ও মানসিক অসম্পূর্ণতার কারণে ইসলাম স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক জীবনে পুরুষের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সমষ্টিগত জীবনের প্রধান কিংবা পারিবারিক জীবনের চেয়ারম্যান— পরিচালক ও নেতা হচ্ছে পুরুষ— স্ত্রী নয়। কেননা পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে যে কোনো প্রতিকূলতা, অসুবিধা, বিপদ-মুসিবত আসতে পারে কিংবা সাধারণত এসে থাকে, তার মুকাবিলা করার এবং এ সমস্যার ও জটিলতার সমাধান করার উপযুক্ত ক্ষমতা ও যোগ্যতা পুরুষেরই রয়েছে। সাধারণত সে ক্ষমতা স্ত্রীলোকের হয় না। অন্তত পুরুষের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে স্ত্রীলোকদের সে ক্ষমতা অনেকাংশে কম ও অপ্রতুল। একথা বাস্তব দৃষ্টিতে ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অনস্বীকার্য। ঠিক এ কারণেই পরিবার পুরুষের নেতৃত্বে চলবে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে একথাই বলেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ - (النساء : ٣٤)

স্বামীগণ হচ্ছে তাদের স্ত্রীদের পরিচালক, সংরক্ষক, শাসনকর্তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরস্পরকে পরস্পরের ওপর অধিক মর্যাদাবান করেছেন এবং এজন্যে যে, পুরুষ তাদের ধনমাল খরচ করে।

কুরআনের শব্দ قوام -এর মানে হচ্ছে Sustainer, provider, protector, শাসক, সংরক্ষক, নেতা, কর্তা, যাবতীয় বিষয় ও ব্যাপারের সম্পাদনকারী ও পর্যবেক্ষক। ইবনুল আরাবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

قَوَّامٌ هُوَ اَمِيْنٌ عَلَيْهَا يَتَوَتّٰى اَمْرَهَا وَيُصْلِحُهَا فِىْ حَالِهَا - (احكام القران : ج -١، ص- ٤١٦)

স্বামী 'কাওয়াম'-এর অর্থ হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর আমানতদার রক্ষণাবেক্ষণকারী, তার যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল, কর্তা এবং তার অবস্থার সংশোধনকারী ও কল্যাণ বিধানকারী।

ইবনুল আরাবী সূরা আল-বাকারার আয়াতাংশ ঃ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

يفضل القوامية فعليه ان يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة ويحجبها ويا مرها بطاعة الله وينهى اليها شعائرها الاسلام من صلاة وصيام وعليها الحفظ لماله والاحسان الى اهله والالتزام لامره فى الحجبة وغير الاباذنه - (احكام القران : ج- ١، ص -٤١٦)

পুরুষের অধিক মর্যাদা হচ্ছে নেতৃত্বের অধিকারের কারণে। স্ত্রীকে মহরানা দান, যাবতীয় ব্যয়ভার বহন, তার সাথে গভীর মিলমিশ সহকারে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা, তাকে সব অপকার থেকে রক্ষা, আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্যে আদেশ করা এবং নামায-রোযা ইত্যাদি ইসলামের মৌলিক অনুষ্ঠানাদি পালনের জন্যে তাগিদ করার কাজ স্বামীই করে থাকে— করা কর্তব্য। আর তার বিনিময়ে স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর ধনমালের হেফাযত করা, স্বামীর পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা এবং আত্মসংরক্ষণমূলক যাবতীয় কাজে-কর্মে স্বামীর আদেশ পালন করে চলা— স্বামীর বিনানুমতিতে তার কোনোটাই ভঙ্গ না করা।

উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে ইবনুল আরাবীর মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছে এই ঃ

اَلْمَعْنٰى اِنِّيْ جَعَلْتُ الْقَوَّامِيَّةَ عَلَى الْمَرْاَةِ لِلرَّجُلِ لِاَجْلِ تَفْضِيْلِى لَهٗ عَلَيْهَا وَذٰلِكَ لِثَلَاثَةِ اَشْيَاءَ اَلْاَوَّلُ كَمَالُ الْعَقْلِ وَالتَّمْيِيْزُ اَلثَّانِيْ كَمَالُ الدِّيْنِ وَالطَّاعَةُ فِى الْجِهَادِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى الْعُمُوْمِ - (احكام القران : ج -١، ص -٤١٦)

আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ আমি স্ত্রীর ওপর পুরুষের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব দিয়েছি তার ওপর তার স্বাভাবিক মর্যাদার কারণে। তিনটি বিষয়ে পুরুষ স্ত্রীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। প্রথম, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনায় পূর্ণত্ব লাভ; দ্বিতীয়, দ্বীন পালন ও জিহাদের আদেশ পালনের পূর্ণতা এবং তৃতীয় সাধারণভাবে ভালো কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা-(এসব পুরুষের দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পুরামাত্রায় পুরুষের ওপরই বর্তে।)

সহজ কথায় বলা যায়, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, কর্মশক্তি, দুর্ধর্ষতা, সাহসিকতা, বীরত্ব, তিতিক্ষা ও সহ্যশক্তি স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা পুরুষদের বেশি। আর পারিবারিক জীবনে অর্থোপার্জন ও শ্রম পুরুষই করে থাকে। স্ত্রীকে মহরানা পুরুষই দেয়; স্ত্রীর ও সন্তান-সন্তুতির খোরাক-পোশাক ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস পুরুষই সংগ্রহ করে থাকে। এজন্যে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দাম্পত্য জীবনের প্রধান কর্তা, পরিচালক ও চেয়ারম্যান পুরুষকেই বানানো হয়েছে! কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণ কি ?

পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য

কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত বহু গুণ-বিশিষ্ট এবং স্বভাবজাত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার কারণে স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরুষ অনেকখানি অগ্রসর! স্ত্রীলোক স্বাভাবিকভাবেই জীবনের কিছু সময় সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তখন সে অপরের সাহায্য ও সক্রিয় সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। সন্তান গর্ভে থাকাকালে, সন্তান প্রসব, স্তনদান, শিশু পালন এবং নিয়মিত হায়েয-নেফাসের সময় স্ত্রীলোকদের অবস্থা কোনো বিশেষ দায়িত্ব পালনের অনুকূল নয়।

শাহ্ অলী উল্লাহ্ দেহ্‌লভী পুরুষের এ প্রাধান্য সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

يجب ان يجعل الزوج قواما على امراته ان يكون له الطول عليها بالجبلة فان الزوج اتم عقلا واوقر سياسة واكد حماية وذباللعار وبالمال حيث انفق عليها رزقها وكسوتها - (حجة الله البالغة : ج -٢)

স্বামীকে তার স্ত্রীর ওপর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে নিযুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। আর স্ত্রীর ওপর এ প্রাধান্য স্বভাবসম্মতও বটে। কেননা পুরুষ জ্ঞান-বুদ্ধিতে অধিক পূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অধিক সুদক্ষ, সাহায্য-প্রতিরোধের কাজে প্রবল ও সুদৃঢ়। লজ্জা ও অপমানকর ব্যাপার থেকে রক্ষা করার অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। পুরুষ স্ত্রীর খোরাক-পোশাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে বলেও স্ত্রীর ওপর পুরুষের এ নেতৃত্ব ও প্রাধান্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আল্লামা বায়জাবী উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

পুরুষরা স্ত্রীদের দেখাশোনা ও পরিচর্যা এমনভাবে করে, ঠিক যেমনভাবে শাসকগণ করে থাকে (বা করা উচিত) দেশের জনসাধারণের। আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীদের তুলনায় পুরুষদের দুটি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। একটি কারণ আল্লাহ্‌র বিশেষ দান সম্পর্কীয়, আর অপরটি পুরুষদের

নিজস্ব অর্জনের ব্যাপারে। আল্লাহ্র দান এই যে, আল্লাহ্ নানা দিক দিয়ে পুরুষদের বিশিষ্ট করেছেন। স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও গুরুতর কার্য সম্পাদন, বিপুল কর্মশক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে পুরুষগণ সাধারণতই প্রধান ও বিশিষ্ট। এজন্যেই নবুয়ত, সামাজিক নেতৃত্ব, শাসন ক্ষমতা, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্যে জিহাদ, বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দায়িত্ব কেবল পুরুষের ওপরই অর্পিত হয়েছে এবং সেই দায়িত্ব অধিক হওয়ার কারণে মীরাসে স্ত্রীলোকদের তুলনায় পুরুষদের অংশ বেশি দেয়া হয়েছে। আর পুরুষদের উপার্জিত কারণ হলো ঃ আসলে বিয়ে থেকে শুরু করে মহরানা দান, ভরণ-পোষণ ও পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের যাবতীয় দায়িত্ব পুরুষরাই পালন করে থাকে। (تفسير بيضاوى : ج-١، ص-١٨٥)

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যাচাই করলেও একথা প্রমাণিত হয় যে, পুরুষের মগজ স্ত্রীলোকের তুলনায় অনেক বড়। বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রতিভা অপেক্ষাকৃত বেশি। বুদ্ধি-জ্ঞানে অধিক পরিপক্ক। সেই সঙ্গে পুরুষের দেহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও হয় নারীর তুলনায় অনেক মজবুত। মিসরীয় চিন্তাবিদ আল্লামা ফরীদ আজ্দী লিখেছেন ঃ

পুরুষের মগজ সাধারণত গড়ে সাড়ে ৪৯ আউন্স, আর স্ত্রীলোকের মগজের ওজন মাত্র ৪৪ আউন্স। দু'শ' আটাত্তরজন পুরুষের মগজ ওজন করে দেখা গেছে, সবচেয়ে বড় মগজের ওজন হচ্ছে ৬৫ আউন্স, আর সবচেয়ে ছোট মগজের ওজন ৩৪ আউন্স। পক্ষান্তরে ২৯১ জন স্ত্রীলোকের মগজ ওজন করার পর প্রমাণিত হলো যে, সবচেয়ে ভারী মগজের ওজন হচ্ছে ৫৪ আউন্স, আর সচেয়ে হালকা মগজের ওজন হচ্ছে ৩১ আউন্স।.........এ থেকে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, স্ত্রীলোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও স্নায়ু পুরুষের তুলনায় অনেক গুণ দুর্বল ? (المراة المسلمة। ফরীদ অজ্দী) বৈজ্ঞানিক তদন্তে এও জানা গেছে যে, নারী-পুরুষের মগজের ওজনের এ পার্থক্য কেবল এক সমাজেই নয়, সব সমাজের— সকল স্তরের নারী-পুরুষেরই এই একই অবস্থা। সভ্য-অসভ্য জাতির মধ্যেও এ ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। প্যারিসের মতো সুসভ্য নগরীতে যেমন নারী ও পুরুষের এ পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে, তেমনি দেখা যাবে আমেরিকার বর্বরতম জাতির মধ্যেও।

এ যুগের আরবী মনীষী আব্বাস মাহমুদ আকাস আল-আক্কাদ লিখেছেন ঃ

'স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব স্বাভাবিক মর্যাদা আধিক্যের কারণে এবং এ কারণে যে, স্ত্রীর যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব স্বামীর। আর এ কর্তব্য হচ্ছে কম মর্যাদাশালীর প্রতি অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তির কর্তব্য। কেবল আর্থিক প্রয়োজন পূরণই এর একমাত্র ভিত্তি নয়। অন্যথা যে স্ত্রীর ধনশালী কিংবা যে স্বামী স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণ করে না বরং স্ত্রীর মেহমান হয়ে তার সম্পদ ভোগ করে, সেখানে স্ত্রীরই উত্তম ও কর্তী— হওয়া উচিত স্বামীর কিন্তু ইসলামে তা কোনো দিন হতে পারে না। (مجلة الحج عدد ٨ السنه ١٩ من سهر صفر ١٣٨٥)

মোটকথা, আধুনিক জ্ঞান-গবেষণা অনুযায়ীও স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা অধিক!

কুরআন মজীদে এ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - (البقرة : ٢٢٨)

এবং স্ত্রীদের ওপর পুরুষের এক ধরনের প্রাধান্য রয়েছে।

এ আয়াতেও পারিবারিক জীবনের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য পুরুষকেই দেয়া হয়েছে, নারীকে নয়। আর সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও বস্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এ কথার যথার্থতা স্বীকৃত।

পুরুষ সন্তানের পিতা, তারই সন্তান বলে পরিচিত হয়ে থাকে লোকসমাজে। ছোটরাও যেমন, বড়রাও তেমনি। তাই পরিবারে পুরুষেরই কর্তৃত্ব হওয়া উচিত।

পরিবারের লোকজনের সকল প্রকার খরচপত্র পরিবেশনের জন্যে পুরুষ— পিতাই— দায়ী, তারই নিকট সব কিছু দাবি করা হয় এবং সেই বাধ্য হয় সব যোগাড় করে দিতে। খাবার, পোশাক, চিকিৎসা, বিয়ে ও শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হয়। এদের মধ্যে সন্তানরাও যেমন থাকে, স্ত্রীও। অতএব এ সকলের ওপর পুরুষের নেতৃত্বই স্বাভাবিক। আর তার নেতৃত্বে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কোনো আপত্তি বা সংশয় থাকতে পারে না।

মেয়েলোকের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার আজীবনের আশ্রয় পিতার ঘর হয়ে যায় পরের বাড়ি, আর জীবনে কোনোদিন যাকে দেখেনি— যার নাম কখনো শুনেনি, তেমন এক পুরুষ হয়ে যায় তার চিরআপন এবং সে পিতার ঘর ত্যাগ করে তারই সাথে চলে যায় তারই বাড়িতে। এ-ই সাধারণ নিয়ম। অতএব বসতবাটির মালিক হচ্ছে পুরুষ, সে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব যার, ঘরের ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বও তারই হওয়া উচিত! কিন্তু এ কর্তৃত্ব জোর-জবরদস্তির নয়, না-ইনসাফী, অসাম্য ও স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়; বরং এ হচ্ছে— "যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদেরই পরিচালনার কর্তৃত্ব" ধরনের। কেননা একজন লোক যাদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে, তাদের ওপর সে লোকের যদি কর্তৃত্ব না থাকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের, পথনির্দেশের, প্রতিরোধের, তাহলে সে তার দায়িত্ব পালন করতে কিছুতেই সমর্থ হতে পারে না। এ ধরনের কর্তৃত্ব যেমন পরিবারের অন্যান্য লোকের অধিকার হরণকারী হয় না, তেমনি তা হরণ করে না স্ত্রীর অধিকারও। অতএব এ ধরনের কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মাত্র, যা দায়িত্বাধীন লোকদের তুলনায় দায়িত্বশীলের জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এতে করে না স্ত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা স্বামীকে দেয়া হয়েছে, না তার ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করা হয়েছে।

বস্তুত পারিবারিক ব্যবস্থাপনা-পরিচালনার কর্তৃত্ব স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে সুবিচার, সাম্য ও পরামর্শমূলক সূক্ষ্মতম ভিত্তিতে কায়েম হয়ে থাকে, তা স্বভাবতই স্বৈরনীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। বরং তাতে প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতের আযাদী, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভের সুযোগ সংরক্ষিত হয়, স্ত্রীর ধন-মালের ওপর কর্তৃত্ব তারই হবে, স্বামীর নয়। স্ত্রী যথা-ইচ্ছা ও যেমন ইচ্ছা তা ব্যয় ব্যবহার করতে পারে, সে বিষয়ে স্বামীর কিছুই বলবার ও করবার থাকতে পারে না। সে যদি তার ধনমাল সংক্রান্ত কোনো বিবাদে অপর কারো বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থী হতে চায়, তবে সে অনায়াসেই তা করতে পারে। স্বামীর সে ব্যাপারে আপত্তি বা হস্তক্ষেপ করারও কোনো অধিকার নেই। ইসলাম এদিক দিয়ে মুসলিম নারীকে এমন এক মর্যাদা দিয়েছে, যা অত্যাধুনিকা ফরাসী নারীরাও আজ পর্যন্ত লাভ করতে পারে নি। (المرأة بين البيت والمجتمع للخولى)

অধিকার সাম্য

স্বামী-স্ত্রীর মিলিত দাম্পত্য জীবনে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও ইসলাম স্ত্রীকে পুরুষের দাসী-বাঁদী বানিয়ে দেয়নি। যদি কেউ তা মনে করে, তবে সে মারাত্মক ভুল করে। প্রশ্ন হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রীর মিলিত পারিবারিক জীবনে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে না কি ? কোনো বিষয়ে যদি পারস্পরিক মতপার্থক্য কখনও ঘটে যায়, তখন সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার কার্যকরী পন্থা কি হতে পারে ? ইসলাম বলেছে, তখন পুরুষের মতই প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার পাবে। তখন স্ত্রীর কর্তব্য হবে স্বামীর মতকেই মেনে নেয়া, স্বামীর কথা মতো কাজ করা। কেননা তাকে মনে করতে হবে যে, স্বামী— তার চাইতে বেশি জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অধিকারী এবং এজন্যে পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত 'সভাপতিত্বের' মর্যাদা স্বতঃই স্বামীরই প্রাপ্য।

এ সম্পর্কে ইসলামের ব্যাপক আদর্শ হচ্ছে এই যে, মুসলিম জীবনের সকল সামাজিক-সামগ্রিক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক পরামর্শ ও যথাসম্ভব ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। এ পরামর্শ নেয়া-দেয়া কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই নয়, পারিবারিক জীবনের গণ্ডীতেও অপরিহার্য। আর তাতে পরামর্শ দেয়ার অধিকার রয়েছে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই এবং এ পরামর্শের ব্যাপারেও যার মত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হবে, তারই মত মেনে নেয়া হলো পরামর্শ ভিত্তিক সংস্থার লক্ষ্য।

কুরআন মজীদে এ পর্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - (البقرة : ٢٢٨)

স্ত্রীদের ওপর পুরুষদের যে রকম অধিকার রয়েছে, ঠিক অনুরূপ সমান অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর স্ত্রীলোকদের এবং তা সুস্পষ্ট প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হবে।

আয়াতটি সংক্ষিপ্ত হলেও এতে পারিবারিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ও নিয়ম উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, সকল ব্যাপারে ও বিষয়ে নারী পুরুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন। সকল মানবীয় অধিকারে নারী পুরুষেরই সমান, প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে। তাই রাসূলে করীমও বলেছেন ঃ

اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَاءِكُمْ حَقًّا وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا - (طبرى)

নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের হক— অধিকার— রয়েছে এবং তাদেরও অধিকার রয়েছে তোমাদের ওপর।

কেবল একটি মাত্র ব্যাপারে পুরুষ স্ত্রীর তুলনায় অধিক মর্যাদা পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের সমান নয়। আর তা হচ্ছে তাই যা বলা হয়েছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ -

পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সম্পন্না।

এই আয়াতাংশ এবং এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া আর সব ক্ষেত্রেই নৈতিকতা, ইবাদত, আল্লাহ্‌র রহমত ও ক্ষমা লাভ, কর্ম ফল প্রাপ্তি, মানবিক অধিকার ও সাধারণ মান-মর্যাদা এসব ব্যাপারেই স্ত্রীলোক পুরুষের সমান। অপর কোনো ক্ষেত্রেই পুরুষকে স্ত্রীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং স্ত্রীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করা যেতে পারে না। আর সত্যি কথা এই যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাসমূহের মাঝে একমাত্র ইসলামই নারীকে এ মর্যাদা দিয়েছে।

পুরুষকে পারিবারিক সংস্থার 'সভাপতি' করে দেয়া সত্ত্বেও ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে সব ব্যাপারে পারস্পরিক পরামর্শ করা ও পরামর্শের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কেননা এরূপ হলেই পারিবারিক জীবনে শান্তি, সন্তুষ্টি, মাধুর্য ও পরস্পরের প্রতি গভীর আস্থা ও নির্ভরতা বজায় থাকতে পারে। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ পান করাবার মেয়াদ হচ্ছে পূর্ণ দু'বছর। এর পূর্বে যদি দুধ ছাড়াতে হয় তবে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক পরামর্শ করে তা করতে পারে। নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই বলা হয়েছে ঃ

فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا - (البقرة : ٢٣٣)

স্বামী-স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট ও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে চায়, তবে তাতে তাদের কোনো গুনাহ হবে না।

আয়াতটিতে একদিকে যেমন স্বামী-স্ত্রী— পিতামাতা— উভয়েরই সন্তুষ্টি এবং পারস্পরিক পরামর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তেমনি অপরদিকে বিশেষভাবে স্ত্রী-সন্তানের মা'র সন্তুষ্টি

ও তার সাথে পরামর্শের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। একে তো বাপ-মা দু'জনের একজনের ইচ্ছায় এ কাজ হতে পারে না বলা হয়েছে; দ্বিতীয়ত হতে পারে যে, মা'য়ের মত ছাড়াই বাবা নিজের ইচ্ছার জোরে শিশু সন্তানের দুধ দু'বছরের আগেই ছাড়িয়ে দিলো, আর তাতে মা ও চিন্তান্বিতা হয়ে পড়ল এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুরও ক্ষতি হয়ে পড়ল। অতএব স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্তুষ্টি এবং সন্তানের পূর্বাপর অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সহজেই বুঝতে পারা যায়, দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধ ছাড়ানোর জন্যে যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও পরামর্শের এতদূর গুরুত্ব থাকতে পারে, তাহলে দাম্পত্য জীবনের অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে সেই পরামর্শ ও সন্তুষ্টির গুরুত্ব নিশ্চয়ই অনেক বেশি হবে। আর বাস্তবিকই যদি স্বামী-স্ত্রীর যাবতীয় কাজ পারস্পরিক পরামর্শ ও একে অপরের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পন্ন করে, তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবন নিঃসন্দেহে বড়ই মধুর হবে, নির্ঝঞ্ঝাট হবে, হবে সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ।

স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান ও তার আনুগত্য

এ দৃষ্টিতে স্বামীর যেমন কর্তব্য স্ত্রীর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে চেষ্টা করা, তেমনি স্ত্রীরও তা-ই কর্তব্য। স্ত্রীর যাবতীয় কাজে-কর্মে লক্ষ্য থাকবে প্রথম আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ এবং তারপরই দ্বিতীয়ত থাকবে স্বামীর সন্তোষ লাভ। আর এ স্বামীর সন্তোষ লাভের জন্য চেষ্টা করাও আল্লাহ্র সন্তোষেরই অধীন। কেননা আল্লাহ্ই তার সন্তোষ লাভের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীদের। এ কারণে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَيُّمَا اِمْرَاَةٍ مَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَنْهَارَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ - (ترمذی)

যে মেয়েলোকই এমনভাবে মৃত্যুবরণ করবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে অবশ্যই বেহেশতবাসিনী হবে।

স্বামীর সন্তোষ বিধানের জন্যেই তার আনুগত্য করাও স্ত্রীর কর্তব্য। রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَرْاَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاوَعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْ خُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَبِ الْجَنَّةِ شَائَتْ -

স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায রীতিমত পড়ে, যদি রমযানের একমাস ফরয রোযা রাখে, যদি তার যৌন অঙ্গের পবিত্রতা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে, তবে সে অবশ্যই বেহেশতের যে দুয়ার দিয়েই ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারবে।

এ হাদীসে স্বামীর আনুগত্য করাকে নামায-রোযা ও সতীত্ব রক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একেও সেসব কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় হাদীসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, স্ত্রীর ওপর যেমন আল্লাহ্র হক রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্বামীর অধিকার। স্ত্রীর যেমন কর্তব্য আল্লাহ্র হক আদায় করা, তেমনি কর্তব্য স্বামীর কথা শোনা এবং তার আনুগত্য করা, স্বামীর যাবতীয় অধিকার পূরণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। স্বামীর অধিকার আদায় না করে স্ত্রীর জৈবিক জীবন তেমনি সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না, যেমন আল্লাহ্র হক্ আদায় না করে সফল হতে পারে না তার নৈতিক ও পরকালীন জীবন। শুধু তাই নয়, স্বামীর হক আদায় না করলে আল্লাহ্র হকও আদয় করা যায় না। রাসূলে করীম (স) খুবই জোরালো ভাষায় বলেছেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا تُؤَدِّى الْمَرْاَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتّٰى تُؤَدِّىْ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَالَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلٰى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ - (ابن ماجه)

যাঁর মুষ্টিতে মুহাম্মদের প্রাণ-জীবন, তাঁর শপথ, স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বামীর হক আদায় না করবে, ততক্ষণ সে তার আল্লাহ্‌র হকও আদায় করতে পারবে না। স্বামী যদি স্ত্রীকে পেতে চায়— যখন সে সওয়ার হয়ে যাচ্ছে— তবে তখনো সে স্বামীকে নিষেধ করতে পারবে না

বস্তুত স্বামীর হক আদায় করার জন্যে দরকার তার আনুগত্য করা, তার কথা বা দাবি অনুযায়ী কাজ করা। এজন্যে সর্বোত্তম স্ত্রী কে এবং কি তার গুণ, এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلَّتِىْ تَسُرُّهٗ اِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهٗ اِذَا اَمَرَ وَ لَا تُخَالِفُهٗ فِىْ نَفْسِهَا وَ لَا مَالِهَا بِهَا يَكْرَهُ -

সে হচ্ছে সেই স্ত্রীলোক, যাকে স্বামী দেখে সন্তুষ্ট হবে, যে স্বামীর আনুগত্য করবে এবং তার নিজের স্বামীর ধনমালে স্বামীর মতের বিরোধিতা করবে না— এমন কাজ করবে না, যা সে পছন্দ করে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর যেমন কর্তব্য, তেমনি অত্যন্ত বিরাট মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের ব্যাপারও বটে। নিম্নোক্ত হাদীসে এ মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কথা সুস্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে।

مَااسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوٰى اللّٰهِ خَيْرًالَّهٗ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَ اِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ - (ابن ماجه)

মুসলিমদের জন্যে তাকওয়ার পর সবচেয়ে উত্তম জিনিস হচ্ছে নেককার চরিত্রবতী স্ত্রী— এমন স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মেনে চলে, স্বামী তার প্রতি তাকালে সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং স্বামী কোনো বিষয়ে কসম দিলে সে তা পূরণ করবে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজের ও স্বামীর ধনমালের ব্যাপারে স্বামীর কল্যাণকামী হবে।

অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র ভয় ও তাক্‌ওয়ার পর সব মুসলিম পুরুষের জন্যেই সর্বোত্তম সৌভাগ্যের সম্পদ হচ্ছে সতী-সাধ্বী, সুদর্শনা ও অনুগতা স্ত্রী। প্রিয়তম স্বামীর সে একান্ত প্রিয়তমা, স্বামীর প্রতিটি কথায় সে উৎসর্গীকৃতা, সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে সে অতন্দ্র সজাগ আর এ রকম স্ত্রী যেমন একজন স্বামীর পক্ষে গৌরব ও মাহাত্ম্যের ব্যাপার, তেমনি এ ধরনের স্ত্রীও অত্যন্ত ভাগ্যবতী।

স্বামীর আনুগত্য করার ওপর এই সব হাদীসেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পারিবারিক জীবনে স্ত্রী যদি স্বামীর প্রাধ্যান্য স্বীকার না করে, স্বামীকে মেনে না চলে, স্বামীর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি উভয় সময়ই যদি স্ত্রী স্বামীর কল্যাণ বিধানে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে দাম্পত্য জীবন কখনই মধুর হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু স্বামীর এ আনুগত্যও অবাধ নয়, অসীম নয়, নয় নিঃশর্ত। ইসলামের আনুগত্য নীতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এ আনুগত্যও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অধীন। এজন্যে আনুগত্যের ব্যাপারে সর্বত্র শরীয়ত সীমার উল্লেখ করা হয়েছ। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ 'সঙ্গত ও শরীয়তসম্মত কাজে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য।' অন্যত্র বলেছেন ঃ 'কোন স্ত্রী ঈমানের স্বাদ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় করবে।' (مفتاح الخطابة عن الحاكم - ص : ١٨٥)

এ দুটি হাদীসেই 'সঙ্গত' ও 'শরীয়তসম্মত' বা 'ন্যায়সঙ্গত' শর্তের উল্লেখ রয়েছে। কাজেই স্বামীর

অন্যায় জিদ বা শরীয়ত-বিরোধী কাজের কোনো আদেশ বা আবদার পালন করতে স্ত্রী বাধ্য নয়। শুধু তা-ই নয়, স্বামী শরীয়ত-বিরোধী কোনো কাজের আদেশ করলে তা অমান্য করাই ঈমানদার স্ত্রীর কর্তব্য। বুখারী শরীফের এক অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে ঃ

بَابُ لَا تُطِيْعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِىْ مَعْصِيَةٍ -

গুনাহের কাজে স্ত্রী স্বামীর আদেশ মানবে না— এ সম্পর্কিত হাদীসের অধ্যায়।

আর তারপরই যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, এক আনসারী মহিলা তার কন্যাকে বিয়ে দেয়। বিয়ের পর কন্যার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করে। তখন মহিলাটির জামাতা তাকে বলল— তার স্ত্রীর মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দিতে। তখন মহিলাটি রাসূলে করীমের দরবারে হাজির হয়ে বলল ঃ

اِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِىْ اَنْ اَصِلَ فِىْ شَعَرِهَا -

আমার মেয়ের স্বামী আমাকে আদেশ করেছে যে, আমি যেন মেয়ের মাথায় পরচুলা জুড়ে দেই।

একথা শুনে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

لَا اِنَّهُ قَدْ لَعَنَ الْمَوْصُوْلَاتِ -

না, তা করবে না, কেননা যেসব মেয়েলোক পরচুলা লাগায় তাদের ওপর লানত করা হয়েছে।

অন্য কথায়, পরচুলা লাগানো যেহেতু হারাম, অতএব এ হারাম কাজের জন্যে স্বামীর নির্দেশ মানা যেতে পারে না। (بخارى : ج- ٢)

নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদে স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর ঘরে স্ত্রীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত। স্ত্রীর যেমন অধিকার আছে সীমার মধ্যে থেকে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করার পরে যে কোনো কাজ করে অর্থোপার্জন করার, তেমনি অধিকার রয়েছে সেই উপার্জিত অর্থের মালিক হওয়ার এবং নিজের ইচ্ছানুক্রমে তা ব্যয় ও ব্যবহার করার। স্বামীর ধন-সম্পদেও তার ব্যয়-ব্যবহার ও দান প্রয়োগের অধিকার রয়েছে। সেই সঙ্গে সে মীরাস পেতে পারে পিতার, ভাইয়ের, পুত্র-কন্যার এবং স্বামীর।

স্বামীর ধন-সম্পদে স্ত্রীর অধিকার এতদূর রয়েছে যে, তার ব্যয়-ব্যবহার করার ব্যাপারে সে তার স্বামীর মর্জি বা অনুমতির মুখাপেক্ষী নয়। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ ذَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ -

(رواه الجماعة)

স্ত্রী যদি স্বামীর খাদ্যদ্রব্য থেকে শরীয়ত-বিরোধী নয়— এমন কাজে এবং খারাপ নয়— এমনভাবে ব্যয় করে তবে তাতে তার সওয়াব হবে, কেননা সে ব্যয় করেছে; আর তার স্বামীর জন্যেও সওয়াব রয়েছে, কেননা সে তা উপার্জন করেছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ كَسَبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِهِ - (بخارى، مسلم)

স্ত্রী যদি তার স্বামীর কামাই-রোজগার করা ধন-সম্পদ থেকে তার আদেশ ব্যতীতই কিছু ব্যয় করে, তবে তার স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে।

হযরত আসমা বিন্‌তে আবূ বাশার (রা) একদিন রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لِىْ شَىْءٌ اِلَّا مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ اَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَىَّ -

হে রাসূল, স্বামী জুবাইর আমাকে সংসার খরচ বাবদ যা কিছু দেন, তা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। এখন তা থেকে যদি আমি দান-সাদ্‌কার কাজে কিছু ব্যয় করি, তবে কি আমার গুনাহ্ হবে ?

তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِرْضَخِىْ مَااسْتَطَعْتِ وَ لَا تُوْعِىْ فَيُوْعِىْ اللّٰهُ عَلَيْكَ - (بخارى، مسلم)

যা পারো দান-সাদ্‌কা করো— করতে পারো; তবে নিজের তহবিলে নিয়ে জমা করে রেখো না, তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ্ও তোমার জন্যে শাস্তি জমা করে রাখবেন।

ইবনে আরাবী লিখেছেন ঃ স্বামীর ঘরের মাল-সম্পদ থেকে দান-সাদ্‌কা করা স্ত্রীর পক্ষে জায়েয কিনা— এ সম্পর্কে প্রথম যুগের মনীষিগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে— সে দানের পরিমাণ অল্প, সামান্য ও হালকা হলে কোনো দোষ নেই, তা জায়েয। কেননা তাতে স্বামীর বিশেষ কোনো ক্ষতি-লোকসানের আশংকা নেই। কেউ বলেছেন, স্বামীর অনুমতি হলে তবে তা করা যেতে পারে; সেই অনুমতি সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট হলেও ক্ষতি নেই। ইমাম বুখারীরও এই মত। তবে কোনো প্রকার অন্যায় কাজে অর্থ ব্যয় কিংবা স্বামীর ধন-সম্পদ বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েয। অনেকের মতে স্বামীর ধন-সম্পদে যখন স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত এবং তা দেখাশোনা করার দায়িত্বও তারই ওপর রয়েছে, তখন তা থেকে দান-সাদ্‌কা করাও স্ত্রীর পক্ষে অবশ্যই সঙ্গত হবে।

ইমাম শাওকানীর মতে এ সম্পর্কিত যাবতীয় হাদীস থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় ঃ

اِنَّهٗ يَجُوْزُ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَنْفِقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ اِذْنِهٖ -

স্বামীর ঘর থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকেই অর্থসম্পদ ব্যয় করা স্ত্রীর পক্ষে সম্পূর্ণ জায়েয।

তবে যেসব হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধ উল্লিখিত হয়েছে, নিষেধের মানে 'হারাম' নয়, বরং বড়জোর মাক্‌রূহ। আর মক্‌রূহ তানজীহ্ জায়েয হওয়ার পরিপন্থী নয়।

وَيُمْكِنُ اَنْ يُّقَالَ اَنَّ النَّبِىَّ لِلْكَرَاهَةِ فَقَطْ .... وكَرَاهَةُ التَّنْزِيْهِ لَا تُنَا فِىْ الْجَوَازَ -

(نيل الاوطار: ج -٦، ص -١٢٢)

অপর এক হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, মুজার কবীলার এক সম্মানিতা মহিলা রাসূলে করীম (স)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ

يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَنَا كُلٌّ عَلٰى اٰبَائِنَا وَ اَبْنَائِنَا وَ اَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ اَمْوَالِهِمْ -

হে আল্লাহ্‌র নবী, আমরা হচ্ছি আমাদের পিতা, পুত্র ও স্বামীদের ওপর এক বোঝা স্বরূপ। এমতাবস্থায় তাদের ধনমাল থেকে ব্যয় করার কোনো অধিকার আমাদের আছে কি ?

জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

الرطب تاكلنه وتهدينه - (الوداؤد)

যাবতীয় তাজা খাদ্য তোমরা খাবে, আর অপরকে হাদিয়া-তোহফা দেবে।

এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে ঃ

يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَاْكُلَ مِنْ مَالِ اِبْنِهَا وَ اَبِيْهَا وَ زَوْجِهَا بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ وَتَهَادِىْ -

(نيل الاوطار : ج -٦، ص-١٢٦ظ)

মেয়েদের জন্যে তাদের স্বামী, পিতা ও পুত্রের ধনমাল থেকে তাদের অনুমতি ছাড়াই পানাহার করা ও অপরকে হাদিয়া-তোহফা দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয।

তবে ইমাম শাওকানীর মতে মেয়েদের এ অধিকার কেবলমাত্র খাদ্য ও পানীয়ের দ্রব্যাদি সম্পর্কেই প্রযোজ্য ও স্বীকৃত। কাপড়-চোপড় ও টাকা-পয়সার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এ পর্যায়ে পরের উক্ত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য ঃ

وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ اَمْرِهٖ فَاِنَّهٗ يُؤَدِّىْ اِلَيْهِ شَطْرَهٗ - (بخارى)

স্ত্রী স্বামীর আদেশ-অনুমতি ব্যতিরেকেই যা কিছু ব্যয় করে তার অর্ধেক সওয়াব সে স্বামীকে দেয়।

স্ত্রীর নিজস্ব ধনমাল ব্যয়-ব্যবহার ও দান-সাদ্‌কা করার অধিকার আছে কিনা, থাকলে কতখানি, তা নিম্নের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَجُوْزُ لِامْرَاَةٍ عَطِيَّةٍ اِلَّا بِاِذْنِ زَوْجِهَا - (احمد، نسائى، ابوداؤد)

স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে দান-সাদ্‌কা করা বা উপহার-উপঢৌকন দেয়া জায়েয নয়।

অপর বর্ণনায় হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ ঃ

لَا يَجُوْزُ لِلْمَرْاَةِ اَمْرٌ فِىْ مَالِهَا اِذَا مَلَكَ زَوْجِهَا عِصْمَتَهَا -

স্ত্রীর সমগ্র যৌন সত্তার মালিক যখন স্বামী, তখন তার অনুমতি ছাড়া তার নিজের ধনমাল ব্যয়-বন্টন করা স্ত্রীর জন্যে জায়েয নয়।

এ হাদীস থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি পূর্ণ বয়স্কা ও বুদ্ধিমতিও হয়, তবু স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তার নিজের ধনমাল থেকেও দান-সাদ্‌কা করা, উপহার-উপঢৌকন দেয়া তার পক্ষে জায়েয নয়। কিন্তু এ সম্পর্কিত চূড়ান্ত ফায়সালায় মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম লাইস বলেছেন ঃ

لايجوز لها ذلك مطلقالا فى الثلث ولا فيما دونه الافى الشى التافقة -

স্ত্রীর পক্ষে তা আদৌ জায়েয নয়, এক-তৃতীয়াংশের ওপরও নয়, তার কম পরিমাণের ওপর নয়। তবে অল্প-স্বল্প পরিমাণ ধর্তব্য নয়।

তাউস ও ইমাম মালিক বলেছে ঃ

انه يجوز لها ان تعطى مالها بغيرا ذنه فى الثلث لافيما فوقه فلا يجوز الا باذنه -

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী তার নিজর ধনমালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে দান-সাদ্‌কা করতে পারে। তার বেশি পারে না।

আর অধিকাংশ ফিকাহ্‌বিদ ও মনীষীদের মত হচ্ছে ঃ

يجوز لها مطلقا من غيراذن من الزوج اذا لم تكن سفيهة فان كانت سفيهة لم يجز -

স্ত্রী যদি বুদ্ধিহীনা ও বোকা না হয়, তাহলে স্বামীর কোনো প্রকার অনুমতি ব্যতিরেকেই তার (স্ত্রী) নিজের ধনমাল থেকে সে ব্যয়-ব্যবহার করতে পারে। আর সে যদি বুদ্ধিহীনা ও বোকা হয়, তবে তা জায়েয নয়।

এঁদের দলীল হচ্ছে প্রধানত এই যে, রাসূলে করীম (স)-এর আহ্বানক্রমে মহিলা-সাহাবিগণ নিজ নিজ অলংকার জিহাদের জন্যে দান করেছিলেন কিংবা যাকাত বাবদ দিয়ে দিয়েছিলেন এবং রাসূলে করীম (স) তা গ্রহণও করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর অনুমতি— এমন কি তার উপস্থিতি ছাড়াই স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে দান-সাদকা করা যখন স্ত্রীর পক্ষে জায়েয হলো তখন ঃ

فبا الا ولى الجواز فى ما لها - (نيل الاوطار : ج-٦، ص-١٢٥)

স্ত্রীর নিজের ধনমাল থেকে দান-সদকা করা তো আরো বেশি করে জায়েয হবে।

ঈদের ময়দানে উপস্থিত মেয়েরা নবী করীম (স)-এর আহ্বানক্রমে নিজেদের অলংকারাদি যাকাত বাবদ কিংবা দ্বীনের জিহাদের জন্যে দান করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

فذكرهن ووعظهن وامر هن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المراة تلقى الخاتم والخرص والشئ - (مسلم)

নবী করীম (স) মেয়েদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের নসীহত করলেন, তাদের লক্ষ্য করে ওয়াজ করলেন এবং সাদকা দিতে আদেশ করলেন। এ সময় বিলাল কাপড় পেতে ধরলেন এবং মেয়েরা আংটি, কানের বালা, ঝুমকা ইত্যাদি অলংকার সে কাপড়ের ওপর ফেলতে লাগল।

ইমাম নববী এ হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

فى هذا الحديث جواز صدقة المراة من مالها بغير اذن زوجها ولا يتوقف على ثلث مالها -

এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, মেয়েরা তাদের নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকেই দান সাদকা করতে পারে— করা জায়েয এবং এ দান মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্য থেকে হওয়ার কোনো শর্ত নেই।

এ হাদীস থেকে একথাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম(স) যখন মেয়েদের দান করতে বললেন এবং সে দান গ্রহণ করাও হচ্ছিল, তখন তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেন নি যে, তারা তাদের স্বামীদের কাছে অনুমতি পেয়ে দান করছে কিনা। বরং তারা যে তাদের স্বামীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দান করছে না তা তখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। দানকারিণী এ মহিলাদের স্বামীরা ময়দানে উপস্থিত ছিল বটে, কিন্তু তারা ছিল বেশ খানিকটা দূরে অবস্থিত। তাদের বেগমরা ঈদ-ময়দানের অপর একপাশে বসে কেবলমাত্র রাসূলে করীমের নির্দেশ মতো দান করছিলেন। ফলে তাদের স্বামীরা এ দানের খবর এবং তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতেও পারেনি, আর এ দানে তাদের অনুমতি দেয়ারও কোনো অবকাশ ছিল না। কাজেই তাদের নীরব অনুমতিরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না

দ্বিতীয়ত মেয়েরা যখন দান করছিল, তখন তাদের সমস্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে দান করছে কিনা, তা জিজ্ঞেস করারও কোনো প্রয়োজন নবী করীম (স) বোধ করেন নি।

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নরনারীর নৈতিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সংরক্ষণ। আর এজন্যে যেমন বিয়ে করার আদেশ করা হয়েছে, তেমনি পুরুষদের জন্যে এ অনুমতিও দেয়া হয়েছে যে, বিশেষ কোনো কারণে যদি এক সাথে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে সে তা করতে পারে। তবে তার শেষ সীমা হচ্ছে চারজন পর্যন্ত। এক সঙ্গে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করা একজন পুরুষের পক্ষে জায়েয— বিধিসঙ্গত। এক সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে যে আয়াতটি রয়েছে তা হচ্ছে এইঃ

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَ رُبٰعَ - (النساء : ٣)

তবে তোমরা বিয়ে করো যা-ই তোমাদের জন্যে ভালো হয়— দুইজন, তিনজন, চারজন।

'ما' অক্ষরের কারণে আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে। প্রথমত মেয়েলোকদের মধ্য থেকে দুই, তিন, চার যে বা যত সংখ্যাই তোমার জন্যে ভালো হয়, তত সংখ্যক মেয়েই তুমি বিয়ে করো। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছেঃ মেয়েলোকদের মধ্য থেকে যে যে মেয়ে তোমার জন্যে ভালো বোধ হয় তাকে তাকে বিয়ে করো, তারা দু'জন হোক, তিন জন হোক, আর চার জনই হোক না কেন। এজন্যে তাফসীরকারগণ এ আয়াতের অর্থ লিখেছেন এ ভাষায়ঃ

ای من طبن لنفوسكم من جهة الجمال الحسن او العقل ولصلاح منهن -

(محاسن التاويل : ج-٥ ص-١١٠٤)

অর্থাৎ রূপ-সৌন্দর্য কিংবা জ্ঞান-বুদ্ধি অথবা কল্যাণকারিতার দৃষ্টিতে যে যে মেয়ে তোমাদের নিজেদের পক্ষে ভালো বোধ হবে তাদের বিয়ে করো।

ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِالْاٰيَةِ عَلٰى تَحْرِيْمِ مَازَادَ عَلَى الْاَرْبَعِ .... وَ بَيَّنُوْا ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ خِطَابٌ لِجَمِيْعِ الْاُمَّةِ وَ اِنَّ كُلَّ نَاكِحٍ لَهٗ اَنْ يَّخْتَارَ مَا اَرَادَ مِنْ هٰذَا الْعَدَدِ - (فتح القدير: ج -١، ص -٥ -٣)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, চারজনের অধিক স্ত্রী এক সময়ে ও এক সঙ্গে গ্রহণ করা হারাম। তাঁরা বলেছেন যে, এ আয়াতে সমগ্র মুসলিম উম্মাকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। অতএব প্রত্যেক বিবাহকারী এ সংখ্যাগুলোর মধ্যে যে কোনো সংখ্যক স্ত্রী ইচ্ছা করবে গ্রহণ করতে পারবে।

এক সঙ্গে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের এ অনুমতি আয়াতটির পূর্বাপর অনুসারে যদিও ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে করে তাদের 'আদল' করতে না পারার ভয়ে শর্তাধীন, তবুও সমগ্র মুসলিম মনীষীদের মতে এক সময়ে চারজন পর্যন্ত বিয়ে করার এ অনুমতি তার জন্যেও যে তা ভয় করে না;— ইয়াতীম বিয়ে করে তাদের প্রতি আদল করতে না পারার ভয় যাদের নেই, তারাও একসঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে।

আয়াতের انكحوا 'বিয়ে করো' শব্দের কারণে যদিও বাহ্যত আদেশ বোঝায়, কিন্তু আসলে এর উদ্দেশ্য চারজন পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দান; সে জন্যে আদেশ দেয়া নয় এবং তা করা ওয়াজিব কিংবা ফরযও নয়; বরং তা অনুমতি মাত্র। অতএব তা জায়েয বা মুবাহ বৈ আর কিছু নয়। বিভিন্ন যুগের তাফসীরকার ও মুজতাহিদগণ এ মতই প্রকাশ করেছেন এবং এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত মনীষীদের মধ্যে কোনো দ্বিমত দেখা দেয়নি।

কিন্তু রাফেজী ও খাওয়ারিজদের মত স্বতন্ত্র। রাফেজীরা কুরআনের এ আয়াতের ভিত্তিতেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, একসঙ্গে নয়জন পর্যন্ত স্ত্রী রাখা যেতে পারে— জায়েয। নখ্য়ী ইবনে আবৃ লায়লা— এই দুই তাবেয়ী ফকীহ্রও এইমত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁদের দলীল হচ্ছে, আয়াতের واو (এবং) অক্ষরটি। তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে, এই তিনটি সংখ্যার কোনো একক সংখ্যা জায়েয নয়, বরং এর যোগফল অর্থাৎ দুই, তিন ও চার— মোট নয় জন একত্রে বিয়ে করা জায়েয। তাদের মতে আয়াতটির মানে হবে এরূপঃ

فانكحوا ثنتين وثلاثا و ربعا و مجموع ذلك تسع -

অতএব, বিয়ে করো দুই এবং তিন এবং চার। আর এর যোগফল হচ্ছে নয়।

খারেজীরা আবার এ আয়াত থেকেই প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, মাত্র নয় জন নয়, নয়– এর দ্বিগুণ অর্থাৎ আঠার জন স্ত্রী একসঙ্গে রাখা জায়েয। তাদের মতে আয়াতে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি সংখ্যা দু' দু'বার করে যোগ করতে হবে, তবেই হবে বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্যের সংখ্যা— অর্থাৎ আঠার।

কিন্তু এ দুটো মতই সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল এবং বিভ্রান্তিকর। কেননা তাদের একথা কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যহীন, কোনো মিল নেই। আল্লাহ্ যদি এক সঙ্গে নয় জন স্ত্রী গ্রহণ জায়েয করে দিতে চাইতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এরূপ ভাষায় বলতেন না— বলতেন ঃ

فانكحوا ماطاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا واربعا -

তোমরা বিয়ে করো দুইজন এবং তিনজন এবং চারজন মেয়ে লোক।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ ভাষায় কথাটি বলেন নি। এখানে কথাটি বলায় যে ভঙ্গী অবলম্বিত হয়েছে তদৃষ্টে এর তরজমা করতে হলে তার ভাষা হবে এমনিঃ

فَلَكُمْ نِكَاحُ اَرْبَعٍ فَاِنْ لَّمْ تَعْدِلُوْا فَثَلَا ثَةٌ فَاِنْ لَّمْ تَعْدِلُوْ فَاِثْنَتَيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةٌ -

তোমাদের জন্যে চারজন পর্যন্ত বিয়ে করা সঙ্গত। আর তাদের মধ্যে আদল করতে না পারলে তবে তিনজন, যদি তাদের মধ্যেও আদল করতে না পার তবে দুজন। আর তাদের মধ্যেও যদি আদল রক্ষা করতে না পার তবে মাত্র একজন।

আয়াতের কথার ধরন হচ্ছে এই। অক্ষমের জন্যে তার সামর্থের সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে একজন অথচ হালালের সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে চারজন। কুরআনে এই হচ্ছে সর্বশেষ সংখ্যা। আল্লাহ্ যদি নয় জন কিম্বা আঠারজন পর্যন্তই হালাল করতে চাইতেন, তাহলে বলতেন ঃ

فانكحو اتسع نسوة - اوثما نى عشرة نسوة فان لم تعد لوافو احدة -

(احكام القران لاين العربى: ج -١، ص- ٣١٣.

তোমরা নয়জন বিয়ে করো অথবা আঠারজন বিয়ে করো আর যদি আদল করতে না পারো, তাহলে একজন মাত্র।

আমাদের নিজস্ব কথার ধরন থেকেও এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারি; আমি যদি বহু সংখ্যক লোকের সামনে কিছু পয়সা রেখে দিয়ে বলিঃ "তোমরা দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পয়সা করে নাও" তবে তার অর্থ কখনো এ হবে না যে, এক-একজন নয় পয়সা করে নেবে।

এজন্যে আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের মানে লিখেছেন ঃ

اَىْ اِنْكِحُوْا مَنْ شِئْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِنْ شَاءَ اَحَدُكُمْ ثِنْتَيْنِ وَاِنْ شَاءَ ثَلاَثًا وَاِنْ شَاءَ اَرْبَعًا -

অর্থাৎ তোমরা বিয়ে করো মেয়েদের মধ্যে যাকে চাও। তোমাদের কেউ চাইলে দুজন, কেউ চাইলে তিনজন এবং কেউ চাইলে চারজন পর্যন্ত।

এতদ্ব্যতীত এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, কুরআন— কুরআনের এ আয়াতও— রাসূলে করীমের প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং তিনি নিজে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দান করেছেন। এ আয়াত কায়স ইবনুল হারেস প্রসঙ্গে নাযিল হওয়ার পর রাসূলে করীম (স) তাকে ডেকে বললেন ঃ

طَلِّقْ اَرْبَعًا وَ اَمْسِكْ اَرْبَعًا -

চারজনকে তালাক দাও, আর বাকী চারজনকে রাখো।

সে গিয়ে তার নিঃসন্তান চারজন স্ত্রীকে এক এক করে বললো ঃ

يَا فُلاَنَةَ اَدْبِرِىْ - (تفسير بغوى - المظهرى)

হে অমুক! তুমি চলে যাও।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, গায়লান ইবন সালমা সাকাফী যখন ইসলাম কবুল করে তখন তার দশজন স্ত্রী বর্তমান ছিল এবং তারা সকলেই তার সঙ্গে ইসলাম কবুল করে। তখন নবী করীম (স) তাঁকে বললেন ঃ

اِخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا - (مسند احمد، ترمذى، ابن ماجه)

এদের মধ্যে মাত্র চারজন বাছাই করে রাখো।

নওফল ইবনে মুয়াবিয়া ফায়লামী বলেন ঃ

اَسْلَمْتُ وَعِنْدِىْ خَمْسَةَ نِسْوَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ اَرْبَعًا وَ فَارِقِ الْاُخْرٰى - (مسند شافعى)

আমি যখন ইসলাম কবুল করি, তখন আমার পাঁচজন স্ত্রী ছিল। রাসূলে করীম (স) তখন আমাকে আদেশ করলেন ঃ মাত্র চারজন রাখো, বাকিদের ত্যাগ করো।

ওর্ওয়া ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আমি যখন ইসলাম কবুল করি তখন আমার দশজন স্ত্রী ছিল। রাসূলে করীম (স) আমাকে বললেন ঃ

اِخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَخَلِّ سَائِرَهُنَّ -

এদের মধ্য থেকে মাত্র চারজনকে বাছাই করে রাখো আর বাকি সবাইকে ছেড়ে দাও।

কায়স ইবনুল হারেস সম্পর্কিত হাদীসের সনদ সম্বন্ধে মুহাদ্দিসগণ আপত্তি তুলেছেন। ইমাম শাওকানী লিখেছেন যে, এ হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা নামের একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, আর হাদীস শাস্ত্রের সব ইমামই তাঁকে 'যয়ীফ বর্ণনাকারী' বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বাগভী বলেছেন, কায়স ইবনুল হারিস কিংবা হারিস ইবনে কায়স্ থেকে এতদ্ব্যতীত অপর কোনো হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে আমি জানি না।

আর আবূ আমর আন-নমীরী বলেছেন ঃ

لَيْسَ لَهٗ اِلَّا حَدِيْثٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَاْتِ بِهٖ مِنْ وَجْهٍ صَحِيْحٍ -

তাঁর বর্ণিত এই একটি মাত্র হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীসই নেই। কিন্তু এ হাদীসটিও তিনি খুব বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করতে পারেন নি।

আর গায়লান সাকাফী সম্পর্কিত হাদীসটি সম্বন্ধেও অনুরূপ আপত্তি তোলা হয়েছে।

হাদীসদ্বয়ের সনদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের এ আপত্তি যদিও অকাট্য এবং তা এক-একটি সনদ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে সত্য, কিন্তু কেবল সেই একটি সূত্র থেকেই মূল হাদীস কয়টি বর্ণিত হয়নি, তা আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অতএব হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য এবং তা হচ্ছে এই যে, কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলে করীম (স) তা থেকে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী এক সঙ্গে ও এক সময়ে রাখা জায়েয— তার অধিক নয়— এ কথাই বুঝতে পেরেছেন এবং তিনি ঠিক সেই অনুযায়ী চারজনের অধিক স্ত্রী না রাখার নির্দেশও কার্যকরভাবে জারি করেছেন। আল্লামা শাওকানী লিখেছেন, 'কুরআনের উপরোক্ত আয়াত দ্বারা চারজনের অধিক স্ত্রী একসঙ্গে গ্রহণ জায়েয নয় বলে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় না, তবে হাদীসের ভিত্তিতে তা অবশ্যই প্রমাণিত হয়। বিশেষত সমগ্র মুসলিম সমাজই যখন এ সম্পর্কে একমত।'

শুধু তাই নয়, রাসূলে করীম (স)-এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুনিয়ার সব মুসলিমের সর্বসম্মত মত হচ্ছে একসঙ্গে সর্বাধিক ও অনুর্ধ্ব মাত্র চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখা জায়েয, তার অধিক নয়।

এ পর্যায়ে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ

لَوْكَانَ يَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعٍ تَسُوْغُ لَهٗ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَائِرَ هُنَّ فِىْ بَقَاءِ الْعَشَرَةِ وَقَدْ اَسْلَمْنَ فَلَمَّا اَرَاهُ بِاِمْسَاكِ اَرْبَعَ وَفِرَاقِ سَائِرِ هُنَّ دَلَّ عَلٰى اَنَّهٗ لَا يَجُوْزُ الْجَمْعُ بَيْنَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعٍ بِحَالٍ فَاِذَا كَانَ هٰذَا فِى الدَّوَامِ فَفِى الْاِسْتِئْنَافِ بِطَرِيْقِ الْاَوْلٰى - (تفسير ابن كثير)

এক সঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা যদি জায়েয হতো তাহলে রাসূলে করীম (স) তাকে (গায়লানকে) তার দশজন স্ত্রী রাখবারই অনুমতি দিতেন— বিশেষত তারা যখন ইসলাম কবুল করেছিল। কিন্তু কার্যত যখন দেখছি, তিনি মাত্র চারজন রাখার অনুমতি দিচ্ছেন এবং অবশিষ্টদের বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন তা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, কোনোক্রমেই এক সঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা জায়েয নয়। আর স্থায়ীকালের জন্যে যখন এ অবস্থা, তখন নতুন করে গ্রহণের ব্যাপারে তো এরূপ নির্দেশ হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে।

ইমাম ইবনে রুশদ্ লিখেছেন ঃ

اتفق المسلمون على جواز نكاح اربعة من النساء معا - (بداية المجتهد :ج -٢،ص -٤٠)

... واما فوق الاربع فان الجمهور على انه لا تجوز الخامسة (ص -٤١)

সমগ্র মুসলিম একসঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণ জায়েয হওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত।

.... এবং চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ অধিকাংশ মুসলিমের মতে— চারজনের বর্তমানে পঞ্চমা গ্রহণ জায়েয নয়।

মওলানা সানাউল্লাহ্ পানীপতি লিখেছেন ঃ

لايجوزان يتزوج ما فوق الاربعة من النساء عند الائمة وجمهو رالمسلمن - (تفسير المظهرى :ج-٢)

সমস্ত ইমাম ও সমগ্র মুসলিমের মতে চারজনের অধিক বিয়ে করা জায়েয নয়।

তবে রাসূলে করীম (স) যে এক সঙ্গে নয়জন কিংবা ততোধিক স্ত্রী রেখেছিলেন তার কারণ, আল্লাহ্র বিশেষ অনুমতিক্রমে কেবল মাত্র তাঁরই জন্যে তা সম্পূর্ণ জায়েয ছিল। তিনি ছাড়া মুসলিমদের মধ্যে অপর কারো জন্যেই তা জায়েয নয়। ইবনুল হাজার আসকালানী লিখেছেন ঃ

اتفق العلماء على ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على اربع نسوة يجمع بينهن -

(فتح البارى، محاسن التاويل : ج -٤، ص -١١١٤)

চারজনের অধিক স্ত্রী একসঙ্গে ও এক সময়ে রাখা বিশেষভাবে কেবলমাত্র রাসূলে করীম (স)-এর জন্যেই জায়েয ছিল— এ সম্পর্কে সব মনীষীই সম্পূর্ণ একমত।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) লিখেছেন ঃ

وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة من الله انه لا يجوز لاحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة - (تفسير ابن كثير)

রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত— যা আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রতিষ্ঠিত— প্রমাণ করেছে যে, রাসূলে করীম (স) ব্যতীত অপর কারো জন্যেই একসঙ্গে ও এক সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা জায়েয নয়।

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ

وهذاعند العلماء من خصائصه دون غيره من الائمة (تفسيرابن كثير)

রাসূলের এই নয়, এগারো, পনের জন স্ত্রী এক সঙ্গে রাখা তার জন্যে বিশেষ অনুমোদিত ব্যাপার, মুসলিম উম্মতের মধ্যে এ জিনিস অপর কারো জন্য জায়েয নয়।

মোটকথা, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বর্তমান সভ্যতায় যতই দূষণীয় ও কলংকের কাজ হোক না কেন, আল্লাহ্ ও রাসূলের দৃষ্টিতে এ কাজ যে একেবারে ঘৃণার্হ ও নিষিদ্ধ ছিল না, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। বিশেষত যে সব পুরুষ একজন মাত্র স্ত্রী দ্বারা নিজের চরিত্রকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে পারে না, যৌন শক্তির প্রাবল্য পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হতে ও অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে যাদের বাধ্য করে, তার পক্ষে একাধিক স্ত্রী— দুজন থেকে প্রয়োজনানুপাতে চারজন পর্যন্ত— গ্রহণ করা যে কর্তব্য তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তিদের পক্ষে এ কেবল অনুমতিই নয়, এ হচ্ছে তাদের প্রতি সুস্পষ্ট আদেশ। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে চরিত্রের পবিত্রতা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চরিত্রই যদি রক্ষা না পেল, তাহলে দুনিয়ায় মানুষের স্থান একান্তভাবে পশুদের স্তরে। আর চরিত্রকে রক্ষা করার জন্যেই এ কাজ যদি অপরিহার্যই হয়, তাহলে তা অবশ্যই করতে হবে।

ইসলামের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মানবিক ও নৈতিক ব্যবস্থা মাত্র। ইসলাম ঠিক যে কারণে বিয়ে করার অনুমতি বা নির্দেশ দিয়েছে, ঠিক সেই একই কারণে একাধিক (চারজন পর্যন্ত) স্ত্রী গ্রহণেরও অনুমতি দিয়েছে। এ অনুমতি যদি ইসলামে না থাকত, তাহলে বিয়ে করার অনুমতি বা আদেশ দেয়া একেবারেই অর্থহীন– উদ্দেশ্যহীন হয়ে যেত। অবশ্য কুরআনের যে আয়াতে একাধিক বিয়ের এ অনুমতির উল্লেখ হয়েছে তাতেই এ পর্যায়ে একটি গুরুতর শর্তেরও উল্লেখ করা হয়েছে আর তা হচ্ছে عدل সুবিচার, সমান মানে ও সমান প্রয়োজনে সকলের অধিকার আদায় করা।

সমতা বিধানের শর্ত

কেউ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে— কারো যদি স্ত্রী থাকে দুই, তিন কিংবা চারজন, তবে স্ত্রীদের যা কিছু অধিকার এবং যা কিছু তাদের জন্যে করা স্বামীর কর্তব্য, স্বামী তার সব কিছুই পূর্ণ সুবিচার, ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা ও পূর্ণ সমতা সহকারে যথারীতি আদায় করবে। পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান-বাসসামগ্রী, খাদ্য, সঙ্গদান, মিল-মিশ, হাসি-খুশীর ব্যবহার, কথা-বার্তা বলা ইত্যাদি সব বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রেই সমতা রক্ষা করে— সকল স্ত্রীর অধিকার আদায় করা স্বামীর কর্তব্য। এ সম্পর্কে প্রথমত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি যে আয়াতে দেয়া হয়েছে, তাকেই সামনে রাখতে হবে। আয়াতটি পূর্ণ আকারে নিম্নরূপ ঃ

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا - (النساء : ٣)

তোমরা যদি ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে ভয় করো যে, তাদের বিয়ে করে ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, তাহলে তোমরা অন্যসব মেয়ে লোকদের মধ্য থেকে দুই, তিন, চার— তোমাদের যা ভালো লাগে তাই বিয়ে করো। আর তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না বলে যদি ভয় করো তোমরা, তাহলে একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করবে অথবা তোমাদের দাসীদের ব্যবহার করবে।— যেন কোনো একজনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে অন্যদের প্রতি জুলুম না করো, এ ব্যবস্থা তার অধিক অনুকূল নিকটবর্তী।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আয়াতে পর পর দুটি বিষয়ে "তোমরা যদি ভয় করো" বলা হয়েছে। প্রথম ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে। তাদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারা সম্পর্কে; আর দ্বিতীয় হচ্ছে এক সঙ্গে দুই, তিন্ বা চার জন স্ত্রী গ্রহণ করে তাদের প্রতি সুবিচার করতে না পারা সম্পর্কে।

জাহিলিয়াতের জামানায় নিজেদের কাছে পালিতা ইয়াতীম মেয়েদের ধনমাল কিংবা রূপ-লাবণ্য-সৌন্দর্যের কারণে বিয়ে করে লোকেরা তাদের প্রতি মোটেই ইন্‌সাফ করত না, ভালো ব্যবহার করত না, স্ত্রীত্বের অধিকার দিত না। এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিলেন ঃ ইয়াতীম মেয়েদের বিয়ে করে তাদের প্রতি তোমরা না-ইনসাফী করবে, এর চেয়ে বরং অন্যান্য মেয়েদের বিয়ে করো। তাহলে তাদেরকে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা– দান তোমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে না। এগুলো ইসলামের এক মূল্যবান সমাজ সংশোধনী নির্দেশ।

দ্বিতীয় একাধিক স্ত্রী একসঙ্গে যদি কেউ গ্রহণ করে, তাহলে তাদের সকলের প্রতি সুবিচার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি কেউ সুবিচার ও ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না বলে ভয় করে, তবে তাকে একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করবার অনুমতি বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আয়াতে উল্লিখিত عدل শব্দের তাৎপর্য অনুধাবনীয়। আল্লামা রাগেব ইসফাহানী লিখেছেন ঃ

العدل لفظ يقتضى المساواة والعدل هو التقسيط على سواء - (مفردات : ص - ٣٢)

'আদল'— সুবিচার-ইনসাফ— মানে সমতা, সাম্য রক্ষা এবং 'আদল' মানে সমানভাবে ও হারে বা পরিমাণে অংশ ভাগ করে দেয়া। "আর তোমরা যদি ভয় পাও যে, স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' করতে পারবে না" এর মানে—

العدل الذى هو القسم والنفقة -

সেই আদল ও ইনসাফ যা স্ত্রীদের মধ্যে রাত বন্টন ও যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের ব্যাপারে স্বামীকে করতে হয়।

আল্লামা ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ

معناه فى القسم بين الزوجات والتسوية فى حقوق النكاح وهو فرض – (احكام القران : ج -١، ص-٣١٣)

এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রীদের মাঝে রাত ভাগ করে দেয়া এবং বিয়েজনিত অধিকারসমূহ আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা, সমভাবে প্রত্যেকের প্রাপ্য তাকেই আদায় করা। আর এ হচ্ছে ফরয।

বস্তুত একাধিক স্ত্রীর স্বামীর পক্ষে রাত বণ্টন ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ ও সমতা সহকারে পরিবেশন একান্তই কর্তব্য। আর যদি সে তা রক্ষা করতে পারবে না বলে আশংকা বোধ করে তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করা তার কর্তব্য। আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের তরজমা করেছেন এ ভাষায় ঃ

اى وان خفتم من تعداد النساء ان لا تعد لوا بينهن ... فليقتصر على واحدة – (ابن كثير)

তোমরা কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে 'আদল' রক্ষা করতে পারবে না বলে যদি ভয় করো, তাহলে একজন স্ত্রী গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত।

এই হচ্ছে কুরআন মজীদের ঘোষণা।

সুবিচার ও সমতা রক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য

সুবিচারপূর্ণ বণ্টনের পর্যায়ে একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, সংখ্যা ও পরিমাণ ইত্যাদির দিক দিয়ে ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে প্রত্যেক স্ত্রীর অধিকার সাম্য ও প্রয়োজনানুপাতে দরকারী জিনিস পরিবেশনের কথা। কেননা একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের প্রয়োজন, রুচি ও পছন্দ যে একই ধরনের ও একই মানের হবে এমন কোনো কথা নেই। কেউ হয়ত রুটিখোর, তার প্রয়োজন আটা বা রুটির। আর কেউ ভাতখোর, তার প্রয়োজন চাল বা ভাতের। কেউ হয়ত বেশ মোটা-সোটা, তার জামা ব্লাউজ ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্যে বেশি কাপড় দরকার, আর কেউ হালকা-পাতলা, শীর্ণ, তার জন্যে প্রয়োজনীয় কাপড়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। কেউ বেশি বয়সের মেয়েলোক, স্বামীসঙ্গ লাভের প্রয়োজন তার খুব বেশি নয়, খুব ঘন ঘনও প্রয়োজন দেখা দেয় না; আর কেউ হয়ত যুবতী, স্বাস্থ্যবতী, তার পক্ষে অধিক মাত্রায় স্বামীসঙ্গ লাভের দরকার। আবার কেউ যুবতী হয়েও রুগ্ন, তার যৌন মিলন অপেক্ষা সেবা শুশ্রূষা ও পরিচর্যার প্রয়োজন বেশি। কাজেই 'আদল' عدل সুবিচার ও সমতার অর্থ পরিমাণ বা মাত্রা-সাম্য নয়, বরং তার মানে হচ্ছে সকলের প্রতি সমান খেয়াল রাখা, যত্ন নেয়া এবং প্রত্যেকের দাবি যথাযথভাবে পূরণ করা। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের শর্ত এতটুকু মাত্র, এর বেশি নয়। এ শর্ত পূরণ করতে পারবে না বলে যদি কেউ ভয় পায় এবং আত্মবিশ্লেষণ করে যদি বুঝতে পারে যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করলে 'আদল' ইনসাফের এ শর্তটুকু পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তাহলে তার উচিত আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হওয়া। এ কথাই তিনি বলেছেন আয়াতটির নিম্নোক্ত অংশে ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً .... ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا – (النساء : ٣)

তোমরা ইনসাফ-সমতা রক্ষা করতে পারবে না বলে যদি ভয় করো তবে একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করবে.....বস্তুত জুলুম ও অবিচারের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এ হচ্ছে অধিক কার্যকর ও অনুকূল ব্যবস্থা।

ইমাম শাফেয়ীর মতে আয়াতের এ অংশ আরো একটি শর্ত পেশ করছে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে। আর তা হচ্ছে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য। তিনি আল্লাহ্র বাণী ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا এর তরজমা করেছেন এ ভাষায় ঃ

اِنْ لَا تَكْثُرْ عَيَالُكُمْ -

তোমাদের সন্তান বেশি না হওয়ার পক্ষে এই একজন স্ত্রী গ্রহণই অধিক নিকটবর্তী ব্যবস্থা।

ইমাম বায়হাকী এ আয়াতের তাফসীর ইমাম শাফেয়ীর উপরোক্ত মত অনুযায়ী নিজ ভাষায় লিখেছেন ঃ

ای لا يكثر من تعولون اذا اقتصر المراة على واحدة وان ابلح له اكثر منها -

(احكام القران للبيهقى: ص-٢٦٠)

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও একজন মাত্র গ্রহণ করে ক্ষান্ত হলে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে হয় এমন লোক বেশি হবে না।

এ তাফসীরকে ভিত্তি করে ড. মুস্তফা সাবায়ী লিখেছেন ঃ

وهذا يفيد ضمنا الشتراط القدرة على الانفاق لمن اراد التعدد الاانه شرط ديانة لاقضاء -

(المراة بين الفقه والقانون :ص- -٩)

এ আয়াতটি প্রকারান্তরে ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্যের শর্তটি একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে তুলে ধরে। যদিও এ শর্তটি পালনীয় কিন্তু এর ওপর আইন প্রয়োগ করা যায় না।

এ কারণে মুসলিম মনীষীগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন যে, রাসূলে করীম (স)-এর ব্যাখ্যা ও বাস্তব ব্যবস্থার দৃষ্টিতে 'আদল' বলতে বোঝায় ঃ

اَلْعَدْلُ الْمَشْرُوْطُ هُوَا الْعَدْلُ الْمَادِّي فِى الْمَسْكَنِ وَاللِّبَاسِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْمَبِيْتِ وَ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَامِلَةِ الزَّوْجَاتِ مِمَّا يُمْكِنُ فِيْهِ الْعَدْلُ - (ايضا)

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে যে আদল-এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে বাসস্থান, পোশাক, খাদ্য, পানীয়, রাত যাপন এবং দাম্পত্য জীবনের এমন সব ব্যাপার, যাতে আদল-ইনসাফ রক্ষা করা যায়— এ সব বিষয়ের বাস্তব ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করা।

প্রশ্ন হতে পারে, স্ত্রী কি কেবল এ সব বৈষয়িক জিনিস পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে ? এ ছাড়া প্রেম-ভালোবাসাও তো প্রয়োজন রয়েছে এবং তাও তাদের পেতে হবে স্বামীর কাছ থেকেই। কাজেই সে দিকে দিয়েও সমতা রক্ষা করা কি একাধিক স্ত্রীর বেলায় স্বামীর কর্তব্য নয় ?

এর জবাব হচ্ছে এই যে, হ্যাঁ, এসব জৈবিক প্রয়োজন ছাড়াও প্রেম-ভালোবাসা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ও মানবিক প্রয়োজনও স্ত্রীদের রয়েছে এবং তাও স্বামীর কাছ থেকেই তাদের পেতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। আর এ ব্যাপারে যতদূর সম্ভব সমতা রক্ষা করা স্বামীর কর্তব্য। অন্তত সে জন্যেই তাকে প্রাণ-পণে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, প্রেম-ভালোবাসা, মনের ঝোঁক, টান, অধিক পছন্দ ইত্যাদি মনের গভীর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে মানুষের নিজের ইচ্ছে ও চেষ্টা-যত্নের অবকাশ খুবই সামান্য। মানুষ হাজার চেষ্টা করেও অনেক সময় সফল হতে পারে না। একেবারে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন করে সমান মাত্রায় ভালোবাসা সকল স্ত্রীর প্রতি পোষণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। ঠিক এ সমস্যাই বাস্তবভাবে দেখা দিয়েছিল যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের এ অনুমতি প্রথম নাযিল হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তাদের মধ্যে প্রথম প্রকারের প্রয়োজন পূরণের দিক দিয়ে পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। এ চেষ্টায় তাঁরা সফলতাও লাভ করেছিলেন। কিন্তু প্রেম ভালোবাসা, ভালো লাগা, পছন্দ হওয়া, মন-মেজাজের মিল ইত্যাদি দিক দিয়ে পূর্ণ সমতা রক্ষা

করতে তাঁরা অসমর্থ হলেন। হাজারো চেষ্টা করেও তাঁরা সব স্ত্রীকে সমান মাত্রায় ভালোবাসতে সমর্থ হলেন না। তখন তাঁরা মনের দিক দিয়ে খুব বেশি কাতর হয়ে পড়লেন, আল্লাহ্র কাছে এজন্যে কি জবাব দেবেন, এ চিন্তায় তাঁরা অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্র তরফ থেকে এ বাস্তব সমস্যার সমাধান হিসেবে নাযিল হলো এ প্রসঙ্গের দ্বিতীয় আয়াত ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوْآ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (النساء : ١٢٩)

এবং তোমরা একাধিক স্ত্রীর মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না— যত কামনা ও ইচ্ছাই তোমরা পোষণ কর না কেন। এমতাবস্থায় (এতটুকুই যথেষ্ট) তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে কোনো একজনের প্রতি এমনভাবে পূর্ণমাত্রায় ঝুঁকে পড়বে না যে, অপর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে। তোমরা যদি কল্যাণপূর্ণ নীতি অবলম্বন করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল সীমাহীন দয়াবান।

হযরত ইবনে আব্বাস, উবায়দা সালমানী, মুজাহিদ, হাসনুল বসরী, জহাক ও ইবনে মুজহিম প্রমুখ মনীষী এ আয়াতের তাফসীর করেছেন নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় ঃ

اَىْ لَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَيُّهَا النَّاسُ اَنْ تَسَاوُوْا بَيْنَ النِسَاءِ مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ فَاِنَّهٗ وَاِنْ وَقَعَ الْقَسَمُ الصُّوْرِىْ لَيْلَةً لَيْلَةً فَلَابُدَّ مِنْ تَفَاوُتٍ فِىْ الْمُحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ - (ابن كثير)

অর্থাৎ হে লোকেরা, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সবদিক দিয়ে ও সর্বতভাবে সমতা রক্ষা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। কেননা এ সমতা রক্ষা ও সাম্য এক এক রাতের বাহ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে যদিও কার্যকর হয় তবুও প্রেম-ভালোবাসা, যৌন স্পৃহা ও আকর্ষণ এবং যৌন মিলনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী।

প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনে শিরীন তাবি'ঈ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

هُوَ الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ وَصَدَقَ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَا يَمْلِكُهٗ اَحَدٌ اِذْقَلْبُهٗ بَيْنَ اُصْبُعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ يُصَرِّفُهٗ كَيْفَ يَشَاءُ وَكَذٰلِكَ الْجِمَاعُ قَدْ يَنْشِطُ لِلْوَاحِدَةِ مَالَا يَنْشِطُ لِلْاُخْرٰى فَاِذَا لَمْ يَكُمْ ذٰلِكَ بِقَصْدٍ مِّنْهُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيْهِ فَاِنَّهٗ مِمَّا لَا يَسْتَطِيْعُهٗ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهٖ تَكْلِيْفٌ - (احكام القران لابن العربى : ج -١، ص-٥٥)

মানুষের সাধ্যায়াত্ত যা নয় তা হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসা, যৌন মিলন স্পৃহা ও আন্তরিক বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সাম্য রক্ষা। কেননা এ সব জিনিসের ওপর কর্তৃত্ব কারোরই খাটে না। যেহেতু মানুষের দিল আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত, তিনি যেদিকে চান, তা ফিরিয়ে দেন। যৌন মিলনও এমনি ব্যাপার। কেননা তা কারোর প্রতি আগ্রহের বিষয়, কারোর প্রতি নয়। আর এ অবস্থা যখন কারোর ইচ্ছাক্রমে হয় না, তখন এ জন্যে কাউকেই দায়ী করা চলে না। আর তা যখন কারোর সাধ্যায়াত্তও নয়, তখন এ ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষার দায়িত্ব কাউকেই দেয়া যায় না।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায় এ আয়াতের তাফসীর হচ্ছে ঃ

اَىْ لَنْ تُطِيْعُوْا اَيُّهَا الرِّجَالُ اَنْ تُسَرُّوْا بَيْنَ نِسَائِكُمْ فِىْ حُبِّهِنَّ بِقُلُوْبِكُمْ حَتّٰى تَعْدِلُوْا بَيْنَهُنَّ فِىْ ذٰلِكَ لِاَنَّ ذٰلِكَ لَا تَمْلِكُوْنَهٗ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فِىْ تَسْوِيَتِكُمْ بَيْنَهُنَّ فِىْ ذٰلِكَ - (عمدة القارى : ج-٢٠)

হে পুরুষগণ, তোমরা তোমাদের একাধিক স্ত্রীর মধ্যে তাদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা পোষণের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করতে সমর্থ হবে না। ফলে তাদের মধ্যে এ দিক দিয়ে 'আদল' করা তোমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। কেননা তোমরা এ জিনিসের মালিক নও, যদিও তোমরা তাদের মধ্যে এ বিষয়ে সমতা রক্ষা করতে ইচ্ছুক ও আগ্রহান্বিত হবে।

প্রেম-ভালবাসা ও যৌন সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে যে আদল ও সমতা রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়, তার বাস্তব কারণ রয়েছে। একজনের কয়েকজন স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে কেউ অধিক সুন্দরী হবে, কেউ হবে কুশ্রী। কেউ যুবতী, কেউ অধিক বয়স্কা— প্রায় বৃদ্ধা। কেউ স্বাস্থ্যবতী, কেউ রুগ্না, কেউ মিষ্টভাষী খোশ মেজাজী, স্বামীগতা প্রাণ; কেউ ঝগড়াটে, খিটখিটে মেজাজের ও কটুভাষী। এভাবে আরো অনেক রকমের পার্থক্য হতে পারে স্ত্রীদের পরস্পরের মধ্যে, যার দরুন এক স্ত্রীর প্রতি স্বামীর স্বাভাবিকভাবেই অধিক আকর্ষণ হয়ে যেতে পারে, আর কারোর প্রতি আগ্রহের মাত্রা কম হতে পারে। কারোর জন্যে হয়ত দরদে-ভালোবাসায় প্রাণ ছিঁড়ে যাবে আর কারোর দিকে তেমন টান অনুভূত হবে না। এ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্যে কোনো স্বামীকে বাস্তবিকই দোষ দেয়া যায় না। কেননা প্রকৃত পক্ষে এর উপর কারোরই কোনো হাত নেই। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও ইচ্ছে ক্ষমতা কোনো কিছুই এখানে পুরোপুরি কাজ করতে পারে না। এজন্যে সব ব্যাপারে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা যে মানুষের সাধ্যাতীত, সাধ্যায়ত্ত নয়, তা-ই বলা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত ঘোষণায়।

আর আল্লাহ্র এ ঘোষণা যে কতখানি সত্য, তা রাসূলে করীমের অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। তিনি আর যা-ই হোন, একজন মানুষ ছিলেন। আর মানুষের মানবিক ও স্বভাবগত দুর্বলতা থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি তাঁর সব কয়জন স্ত্রীর মধ্যে হযরত আয়েশা (রা)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন অথচ তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক জৈবিক যাবতীয় বিষয়ে পূর্ণ সমতা রক্ষা করে চলতেন। আর মনের টান, অধিক আকর্ষণ ও প্রেম-ভালোবাসা তাঁর নিজ ইখতিয়ারের জিনিস ছিল না বলে সেক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। এ কারণে তিনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেছিলেন নিম্নরূপ ভাষায় ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ قَدْ رَتِیْ فِیْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَسْاَلْنِیْ فِی الَّذِیْ تَمْلِكُ وَ لَا اَمْلِكُ -

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه، دارمی)

হে আল্লাহ্, আমার সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীদের মধ্যে অধিকার বন্টন করেছিলাম; কিন্তু যা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়, বরং যা তোমার কর্তৃত্বাধীন; সে বিষয়ে অমান্য হয়ে গেলে তুমি নিশ্চয়ই সেজন্যে আমাকে পাকড়াও করবে না।

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-কাহলানী লিখেছেন ঃ

اَلْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْمُحَبَّةَ وَمَيْلُ الْقَلْبِ اَمْرٌ غَيْرٌ مَقْدُوْرٍ لِلْعَبْدِ بَلْ هُوَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْدُ -

(سبل الاسلام شرح بلوغ المرام : ج- ٣، ص - ١٦٠)

রাসূল সম্পর্কিত এ বর্ণনা প্রমাণ করছে যে, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা এবং মনের ঝোঁক টান-আকর্ষণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার নয়, বরং তা হচ্ছে একান্তভাবে আল্লাহ্র কর্তৃত্বের বিষয়, মানুষের হাতে তার কিছু নেই।

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে জৈবিক বিষয়ে পূর্ণ সমতা রক্ষা করার নির্দেশ দেয়ার পর প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা মানুষের সাধ্যাতীত বলে সেক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা বান্দার ওপর আরোপ করা হয়নি। এজন্যে ইসলামী শরীয়ত তা কারোর নিকট দাবিও করে না। ইসলামী শরীয়তের দাবি হচ্ছে

এই যে, এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও যখন তুমি একজনকে তালাক দিচ্ছ না বরং যে কারণেই হোক তাকে স্ত্রী হিসেবেই রেখে দিচ্ছ, তখন তার সাথে ঠিক স্ত্রীর মতোই ব্যবহার করতে হবে, তাকে বিধবা বা স্বামীহীনা করে রেখে দিও না। আয়াতের শেষাংশে তাই বলা হয়েছে ঃ

فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ -

অতএব তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার দরুন কোনো স্ত্রীকে তোমরা ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে।

এ আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

اى فاذا ملتم الى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكية فتذ روها كالمعلقة اى فتبقى هذه الاحرى معلقة لاذات ذوج ولا مطلقة - (ابن كثير)

তোমরা একজনের প্রতি যখন একটু ঝুঁকে পড়বেই, তখন সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না— চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যেও না, তাহলে অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেবে, মানে সে এমন অবস্থায় ঝুলে থাকবে যে, সে না হবে স্বামীওয়ালী আর না পরিত্যক্তা, তালাক প্রাপ্তা।

আর কুরআনের এ সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ সম্পর্কে ইবনুল মুনযির বলেছেন ঃ

دلت هذه الاية على ان التسوية بينهن فى المحبة غير واجبة - (عمدة القارى : ج -٢، ص -١٩٩)

এ আয়াত প্রমাণ করছে যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার দিক দিয়ে সমতা রক্ষা করা স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব নয়।

কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় দিক দিয়ে সমতা রক্ষা করা ফরয। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ কেবল তখনি বিধিসঙ্গত হতে পারে, যদি অন্তত এক্ষেত্রে স্ত্রীদের মধ্যে পূর্ণ সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা হয়। আর এ দিকদিয়ে সমতা রক্ষা করার তাগিদ করে নবী করীম (স) কঠোর ভাষায় বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهٗ امْرَاَتَانِ يَمِيْلُ مَعَ اِحْدَا هُمَا عَلَى الْاُخْرٰى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ - (ابوداؤد)

যে লোকের দুজন স্ত্রী থাকবে একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবে, কিয়ামতের দিন তার এক পাশের গাল কাটা ও ছিন্ন অবস্থায় ঝুলতে থাকবে।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَتْ لَهٗ امْرَاَتَانِ فَمَالَ اِلٰى اِحْدَ هُمَا دُوْنَ الْاُخْرٰى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهٗ مَائِلٌ -

(مسند احمد، ترمذى، ابن ماجه)

যার দুজন স্ত্রী আছে, সে যদি একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে আর অপরজনকে বাদ দিয়ে চলে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার এক পাশ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى تَحْرِيْمِ الْمَيْلِ اِلٰى اِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ دُوْنَ الْاُخْرٰى اِذَا كَانَ ذٰلِكَ فِىْ اَمْرٍ يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ كَالْقِسْمَةِ وَالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَ لَايَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ السَّوِيَّةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ كَالْمَحَبَّةِ -

(نيل الاوطار: ج -٦،ص -٣٢١)

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুজন স্ত্রীর মধ্যে একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়া আর অপরজনকে বাদ দিয়ে চলা— বিশেষত দিন বণ্টন, খাদ্য-পানীয় ও পোশাক পরিবেশনের ক্ষেত্রে— সম্পূর্ণ হারাম। কেননা এসব বিষয়ে সমতা রক্ষা স্বামীর ক্ষমতায় রয়েছে। যদিও প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা— যাতে স্বামীর কোনো হাত নেই, তাতে সমতা রক্ষা করা স্বামীর প্রতি ওয়াজিব বা ফরয নয়।

ভুল ধারণা অপনোদন

উপরোক্ত আয়াতকে কেউ কেউ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রতিবন্ধক হিসেবে পেশ করতে চেষ্টা করে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, প্রথম আয়াতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষার শর্তে। আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, সমতা রক্ষা করতে চাইলেও তা করা মানুষের সাধ্যাতীত। অতএব একাধিক স্ত্রী গ্রহণ জায়েয নয়, আল্লাহ্‌র পছন্দও নয়। তাঁদের মতে আল্লাহ্ তাআলা একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি এক হাতে যেমন দিয়েছেন, অপর হাতে তেমনি তা ফিরিয়েও নিয়েছেন। ফলে এজন্য আর কোনো অনুমতি বাকি রইল না।

এ সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, যাঁরা এ ধরনের কথা বলেন, তাঁরা কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তকে ভালো করে না বুঝেই বলেন অথবা বলা যেতে পারে তাঁরা নিজেদের মনগড়া কথাকেই কুরআনের দোহাই দিয়ে চালিয়ে দিতে চান। কেননা পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে আদল— সুবিচার— ও সমতা যেসব বিষয়ে রক্ষা করার জন্য শরীয়ত দাবি করে— নির্দেশ দেয়, তা মানুষের সাধ্যায়ত্ত বিষয়। আর যে ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা মানুষের সাধ্যাতীত, সে ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত মানের সমতা রক্ষার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, শরীয়ত তার দাবিও করে না। প্রথম প্রকারের 'আদল' হচ্ছে বৈষয়িক বিষয়, স্ত্রী সহবাস, খাদ্য-পানীয়-পোশাক পরিবেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এ হচ্ছে বস্তু বিষয়ে আদল (সুবিচার) আর দ্বিতীয় হচ্ছে আধ্যাত্মিক...... প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার ক্ষেত্রের আদল। প্রথম আয়াতে প্রথম পর্যায়ের আদল রক্ষার শর্ত করা হয়েছে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের জন্যে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের আদল করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলে তার কম-সে-কম মাত্রার নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব আয়াতদ্বয়ে কোনো প্রকার বৈপরীত্য নেই। বরং এ দুটোর আয়াত থেকেই মানুষের পক্ষে করণীয় আদল এবং একটা সুস্পষ্ট ও বাস্তব রূপ ফুটে ওঠে যার অনুসরণ করতে হবে একাধিক স্ত্রীর স্বামীকে। এ নির্দেশ চিরন্তনের জন্যে। আর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করলে রীতিমত গুনাহ্‌গার হতে হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে সেই আদল-এর কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। আর আল্লাহ্ যখন মানব-প্রকৃতি ও মানুষের প্রকৃতিগত ত্রুটি-দুর্বলতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তখন তিনি এ 'আদল' মানুষ করতে পারে না বলে যথার্থই ঘোষণা করলেন। এ অবস্থায় মানুষের দ্বারা যা এবং যতটুকু সম্ভব তারই নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের একজনের প্রতি তো ঝুঁকে পড়বেই— এ স্বাভাবিক, তবে এমনভাবে কখনো ঝুঁকে পড়বে না, যার ফলে অপর স্ত্রী ঝুলন্ত অবস্থায় না বিবাহিতা না পরিত্যাক্তা— হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।' তার অর্থ ঃ কোনো এক স্ত্রীর দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এ খানিকটা ঝুঁকে পড়া যে অবশ্যম্ভাবী, তাও বলে দিচ্ছেন। অতএব কারো প্রতি খানিকটা ঝুঁকে পড়লে তা দোষের হবে না, মানুষকে সেজন্যে দোষী বা দায়ীও করা হবে না। আয়াতের শেষ অংশে সেই কথাই বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

যদি তোমরা ভুল-ত্রুটির সংশোধন করতে থাক— ভুলের মধ্যে ডুবে দিশেহারা হয়ে পড় না, আর সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, তাহলে আল্লাহ্ মাফও করবেন, রহমতও করবেন।

আয়াতের এ অংশে স্বামীকে স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহার ও তাদের অধিকারসমূহ সঠিকরূপে আদায় করার জন্যে নতুন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ যদি স্বামী করতে থাকে, তাহলে এক স্ত্রীর প্রতি খানিকটা ঝুঁকে পড়ার দরুন অপর স্ত্রীর প্রতি যা কিছু অবহেলা-উপেক্ষা এর মধ্যে হয়ে গেছে তা দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ও ক্ষমা করবেন। আর যেহেতু সে ভবিষ্যতে আল্লাহ্কে ভয় করে স্ত্রীদের অধিকার সমানভাবে আদায় করতে থাকবে বলে এবং কখনো ইচ্ছে করে কোনো বিষয়ে তাদের মধ্যে তারতম্য— পার্থক্য করবে না বলে সংকল্প গ্রহণ করেছে, এজন্যে আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন, ভবিষ্যতে যাতে করে সকলের অধিকার ঠিক ঠিকভাবে আদায় করতে পারে, সেজন্যে তওফীকও দান করবেন। তার মনে স্ত্রীদের প্রতি ভালো ব্যবহারের দায়িত্বের অনুভূতিও জাগিয়ে দেবেন।

সেসব লোক যা ধারণা করেছে, তাই যদি আল্লাহ্র ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে যে ঃ فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ এ আয়াতের সত্যিই কোনো অর্থ হয় না, বরং এ কথাটি একেবারে অর্থহীন ও বাজে কথা হয়ে যায়। আর তাহলে আল্লাহ্র এ কথাটিকে এভাবে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। সোজা করে বললেই পারতেন ঃ তোমরা 'আদল' করতে পারবে না বলে একাধিক বিয়েও করো না। তা না বলে এক অসম্ভব শর্তের সাথে যুক্ত করে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়ার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? আল্লাহ্ তো সর্বোচ্চ, একজন সাধারণ বুদ্ধিমান লোকও যে এ ধরনের কথা বলতে পারে, তা সত্যিই ধারণা করা যায় না।

সর্বোপরি, রাসূলে করীম (স)-ই হচ্ছেন কুরআনের ধারক, কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। মুখের কথা দ্বারাও এবং বাস্তব কাজের ভিতর দিয়েও। আর তিনি নিশ্চয়ই কোনো হারাম কাজ করেন নি বা করতে পারেন না। আর কোনো হারাম কাজকে তিনি চুপচাপ বরদাশ্ত করবেন, তাও তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। বহু সংখ্যক স্ত্রীর স্বামী ইসলাম কবুল করলে তিনি তাদের মধ্য থেকে চারজনকে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরকম ঘটনা একটা দুটো নয়। তার সংখ্যা অনেক এবং তার প্রত্যেকটি ঘটনারই নির্ভরযোগ্য সনদসূত্রে প্রমাণিত। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ যদি হারামই হতো, তাহলে রাসূলে করীম (স) তাদেরকে একজন মাত্র রাখারই নির্দেশ দিতেন, চারজন রাখার নয়। তা ছাড়া তিনি নিজেও একসঙ্গে একাধিক স্ত্রীর স্বামী ছিলেন— যদিও তাঁর জন্যে আল্লাহ্র মর্জি অনুযায়ীই চারজনের কোনো সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। উপরন্তু একথাও ধারণা করা যেতে পারে না যে, রাসূলে করীম (স) নিজে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ী পর্যায়ের বড় বড় মনীষী— যাঁরা সকলেই একবাক্যে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ জায়েয বলে ঘোষণা করেন— এ আয়াতদ্বয়ের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি, বুঝতে পেরেছেন— আজকালকার এ বুদ্ধিমানেরা! এ ধরনের কথা আধুনিক বুদ্ধিবাদী নির্বোধেরাই বলতে পারে।

আমার মনে হয়, একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে যারা কুরআনের ভিত্তিতেই হারাম বলে প্রমাণ করতে চান, তাঁরা দু'শ্রেণীর লোক। এক শ্রেণীর অত্যন্ত সাদাসিধে, ইসলামের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তাঁরা যখন দেখলেন ইসলামের এ বহুবিবাহ-ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য সমাজ মোটেই ভালো চোখে দেখছে না, বরং এ কারণে ইসলামের ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ চালানো হচ্ছে, তখন তাঁরা ইসলামের মান রক্ষার উদ্দেশ্যেই বলতে শুরু করলেন, 'না ইসলামে আসলে একজন স্ত্রী রাখাই নির্দেশ, একাধিক স্ত্রী রাখার নয়।' তাঁদের সম্পর্কে বলা যায়, এঁরা হচ্ছেন ঈমানদার নির্বোধ লোক। অন্যের কারণে নিজের ঘরে আগুন লাগাবার কাজ করেন তাঁরা। তাঁদেরকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু তাঁদের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা জাগে না। তাঁরা বুঝেন না যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণই ইসলামের ওপর পাশ্চাত্য সমাজের হামলার একমাত্র কারণ নয়। তার কারণ অনেক গভীর এবং যারা এ হামলা চালাচ্ছে, তারা নিজেরাই 'বহু বিবাহে' নয়, বহু স্ত্রী সঙ্গমে বিশ্বাসী এবং বাস্তবেও অভ্যস্ত।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক তারা, যাদের নিয়তই খারাপ। তারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল ব্যবস্থায় এমন এক নতুন জিনিসের আমদানি করতে চায়, যার সাথে ইসলামের কোনো মিল, কোনো সামঞ্জস্য নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে তারা যে 'সত্য'কে মনের মাঝে বদ্ধমূল করে নিয়েছে তাকেই তারা ইসলামের নামে চালিয়ে দিয়ে দুনিয়াকে ধোঁকা দিতে চায়। তাদের নিজেদের পছন্দকে 'আল্লাহ্‌র পছন্দ' বলে লোকদের সামনে তুলে ধরতে চায়। এ হচ্ছে দস্তুরমতো বিশ্বাসঘাতকতা, এ হচ্ছে ইসলাম বিকৃতকরণ; এ এক অমার্জনীয় অপরাধ।

ইতিহাসে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ

আসলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দানে ইসলামই অপরাধী (?) নয়; না প্রথম অপরাধী, একমাত্র অপরাধী। এ ব্যাপারে ইউরোপীয় ধর্ম ও সভ্যতার অবদান সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্যায়ে আমাদের বক্তব্য এই ঃ

১. ইসলামই সর্বপ্রথম একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দান করেনি। প্রাচীন প্রায় সবগুলো জাতি ও সভ্যতায় এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। অ্যাসিরীয়, চীনা, ভারতীয়, বেবিলনীয়, অসুরীয় ও মিসরীয় সভ্যতায় বহু স্ত্রী গ্রহণ ছিল একটি সাধারণ রেওয়াজ। এদের অধিকাংশের মধ্যে আবার স্ত্রীদের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। চীনের 'লীকী' ধর্ম একসঙ্গে একশ ত্রিশজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিল একজন পুরুষকে। আর চীনের বড় বড় বাবু লোকদের তো তিন হাজার পর্যন্ত স্ত্রী ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

২. ইয়াহুদী ধর্মশাস্ত্রে সীমা-সংখ্যাহীন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। তওরাত কিতাবে উল্লিখিত নবীগণের প্রত্যেকেরই বহুসংখ্যক স্ত্রী ছিল। তাতেই বলা হয়েছে, হযরত সুলায়মানের সাতশজন ছিল স্বাধীনা স্ত্রী, আর তিনশ ছিল দাসী।

৩. খ্রিস্ট ধর্মশাস্ত্রে বহু স্ত্রী গ্রহণের কোনো নিষেধবাণীর উল্লেখ নেই। শুধু উপদেশ ছলে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক পুরুষের জন্যই তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। এতে করে বড়জোর একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণের দিকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। ইসলামও তাই বলে। তাহলে এজন্যে ইসলামের দোষ দেখাবার যুক্তি কি থাকতে পারে।

ইন্‌জিল কিতাবে বহু-বিয়ে নিষেধ করে কোনো স্তোত্র বলা হয়নি। বরং পলিশ-এর কোনো কোনো পুস্তিকায় এমন ধরনের কথা রয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সঙ্গত। তাতে এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ 'আর্চবিশপকে অবশ্যই এক স্ত্রীর স্বামী হতে হবে।' তাহলে অন্যদের জন্য একাধিক স্ত্রীর স্বামী হতে কোনো বাধা নেই বলে মনে করা যেতে পারে। অর ইতিহাস প্রমাণ করছে যে, প্রাচীনকালের অনেক খ্রিস্টানই এমন ছিল, যারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিল একই সময়ে। বহু গির্জার পাদ্রীর বহু সংখ্যক স্ত্রী ছিল। আর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ সঙ্গত বলে খ্রিস্ট যুগের বহু পণ্ডিত ফতোয়াও দিয়েছেন।

পারিবারিক ইতিহাস বিশেষজ্ঞ Wester Mark বলেছেন ঃ

ان تعد دالز وجات باعتراف الكنيسة بقى الى القران السابع عشر وكان يتكر ركثيرا فى الحالات
التى لا تخصيها الكنيسة والدولة - (العقاد- حقائق الاسلام :ص -١٧٧)

গির্জার অনুমতিক্রমে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ সপ্তদশ শতক পর্যন্ত চলেছে। আর অনেক অবস্থায় গির্জা ও রাষ্ট্রের হিসাবের বাইরে তার সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে যেত।

তাঁর গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে ঃ

আয়ার্ল্যাণ্ড সম্রাটের দু'জন ছিল স্ত্রী আর দু'জন ছিল দাসী।

শার্লিম্যানেরও দুইজন স্ত্রী ছিল, ছিল বহু সংখ্যক দাসী। তাঁর রচিত আইন থেকে প্রকাশ পায় যে, তাঁর যুগের লোকদের মধ্যে বহু বিবাহ কিছুমাত্র অপরিচিত ব্যাপার ছিল না।

মার্টিন লুথারও বহু বিবাহের যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারেন নি। কেননা তাঁর মতে তালাক অপেক্ষা একাধিক স্ত্রী রাখাই উত্তম। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে ভিস্টা ফিলিয়ার[১] প্রখ্যাত সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এক প্রস্তাবের মাধ্যমে একজন পুরুষের জন্যে দুজন করে স্ত্রী গ্রহণ জায়েয করে দেয়া হয়। খ্রিস্টানদের কোনো কোনো শাখার লোকেরা বরং মনে করে যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ একান্তই কর্তব্য। ১৫৩১ সনের এক ঘোষণায় সুস্পষ্ট করে বলা হয় যে, সত্যিকার খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীকে অবশ্যই বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করতে হবে। প্রট্যাস্ট্যান্ট (খ্রিস্টানদের এক শাখা)-দের ধারণা ছিল, বহু স্ত্রী গ্রহণ এক পবিত্র আল্লাহরই ব্যবস্থা।

৪. আফ্রিকার কালো আদমীদের মধ্যে যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করত, গির্জা তাদের জন্য বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অবাধ অনুমতি দিয়েছিল। কেননা প্রথম দিক দিয়ে আফ্রিকায় যখন খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হচ্ছিল ও কালো আদমীরা দলে দলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছিল, তখন গির্জা কর্তৃপক্ষ চিন্তা করল যে, আফ্রিকার অধিবাসী বহু স্ত্রী গ্রহণের অন্ধভাবে আগ্রহী, তাদের যদি তা করতে নিষেধ করা হয় তাহলে তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে রাজি হবে না— খ্রিস্টধর্ম প্রচারে তা হবে বাঁধাস্বরূপ। কাজেই বহু স্ত্রী গ্রহণ করা তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

৫. পাশ্চাত্য খ্রিস্টান সমাজে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ার দরুন— বিশেষত দুই বিশ্বযুদ্ধের পরে— এক জটিল সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার কোনো সমাধানই আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। আর একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ভিন্ন এ সমস্যার কোনো বাস্তব সমাধানই হতে পারে না। ১৯৪৮ সনে আলমানিয়ার মিউনিখে এক বিশ্ব যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আরব দেশেরও অনেক যুবক তাতে যোগদান করে। এ সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আলমানিয়া পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। তার নানাবিধ সমাধান চিন্তা করা হয়। এখানে আরব যুবকদের পক্ষ থেকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব একটি বাস্তব সমাধান হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। প্রথমে এ প্রস্তাব গৃহীত হলেও পরে সম্মেলনে নানা মতভেদ দেখা দেয়। পরে এ ব্যাপারে সকলেই একমত হয় যে, এ ব্যবস্থা ছাড়া সমস্যার বাস্তব ও কার্যকর আর কোনো সমাধানই নেই— হতে পারে না। পরের বছর আলমানিয়া শাসনতন্ত্রে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি সংক্রান্ত ধারা সংযোজনের প্রস্তাব ওঠে। (فى احكام الادوال الشخصية للدكتور محمد يوسف ١٢١)

এরপর আলমানিয়া থেকে এক প্রতিনিধি দল মিসরের জামে আজহারে আগমন করে ইসলামের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে। হিটলারও চেয়েছিলেন তাঁর দেশে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি আইন চালু করতে; কিন্তু মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে তা আর হয়ে ওঠে না।

---

১. ১৬১৮ সন জার্মানীর বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ও নওয়াব সামন্তদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং মধ্য ইউরোপের লোকদেরকে ক্রমাগতভাবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত এক আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত করে রাখে। ১৬৪৮ সনে এ যুদ্ধ খুব কষ্টের সঙ্গে বন্ধ করানো হয় এবং পরস্পরে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ফলে এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাই 'ভিস্টা ফিলিয়া সন্ধি' নামে অভিহিত।

বহু খ্রিস্টান মনীষী একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুকূলে অনেক কথা বলেছেন। প্রখ্যাত আলমানিয়া দার্শনিক শোপেন আওয়ার লিখেছেন ঃ

> পুরুষ ও স্ত্রী সমান মর্যাদার হওয়ার কারণে ইউরোপে বিবাহ সংক্রান্ত আইন অত্যন্ত খারাপ। আমাদেরকে একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য করেছে; ফলে আমাদের অর্ধেক অধিকারই নষ্ট হয়ে গেছে অথচ আমাদের দায়িত্ব বহুগুণে বেড়ে গেছে। কাজেই যতদিন পর্যন্ত মেয়েদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হবে, তদ্দিন তাদেরকে পুরুষদের মতো বুদ্ধিও দিয়ে দেয়া উচিত।
>
> আমরা যখন মূল বিষয়ে চিন্তা করি, তখন এমন কোনো কারণ খুঁজে পাইনে, যার দরুন পুরুষকে এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয়াকে গ্রহণ করতে বাধা দেয়া যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। বিশেষত কারো স্ত্রী যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা বন্ধ্যা হয় অথবা কয়েক বছরের দাম্পত্য জীবনের পরই বৃদ্ধা হয়ে যায়, তখন সেই পুরুষকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে কি করে বাধা দেয়া যেতে পারে। 'মোরমোন' খ্রিস্টানরা এই এক স্ত্রী গ্রহণের রীতি বাতিল না করে কোনো কল্যাণই লাভ করতে পারে না।

বস্তুত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামের অনুমতিকে আধুনিক পাশ্চাত্যপন্থীরা যতোই ঘৃণার চোখে দেখুন না কেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর ফলে জাতীয় নৈতিক চরিত্র অনেক উন্নতি লাভ করে, পারিবারিক সম্পর্ক গ্রন্থি সুদৃঢ় হয় এবং নারীকে এক উচ্চ মর্যাদা দান করা সম্ভব এর সাহায্যে, যা ইউরোপীয় সমাজে দেখা যায় না।

উপরের আলোচনা হতে এ কথা সপ্রমাণিত হয়েছে যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ মানব সমাজে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছে; কম-বেশি ইতিহাসের সকল যুগে, সভ্যতার সকল স্তরে এর প্রচলন রয়েছে। সুসভ্য-অসভ্য, বর্বর ও উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন সকল জাতিই এ বিষয়ে অভ্যস্ত ছিল। পাক-ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও দেখা যায়, রাজা-মহারাজা ও সম্রাট-বাদশাহদের ছাড়াও অলী-দরবেশ ও মুণি-ঋষিরা পর্যন্ত একাধিক স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত। রামচন্দ্রের পিতা মহারাজা দশরথের তিনজন স্ত্রী ছিল— পিটরানী, কৌশল্যা ও রানী সুমিত্রা। শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বা স্বয়ং ভগবান বলে ধারণা করা হয়, তারও ছিল অসংখ্য স্ত্রী। লাল লজপত রায় কৃষ্ণ চরিত্রে তাঁর আঠারজন স্ত্রী ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। রাজা পাণ্ডোরও ছিল দু'জন স্ত্রী— কুন্তি আর মাভরী।

ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরাও একাধিক স্ত্রীর স্বামী ছিলেন। নবী-পয়গাম্বরদের তো প্রায় সকলেরই ছিল বহু সংখ্যক স্ত্রী। আর তাঁরপর হযরত হাসান ইবনে আলী, হুসাইন ইবনে আলী, হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস, সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত হামযা, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত বিলাল ইবনে রিবাহ, জায়দ ইবনে হারিস, আবূ হুযায়ফা, উসামা ইবনে জায়দ (রা) প্রমুখ বড় বড় সাহাবীও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন।

একাধিক স্ত্রী আর বহু স্ত্রী গ্রহণের এ ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এ ব্যাপারটি মোটেই সামান্য নয়, প্রকৃতপক্ষে এ এক অনন্য সাধারণ ব্যাপার। সাময়িক উত্তেজনার কিংবা কেবলমাত্র যৌন লালসার যথেচ্ছ চরিতার্থতার উদ্দেশ্যেই ইতিহাসের এ মহামনীষীবৃন্দ এদিকে অগ্রসর হন নি। আসলে মানব প্রকৃতির অন্তস্থলে এর কারণ নিহিত রয়েছে এবং সে কারণ থাকবে, তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে, যদ্দিন মানুষ থাকবে এ ভূ-পৃষ্ঠে। এর প্রতি একটা ঘৃণার দৃষ্টি আর ঘৃণা প্রকাশক দুটো কথা, দুটো আইনের ধারার আঘাতেই তা কখনও মিটে যাবে না; বন্ধ হবে না এর সম্ভাবনার দুয়ার।

মানব প্রকৃতি ও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ

এ পর্যায়ে মূল বিষয়ের যথার্থতা বোঝাবার জন্যে আমাদের অবশ্যই মানব প্রকৃতি অধ্যয়ন করতে হবে। দেখতে হবে মানব প্রকৃতি কি এক বিয়ের পক্ষে, না তার কোথাও একাধিক বিয়ের সামান্য দাবিও নিহিত রয়েছে?

প্রকৃতি— তা মানুষেরই হোক আর জন্তু-জানোয়ারের হোক সবই একাধিক বিয়ের কামনা-আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর। আমাদের কাছাকাছি যেসব গরু-মহিষ-ছাগলের পাল রয়েছে তার দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাব, বহু সংখ্যক গাভী, মহিষ, আর ছাগীর জন্যে দু একটি করে ষাঁড়, মহিষ আর পাঁঠা থাকে। আর স্ত্রী জাতীয় জন্তুগুলো তাদেরই কাছ থেকে গর্ভ ধারণ করে। যে মোরগের ধ্বনি ঘরে-দালানে মুখরিত হয়ে ওঠে, তাও বহু সংখ্যক মুরগীর মধ্যে একটি দুটি হয়ে থাকে মাত্র। আর এ মোরগ একটি ঘরে যতগুলো মুরগী নিয়ে বসবাস করে, সেখানে অপর কোনো মোরগকে বরদাশ্ত করতে কখনও রাজি হয় না। অন্তত সেখানকার মুরগীগুলোর প্রতি অপর মোরগকে কোনো প্রেম প্রকাশ করতে দিতে রাজি হয় না। জঙ্গলের অধিবাসী জন্তুদের জীবন পর্যবেক্ষণ করলেও দেখা যাবে, তাদের কোনো কোনোটি এক স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত থাকলেও বহু স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত জন্তুর সংখ্যা অনেক বেশি।

মানব প্রকৃতিটা নিয়েই বিচার করে দেখুন, আপনার মন সাক্ষ্য দেবে যে, মানব প্রকৃতিতে বহু স্ত্রী গ্রহণের প্রতি প্রবণতা অনেক বেশি এবং তীব্র। এক স্ত্রী গ্রহণের পরও কি কোনো যুবক এমন পাওয়া যাবে যে, অপর কোনো সুন্দরী যুবতী নারীকে দেখে আকৃষ্ট হয় না ? তার মধ্যে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়না ? সে যুবতী কন্যাকে পাবার জন্যে প্রেম ভালোবাসার বন্যা তার হৃদয়-মনে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে না ? সে যদি নৈতিকতা ও সামাজিক বাধ্যবাধকতার কারণে কার্যত কিছু না করে, তবুও এক স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অপর নারীর প্রতি তার মনে যে আকর্ষণ জাগ্রত হয় তা কে অস্বীকার করতে পারে ? আমরা রাত দিন দেখতে পাচ্ছি— রাস্তাঘাটে কোনো সুন্দরী-রূপসী যুবতী যখন জাঁকজমক আর চাকচিক্যপূর্ণ পোশাক পরে বের হয়, তখন চারদিকে থেকে পুরুষরা এমনভাবে হা করে অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে যে, মনে হয়, আজ পর্যন্ত কোন মেয়েলোক তারা পায়নি, আজই প্রথম দেখছে এবং দেখে শুধু পুলকিতই হচ্ছে না, উদ্‌ভ্রান্তও হচ্ছে। এ পুরুষদের মধ্যে কেবল অবিবাহিত তরুণরাই থাকে না, বিবাহিত, পূর্ণ বয়স্ক এমনকি ছেলেমেয়ের বাপদের সংখ্যাও এতে কম থাকে না। এদের মধ্যে এমন লোকও থাকে, যারা একসঙ্গে একাধিক বিয়ে করাকে অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে সঙ্গত কাজ বলে মেনে নিতে রাজি হবে না; কিন্তু বাহ্যিক ভয়-ভীতিহীন পরিবেশে তারা পরস্ত্রী ভোগ করার সুযোগ পেলে নিজ স্ত্রীকে বঞ্চিত করেও তা করতে একটুও দ্বিধাবোধ করবে না। এ থেকে কি একথাই প্রমাণিত হয় না যে, মানব প্রকৃতি এক স্ত্রী দিয়ে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়ে থাকতে কিছুতেই রাজি নয় ? বাহ্যত এক স্ত্রী গ্রহণ করে কার্যত বহু স্ত্রী ভোগ করার ঘটনা এক স্ত্রীতে বিশ্বাসী সমাজে কিছুমাত্র বিরল নয়। বস্তুতই যদি মানব প্রকৃতি এক স্ত্রীতে তৃপ্ত সন্তুষ্ট হতো, তাহলে বিবাহিত পুরুষ নিশ্চয়ই অপর স্ত্রী দেখে কিছুমাত্র লালসা বোধ করত না। নিজের মধ্যে এবং নিজের স্ত্রী ছাড়া অপর নারীর প্রতি ভুলক্রমেও কখনও তাকাত না। কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রকৃতি ও অধিকাংশ পুরুষের দেহের ঐকান্তিক দাবি হচ্ছে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, একজন মাত্র স্ত্রী দিয়ে অতৃপ্ত। এজন্যে মানুষের ইতিহাসে এমন কোনো পর্যায় আসেনি, যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ চালু হতে দেখা যায়নি। বহু স্ত্রী প্রবণতা অপূর্ণ ও অতৃপ্ত থাকার কারণেই আমরা দেখতে পাই— এক স্ত্রী গ্রহণ আইন যেসব দেশে জোর করে চালু করা হয়েছে, সেখানে বহু স্ত্রী ভোগের রেওয়াজ অপরাপর দেশের তুলনায় অনেক বেশি। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, কোথাও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ আইনসম্মত আর কোথাও বে-আইনীভাবে আইনকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ উপায়ে বহু স্ত্রী ভোগের মাধ্যমে লালসার বন্যা প্রবাহিত করা হয়। এই কারণেই নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অপর নারী-বন্ধু গ্রহণ করা হয়। নারী-পুরুষের মিলিত খেল-তামাসা, ক্লাব, নাচ, থিয়েটার, আসর বৈঠক ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন হয়েছে সর্বত্র। এ সবই হচ্ছে এক স্ত্রী গ্রহণের ছত্রছায়ায় বহু স্ত্রীর রূপ ও যৌবন ভোগ করার অতি আধুনিক ব্যবস্থা। হাটে-বাজারে ও শহরে-বন্দরে এই যে বেশ্যালয়গুলো দাঁড়িয়ে আছে, চালু রয়েছে, এর মূলেই সেই বহু স্ত্রী সম্ভোগ লিপ্সার পরিতৃপ্তিই চরম উদ্দেশ্য হয়ে রয়েছে। এজন্যেই আজ প্রাইভেট সেক্রেটারী, টাইপিস্ট-কাম-স্ট্যানোগ্রাফার, পার্সোনাল এসিস্ট্যান্ট,

অফিস-ক্লার্ক, এয়ার হোস্টেস, গেস্ট রিসিভার, টেলিফোন অপারেটর, রেডিও এ্যানাউন্সার, রেডিও ও সিনেমা আর্টিস্ট— প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুন্দরী যুবতী নারীকে নিয়োগ করতে দেখা যায়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রচলণ ও শিক্ষয়িত্রী নিয়োগও এজন্যেই হয়ে থাকে। এভাবে বর্তমানে পুরুষের বহু স্ত্রী ভোগের এ প্রকৃতিগত প্রবনতার তাণ্ডব নৃত্য দেখা যায় আধুনিক সভ্যতার সর্বত্র।

বস্তুত মানুষের জীবন ও মনস্তত্ব অত্যন্ত জটিল, সমস্যাসংকুল, অত্যন্ত ঠুন্‌কো। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পুরুষের মনের দিকদিয়ে দেখা যেতে পারে, দেখা দিতে পারে দেহের ও পৌরুষের দিক দিয়ে। দেখা দিতে পারে নিতান্ত পারিবারিক ও বৈষয়িক কারণে। যার প্রথম স্ত্রী পছন্দনীয় নয় বলে সে তাকে একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসতে পারে নি কিংবা যাকে দিয়ে তার মন পূর্ণ মাত্রায় পরিতৃপ্ত নয়, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ তার মানসিক ও মনস্তাত্বিক প্রয়োজন, ভালোবাসার প্রয়োজন। যার প্রথম স্ত্রী রুগ্না, স্বামীর দৈহিক দাবি পরিপূরণে অক্ষম দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ তার দৈহিক ও জৈবিক প্রয়োজন— যৌন প্রয়োজন। যার প্রথম স্ত্রী তাকে কোনো উত্তরাধিকারী উপহার দিতে পারেনি, বন্ধ্যা, সন্তান প্রসবে অক্ষম কিংবা যার সন্তান হয়ে হয়ে মারা গিয়েছে, দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ তার পারিবারিক প্রয়োজন। কোনো শ্রমজীবী মনে করতে পারে যে, তার আর একজন স্ত্রী হলে শ্রমের কাজে তাকে সাহায্য করতে পারবে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন। এভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আরো অনেক প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, যার দরুন একজন ব্যক্তি এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আরো স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য হতে পারে। যদি তা না করে কিংবা আইন করে এ পথে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়, তাহলে হয় তাকে অবৈধ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, রীতিমত ব্যভিচারে লিপ্ত হতে হবে নতুবা পারিবারিক জীবনের মাধুর্য থেকে চিরবঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে অথবা বংশের প্রদীপ এখানেই শেষ হয়ে যাবে। এক সঙ্গে দুই, তিন বা চার জন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের আইনসম্মত সুযোগ না থাকলে প্রথম স্ত্রী উপরোক্ত ধরনের ব্যর্থতায় তাকে পরিত্যাগ করেই অপর স্ত্রী গ্রহণ ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু এ যে কত মর্মান্তিক, কত হৃদয়বিদারক, তা প্রকাশ করা যায় না। এর ফলে কত নারী আর কত পুরুষের জীবন যে বিপর্যস্ত হয়ে যায়, চুরমার হয়ে যায় কত দম্পতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার কোনো হিসেব-নিকেশ করা সম্ভব নয়।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সামাজিক গুরুত্ব

এমন বহু সামাজিক প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে, যার দরুন এক– একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আর তা না করলে সমাজ মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হয়ে যায়। দুটো পরিস্থিতি সামনে রেখে এ সামাজিক প্রয়োজনের যথার্থতা বিচার করা যেতে পারে ঃ

১. কোনো কারণে সমাজে যদি নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অধিক হয়ে যায়— যেমন উত্তর ইউরোপে বর্তমানে রয়েছে। ফিনল্যাণ্ডের জনৈক চিকিৎসক বলেছেন, সেখানে প্রত্যেক চারটি সন্তানের মধ্যে একটি হয় পুরুষ আর বাকী হয় মেয়ে।

এরূপ অবস্থায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এক নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য হয়ে পড়ে। কেননা এক স্ত্রী গ্রহণের রীতিতে সেখানে বহু মেয়েলোক থেকে যাবে, যাদের কোনো দিন বিয়ে হবে না, যারা স্বামীর মুখ দেখতে পাবে না কখনো, তখন তারা তাদের যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে পথে-ঘাটে মৌমাছির সন্ধান করে বেড়াবে। তাদের স্বামী হবে না কেউ, হবে না কোনো ঘর, আশ্রয়স্থল, হবে না কোনো বৈধ সন্তান। আর সে কারণে সামাজিক জীবনে তাদের কোনো প্রতিষ্ঠা হবে না। আগাছা-পরগাছার মতো লাঞ্ছিত জীবন যাপনে বাধ্য হবে। চিন্তা করা যেতে পারে, তাদের এ রকমের উপেক্ষিতা জীবনের অপেক্ষা একজন নির্দিষ্ট স্বামীর অধীন অপর নারীর সাথে একত্রে ও সমান মর্যাদায় জীবন যাপন কি অধিকতর কল্যাণকর নয় ?

বিংশ শতকের শুরু থেকেই ইউরোপীয় সমাজ-দার্শনিকগণ একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করণের কুফল প্রত্যক্ষ করতে পাচ্ছেন। তাঁরা দেখছেন, সমাজে হু হু করে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে, কিভাবে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ করে না দিলে এ সমস্যার কোনো সমাধানই সম্ভব নয়।

'লন্ডন ট্রিবিউট' পত্রিকার ১৯০১ সালে ২০শে নভেম্বরের সংখ্যায় এক ইউরোপীয় মহিলার নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলো প্রকাশিত হয়েছে ঃ

> আমাদের অনেক মেয়েই অবিবাহিত থেকে যাচ্ছে, ফলে বিপদ কঠিনতর হয়ে আসছে। আমি নারী, আমি যখন এ বিবাহাতিরিক্ত মেয়েদের দিকে তাকাই, তখন তাদের মমতায় আমার দিল দুঃখ-ব্যথায় ভরে যায়। আর আমার সাথে সব মানুষ একত্রিত হয়ে দুঃখ করলেও কোন ফায়দা হবার নয়, যদি না এ দুরবস্থার কোনো প্রতিবিধান কার্যত করা হয়।

মনীষী টমাস এ মহারোগের ঔষধ বুঝতে পেরেছেন এবং পূর্ণ নিরাময় হওয়ার 'ঔষধ'ও ঠিক করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক পুরুষের জন্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অবাধ অনুমতি দিতে হবে। এর ফলেই এ বিপদ কেটে যাবে এবং আমাদের মেয়েরা ঘর পাবে, স্বামী পাবে। এতে করে বোঝা গেল যে, বহু নারী সমস্যার একমাত্র কারণ হচ্ছে একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করতে পুরুষদের বাধ্য করা। এ বাধ্যবাধকতায়ই আমাদের বহু মেয়ে বৈধব্যের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। যদ্দিন না প্রত্যেক পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দেয়া হবে, এ সমস্যার কোনো সমাধান হওয়াই সম্ভব হবে না। (مجلة المنار للسيد رشيد رضا -٤)

বর্তমান ইউরোপীয় সমাজে এমন অনেক বিবাহিত পুরুষও রয়েছে যাদের বহু সংখ্যক অবৈধ সন্তান রয়েছে, আর তারা ঘাটে-পথে তাড়া খাচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে। যদি একাধিক স্ত্রী বৈধভাবে গ্রহণের অনুমতি থাকত, তাহলে এ অবৈধ সন্তান আর তাদের মায়ের বর্তমান লাঞ্ছিত অবস্থায় নিশ্চয়ই পড়তে হতো না। তাদের ও তাদের সন্তানদের ইয্যত রক্ষা পেত। বস্তুত একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রত্যেক নারীকে বৈধভাবে স্বামীর ঘরের গৃহণী ও সন্তানের মা হওয়ার সুযোগ দান করে। দুনিয়ায় এমন নারী কে আছে যে তা পছন্দ করে না, কামনা করে না। আর এমন বুদ্ধিমান কে আছে, যে এ ব্যবস্থার সৌন্দর্য ও কল্যাণকারিতাকে অস্বীকার করতে পারে।

বর্তমানে আমেরিকায় যে লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তান এক জটিল সামাজিক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে, তা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পুরুষেরা নিজের এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না, আর শত সহস্র নারী বৈধ উপায়ে পাচ্ছে না যৌন মিলন লাভের সুযোগ। এরূপ অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে— একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান।

২. সর্বধ্বংসী যুদ্ধের ফলে কোনো দেশে যদি পুরুষ সংখ্যা কম হয়ে যায় আর মেয়েরা থেকে যায় অনেক বেশি, তখনো যদি সমাজের পুরুষদের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি না থাকে, তাহলে বেশির ভাগ মেয়ের জীবনে কখনো স্বামী জুটবে না। ইউরোপ বিগত দুটো বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ যুবক হারিয়েছে, এ কারণে যুবতী মেয়েদের মধ্যে খুব কমই বিবাহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ফলে এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে যে, হয় বিবাহিত পুরুষেরা আরো এক-দুই-তিন করে স্ত্রী গ্রহণ করবে, তবে অবশিষ্ট অবিবাহিতা মেয়েদের কোনো গতি হবে, নয় সে বিবাহিত যুবকরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এ স্বামীহীনা মেয়েদের যৌন পরিতৃপ্তি দানের জন্যে প্রস্তুত হবে।

এ কারণেই ইউরোপের কোনো কোনো দেশে যেমন— আলমানিয়া— এমন সব নারী সমিতি গঠিত হয়েছে, যাদের দাবি হচ্ছে, হয় একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অবাধ অনুমতির ব্যবস্থা, নয় প্রত্যেক পুরুষ তার স্ত্রী ছাড়া আরো একজন মেয়ের যাবতীয় দায়িত্ব বহনের জন্যে রাজি হবে— এমন আইন চালু করতে হবে।

বস্তুত যুদ্ধ-সংগ্রামের অনিবার্য ফল হচ্ছে দেশের পুরুষ সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পেয়ে যাওয়া। আর এরূপ অবস্থায় একমাত্র সুষ্ঠু ও শালীনতাপূর্ণ উপায় হচ্ছে প্রত্যেক পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দান। তাই দার্শনিক স্পেন্সার একাধিক স্ত্রী গ্রহণ রীতির বিরোধী হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, যুদ্ধে পুরুষ খতম হলে পরে সেখানে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দান একান্তই অপরিহার্য। তিনি তাঁর Principle of Sociology গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

> কোনো জাতির অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার পুরুষেরা যুদ্ধে গিয়ে খতম হয়ে যায়, আর অবশিষ্ট যুবকেরা একজন করে স্ত্রী গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকে, ফলে বিপুল সংখ্যক নারীই থেকে যায় অবিবাহিতা, তাহলে সে জাতির সন্তান জন্মের হার অবশ্যই হ্রাস প্রাপ্ত হবে, তাদের সংখ্যা মৃত্যুসংখ্যার সমান হবে না কখনো। দুটো জাতি যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যারা সর্বদিক দিয়ে সমান শক্তিমান, আর তাদের একটি যদি এমন হয় যে, সন্তান জন্মানোর ব্যাপারে সে জাতির সব মেয়েকেই ব্যবহার করা না হয়, আর অপর জাতি তার সব সংখ্যক নারীকে এ কাজে লাগায়, তাহলে প্রথম জাতিটি তার শত্রু পক্ষকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না। তার ফল এই হবে যে, এক স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত জাতি সেসব জাতির সামনে ধ্বংস হয়ে যাবে, যারা বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণে পক্ষপাতী। (دئرة المعارف فريد وجدى- ج: ٤، ص: ٦٩٢)

এ প্রসঙ্গে আমি বলব, মধ্যমান জাতিগুলো যদি এক স্ত্রী গ্রহণে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার মধ্যে সে জাতি অতি সহজেই ধ্বংস হবে, সে জাতি বিলাস বাহুল্যে নিমজ্জিত হবে। কেননা বিলাসী জাতির মেয়েরা সাধারণত কম সন্তান প্রসব করে থাকে। জন্মহার তার অনেক কমে যাবে। এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফ্রান্স। আর মুকাবিলায় কম বিলাসী জাতি জয়লাভ করবে, কেননা কম বিলাসী জাতির মেয়েরা সাধারণভাবে অধিক সন্তান প্রসব করে থাকে— যেমন রাশিয়া। এ কারণে বিলাসী জাতির পক্ষেও কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের মধ্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রীতির ব্যাপক প্রচলন করা, তাহলে তাদের জনসংখ্যার ক্ষতি পূরণ হতে পারবে।

একটি হাস্যকর প্রশ্ন

পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের এ যুক্তিপূর্ণ অনুমতি বা আবশ্যকতার ওপর অত্যাধুনিক মেয়েরা একটি প্রশ্ন তুলে থাকে। তারা বলে যে, পুরুষরা যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, তাহলে মেয়েরা কেন একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না ?

প্রশ্নটি যে কতখানি হাস্যকর, তা সহজেই বোঝা যায়। নারী-পুরুষের সাম্য সম্পর্কে আধুনিক কালের মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার কারণেই এ ধরনের নির্লজ্জ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে। অথচ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, নারী পুরুষের এ পর্যায়ের সমতা স্বভাব ও জন্মগত কারণেই অসম্ভব। মেয়েরা স্বভাবতই এক সময় গর্ভধারণ করে আর বছরে মাত্র একবারই তার গর্ভে সন্তানের সঞ্চার হয়। বহু সংখ্যক পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত হলেও তার গর্ভে সন্তান হবে একজন মাত্র পুরুষ থেকেই। কিন্তু পুরুষদের অবস্থা এরূপ নয়। একজন পুরুষ এক সঙ্গে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোককে গর্ভবতী করে দিতে পারে এবং একই সময় বহু সংখ্যক স্ত্রী থেকে বহু সংখ্যক সন্তান জন্মগ্রহণ করাতেও পারে।

এমতাবস্থায় একজন মেয়েলোকের যদি একই সময় একাধিক স্বামী থাকে এবং একই সময়ে সকলের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং তার গর্ভে সন্তান আসে, তাহলে সেই সন্তান যে কোন পুরুষের, তা নির্ণয় করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু একজন পুরুষ যদি একই সময়ে একাধিক স্ত্রীর স্বামী হয়, তাহলে সেই স্ত্রীদের গর্ভের সন্তান যে সেই একমাত্র পুরুষের ঔরসজাত, তা ঠিক করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।

দ্বিতীয়ত পারিবারিক জীবনে পুরুষেরই কর্তৃত্ব বিশ্বের সব সমাজ সব ধর্মেই স্বীকৃত। এখন একজন স্ত্রীলোকের যদি একাধিক স্বামী হয়, তবে সে পরিবারে কোন পুরুষের কর্তৃত্ব চলবে? আর স্ত্রীই বা কার কর্তৃত্ব মেনে চলবে পারিবারিক কাজ কারবারে? এক সঙ্গে সব কয়জন স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা নিশ্চয়ই একজন স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা সব পুরুষের মতি-গতি, রুচি-বাসনা সমান নয়, পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণও নয়— বিশেষত দাম্পত্য বিষয়ে। স্ত্রী যদি স্বামীদের একজনের কর্তৃত্ব মেনে চলে তাহলে অপর স্বামীদের পক্ষে তা হবে সহ্যাতীত। অতএব একজন নারীর পক্ষে একাধিক স্বামী গ্রহণ অপেক্ষা একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অধিকতর সহজসাধ্য, নিরাপত্তাপূর্ণ, স্বাস্থ্যকর ও নির্বিঘ্ন। এ সম্পর্কে যত চিন্তাই করা হবে, অত্যাধুনিকদের উপরোক্ত প্রশ্নের অন্তঃসারশূন্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এজন্যেই ড ঃ মার্সিয়ার (Mercier) বলেছেন ঃ

> The man is in this respect, as in many other respects, essentially different from woman, has been well noted by students of Biology:
>
> Woman is by Nature a monogamist, man has in him the element of a polygamist.
>
> (Conduct and its Disorders Biologically Considered. pp. 292-293)

এ পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষের জন্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত অনুমতির যথার্থতা ও কার্যকরতা সহজেই অনুধাবন করা যায়। ইসলাম মানব জীবনের জন্যে আল্লাহ্‌র দেয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের সার্বিক জীবনের প্রয়োজন ও জীবনের যাবতীয় সমস্যাকে সামনে রেখেই সর্বাঙ্গ সুন্দর ও নির্ভুল বিধান রচনা করেছেন মানব স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কারোই সার্বিক জ্ঞান নেই— থাকা সম্ভব নয় বলে তাঁর দেয়া বিধানের সৌন্দর্য মানুষের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। তিনি নারীকে নয়, পুরুষদেরকে এক সময় একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে যে বিশ্বমানবতার প্রতি বিরাট কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনুধাবনীয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইসলামের দুশমনগণ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের এ অনুমতিকে একটি ত্রুটি— একটি দোষের ব্যাপার বলে প্রচারণা চালাচ্ছে, ইসলামের ওপর নিরন্তর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে যে পাশ্চাত্য দেশে নারীর সতীত্ব ও মান-মর্যাদার এক কানা কড়িও দাম নেই, বরং যা পথে-ঘাটে, হোটেল-রেস্তোরাঁয়, নাচের আসরে, থিয়েটার হলে ও নাইট ক্লাবে দিনরাত লুণ্ঠিত হচ্ছে, নগদ কড়ির বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে, সে পাশ্চাত্য দেশে— পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরাই ইসলাম সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি নিতান্ত পুরাতন ব্যাপার হয়ে গেছে। এতে না আছে কোনো নতুনত্ব আর না আছে কোনো বৈচিত্র। কেননা ইসলামকে এজন্যে যতই দোষ দেয়া হোক না কেন, তারা নিজেরা নিজেদের দেশের ও সমাজের নানা অবস্থার কারণে আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি একটি স্বাভাবিক ও মানব সমস্যার সমাধানকারী ব্যবস্থাও বটে। ইউরোপীয় সমাজের বহু চিন্তাবিদ মনীষী এর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেও দ্বিধা বোধ করছেন না।

এক বিয়ের ধারক (monogamist) ইউরোপীয় সমাজের নৈতিক ভাঙ্গন ও পারিবারিক বিপর্যয় দেখে মনীষীরা চীৎকার করে উঠেছেন। তাঁদের মতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ কোনো দোষের কাজ তো নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য, নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নিম্নে কয়েকজন মনীষীর এ সম্পর্কিত উক্তির উদ্ধৃতি দেয়া যাচ্ছে ঃ

১. লণ্ডনের মিস্ মেরী স্মীথ নামের এক স্কুল শিক্ষয়িত্রী লিখেছেন ঃ

এক স্ত্রী গ্রহণের (monogamy) যে নিয়ম ও আইন বৃটেনে প্রচলিত, তা সবই নিতান্ত ভুল। পুরুষদের জন্যে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের অনুমতি থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

লিখেছেন ঃ

এ দেশে (বৃটেনে) নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। এজন্যে প্রত্যেক নারী স্বামী লাভ করতে পারছে না।

তারপর লিখেছেন ঃ

এক স্ত্রী গ্রহণের নিয়ম ব্যর্থ হয়েছে। আর এ নিয়ম বিজ্ঞানসম্মতও নয়।

২. অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আল্লামা শেয়খ আবদুল আজিজ শ্বাদীস মিছরী তাঁর 'স্বাভাবিক ধর্ম' নামক গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন ঃ

লণ্ডনের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলো। ইসলামের নানা দিক নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ হলো। বহু বিবাহ সম্পর্কে কথা উঠতেই তিনি বললেন ঃ হায়! আমিও যদি মুসলিম হতাম, তাহলে আর একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতাম। কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন ঃ আমার স্ত্রী পাগল হয়ে গেছে, তারপরও কত বছর অতিবাহিত হলো। ফলে আমাকে বান্ধবী আর প্রণয়িনী গ্রহণ করতে হয়েছে। কেননা আইনসম্মতভাবে আমি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারিনে। আমাদের সমাজেও দ্বিতীয় স্ত্রী বৈধ হলে তার থেকে আমার বৈধ সন্তানের জন্ম হতো; সে হতো আমার বক্ষের পুতুলি, আমার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আর আমি পেতাম জীবন সঙ্গিনী, লাভ করতে পারতাম গভীর শান্তি ও অপরিসীম তৃপ্তি।

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

ইংলণ্ডে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সতেরো শতক থেকেই বহু বিবাহ প্রথার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। ১৬৫৮ সনে এক ব্যক্তি ব্যভিচার ও নবজাতক অবৈধ সন্তানের মৃত্যু বন্ধ করার জন্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের স্বপক্ষে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তার এক শতাব্দী পর ইংলণ্ডের জনৈক আদর্শ চরিত্রবান পাদ্রী এ প্রস্তাব সমর্থন করে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ জেম্‌স হুলটন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচার প্রতিরোধের জন্যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন।

৩. প্রখ্যাত চিন্তাবিদ শোপেন আওয়ার তাঁর এ সম্পর্কিত চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন এভাবেঃ

এক স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল লোক কোথায়, আমি তাদের দেখতে চাই। আসলে আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিরই বহু সংখ্যক স্ত্রী প্রয়োজন। এজন্যে পুরুষের স্ত্রী গ্রহণের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়।

৪. প্রসিদ্ধ যৌনতত্ত্ববিদ কিলবন তাঁর Human Love নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

ইংলণ্ডে যদিও কার্যত বহু স্ত্রী গ্রহণের রীতি চালু রয়েছে, কিন্তু সমাজ ও আইন তা এখন পর্যন্ত সমর্থন করেনি। যদিও সে সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি দেখা যায়। যেসব লোক একজন স্ত্রী গ্রহণ করে দুই বা তিনজন রক্ষিতা ও বান্ধবীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, সমাজ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে একবারে নীরব। কিন্তু পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকা উচিত বলে কেউ যদি কোনো প্রস্তাব পেশ করে তাহলে সমাজ অমনি তার বিরুদ্ধে চীৎকার করে ওঠে।

৫. আমেরিকায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি বা প্রচলন না থাকার ফল কত মর্মান্তিক হয়েছে তা ওয়াশিংটনস্থ 'ইয়ং ওমেন ক্রীশ্চান এসোসিয়েশন'-এর চেয়ারম্যান মিসেস ডাসেল কানফিংক প্রদত্ত এক ভাষণ থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তিনি বুকিং কমিটির সামনে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

> আমেরিকায় চৌদ্দ বছরের উর্ধ্ববয়স্কা যুবতী মেয়ের সংখ্যা এক কোটি বিশ লাখ। আর এরা সবাই অবিবাহিতা। তার তুলনা অবিবাহিত ছেলেদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র নব্বই লাখ। এ হিসেব অনুযায়ী ত্রিশ লাখ যুবতী মেয়ের পক্ষে স্বামী লাভ করা কঠিন কাজ বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা মহাযুদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের সংখ্যাগত ভারসাম্য অনেকাংশে নষ্ট করে দিয়েছে।
>
> (লাহোর থেকে প্রকাশিত 'জমজম' পত্রিকা-১৫-৮-১৯৪৫)

৬. কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবেশে 'বহু বিবাহ ও তালাক' পর্যায়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গ্রন্থকার রবার্ট রীমার বলেছেন ঃ

> তালাকের ক্রমবর্ধমান ঘটনাবলীকে প্রতিরোধ করা এবং শিশু ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে আমেরিকার লোকদেরকে এক সময়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া আবশ্যক। এর ফলে সেয়ানা বয়সের পুরুষ নারী, বিধবা ও রক্ষিতাদের বহু উপকার সাধিত হবে। (দৈনিক জং, করাচী-২২-১২-৬৪)

৭. চেকোশ্লাভিয়া সম্পর্কে সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে, তথায় অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা অবিবাহিত পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, সে দেশে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নারীর সংখ্যা বিবাহেচ্ছু পুরুষ অপেক্ষা তিন লাখ ত্রিশ হাজার অধিক।

(দৈনিক 'দাওয়াত', দিল্লী-১৫-১২-৬৪)

৮. প্রখ্যাত নারী চিকিৎসক ডা. এনি ব্যাসেন্ত (Annie Besent) বলেছেন ঃ

> There is pertended monogamy in the west, but there is really polygamy without responsibility; the mistress is cast off when the man is weary of her, and sinks gradually to be the "Woman of the street", for the first lover has no responsibility for her future and she is a hundred times worse off than the sheltered wife and mother in the polygamous home. When we see thousands of miserable women who crowd the streets of Western towns during the night we must surely feel that it does not lie within Western mouth to reproach Islam for polygamy. It is better for woman, happier for woman more respectable for woman, to live in polygamy, united to one man only, with the legitimate child in her arms, and surrounded with respect, than to be seduced, cast out in the streets—perhaps with an illegitimate child outside the pale of low—unsheltered and uncared for to become the victim of any passer-by, night after night, rendered incapable of motherhood despised by all.
>
> (Morning News. 27.12.63)
>
> (The Light of Islam Polygamy and Law)
>
> By Khurshid Ahmad

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের খারাপ দিক

এতক্ষণে আমরা স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং এ ব্যবস্থা চালু না থাকার কারণে দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজে কি পরিণতি ঘটেছে আর সে সব কি সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন, তাও আমরা দেখেছি এবং তারও পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আবশ্যকতা প্রমাণ করেছি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইনসাফের তাগিদ হচ্ছে— এর খারাপ দিকটি সম্পর্কেও দুটো কথা বলে দেয়া। কেননা এরও যে একটা খারাপ দিক রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ক. এ পর্যায়ে সবচেয়ে খারাপ দিক যেটা মারাত্মক হয়ে ওঠে পারিবারিক জীবনে, তা হচ্ছে স্ত্রীদের পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, মন-কষাকষি ও ঝগড়া-বিবাদ। এ যে অনিবার্য তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই এবং এর ফলে যে পারিবারিক জীবন তিক্ত বিষ জর্জরিত হয়ে ওঠে তাও অনস্বীকার্য। এ রকম অবস্থায় স্বামী বেচারার দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা চলে যায় স্ত্রীদের মধ্যে ঝগড়া মেটাবার কাজে। এতেও তার জীবন জাহান্নামে পরিণত হয়। এমন সময়ও আসে, যখন সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার জন্যে নিজেকে রীতিমত অপরাধী মনে করতে শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, স্বামী যেহেতু স্বাভাবিক কারণেই একজন স্ত্রীর প্রতি বেশি টান ও বেশি ভালোবাসা পোষণ করে, ফলে স্ত্রীদের মধ্যে জ্বলে ওঠে হিংসার আগুন, যা দমন করতে পারে কেবল স্বামীর বুদ্ধিমত্তা আর এ আগুন থেকে বাঁচতে পারে কেবল সে, যে নারীর আদর্শ চরিত্রকে অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করতে পেরেছে।

খ. হিংসার আগুন স্ত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তা স্ত্রীদের সন্তানদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। তারাও বিভিন্ন মায়ের সন্তান হওয়ার কারণে পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক শত্রুতায় পরিণত হয়ে যায়। ফলে গোটা পরিবারই হিংসা-বিদ্বেষের আগুনে জ্বলতে থাকে। এরূপ অবস্থায় বিশেষ করে পিতার পক্ষে— একাধিক স্ত্রীদের স্বামীর পক্ষে— হয়ে পড়ে অত্যন্ত মারাত্মক। পরিবারের স্থিতি বিনষ্ট হয়, শান্তি ও সৌভাগ্য থেকে হয় বঞ্চিত।

গ. ভালোবাসার দিক দিয়ে স্ত্রীদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যে স্ত্রী নিজকে স্বামীর ভালোবাসা বঞ্চিতা বলে মনে করে, সতীনদের প্রতি তার স্বামীর মনের ঝোঁক-আকর্ষণ ও টান লক্ষ্য করে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই মনে করে যে, তারও একদিন ছিল, যখন সে স্বামীর হৃদয়ভরা ভালোবাসা লাভ করেছিল। তখন তার মনে জাগে হতাশা। স্বামীর ভালোবাসায় পরবর্তী শরীককে তখন সে নিজের শত্রু বলে মনে করতে শুরু করে। আর তখন তার মনে যে ব্যর্থতার বেদনা জাগ্রত হয়, তা অনেক সময় তার নিজের জীবনকেও নষ্ট করে দিতে পারে, সে সতীনকে অপসারিত করার উপায় উদ্ভাবনের তৎপরতাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

ঘ. অনেকের মতে একাধিক স্ত্রীসম্পন্ন পরিবারের ছেলে মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। ঘরে যখন দেখতে পায় মায়েদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি দিন-রাত লেগেই আছে আর তার সামনে বাবা নিতান্ত অসহায় হয়ে হয় চুপচাপ নির্বাক থাকে, না হয় স্ত্রীদের ওপর চালায় অত্যাচার, নিষ্পেষণ, নির্যাতন, তখন পরিবারের শৃঙ্খলা ও শাসন-বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে। ছেলেমেয়েরা ঘরে শান্তি-সম্প্রীতির লেশমাত্র না পেয়ে ঘরের বাইরে এসে পড়ে আর শান্তির সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরে মরে।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের পরিণামে উপরোক্ত অবস্থা দেখা দেয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আর পারিবারিক জীবনে এ যেন একটি অকল্যাণের দিক, তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মানব সমাজের জন্যে এমন কোনো ব্যবস্থা রয়েছে, যা বাস্তবে জমিনে রূপায়িত হলে তাতে কোনো দোষ— কোনো ত্রুটিই দেখা দেবে না? মানুষ যা কল্পনা করে, আশা করে, বাস্তবে তার কয়টি সম্ভব হয়ে ওঠে? ইসলামের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কিত অনুমতি বা অবকাশেও যে বাস্তব ক্ষেত্রে এমনি ধরনের কিছু

দোষ-ক্রটি দেখা দেবে কিংবা বলা যায়, এ অনুমতির সুযোগে কিছু লোক যে দুষণীয় কাজ করবে, তা আর বিচিত্র কি। তবে ইসলামের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতিই একমাত্র জিনিস নয়, সে সঙ্গে রয়েছে প্রকৃত দ্বীনদারী ও পবিত্র চরিত্র গ্রহণের আদর্শ— আদেশ, উপদেশ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। তা যদি পুরাপুরি অবলম্বিত হয়, তাহলে উপরোক্ত ধরনের অনেক খারাবী থেকেই পরিবারকে রক্ষা করা যেতে পারে, একথা জোরের সাথেই বলা যায়।

একথা মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের কোনো নির্দেশ দেয়া হয় নি, তা ফরযও করে দেয়া হয়নি মুসলিম পুরুষদের ওপর। বরং তা হচ্ছে প্রয়োজনের সময়কালীন এক ব্যবস্থা মাত্র, তা হচ্ছে নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি। বস্তুত এক সঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রয়োজন যে দেখা দিতে পারে, অনেক সময় তা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে তা পূর্বে আমরা দেখেছি। এখন কথা হলো, নিরুপায় হয়ে পড়লে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে কিনা! আর নিতান্ত প্রয়োজনে পড়ে গৃহীত এ ব্যবস্থায় যদি কিছু কষ্টের কারণ দেখা দেয় তাহলেও তা অবলীলাক্রমে বরদাশত করা হবে কিনা! একটি বৃহত্তর খারাবী থেকে বাঁচবার জন্যে ক্ষুদ্রতর খারাবীকে বরদাশ্ত করা মানব জীবনের স্থায়ী রীতি, যা আমরা দিনরাত সমাজে দেখতে পাই। কিন্তু ক্ষুদ্রতর খারাবী দেখিয়ে একথা বলা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না যে, এ গোটা ব্যবস্থাই ঠিক নয়। কাজেই ব্যাপারটি সম্পর্কে উদার ও ব্যাপকতর দৃষ্টিতেই বিচার করতে হবে ও চূড়ান্ত রায় দিতে হবে।

পরন্তু সতীনের কারণে কোনো স্ত্রীর মনোকষ্ট হওয়া কেবলমাত্র একাধিক স্ত্রী গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্ত্রী যদি দেখতে পায় তার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার স্বামী অপর নারীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তখনো কি তার মনে হতাশা জাগবে না? দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতার আঘাত কি তার কলিজাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে না?.... তাহলে তার স্বামীকে অবৈধ পন্থায় কিংবা গোপনে চুরি করে অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে দেয়ার চাইতে বৈধভাবে তাকে বিয়ে করে ঘরে আনতে দেয়া কি অধিকতর পবিত্র ব্যবস্থা নয়?.......যে লোক একজন মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করেও তার একমাত্র স্ত্রীকে ভালোবাসেন না, সেই স্ত্রীর মানসিক অবস্থা কি এবং সেজন্যে দায়ী কে?

আর এ ধরনের পরিবারের সন্তানদের উচ্ছৃঙ্খল হওয়া সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এর জন্যে একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকাই দায়ী নয়। এক স্ত্রীর সন্তানদেরও অবস্থা এমনি হতে পারে, হয়ে থাকে। আরব জাহানে 'রীফ' গোত্রের লোকেরা সাধারণভাবেই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিক সন্তান লাভ, যেন কৃষিকাজে তারা তাদের সাহায্য করতে পারে, তারা খুবই সচ্ছল অবস্থার লোক। কিন্তু 'রীফ' সন্তানদের মধ্যে পারিবারিক বিদ্রোহের নামচিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। বরং তা দেখা যায় বড় বড় শহরে নগরে, বিশেষত গরীব পর্যায়ের পরিবারের সন্তানদের মধ্যে খুব বেশির ভাগ। বর্তমানে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে পারিবারিক বিদ্রোহের ভাব প্রবল হতে দেখা যাচ্ছে তার কারণ নিশ্চয়ই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নয়, বরং তার কারণ নিহিত রয়েছে শিক্ষা বিষয়ক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে।

পূর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা একটি নৈতিক ও মানবিক ব্যবস্থা। নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা এবং মানবতার স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই এ ব্যবস্থা বিশ্বস্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। নৈতিক ব্যবস্থা এজন্যে যে, একজন পুরুষ নিজ ইচ্ছামতো যে কোনো মেয়েলোককে যে কোনো সময়ে নিজের অঙ্গশায়িনী করে নিতে পারে না, পারে না বিয়ের বাইরে যাকে তাকে দিয়ে তার যৌন লালসা চরিতার্থ করে নিতে। আর তার স্ত্রীর বর্তমানে তিনজনের অধিক স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন মিলন সম্পন্ন করতে পারে না।

তাছাড়া কারো সঙ্গে গোপনে, অবৈধভাবে কোনো মেয়েলোকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা যায় না। বরং রীতিমত বিয়ে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, যার পিছনে ছেলে ও মেয়ের অলী-গার্জিয়ান তথা

সমাজের লোকদের থাকবে পূর্ণ সমর্থন, যার দরুন নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা বিনষ্ট হওয়ার কোনো কারণ ঘটবে না সেখানে।

আর সে ব্যবস্থা মানবিক এজন্যে যে, একজন স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যে পুরুষ অপর স্ত্রীর প্রয়োজন তীব্রভাবে বোধ করে, সে বাধ্য হয় বিয়ে ছাড়াই অবৈধভাবে বান্ধবী আর প্রণয়ী যোগাড় করতে। সে তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখবে, তাদের মধু লুটবে অথচ সে তাদের স্বামী হবে না, গ্রহণ করবে না কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব কিংবা সে বাধ্য হবে হাটে-বাজারে, শহরে-নগরে, কোঠাবাড়িতে অবস্থিত দেহপসারিণীদের দ্বারে দ্বারে লজ্জাস্করভাবে ঘুরে বেড়াতে। এতে করে তার মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে, লাঞ্ছিত হবে, কলংকিত হবে তার ভিতরকার মানুষ।

উপরন্তু সে দেহপসারিণী কিংবা বান্ধবী-প্রণয়িনীদের জন্যে যৌন মিলনের বিনিময়ে যে বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে, তাতে তার অর্থনৈতিক ধ্বংস টেনে আনবে, অথচ তা দ্বারা মানুষের সামাজিক কোনো কল্যাণই সাধিত হবে না। এ যৌন মিলনের পরিণামে গড়ে উঠবে না নতুন কোনো মানব-সমাজ।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইনসম্মত অবকাশ থাকলে এসব ধ্বংসাত্মক পরস্থিতি কখনো দেখা দিতে পারে না। এ কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ইসলামী বিধান যে কত নির্ভুল, কত স্বভাবসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে যেখানে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ, সেখানে কার্যত বহু স্ত্রী ভোগের বীভৎস নৃত্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য আইনে কোনো বাধা নেই, বরং আইনের অধীন—আইনের চোখের সামনেই অনুষ্ঠিত হয় এ জঘন্য কাজ।

—যদিও সেসব স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে রীতিমত স্ত্রীত্বের মর্যাদায় গ্রহণ করা হয় না, তারা হয় বান্ধবী আর প্রণয়িনী মাত্র।

সে সমাজের পুরুষরাও চারজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, সেখানে যৌন সম্পর্ক চলে যথেচ্ছ বাধা-বন্ধনহীন এবং সীমা-সংখ্যাহীন।

এরূপ অবাধ যৌন চর্চায় না গড়ে ওঠে সুষ্ঠু বলিষ্ঠ পরিবার, না নিষ্পাপ সন্তানদের নতুন মানব সমাজ। কেননা বহু স্ত্রীলোকের সাথে এ যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠে গোপনে, সমাজ সমর্থনের বাইরে। এর ধ্বংসকারিতা আজকে পাশ্চাত্য সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে।

এক কথায় বলা যায়, ইউরোপেও বহু স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ কার্যত চালু রয়েছে। যদিও তা অবৈধভাবে। আর ইসলামেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ সমর্থিত, কিন্তু আইনের সাহায্যে এবং চার সংখ্যার সীমার মধ্যে। এ দুয়ের মধ্যে কোনটি যে ভালো ব্যবস্থা, তা যে কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই নির্ণয় করতে পারে।

বস্তুত এ পর্যায়ে ইউরোপীয় সমাজ আর ইসলামী সমাজে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা এক স্ত্রী গ্রহণ আর বহু স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে নয়, আসল পার্থক্য হচ্ছে সীমিত সংখ্যার বৈধ স্ত্রী গ্রহণ আর সীমা-সংখ্যাহীন স্ত্রী ভোগের দায়িত্বহীন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। একটি করে মানুষকে শালিনতাপূর্ণ, দায়িত্বশীল আর অপরটি করে দেয় যেন লালসার দাস, দায়িত্বহীন, উচ্ছৃঙ্খল।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক ইসলামের প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বে আরব সমাজেও সীমা-সংখ্যাহীন বহু স্ত্রী ভোগ করার নানাবিধ উপায় কার্যকর ছিল। ইসলাম এ স্বাভাবিক প্রবণতার সংশোধন করেছে। সীমা-সংখ্যাহীন স্ত্রী ভোগ করার পথ বন্ধ করে চারজন পর্যন্ত সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। দ্বিতীয়, বিয়ের বাইরে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে চিরতরে হারাম করে দিয়েছে এবং

তৃতীয়, স্ত্রীদের মধ্যে আদল ও ইনসাফ কায়েম করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের জন্যে একে জরুরী শর্তরূপে নির্ধারিত করে দিয়েছে। আর চতুর্থ, এ ব্যাপারে স্বামীদের মনে আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় জাগিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ যে কত বড় সংশোধনী কাজ তা সেই সমাজের অবস্থাকে সামনে রেখে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে। রাসূলে করীমের এ সংশোধনী কাজ বাস্তবায়িত হওয়ার পর সমাজের মূল গ্রন্থিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর এবং তা পারিবারিক ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

রাসূলে করীমের গঠিত সমাজে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রেওয়াজ ছিল, কিন্তু সেখানে তার খারাপ দিক কখনো প্রবল হয়ে উঠতে পারে নি। কোনো নারীর কিংবা স্বামীর জীবন সেখানে তিক্ত-বিষাক্তও হয়ে ওঠেনি, স্ত্রীদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠেনি আর তাদের সন্তানরাও হয়নি পরস্পরের শত্রু। ইসলাম যুগের পরিবারগুলো প্রেম-ভালোবাসা, সম্প্রীতি-সদ্ভাবের পূত ভাবধারায় পরিপূর্ণ ছিল, ছিল অকৃত্রিম স্বামী-ভক্তি, ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সেখানে এক স্ত্রীসম্পন্ন পরিবার আর একাধিক স্ত্রী সম্পন্ন পরিবারের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না।

আর এ কারণেই ইসলামী সমাজে নারীর সংখ্যাধিক্য কখনো সমস্যা হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেনি। ইহজগতের পর থেকেই ইসলামী যুদ্ধ-জিহাদের সূচনা হয়, তারপরে প্রায় দু'শতাব্দীকাল পর্যন্ত তা চলতে থাকে। এসব যুদ্ধ-জিহাদে হাজার হাজার পুরুষ শহীদ হয়েছে, হাজার হাজার নারী হয়েছে বিধবা, স্বামীহারা কিংবা অবিবাহিত যুবকদের শহীদ হওয়ায় অবিবাহিতা যুবতীদের সংখ্যা পেয়েছে বৃদ্ধি। কিন্তু কোনো দিন যুদ্ধ করতে সমর্থ যুবশক্তির অভাবও যেমন দেখা দেয়নি, তেমনি অভাব ঘটেনি মেয়েদের জন্যে স্বামীর। অথচ আধুনিক ইউরোপ মাত্র দুটো মহাযুদ্ধের ফলেই পুরুষের সংখ্যাল্পতা ও নারীর সংখ্যাধিক্যের বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। অভাব পড়েছে যুদ্ধযোগ্য যুবশক্তি।

এসব দৃষ্টিতে বিচার করলেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ইসলামী ব্যবস্থার সৌন্দর্য ও যথার্থতা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা আলোচনা করেছি— ইসলামের পরিবার গঠন সম্পর্কে। দ্বিতীয় পর্বে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পরিবার সংরক্ষণ। বস্তুত ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার গঠন যত না গুরুত্বপূর্ণ, পরিবার সংরক্ষণ তার চাইতে শতগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার সংস্থার পবিত্রতা, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং স্থায়িত্ব রক্ষার জন্যে পরিবারের লোকদের ব্যক্তিগতভাবে কতক নিয়ম-নীতি পালন করে চলতে হবে। আর কতগুলো নিয়ম-কানুন পালন করতে হবে সমষ্টিগতভাবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ের অবশ্য পালনীয় নিয়ম-নীতি প্রথম পেশ করা হচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রীর লজ্জাশীলতা

পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও সুস্থতা রক্ষার জন্যে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বপ্রথম পালনীয় নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকের সহজতা লজ্জা-শরমকে যথাযথভাবে জাগ্রত রাখা।

স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই পবিত্র লজ্জা-শরমের ভূষণে ভূষিত হওয়া আবশ্যক। কেননা স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবনধারার গতি অব্যাহত রাখা— উভয়কে উভয়ের জন্যে সুরক্ষিত ও পবিত্র রাখবার জন্যে এ জিনিস একান্তই অপরিহার্য। স্বামীর যদি লজ্জা-শরম থাকে, তবে তার নৈতিক চরিত্রের দুর্গ-প্রাকার চিরদিন দুর্ভেদ্যই থাকতে পারে, কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না তা ভেদ করে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে কলুষ ঢুকিয়ে দেয়া, ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা। স্ত্রীর বেলায়ও একথাই সত্য।

পারিবারিক জীবনের বন্ধনকে অটুট রাখার জন্যে এ লজ্জা-শরম বস্তুতই মহামূল্য সম্পদ। এ সম্পদ যথাযথভাবে বর্তমান থাকলে উভয়ের প্রতি উভয়ের তীব্র আকর্ষণ স্থায়ীভাবে বর্তমান থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর অতলান্ত প্রেম-মাধুর্যে দেখা দেবে না কোনো ছিদ্র-ফাটল। একজন অপরজনের প্রতি বিরাগভাজন হবে না কখনো। এ কারণেই ইসলামে লজ্জা-শরমের গুরুত্ব অপরিসীম। নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ - (بخارى، مسلم)

নিশ্চিতই সত্য, লজ্জা-শরম ঈমানেরই বিষয়।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে লজ্জা-শরম এমন একটি বিশেষ গুণ, যা মানুষকে সকল প্রকার গর্হিত ও মানবতা-বিরোধী কাজ পরিহার করতে এবং তা থেকে পুরো মাত্রায় বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্যে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلْحَيَاءُ لَا يَاْتِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ - (بخارى، مسلم)

লজ্জা-শরম বিপুল কল্যাণই নিয়ে আসে, তা থেকে কোনো অকল্যাণের আশংকা নেই।

মানুষের কাজে-কর্মে, চলায়-বলায়, জীবনের সব স্তরে ও সব ব্যাপারেই এ হচ্ছে এক অতি প্রয়োজনীয় গুণ। এ গুণই হচ্ছে মানুষে ও পশুতে পার্থক্যের ভিত্তি। এ গুণ না থাকলে মানুষে পশুতে কোন পার্থক্য থাকে না, কার্যত মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়। পশুর মতই নির্লজ্জ হয়ে কাজ করতে শুরু করে। রাসূলে করীম (স) এ লজ্জাহীনতার মারাত্মক পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ - (بخاری)

লজ্জাই যদি তোমার না থাকল, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

অপর এক হাদীসে এ কথাটির গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে ঃ

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ - (ترمذی، مسند احمد)

লজ্জা-শরম নিতান্তই ঈমানের ব্যাপার। আর ঈমান বেহেশতে যাওয়ার চাবিকাঠি। পক্ষান্তরে লজ্জাহীনতা হচ্ছে জুলুম, আর জুলুমের কারণেই একজনকে দোযখে যেতে হয়।

মোটকথা, পারিবারিক জীবনে এ অত্যন্ত জরুরী গুণ। এ গুণ না থাকলে এ ছিদ্রপথ দিয়ে চরিত্র-বিরোধী বহু রকমের অসচ্চরিত্রতা ও বদ-অভ্যাস প্রবেশ করে দাম্পত্য জীবনের কিশ্‌তীর যে কোন সময়ে ভরাডুবি ঘটিয়ে দিতে পারে সংসারের মহাসমুদ্রে।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

স্বাভাবিক লজ্জা-শরমের অনিবার্য ফল হচ্ছে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ। চোখের দৃষ্টি এমন একটি হাতিয়ার, যার দ্বারা দুনিয়ায় যেমন ভালকাজও করা যায়, তেমনি নিজের মধ্যে জমানো যায় পাপের পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প। দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীক্ষ্ণ-শানিত তীর যা নারী বা পুরুষের অন্তর ভেদ করতে পারে। প্রেম-ভালবাসা তো এক অদৃশ্য জিনিস, যা কখনো চোখে ধরা পড়ে না, বরং চোখের দৃষ্টিতে ভর করে অপরের মর্মে গিয়ে পৌঁছায়। বস্তুত দৃষ্টি হচ্ছে লালসার বহ্নির দখিন হাওয়া। মানুষের মনে দৃষ্টি যেমন লালসাগ্নি উৎক্ষিপ্ত করে, তেমনি তার ইন্ধন যোগায়। দৃষ্টি বিনিময় এক অলিখিত লিপিকার আদান-প্রদান, যাতে লোকদের অগোচরেই অনেক প্রতিশ্রুতি— অনেক মর্মকথা পরস্পরের মনের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত আখরে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

ইসলামের লক্ষ্য যেহেতু মানব জীবনের সার্বিক পবিত্র ও সর্বাঙ্গীন উন্নত চরিত্র, সেজন্যে দৃষ্টির এ ছিদ্রপথকেও সে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে, দৃষ্টিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যে দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। কুরআন মজীদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -
(النور : ٣٠)

মু'মিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন, তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে, এ নীতি তাদের জন্যে অতিশয় পবিত্রতাময়। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় অবহিত।

কেবল পুরুষদেরকেই নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ - (النور - ٣١)

মু'মিন মহিলাদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে।

দুটি আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে— দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণ, কিন্তু এ একই কথা পুরুষদের জন্যে আলাদাভাবে এবং মহিলাদের জন্যে তার পরে স্বতন্ত্র একটি আয়াতে বলা হয়েছে। এর মানেই হচ্ছে এই যে, এ কাজটি স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই সমানভাবে জরুরী। এ আয়াতদ্বয়ে যেমন রয়েছে আল্লাহ্‌র নৈতিক উপদেশ, তেমনি রয়েছে ভীতি প্রদর্শন। উপদেশ হচ্ছে এই

যে, ঈমানদার পুরুষই হোক কিংবা স্ত্রীই, তাদের কর্তব্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। কাজেই আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক যার প্রতি চোখ তুলে তাকানো নিষিদ্ধ, তার প্রতি যেন কখনো তাকাবার সাহস না করে। আর দ্বিতীয় কথা, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের অনিবার্য ফল হচ্ছে অন্তরের পবিত্রতা, পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহ্‌র বন্দেগী পালনে উদ্যম-উৎসাহ। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ হলে অবশ্যই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা পাবে কিন্তু দৃষ্টিই যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে পরপুরুষ কিংবা পরস্ত্রী দর্শনের ফলে হৃদয় মনের গভীর প্রশান্তি বিঘ্নিত ও চূর্ণ হবে, অন্তরে লালসার উত্তাল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়ে লজ্জাস্থানের পবিত্রতাকে পর্যন্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কাজেই যেখানে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত নয়, দেখাশোনার ব্যাপারে যেখানে পর, আপন, মুহাররম-গায়র মুহাররমের তারতম্য নেই, বাছ-বিচার নেই, সেখানে লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষিত হচ্ছে তা কিছুতেই বলা যায় না। ঠিক এজন্যই ইসলামে দৃষ্টিকে— পরিভাষায় যাকে بريد العشق 'প্রেমের পয়গাম বাহক' বলা হয়েছে,— নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উপদেশের ছলে বলা হয়েছে ঃ ذلك ازكى لهم এ-নীতি তাদের জন্যে খুবই পবিত্রতা বিধায়ক অর্থাৎ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত রাখলে চরিত্রকে পবিত্র রাখা সম্ভব হবে। আর শেষ ভাগে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী-পুরুষ যদি এ হুকুম মেনে চলায় রাজি না হয়, তাহলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিশ্চয়ই এর শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে পুরোমাত্রায় অবহিত রয়েছেন।

এ ভীতি যে কেবল পরকালের জন্যেই, এমন কথা নয়। এ দুনিয়ায়ও দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্রতা রক্ষা না করা হলে তার অত্যন্ত খারাপ পরিণতি দেখা দিতে পারে। আর তা হচ্ছে স্বামীর দিল অন্য মেয়েলোকের দিকে আকৃষ্ট হওয়া এবং স্ত্রীর মন সমর্পিত হওয়া অন্য কোনো পুরুষের কাছে। আর এরই পরিণতি হচ্ছে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে আশু বিপর্যয় ও ভাঙ্গন। দৃষ্টিশক্তির বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ - (المؤمن : ١٩)

তিনি দৃষ্টিসমূহের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে এবং তারই কারণে মনের পর্দায় যে কামনা-বাসনা গোপনে ও অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হয় তা ভালোভাবেই জানেন।

এ আয়াত খণ্ডের ব্যাখ্যায় ইমাম বায়যাবী লিখেছেন ঃ

النظرة الخائنة كالنظرة الثانية الى غيرا المحرم واستراق النظر اليه او خيانة الاعين -

(انوارالتنزيل واسرارالتاويل : ج -٢ ،ص -٢٦٥)

বিশ্বাসঘাতক দৃষ্টি— গায়র-মুহাররম মেয়েলোকের প্রতি বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মতোই, তার প্রতি চুরি করে তাকানো বা চোরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অথবা দৃষ্টির কোনো বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ।

দৃষ্টি বিনিময়ের এ বিপর্যয় সম্পর্কে ইমাম গাযালী লিখেছেন ঃ

ثم عليك وفقك الله وايانا بحفظ العين فانها سبب كل فتنة اوافة - (منهاج العابدين من :ص -٨ ٢)

অতঃপর তোমার কর্তব্য হচ্ছে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা, গায়র-মুহাররমকে দেখা থেকে চোখকে বাঁচানো— আল্লাহ্ তোমাকে ও আমাদের এ তওফিক দান করুন— কেননা এ হচ্ছে সকল বিপদ-বিপর্যয়ের মূলীভূত কারণ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন ঃ

ويغض البصرا ختصاص بالنور -

চোখ নিয়ন্ত্রণ ও নীচু করে রাখায় চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার কারণ এই যে, যৌন উত্তেজনার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী ও পুরুষের প্রায় একই অবস্থা। বরং স্ত্রীলোকের দৃষ্টি পুরুষদের মনে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে থাকে। প্রেমের আবেগ-উচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি অত্যন্ত নাজুক ও ঠুনকো। কারো সাথে চোখ বিনিময় হলে স্ত্রীলোক সর্বাগ্রে কাতর এবং কাবু হয়ে পড়ে, যদিও তাদের মুখ ফোটে না। এ তার স্বাভাবিক দুর্বলতা— বৈশিষ্টও বলা যেতে পারে একে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় এর শত শত প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। এ কারণে স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এমন হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় যে, কোনো সুশ্রী স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন যুবকের প্রতি কোনো মেয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, আর অমনি তার সর্বাঙ্গে প্রেমের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল, সৃষ্টি হলো প্রলয়ঙ্কর ঝড়। ফলে তার বহিরাঙ্গ কলঙ্কমুক্ত থাকতে পারলেও তার অন্তর্লোক পঙ্কিল হয়ে গেল। স্বামীর হৃদয় থেকে তার মন পাকা ফলের বৃন্তচ্যুতির মতো একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল, তার প্রতি তার মন হলো বিমুখ, বিদ্রোহী। পরিণামে দাম্পত্য জীবনে ফাটল দেখা দিলো, আর পারিবারিক জীবন হলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।

কখনো এমনও হতে পারে যে, স্ত্রীলোক হয়ত বা আত্মরক্ষা করতে পারল; কিন্তু তার অসতর্কতার কারণে কোনো পুরুষের মনে প্রেমের আবেগ ও উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তখন সে পুরুষ হয়ে যায় অনমনীয় ক্ষমাহীন। সে নারীকে বশ করবার জন্যে যত উপায় সম্ভব তা অবলম্বন করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। শেষ পর্যন্ত তার শিকারের জাল হতে নিজেকে রক্ষা করা সেই নারীর পক্ষে হয়ত সম্ভবই হয় না। এর ফলেও পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

দৃষ্টির এ অশুভ পরিণামের দিকে লক্ষ্য করেই কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত নাযিল করা হয়েছে, আর এরই ব্যাখ্যা করে রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন অসংখ্য অমৃত বাণী। এখানে কয়েকটি জরুরী হাদীসের উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

একটি হাদীসের একাংশ ঃ

اَلْعَيْنَانِ زِنَا هُمَا النَّظْرُ وَالْاُذْنَانِ زِنَا هُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُمَا الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَا هُمَا الْبَطْشُ

وَالرِّجْلُ زِنَا هُمَا الْخَطَاءُ وَالْقَلْبُ يَهْوِىْ وَيَتَمَنّٰى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ اَوْ يُكَذِّبُهٗ - (مسلم)

চক্ষুদ্বয়ের জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রী দর্শন। কর্ণদ্বয়ের জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রীর রসাল কথা লালসা উৎকণ্ঠিত কর্ণে শ্রবণ করা। রসনার জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রীর সাথে রসাল কণ্ঠে কথা বলা, হস্তের জ্বেনা হচ্ছে পরস্ত্রীকে স্পর্শ করা— হাত দিয়ে ধরা এবং পায়ের জ্বেনা হচ্ছে যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্ত্রীর কাছে গমন। প্রথমে মন লালসাক্ত হয়, কামনাতুর হয়, যৌন অঙ্গ তা চরিতার্থ করে কিংবা ব্যর্থ করে দিয়ে তার প্রতিবাদ করে। (মুসলিম)

আল্লামা খাত্তাবী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اِنَّمَا سُمِّىَ النَّظْرُ زِنًا وَالْقَوْلُ زِنًا لِاَنَّهُمَا مُقَدِّمَتَانِ لِلزِّنَا فَاِنَّ الْبَصَرَ رَائِدٌ وَالِّسَانُ خَاطِبٌ وَالْفَرَجُ مُصَدِّقٌ لِلزِّنَا وَ مُحَقِّقٌ لَهٗ بِالْفِعْلِ - (معالم السنن :ج- ٣، ص- ٢٢٣)

দেখা ও কথা বলাকে জ্বেনা বলার কারণ এই যে, দুটো হচ্ছে প্রকৃত জ্বেনার ভূমিকা— জ্বেনার মূল কাজের পূর্ববর্তী স্তর। কেননা দৃষ্টি হচ্ছে মনের গোপন জগতের উদ্বোধক আর জ্বিহ্বা হচ্ছে বাণী বাহক, যৌন অঙ্গ হচ্ছে বাস্তবায়নের হাতিয়ার— সত্য প্রমাণকারী।

হাফেজ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন ঃ

দৃষ্টিই হয় যৌন লালসা উদ্বোধক, পয়গাম বাহক। কাজেই এ দৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ মূলত যৌন অঙ্গেরই সংরক্ষণ। যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে অবাধ, উন্মুক্ত ও সর্বগামী করে সে নিজেকে নৈতিক পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মানুষ নৈতিকতার ক্ষেত্রে যত বিপদ ও পদস্খলনেই নিপতিত হয়, দৃষ্টিই হচ্ছে তার সব কিছুর মূল কারণ। কেননা দৃষ্টি প্রথমত আকর্ষণ জাগায়, আকর্ষণ মানুষকে চিন্তা-বিভ্রমে নিমজ্জিত করে আর এ চিন্তাই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লালসার উত্তেজনা। এ যৌন উত্তেজনা ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে আর ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হয়। এ দৃঢ় সংকল্প অধিকতর শক্তি অর্জন করে, বাস্তবে ঘটনা সংঘটিত করে। বাস্তবে যখন কোনো বাধাই থাকে না, তখন এ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে কারো কোনো উপায় থাকে না।

(الجو اب الكافى ص : ٢٠٤)

অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি চালনার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلنَّظَرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ -

অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত বাণ বিশেষ।

আল্লামা ইবনে কাসীর এ প্রসেঙ্গ লিখেছেন ঃ

اَلنَّرُ سِهَمٌ سَمٌّ اِلَى الْقَلْبِ -

দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীর, যা মানুষের হৃদয়ে বিষের উদ্রেক করে।

দৃষ্টি চালনা সম্পর্কে রাসূলের নির্দেশ

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

غُضُّوْا اَبْصَارُكُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُجَكُمْ -

তোমাদের দৃষ্টিকে নীচু করো, নিয়ন্ত্রিত করো এবং তোমাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করো।

এ দুটো যেমন আলাদা আলাদা নির্দেশ, তেমনি প্রথমটির অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে শেষেরটি অর্থাৎ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হলেই লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ সম্ভব। অন্যথায় তাকে চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত হতে হবে নিঃসন্দেহে।

নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

يَاعَلِىُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَ لَكَ الْاٰخِرَةُ - (ابوداؤد)

হে আলী, একবার কোনো পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। কেননা তোমার জন্যে প্রথম দৃষ্টিই ক্ষমার যোগ্য, দ্বিতীয়বার দেখা নয়।

এর কারণ সুস্পষ্ট। আকস্মিকভাবে কারো প্রতি চোখ পড়ে যাওয়া আর ইচ্ছাক্রমে কারো প্রতি তাকানো সমান কথা নয়। প্রথমবার যে চোখ কারো ওপর পড়ে গেছে, তার মূলে ব্যক্তির ইচ্ছার বিশেষ কোনো যোগ থাকে না; কিন্তু পুনর্বার তাকে দেখা ইচ্ছাক্রমেই হওয়া সম্ভব। এ জন্যেই প্রথমবারের দেখায় কোনো দোষ হবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার তার দিকে চোখ তুলে তাকানো ক্ষমার অযোগ্য।

বিশেষত এজন্যে যে, দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির পেছনে মনের কলুষতা ও লালসা পংকিল উত্তেজনা থাকাই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের দৃষ্টি দিয়ে পরস্ত্রীকে দেখা স্পষ্ট হারাম।

তার মানে কখনো এ নয় যে, পরস্ত্রীকে একবার বুঝি দেখা জায়েয এবং এখানে তার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আসলে পরস্ত্রীকে দেখা আদপেই জায়েয নয়। এজন্যেই কুরআন ও হাদীসে দৃষ্টি নত করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রাসূলে করীম (স)- কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ 'পরস্ত্রীর প্রতি আকস্মিক দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে আপনার কি হুকুম' ? তিনি বললেন ঃ

أُطْرُقْ بَصَرَكَ - (ابن كثير) —তোমার দৃষ্টি সরিয়ে নাও।

অপর এক বর্ণনায় কথাটি এরূপ ঃ

أَصْرِفْ بَصَرَكَ - (ابو داؤد) —তোমার চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া কয়েকভাবে হতে পারে। আসলে কথা হচ্ছে পরস্ত্রীকে দেখার পংকিলতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা। আকস্মিকভাবে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কারো প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নীচু করা, অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে ঈমানদার ব্যক্তির কাজ ।

নবী করীম (স) একবার দরবারে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ

أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِّلنِّسَاءِ —মেয়েলোকদের জন্যে ভালো কি ?

প্রশ্ন শুনে সকলেই চুপ মেরে থাকলেন, কেউ কোনো জবাব দিতে পারলেন না। হযরত আলী এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাড়ি এসে ফাতিমা (রা) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন ঃ

لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ - (جمع الفوائد : ج -١، ص -٣١٧)

ভিন্ পুরুষরা তাদের দেখবে না। (এটাই তাদের জন্যে ভালো ও কল্যাণকর)।

অপর বর্ণনায় ফাতিমা (রা) বলেন ঃ

لَا يُرِيْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَ هُنَّ - (البزار، دارقطنى)

মেয়েরা পুরুষদের দেখবে নাআর পুরুষরা দেখবে না মেয়েদেরকে।

বস্তুত ইসলামী সমাজ জীবনের পবিত্রতা রক্ষার্থে পুরুষদের পক্ষে যেমন ভিন্ মেয়েলোক দেখা হারাম, তেমনি হারাম মেয়েদের পক্ষেও ভিন্ পুরুষদের দেখা। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে যেমন পাশাপাশি দুটো আয়াতে রয়েছে— পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে— তেমনি হাদীসেও এ দুটো নিষেধবাণী একই সঙ্গে ও পাশাপাশি উদ্ধৃত রয়েছে। হযরত উম্মে সালমা বর্ণিত এক হাদীসের ভিত্তিতে আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ نَظْرُ الرَّجُلِ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نَظْرُ الْمَرْأَةِ - (نيل الاوطار: ج- ٦، ص-٨ ٢٤)

পুরুষদেরকে দেখা মেয়েদের জন্য হারাম, ঠিক যেমন হারাম পুরুষদের জন্য মেয়েদের দেখা।

এর কারণস্বরূপ তিনি লিখেছেন ঃ

لِاَنَّ النِّسَاءَ اَحَدُ نَوْعَى الْاٰدَمِيِّيْنَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِنَّ النَّظْرُ اِلَى النَّوْعِ الْاٰخَرِ قِيَاسًا عَلَى الرَّجُلِ وَيُحَقِّقُهُ اَنْ

الْمَعْنَى الْمُحَرِّمُ لِلنَّظْرِ هُوَ خَوْفُ الْفِتْنَةِ وَهٰذَا فِى الْمَرْأَةِ اَبْلَغُ فَاِنَّهَا اَشَدُّ شَهْوَةً وَ اَقَلُّ عَقْلًا وَ تَتَسَارِعُ اِلَيْهَا الْفِتْنَةُ اَكْثَرُ مِنَ الرَّجُلِ - (ايضًا)

কেননা মেয়েলোক মানব জাতিরই অন্তর্ভূক্ত একটা প্রজাতি। এজন্য পুরুষের মতোই মেয়েদের জন্য তারই মতো অপর প্রজাতি পুরুষদের দেখা হারাম করা হয়েছে। এ কথার যথার্থতা বোঝা যায় এ দিক দিয়েও যে, গায়র-মুহাররমের প্রতি তাকানো হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যৌন বিপর্যয়ের ভয়। আর মেয়েদের ব্যাপারে এ ভয় অনেক বেশি। কেননা যৌন উত্তেজনা যেমন মেয়েদের বেশি, সে পরিমাণে বুদ্ধিমত্তা তাদের কম। আর পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের কারণেই অধিক যৌন বিপর্যয় ঘটে থাকে।

নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মকতুম (রা) রাসূল করীম (স)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলের কাছে বসে ছিলেন হযরত মায়মুনা ও উম্মে সালমা— দুই উম্মুল মু'মিনীন। রাসূলে করীম (স) ইবনে উম্মে মকতুমকে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার পূর্বে দুই উম্মুল মু'মিনীনকে বললেন ঃ اِحْتَجِبَا مِنْهُ। অর্থাৎ তোমরা দুজন ইবনে উম্মে মকতুমের কারণে পর্দার আড়ালে চলে যাও।

তাঁরা দুজন বললেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمٰى لَا يَبْصُرُنَا وَ لَا يَعْرِفُنَا -

হে রাসূল, ইবনে মকতুম কি অন্ধ নয় ? ... তাহলে তো সে আমাদের দেখতেও পাবে না আর চিনতেও পারবে না, তাহলে পর্দার আড়ালে যাওয়ার কি প্রয়োজন ?

তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

اَفَعَمْيَا وَاِنِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تَبْصِرَانِه - (ابوداؤد، ترمذى)

সে অন্ধ, কিন্তু তোমরা দুজনও কি অন্ধ নাকি ? সে তোমাদের দেখতে না পেলেও তোমরাও কি তাকে দেখতে পাবে না ?

তার মানে একজন পুরুষের পক্ষে ভিন্ মেয়েলোকদের দেখা যে কারণে নিষিদ্ধ, মেয়েলোকদের পক্ষেও ভিন্ পুরুষদের দেখায় ঠিক সে সে কারণই বর্তমান। অতএব তাও সমানভাবে নিষিদ্ধ।

বস্তুত আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে সঠিক জীবন যাপন করার জন্য দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ জরুরী। যার দৃষ্টি সুনিয়ন্ত্রিত নয়— ইতস্তত নারীর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে যার চোখ অভ্যস্ত, আসক্ত, তার পক্ষে আল্লাহ্র বন্দেগী করা সম্ভব হয় না। নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلٰى مَحَاسِنِ الْمَرْاَةِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهٗ اِلَّا اَحْدَثَ اللّٰهُ لَهٗ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا -

(مسند احمد، عن ابى امامة)

যে মুসলিম ব্যক্তি প্রথমবারে নারীর সৌন্দর্য দর্শন করে ও সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তার জন্যে তারই ইবাদত-বন্দেগীর কাজে বিশেষ মাধুর্য সৃষ্টি করে দেবেন।

তাহলে যাদের দৃষ্টি নারী সৌন্দর্য দেখতে নিমগ্ন থাকে, তাদের পক্ষে ইবাদতে মাধুর্য লাভ সম্ভব হবে না। হাফেয ইবনে কাসীর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। নবী করীম (স) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন সমস্ত চোখ ক্রন্দনরত থাকবে; কিন্তু কিছু চোখ হবে সন্তুষ্ট, আনন্দোজ্জ্বল। আর তা হচ্ছে সে চোখ, যা আল্লাহ্র হারাম করে দেয়া জিনিসগুলো দেখা হতে দুনিয়ায় বিরত থাকবে, যা আল্লাহ্র পথে অতন্দ্র থাকার কষ্ট ভোগ করবে এবং যা আল্লাহ্র ভয়ে অশ্রু বর্ষণ করবে। (ابن كثير - ج : ٢، ص : ٢٨٢)

মোটকথা, গায়র মুহাররম স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময় কিংবা একজনের অপরজনকে দেখা, লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ ইসলামে নিষিদ্ধ। এতে করে পারিবারিক জীবনে শুধু যে পংকিলতার বিষবাষ্প জমে উঠে তাই নয়, তাতে আসতে পারে এক প্রলয়ংকর ভাঙন ও বিপর্যয়। মনে করা যেতে পারে, একজন পুরুষের দৃষ্টিতে কোনো পরস্ত্রী অতিশয় সুন্দরী ও লাস্যময়ী হয়ে দেখা দিল। পুরুষ তার প্রতি দৃষ্টি পথে ঢেলে দিল প্রাণ মাতানো মন ভুলানো প্রেম ও ভালবাসা। স্ত্রীলোকটি তাতে আত্মহারা হয়ে গেল, সেও ঠিক দৃষ্টির মাধ্যমেই আত্মসমর্পণ করল এই পর-পুরুষের কাছে। এখন ভাবুন, এর পরিণাম কি ? এর ফলে পুরুষ কি তার ঘরের স্ত্রীর প্রতি বিরাগভাজন হবে না ? হবে নাকি এই স্ত্রী লোকটি নিজের স্বামীর প্রতি অনাসক্ত, আনুগত্যহীনা। আর তাই যদি হয়, তাহলে উভয়ের পারিবারিক জীবনের গ্রন্থি প্রথমে কলংকিত ও বিষ-জর্জর এবং পরে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হতে বাধ্য। এর পরিণামই তো আমরা সমাজে দিনরাতই দেখতে পাচ্ছি।

পর্দার ব্যবস্থা

ঠিক এ কারণে ইসলামে পর্দার ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। ইসলামে পর্দা ব্যবস্থা পরিবারের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্যে একান্তই অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, পর্দা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত না হলে পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ স্থিতি ধারণাতীত।

ইসলামের এই পর্দা ব্যবস্থার দুটি পর্যায় রয়েছে। একটি হচ্ছে ঘরের আর অপরটি বাইরের। ঘরের অভ্যন্তরে থাকাকালীন পর্দা ব্যবস্থা পালন করা যেমন মুসলিম নারীর পক্ষে কর্তব্য তেমনি ঘরের বাইরের ক্ষেত্রে। এ উভয় ক্ষেত্রের জন্যে যে পর্দা ব্যবস্থা, তাই হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পর্দা ব্যবস্থা। এখানে পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে।

প্রথম পর্যায়

পর্দা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় হচ্ছে ঘরোয়া জীবনে, ঘরের অভ্যন্তরে পালন ও অনুসরণের নিয়ম-বিধান। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত কর্মকেন্দ্র হচ্ছে তার ঘর। ঘরকেই আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করা বরং স্থায়ীভাবে ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করাই হচ্ছে মুসলিম নারীর কর্তব্য। কুরআন মজীদে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে দুনিয়ার মুসলিম নারী সমাজকে— বলা হয়েছে ঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى - (الاحزاب : ٣٣)

এবং তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাস করো এবং পূর্বকালীন জাহিলিয়াতের মতো নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িও না।

আয়াতটির দুটো অংশ। প্রথম অংশ পর্দা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় অংশ তার দ্বিতীয় পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আয়াতটির প্রথমাংশে বলা হয়েছে যে, নারীর আসল স্থান হচ্ছে ঘর; অতএব ঘরে অবস্থান করাই তার কর্তব্য। আয়াতের শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতি প্রমাণ করছে যে, প্রত্যেক নারীর জন্যে একখানা ঘর থাকা উচিত। এমন একখানা ঘর থাকা উচিত, যেখানে তার বসবাসের স্থান নির্দিষ্ট ও সর্বজন পরিচিত। দ্বিতীয়ত, তার এ ঘরই হবে তার অবস্থানের জায়গা ও কর্মকেন্দ্র। নারী-জীবনের যা কিছু করণীয়, তা প্রধানত এ ঘরকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হবে এবং যে সব কাজ সে নিজের ঘরে বসে সম্পন্ন করতে পারে, তাই হচ্ছে তার পক্ষে শোভনীয় কর্মসূচী। অন্য কথায়, প্রধানত তার বসবাসের ঘরকে কেন্দ্র করেই রচিত হবে তার জন্যে কর্মসূচী।

আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতাংশের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

اَلْزِمْنَ بُيُوْ تَكُنَّ فَلَا تَخْرُجْنَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ -

তোমাদের ঘরকে তোমরা আঁকড়ে থাকো এবং বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে কখনো বের হবে না।

আল্লামা আবূ বাকর আল-জাস্‌সাস এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

وفيه الدلالة على ان النساء مامورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج -

(احكام القران : ج -٣، ص -٤٤٣)

এ আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, মেয়েরা ঘরকে আঁকড়ে থাকার জন্যে নির্দিষ্ট এবং বাইরে বের হওয়া থেকে নিষেধকৃত।

আল্লামা ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ

اسكن فيها وتتحركن ولاتبرجن منها - (احكام القران : ج-٣، ص-١٥٣٣)

ঘরেই বসবাস করো, বাইরে দৌড়াদৌড়ি করো না এবং ঘর ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে যেও না।

আল্লামা শওকানী লিখেছেন ঃ

المراد بها امرهن بالسكون والا ستقرار فى بيوتهن - (فتح لقدير : ج-٤، ص-٢٦٩)

এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, এতে মেয়েদেরকে তাদের নিজেদের ঘরে ধীরস্থিরভাবে বসবাসের আদেশ করা হয়েছে।

আল্লামা আলুসী এ আয়াতাংশের তরজমা লিখেছেন এ ভাষায় ঃ

اَجْمَعْنَ اَنْفُسَكُنَّ فِى الْبُيُوْتِ - (روح المعانى : ج -٢٢، ص- ٦)

তোমরা তোমাদের মন তথা নিজেদের সত্তাকে ঘরের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রাখ।

আল্লামা আলুসী আয়াতাংশের বহু প্রকারের পাঠ-পদ্ধতির উল্লেখ করার পর এর সামগ্রিক তাৎপর্য লিখেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

المرادعلى جميع القراة امرهن بملا زمة البيوت وهوا مر مطلوب من سائر النساء (ايضا)

সকল প্রকার পাঠ-রীতিতেই এর মানে হচ্ছে এই যে, আয়াতে মেয়েদেরকে ঘরকে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সব মেয়েদের প্রতিই এ হচ্ছে ইসলামের দাবি।

এক হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত ঘোষণা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ -

তাদের ঘরই তাদের জন্যে সুখ-শান্তি ও সার্বিক কল্যাণের আকর।

হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, কিছু সংখ্যক মহিলা রাসূলে করীম (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন ঃ

يارسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعالى فهل لناعمل ندرك به فضل المجاهدين فى سبل الله تعالى -

হে রাসূল, পুরুষরা তো আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিশিষ্টতা ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ প্রভৃতি দ্বারা আমাদের

তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে গেছে। আমরা কি এমন কোনো কাজ করতে পারি, যা করে আমরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা লাভ করব ? এ প্রশ্নের জবাবে নবী করীম (স) বললেন ঃ

مَنْ قَعَدَتْ مِنْكُنَّ فِىْ بَيْتِهَا فَاِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى - (البزارعن انس)

যে মেয়েলোক তার ঘরে অবস্থান করল, সে ঠিক আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর কাজ সম্পন্ন করতে পারল।

রাসূলের কথা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের তুলনায় পুরুষদের জন্যে আল্লাহ্‌র দেয়া বিশিষ্টতা মেয়েরা লাভ করতে পারে না কোনোক্রমেই। কেননা তা জন্মগত ব্যাপার। পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই তার এ বিশিষ্টতা। আর মেয়েরা তা পেতে পারে না এজন্যে যে, মেয়ে হয়েই তাদের জন্ম। আর পুরুষও আল্লাহ্‌রই তো সৃষ্টি। তবে নৈতিক মান মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য নেই, মেয়েরাও তা লাভ করতে পারে পুরুষদের মতোই— যদিও ঠিক একই কাজ দ্বারা নয়। কাজের স্বরূপ, ধরন, ক্ষেত্র বিভিন্ন হলেও কাজের ফল হিসেবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করার ব্যাপারে মেয়ে-পুরুষ সমান।

রাসূলের কথা থেকে এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মেয়েদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর আর পুরুষদের কর্মক্ষেত্র বাইরে। জিহাদের সওয়াব পাবার জন্যে পুরুষদের তো যুদ্ধের ময়দানে যেতে হবে, দ্বীনের শত্রুদের সাথে কার্যত মুকাবিলা করতে হবে, জীবন-প্রাণ কঠিন বিপদের সম্মুখে ঠেলে দিতে হবে, ঘর-বাড়ি থেকে বহুদূরে চলে যেতে হবে। কিন্তু মেয়েদের জিহাদ তার ঘরকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হবে এবং ঘরের দায়িত্ব পালন করলেই পুরুষদের জিহাদের সমান মর্যাদা ও সওয়াব লাভ করতে পারবে। জিহাদ স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই করতে হবে। কিন্তু পুরুষদের করতে হবে তা বাইরের ক্ষেত্রে, যুদ্ধের ময়দানে। কেননা তা করার যোগ্যতা ক্ষমতা তাদেরই দেয়া হয়েছে। আর মেয়েদের তা করতে হবে ঘরে বসে। কেননা ঘর কেন্দ্রিক জিহাদ করার যোগ্যতাই মেয়েদের দেয়া হয়েছে, বাইরের জিহাদের নয়।

প্রসঙ্গত 'মেয়েদের নিজেদের ঘর' কথাটির বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক। কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘরকে 'স্ত্রীদের ঘর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে فِىْ بُيُوْتِكُنَّ — 'তোমাদের নিজেদের ঘরে'। হাদীসেও তাই বলা হয়েছে। তার মানে স্ত্রীর নিজস্ব ঘর থাকা আবশ্যক— যেমন পূর্বে বলেছি— এবং এ ঘরই হবে তার কর্মকেন্দ্র, জীবন-কেন্দ্র। এ জন্যেই নবী করীম (স) তাঁর এক-একজন বেগমের জন্যে এক-একটি হুজরা— ছোট কক্ষ— নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এবং যে বেগম যে হুজরায় বসবাস করতেন, তিনিই ছিলেন তার মালিক-ব্যবস্থাপনা-পরিচালনার কর্ত্রী। নবী করীম (স)-এর উপস্থিতিতেও তিনিই তাতে মালিকানা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন।[১]

এরই ভিত্তিতে ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ

مَنْ بَنٰى بَيْتًا لِزَوْجَتِهٖ وَ اَقْبَضَهٗ اِيَّاهَا كَانَ كَمَنْ وَهَبَ زَوْجَتَهٗ بَيْتًا وَسَلَّمَهٗ اِلَيْهَا فَيَكُوْنَ الْبَيْتُ مِلْكًا لَهَا - (روح المعانى : ج- ٢٢، ص- ٧، بحواله التحفة الاثنى عشرية)

যে লোক তার স্ত্রীর বসবাসের জন্যে কোনো ঘর নির্মাণ করবে এবং তার পরিচালন অধিকার তারই হস্তে অর্পন করবে, সে যেন তার স্ত্রীকে একখানি ঘর সম্পূর্ণ হেবা করে দিলো, তারই কাছে তা হস্তান্তর করে দিলো। ফলে সেই ঘরের মালিকানা স্ত্রীর হয়ে যাবে।

---

১. আহলি সুন্নাত আল-জামায়াত-এর মতে এ মালিকানা এমন ছিল না, যার ওপর মিরাসের আইন কার্যকর হতে পারত এবং রাসূলের পরও তার মালিক হয়ে থাকতে পারতেন।

উপরোক্ত আয়াতে এ ঘরকেই আশ্রয় হিসেবে আঁকড়ে ধরে থাকবার জন্যে সমস্ত মুসলিম মহিলাকে আদেশ করা হয়েছে। এমন কি জামা'আতে নামায পড়া ওয়াজিব করা হয়েছে কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যে, মহিলাদের পক্ষে সে নামাযের জামা'আতের উদ্দেশ্যেও ঘর থেকে বের হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ تَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ - (مسند احمد)

মেয়েদের ঘরের কোণই হচ্ছে তাদের জন্যে উত্তম মসজিদ।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আহমাদুল বান্না লিখেছেন ঃ

اَلْمُرَادُ اَنْ تَتَّخِذَ الْمَرْأَةُ فِيْ بَيْتِهَا لِصَلَاتِهَا مَكَانًا لَا يَسْمَعُ مِنْهُ صَوْتُهَا وَ لَا يَرَاهَا اَحَدٌ -

(بلوغ الامانى: ج -٥، ص -١٩٩)

মেয়েরা তাদের ঘরে নামাযের জন্যে এমন একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নেবে, যেখানে তাকে কেউ দেখতেও পাবে না, আর তার কোনো শব্দও কেউ শুনতে পাবে না।

উম্মে হুমাইদ নামে পরিচিতা এক মহিলা রাসূলে করীমের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ -

হে রাসূল, আমি আপনার সাথে জামা'আতে মসজিদে নামায পড়তে ভালবাসি।

তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

قَدْ عَلِمْتُ اَنَّكِ تُحِبِّيْنَ الصَّلَاةَ مَعِىْ وَصَلَاتُكِ فِىْ بَيْتِكِ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِىْ حُجْرَتِكَ وَصَلَاتُكِ فِىْ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِىْ دَارِكِ وَصَلَاتُكِ فِىْ دَارِكِ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَّكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِىْ مَسْجِدِىْ - (مسند احمد)

হ্যাঁ আমি জানতে পারলাম তুমি আমার সাথে জামা'আতে নামায পড়া খুব পছন্দ করো। কিন্তু মনে রেখ, তোমার শয়নকক্ষে বসে নামায পড়া তোমার জন্য বৈঠকখানায় নামায পড়া অপেক্ষা ভালো, বৈঠকখানায় নামায পড়া ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়া অপেক্ষা ভালো, ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়া ঘরের কাছাকাছি মহল্লার মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা ভালো আর তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আমার এই মসজিদে এসে নামায পড়া অপেক্ষা ভালো।

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন ঃ

فَاَمَرَتْ فَبُنِىَ لَهَا مَسْجِدٌ فِىْ اَقْصٰى شَىْءٍ مِّنْ بَيْتِهَا وَاَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّىْ فِيْهِ حَتّٰى لَقِيَتِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ - (مسند احمد)

অতঃপর সেই মেয়েলোকটির আদেশে তার ঘরের দূরতম ও অন্ধকারতম কোণে নামাযের জায়গা বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই নামায পড়েছিল।

আল্লামা আহমাদুল বান্না এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

يستفاد من هذا الحديث ستر المرأة فى كل شىء حتى فى صلاتها وعبادة ربها وكلما كانت فى

مكان استر كان ثوابها اعظم واو فرلهذا ارشد هاالنبى صلى الله عليه وسلم الى اخفى مكان فى بيتها وابعده عن الناس .

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সকল ব্যাপারে এমন কি নামাযে ও আল্লাহ্র সব বন্দেগীর কাজে পূর্ণ মাত্রায় পর্দা গ্রহণ মেয়েদের জন্যে আবশ্যক। আর ঘরের সবচেয়ে গোপন কোণে নামায পড়ায় অধিকতর ও পূর্ণতর সওয়াব বলে নবী করীম (স) মেয়ে লোকটিকে তার ঘরের অধিক গোপন ও লোকদৃষ্টি থেকে দূরবর্তী জায়গায় নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলে করীম (স) মেয়েলোকদেরকে মসজিদে যেতে চাইলে নিষেধ করতে মানা করেছেন একথা ঠিক; কিন্তু

وَلَوْ رَأَى حَالَهُنَّ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ - (مسند احمد)

তিনি যদি আজকের দিনের মেয়েদের অবস্থা দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মেয়েদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণনা করেছেনঃ

مَاعَبَدَتْ اِمْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ اَنْ تَعْبُدَهُ فِىْ بَيْتِهَا - (طبرانى فى الكبير)

মেয়েরা তার ঘরে বসে আল্লাহ্র যে ইবাদত সম্পন্ন করে, সে রকম ইবাদত আর হয় না।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَاصَلَّتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ صَلَاةٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اَشَدِّ مَكَانٍ فِىْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً - (طبرانى فى الكبير)

আল্লাহ্র কাছে মেয়েলোকের সেই নামায সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয়, যা সে তার ঘরের অন্ধকারতম কোণে পড়েছে।

ঠিক এ দৃষ্টিতেই রাসূলে করীম (স) মেয়েদেরকে জানাযার সঙ্গে কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেছেন। হযরত উম্মে আতীয়াতা (রা) বলেন ঃ

نُهِيْنَا عَنْ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يَعْزَمْ عَلَيْنَا - (بخارى، مسلم)

জানাযা অনুসরণ করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, যদিও রাসূলে করীম (স) এ ব্যাপারে আমাদের প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করেন নি।

অপর এক হাদীসে হযরত উম্মে আতীয়াতার কথাটি নিম্নরূপ ঃ

نَهَانَا اَنْ نُخْرِجَ فِىْ جَنَازَةٍ - (طبرانى، عمدة القارى : ج -٨، ص- ٦٣)

রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে জানাযায় বের হতে নিষেধ করেছেন।

হযরত উম্মে আতীয়াতার প্রথমোক্ত কথা থেকে মনে হয়, রাসূলে করীম (স) মেয়েদেরকে জানাযায় বের হতে ও কবরস্থান পর্যন্ত গমন করতে নিষেধ করেছেন বটে; যদিও সে নিষেধ হারাম পর্যায়ে নহে। কেননা তিনি এ ব্যাপারে কোনো কড়াকড়ি দেখান নি, খুব তাগিদ করে নিষেধ করেন নি। শুধু অপছন্দ করেছেন।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন ঃ

ظَاهِرُالْحَدِيْثِ يُقْتَضِىْ اَنَّ النَّهِىْ لِلتَّنْزِيْهِ وَبِهِ قَالَ جُمْهُوْرُ اَهْلُ الْعِلْمِ - (عمده : ج- ٨، ص- ٦٣)

উম্মে আতীয়াতার হাদীস থেকে বাহ্যত মনে হয় যে, এ নিষেধ নৈতিক শিক্ষাদানমূলক— সব ইসলামবিদই এ মত গ্রহণ করেছেন।

সওরী বলেছেন ঃ

اتباع النساء الجائز بدعة —মেয়েদের জানাযায় গমন করা বিদ্‌আত।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলেছেন ঃ

لَا يَنْبَغِ ذٰلِكَ لِلنِّسَاءِ - (عمده القارى : ج -٨، ص -٦٤)

এ কাজ মেয়েদের শোভা পায় না।

ইমাম শাফেয়ী এ কাজকে মাকরূহ মনে করেছেন হারাম নয়। (ঐ)

মনে রাখা আবশ্যক, জামা'আতের সাথে নামায পড়তে মসজিদে যাওয়া এবং জানাযার সাথে কবরস্থানে গমন করতে নিষেধ করা হয়েছে রাসূলে করীম ও সাহাবীদের ইসলামী সমাজের সোনালী যুগে। কিন্তু চিন্তা করার বিষয়— সেকালেও যদি এ দুটো কাজে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, অপছন্দ করা হয়ে থাকে, তাহলে এ যুগে কি তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে কোনক্রমে ? উপরন্তু ঠিক যে যে কারণে এ নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, সে কারণ কি সে যুগের তুলনায় এ যুগে অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করে নি ?

ঘরের অভ্যন্তরে পর্দা

ঘরের অভ্যন্তরেও নারী-পুরুষের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যায়ে নারী-পুরুষের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَ لَآ اِخْوَانِهِنَّ وَ لَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَ لَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَ لَا نِسَآئِهِنَّ وَ لَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ - (الاحزاب : ٥٥)

বাবা, চাচা-মামা, নিজ সন্তান, সহোদর ভাই, ভাই-পো, বোন-পো, মুসলিম মহিলা ও দাসদাসীদের সাথে দেখা দেয়ায় কোনো দোষ নেই।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা আলূসী লিখেছেন ঃ

بيان من لايجب عليهن الا احتجاب عنه (روح المعانى : ج -٢٢، ص- ٧٤)

এ আয়াতে যাদের থেকে পর্দা করা ওয়াজিব নয়, তাদের কথা বলা হয়েছে।

লিখেছেন ঃ

اظاهران المعنى لا اثم عليهن فى ترك الحجاب -

বাহ্যত এর অর্থ হচ্ছে এদের পর্দা না করলে কোনো দোষ নেই।

মুজাহিদ বলেছেন ঃ

المراد لاجناح عليهن فى وضع الجلباب وابداء الزينة للمذكورين -

এর অর্থ এই যে, আয়াতে উদ্ধৃত ব্যক্তিদের সামনে মুখাবরণ উন্মুক্ত করলে ও সৌন্দর্যের অলংকারাদি জাহির করলে কোনো দোষ হবে না।

সূরা আন-নূর-এ একথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ - (النور : ٣١)

এবং মেয়েলোকেরা— তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীর পিতা, গর্ভজাত ছেলে-সন্তান, স্বামীর পুত্র, সহোদর ভাই, ভাই-পো, বোন-পো, মেলা-মেশার মেয়েলোক, দাস, মেয়েদের প্রতি কোনো প্রয়োজন রাখে না— এমন সব পুরুষ এবং যেসব ছেলেপেলে এখনও মেয়েদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও সচেতন হয়নি— এদের ছাড়া আর কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।

আয়াতের প্রত্যেকটি শব্দই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

১. মেয়েরা তাদের নিজ নিজ স্বামীকে দেখা দিতে পারবে, নিজের রূপ-সৌন্দর্য দেখাতে পারবে। শুধু তা-ই নয়, স্বামীর পক্ষে তার সমগ্র দেহকে— দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা সম্পূর্ণ জায়েয। নারী রূপ-সৌন্দর্য যৌবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্যই তাই। নারী তার স্বামীকে তা দেখাতে— দেখতে দিতে বাধ্য। দেখতে দিতে না চাইলে স্বামী বল প্রয়োগ করার অধিকার রাখে। যদিও স্ত্রীর যৌন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত কারো মতে অশোভন, কারো মতে মাকরূহ আর কারো মতে হারাম।

২. কেবল বাবাকেই নয়, বাবার বাবা, তার বাবার ভাই, মায়ের ভাই ইত্যাদিকেও দেখা দেয়া জায়েয। কেবল নিজের বাবা-দাদাই নয়, মায়ের বাবাকেও দেখা দিতে পারে। দুধ বাবাকেও দেখা দেয়া জায়েয। হযরত আয়েশার দুধবাপ ছিল আবূ কুয়াইস। সে হযরত আয়েশার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন ঃ

لَا اٰذَنُ لَهٗ حَتّٰى اِسْتَاْذَنَ فِيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بخارى)

তাঁর সাথে দেখা দেয়ার ব্যাপারে রাসূলের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার আগে আমি তাঁকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেব না।

পরে রাসূলে করীম (স)-কে তাঁর কথা বলা হলে তিনি বলেন ঃ

اِئْذَنِيْ لَهٗ فَاِنَّهٗ عَمُّكِ

হ্যাঁ, তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দাও, কেননা সে তো তোমার চাচা হয়। (বুখারী)

৩. স্বামীর পিতা— শ্বশুরকেও দেখা দেয়া জায়েয।

৪. নিজ গর্ভজাত ছেলে-সন্তান, তাদের ছেলে-সন্তান।

৫. আপন সহোদর ভাই, পিতার দিকের বৈমাত্রেয় ভাই, মায়ের দিকের বৈপিত্রেয় ভাই এবং দুধ-ভাইও তার মধ্যে শামিল।

৬. এসব ভাইয়ের ছেলে-সন্তান, তাদের সন্তান।

৭. বোনের ছেলে-সন্তান, তাদের সন্তান।

৮. সাধারণ মেলামেশার মেয়েলোক, যাদের সঙ্গে দিনরাত দেখা-সাক্ষাত হয়েই থাকে কিংবা যাদেরকে ঘরের ভিতরে কাজ-কর্ম করানোর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়। কাফির ও ফাসিক মেয়েদের

সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা মুসলিম মহিলাদের জন্যে জায়েয নয়। কেননা তাতে করে পর্দার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে যিম্মী ও গায়র যিম্মীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যিম্মী মেয়েলোক মুসলিম মহিলাকে দেখতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। ইমাম গাযালীর মতে, অন্য মুসলিম মহিলার মতো যিম্মী মেয়েলোকও দেখতে পারে। আর ইমাম বগবীর মতে এ দেখা জায়েয নয়। ইবনে হাজার আসকালানী বলেছেন ঃ

الا صح تحريم نظرها الى مايبد و فى المهنة من مسلمة غير سيد تها ومحرمها ودخول الذميات على امهات المؤمنين الوادرد فى الاحاديث الصحيحة دليل محل نظر ها منها ما يبد و فى المهنة – (روح المعانى :ج- ٢٢، ص -٤٣)

খেদমত করার সময় মুসলিম মহিলাদের দেহের যে অংশ সাধারণত প্রকাশ হয়ে পড়ে তা দেখা যিম্মী মেয়েলোকের পক্ষে হারাম, এ হচ্ছে অধিক সত্য ও সহীহ মত। তবে যিম্মী মেয়েলোকেরা নিজের মুনিব মহিলাকে দেখতে পারে। সহীহ হাদীসে উম্মুল মু'মিনীনের কাছে যিম্মী মেয়েলোকের অনুপ্রবেশের যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, খেদমতের জন্যে যে অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ে তা দেখা জায়েয।

ইমাম রাযী ও ইবনুল আরাবীর মতে যিম্মী মেয়েলোকও মুসলিম মহিলার মতোই। কুরআনের نسائهن বলে সব মেয়েলোকই বোঝানো হয়েছে। কেননা মুসলিম মহিলাদের পক্ষে যিম্মী মেয়েলোকদের দেখা না দিয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ

والصحيح عندى ان ذلك جائز لجميع النساء – (احكام القران)

আমার বিবেচনায় বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এই যে, সব মেয়েলোকদের সাথেই মুসলিম মেয়েরা দেখা-সাক্ষাত করতে পারে।

৯. দাস-দাসীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত জায়েয, তারা কাফির হলেও নিষেধ নেই। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর একটি কথা এই যে, মেয়ে-মালিকের দৃষ্টি ক্রীতদাস ভিন্ পুরুষদের মতই। সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব প্রথমে বলেছিলেন ঃ العبد كالامة। মেয়ে-মালিকের পক্ষে দেখা দেয়ার ব্যাপার ক্রীতদাসীর মতোই। কিন্তু পরে তিনি তাঁর এ মত প্রত্যাহার করেছেন এবং বলেছেন ঃ

لَا يَغُرَ نَّكُمْ اٰيَةُ النُّوْرِ فَاِنَّهَا فِى الْاِنَاثِ دُوْنَ الذُّكُوْرِ –

সূরা নূর-এর আয়াত থেকে তোমাদের ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয়, কেননা তা হচ্ছে ক্রীতদাসীদের সম্পর্কে, ক্রীতদাসদের সম্পর্কে নয়।

আর এর কারণস্বরূপ তিনি বলেছেন ঃ

انهم فحول ليسوا ازواجا ولا محارم والشهروة متحققة فيه لجوازا لنكاح فى الجملة –

(روج المعانى : ج -٢٢، ص -١٤٤)

ক্রীতদাসেরা তো বলদের ন্যায়। মেয়ে-মালিকের তারা স্বামীও নয়, মুহাররমও নয় অথচ যৌন উত্তেজনার উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর মোটামুটিভাবে এ নারী-পুরুষের মধ্যে বিয়ে তো হতেই পারে।

এতদ্সত্ত্বেও কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ স্পষ্টভাবেই পুরুষ স্ত্রী— অন্য কথায় দাস ও দাসী— উভয়ের সাথেই সমানভাবে দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি প্রমাণ করে। এ পর্যায়ে হযরত আনাস বর্ণিত একটি

হাদীস উল্লেখ্য। একদা রাসূলে করীম (স) একটি ক্রীতদাসসহ হযরত ফাতিমার ঘরে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখতে পেলেন ঃ ফাতিমা এমন একখানি কাপড় পড়ে আছে, যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা খুলে যায় আর পা ঢাকা হলে মাথা অনাবৃত হয়ে পড়ে। তখন নবী করীম (স) হযরত ফাতিমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

اِنَّهٗ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ اِنَّمَا هُوَ اَبُوْكِ وَغُلَامُكِ – (ابوداؤد، مسند احمد، ابن مردويه)

তোমার কোনো অসুবিধে নেই। এ দাসটি হচ্ছে তোমার বাবা তুল্য এবং তোমার গোলাম।

এ থেকে মেয়ে-মালিকের পক্ষে তার ক্রীতদাসকে দেখা দেয়ায় কোনো দোষ নেই বলেই স্পষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে। (روح المعانى : ج-۲۲، ص-۱٤٤)

১০. মেয়েদের প্রতি যেসব পুরুষ কোনো প্রয়োজন রাখে না— এমন সব অধীনস্থ লোকের দেখা দেয়াও জায়েয। এরা হচ্ছে সে সব লোক, যারা ঘরের বাড়তি খাবার খেতে আসে, কেননা তারা নিজেরা উপার্জন করতে অক্ষম। এরা মেয়েদের দিকে কোনো যৌন প্রয়োজন বোধ করে না, বরং কাজকর্ম করে দেয়, কথাবার্তা শোনে। এরা হচ্ছে বিগত যৌবন বৃদ্ধ, আধাবৃদ্ধ লোক।

মুজাহিদ বলেছেন ঃ

ان غيراولى الاربة الايله الذى لايعرف امرالنساء –

মেয়েদের প্রতি প্রয়োজন রাখে না— এমন পুরুষ হচ্ছে তারা, যারা মেয়েদের ব্যাপারই বুঝে না, জানে না এমন সোজা-সোজা ও সাদাসিধে লোক।

১১. সেসব ছেলেপেলে, যারা এখনো মেয়েলোকদের যৌনত্বের কোনো বোধ লাভ করেনি, যাদের মধ্যে যৌন বোধ এখনো জাগ্রত হয়নি, যে সব কিশোরের মনে নারীদের প্রতি এখনো কোনো কৌতূহল ও ঔৎসুক্য জাগেনি, তারাও এর মধ্যে শামিল।

এসব পুরুষ লোকের সঙ্গে পর্দানশীল মেয়েরাও অবাধে দেখা-সাক্ষাত করতে পারে, এদের সামনে সাজ-সজ্জা ও প্রসাধন করেও আসতে পারে। শরীয়তে তার পূর্ণ ও স্পষ্ট অনুমতি রয়েছে। কেননা পর্দানশীল মেয়েদেরও এ ধরনের পুরুষদের সাথে দিন-রাত দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়ত এ ধরনের পুরুষদের কাছ থেকে মেয়েদের কোনো নৈতিক বিপর্যয়— কোনো অঘটন ঘটার আশংকা নেই বললেও চলে। আর আশংকা না থাকারও কারণ এই যে, এরা হচ্ছে নিতান্ত আপন লোক। আত্মীয়তা, নৈকট্য, রক্ত সম্পর্ক ইত্যাদি বিপর্যয়ের পথের প্রধানতম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদের জন্যে সাধারণত খোলা থাকে মেয়েদের যেসব দেহাঙ্গ, তা দেখায় কোনো দোষ নেই, আর তা হচ্ছে মুখমন্ডল, মাথা, পা-হাটু, দুই হাত। কিন্তু এদের জন্যেও বুক, পিঠ ও পেট এবং নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এলাকার কিছু অংশ দেখা আদৌ জায়েয নয়। কেননা এসব অঙ্গ সাধারণত উন্মুক্ত থাকে না, বস্ত্রাবৃত থাকাই স্বাভাবিক এবং এসব অঙ্গই প্রধানত যৌন আবেদনকারী।

এ ব্যবস্থা দ্বারা মেয়েদের জন্যে একটি পরিবেষ্টনী নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো, সেখানে তারা স্বাধীনভাবে ও দ্বিধা-সংকোচহীন হয়ে বিচরণ করতে পারে। বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে যেসব পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের পথে ইসলামী শরীয়তে কোনোই বাধা আরোপ করা হয়নি বরং অবাধ অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর বাইরের পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত আদৌ জায়েয নয়; সাধারণত তার কোনো প্রয়োজনও দেখা দেয় না। আর অপ্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাত নারী-পুরুষের জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এজন্যে তা বর্জন করা প্রত্যেক ঈমানদার মহিলার কাছেই তার ঈমান ও ইসলামী বিধানের ঐকান্তিক দাবি।

মেয়ে-পুরুষদের এ পর্দা রক্ষার্থেই সাধারণ পুরুষদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আগাম জানান না দিয়ে অপর কারো ঘরে প্রবেশ না করে। বলা হয়েছে ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - (النور: ٢٧)

হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের ঘর ছাড়া অপর লোকের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের আগমন সম্পর্কে পরিচিতি করিয়ে নেবে এবং ঘরের লোকদের প্রতি সালাম পাঠাবে। এ নীতি অবলম্বন করা তোমাদের জন্যে কল্যাণবহ, সম্ভবত তোমরা এ উপদেশ গ্রহণ করবে ও এ অনুযায়ী কাজ করবে।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ এই ছিল যে, একজন মহিলা সাহাবী রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি আমার ঘরে এমন অবস্থায় থাকি যে, তখন আমাকে সেই অবস্থায় কেউ দেখতে পায় তা আমি মোটেই পছন্দ করিনে— সে আমার ছেলে-সন্তানই হোক কিংবা পিতা, অথচ এ অবস্থায়ও তারা আমার ঘরে প্রবেশ করে। এখন আমি কি করব ? এরপরই এ আয়াতটি নাযিল হয়। বস্তুত আয়াতটিতে মুসলিম নারী-পুরুষের পরস্পরের ঘরে প্রবেশ করার প্রসঙ্গে এক স্থায়ী নিয়ম পেশ করা হয়েছে। মেয়েরা নিজেদের ঘরে সাধারণত খোলামেলা অবস্থায়ই থাকে। ঘরের অভ্যন্তরে সব সময় পূর্ণাঙ্গ আচ্ছাদিত করে থাকা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় কারো ঘরে প্রবেশ করা— সে মুহাররম ব্যক্তিই হোক না কেন— মোটেই সমীচীন নয়। আর গায়র মুহাররম পুরুষের প্রবেশ করার তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা বিনানুমতিতে ও আগাম জানান না দিয়ে কেউ যদি কারো ঘরে প্রবেশ করে তবে ঘরের মেয়েদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখা, তাদের দেহের যৌন অঙ্গের ওপর নজর পড়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে পারে। তাদের রূপ-যৌবন দেখে পুরুষ দর্শকের মনে যৌন লালসার আগুন জ্বলে ওঠতে পারে। আর তারই পরিণামে এ মেয়ে-পুরুষের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে গোটা পরিবারকে তছনছ করে দিতে পারে। মেয়েদের যৌন অঙ্গ ঘরের আপন লোকদের দৃষ্টি থেকে এবং তাদের রূপ-যৌবন ভিন্ পুরুষের নজর থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা পেশ করা হয়েছে।

জাহিলিয়াতের যুগে এমন হতো যে, কারো ঘরের দুয়ারে গিয়ে আওয়াজ দিয়েই টপ্ করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করত, মেয়েদেরকে সামলে নেবারও কোনো সময় দেয়া হতো না। ফলে কখনো ঘরের মেয়ে পুরুষকে একই শয্যায় কাপড় মুড়ি দেয়া অবস্থায় দেখতে পেত, মেয়েদেরকে দেখত অসংবৃত বস্ত্রে। এজন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَ اِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ - (النور : ٢٨)

তোমাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়, তাহলে অবশ্যই ফিরে যাবে। এ হচ্ছে তোমাদের জন্যে অধিক পবিত্রতর নীতি। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ মাত্রায় অবহিত রয়েছেন।

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

يَا بُنَيَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُوْنَ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ - (ترميذى)

হে প্রিয় পুত্র, তুমি যখন তোমার ঘরের লোকদের সামনে যেতে চাইবে, তখন বাইরে থেকে সালাম করো। এ সালাম করা তোমার ও তোমার ঘরের লোকদের পক্ষে বড়ই বরকতের কারণ হবে।

কারো ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রথমে সালাম দেবে, না প্রথমে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইবে, এ নিয়ে দু'রকমের মত পাওয়া যায়। কুরআনে প্রথমে অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রথমে অনুমতি চাইবে, পরে সালাম দেবে। কিন্তু একথা ভিত্তিহীন। কুরআনে প্রথমে অনুমতি চাওয়ার কথা বলা হয়েছে বলেই যে প্রথমে তাই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কুরআনে তো কি কি করতে হবে তা এক সঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে। এখানে পূর্বাপরের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। বিশেষত বিশুদ্ধ হাদীসে প্রথমে সালাম করার ওপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

কালদা ইবনে হাম্বল (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু প্রথমে সালাম করিনি বলে অনুমতিও পাইনি। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِرْجِعْ فَقَلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ءَ اَدْخُلُ - (ابوداود، ترمذی)

ফিরে যাও, তারপর এসে প্রথমে বলো আস্‌সালামু আলাইকুম, তার পরে প্রবেশের অনুমতি চাও।

হযরত জাবের বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا تَاْذَنُوْ لِمَنْ لَمْ يُبْدَاْ بِالسَّلَامِ - (بیہقی)

যে লোক প্রথমে সালাম করেনি, তাকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিও না।

হযরত জাবেদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

السلام قبل الكلام —কথা বলার পূর্বে সালাম দাও। (ترمذی) -

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ও হুযায়ফা (রা) বলেছেন ঃ

يَسْتَاذَنُ عَلٰى ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ -

মুহাররম মেয়েলোকদের কাছে যেতে হলেও প্রথমে অনুমতি চাইতে হবে।

এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

اَسْتَاذَنُ عَلٰى اُمِّى —আমার মায়ের ঘরে যেতে হলেও কি আমি অনুমতি চাইব ?

রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ অবশ্যই। সে লোকটি বলল ঃ আমি তো তার সঙ্গে একই ঘরে থাকি— তবুও ? রাসূল (স) বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই অনুমতি চাইবে। সেই ব্যক্তি বলল ঃ আমি তো তার খাদেম। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

اِسْتَاْذَنْ عَلَيْهَا اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً - (مؤطا مالك)

অবশ্যই পূর্বাহ্নে অনুমতি চাইবে, তুমি কি তোমার মাকে ন্যাংটা অবস্থায় দেখতে চাও— তা- ই পছন্দ করো ?

তার মানে, অনুমতি না নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে মাকে ন্যাংটা অবস্থায় দেখতে পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে সালাম করতে হবে এবং পরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে। অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে। এ ফিরে যাওয়া অধিক ভালো, সম্মানজনক প্রবেশের জন্যে কাতর অনুনয়-বিনয় করার হীনতা থেকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাদীসের ইল্‌ম লাভের জন্যে কোনো কোনো আনসারীর ঘরের দ্বারদেশে গিয়ে বসে থাকতেন, ঘরের মালিক বের হয়ে না আসা পর্যন্ত তিনি প্রবেশের অনুমতি চাইতেন না। এ ছিল উস্তাদের প্রতি ছাত্রের বিশেষ আদব, শালীনতা।

কারো বাড়ির সামনে গিয়ে প্রবেশ-অনুমতির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হলে দরজার ঠিক সোজাসুজি দাঁড়ানোও সমীচীন নয়। দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে নজর করতেও চেষ্টা করবে না। নবী করীম (স) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর বলেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهٖ وَلٰكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ اَوِالْاَيْسَرِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ - (ابوداؤد)

নবী করীম (স) যখন কারো বাড়ি বা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতেন, তখন অবশ্যই দরজার দিকে মুখ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন না। বরং দরজার ডান কিংবা বাম পাশে সরে দাঁড়াতেন এবং সালাম করতেন।

এক ব্যক্তি রাসূলে করীমের বিশেষ কক্ষপথে মাথা উচুঁ করে তাকালে রাসূলে করীম (স) তখন ভিতরে ছিলেন এবং তাঁর হাতে লৌহ নির্মিত চাকুর মতো একটি জিনিস ছিল। তখন তিনি বললেন ঃ

لو اعلم ان هذا ينظرني لطعنت بالمدرى في عينه وهل جعل الاستيذان الامن اجل البصر -

(بغوى، تفسيرا المظهرى : ج- ٦، ص - ٤٩٠)

এ ব্যক্তি বাইরে থেকে উঁকি মেরে আমাকে দেখবে তা আগে জানতে পারলে আমি আমার হাতের এ জিনিসটি দ্বারা তার চোখ ফুটিয়ে দিতাম। এ কথা তো বোঝা উচিত যে, এ চোখের দৃষ্টি বাঁচানো আর তা থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যেই পূর্বাহ্নে অনুমতি চাওয়ার রীতি করে দেয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে স্পষ্ট, আরো কঠোর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَوْ اَنَّ امْرَاءً اَطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَ فْتِهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَاكَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ -

(مسند احمد، بخارى، مسلم)

কেউ যদি তোমার অনুমতি ছাড়াই তোমার ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে তাকায় আর তুমি যদি পাথর মেরে তার চোখ ফুটিয়ে দাও, তাহলে তাতে তোমার কোনো দোষ হবে না।

অনুমতি না পাওয়া গেলে কিংবা ঘরে কোনো পুরুষ লোক উপস্থিত নেই বলে যদি ঘর থেকে চলে যেতে বলা হয় তাহলে অনুমতি প্রার্থনাকারীকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। তার সেখানে আরো দাঁড়ানো এবং কাতর কণ্ঠে অনুমতি চাইতে থাকা সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ।

তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও যদি অনুমতি পাওয়া না যায়, তাহলেই এরূপ করতে হবে। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী একবার হযরত উমর ফারূকের দাওয়াত পেয়ে তাঁর ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন এবং তিনবার সালাম করার পরও কোনো জবাব না পাওয়ার কারণে তিনি ফিরে চলে গেলেন। পরে সাক্ষাত হলে হযরত উমর ফারূক বললেন ঃ

مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاتِيَنَا — তোমাকে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তুমি আমার ঘরে আসলে না কেন?

তিনি বললেন ঃ

اِنِّىْ اَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلٰى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدُّ عَلٰى فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَاذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ فَلْيَرْجِعْ - (بخارى، مسلم)

আমি তো এসেছিলাম, আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালামও করেছিলাম। কিন্তু কারো

কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে আমি ফিরে চলে এসেছি। কেননা নবী করীম (স) আমাকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কারো ঘরে যাওয়ার জন্যে তিনবার অনুমতি চেয়েও না পেলে সে যেন ফিরে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম হাসান বসরী বলেছেন ঃ

اَرَاَوَّلُ اِعْلَامٌ وَالثَّانِىْ مُؤَامِرَةٌ وَالثَّالِثُ اِسْتِيْذَانٌ بِالرُّجُوْعِ - (بغوى)

তিনবার সালাম করার মধ্যে প্রথমবার হলো তার আগমন সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। দ্বিতীয়বার সালাম প্রবেশ অনুমতি লাভের জন্যে এবং তৃতীয়বার হচ্ছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা।

কেননা তৃতীয়বার সালাম দেয়ার পরও ঘরের ভেতর থেকে কারো জবাব না আসা সত্যই প্রমাণ করে যে, ঘরে কেউ নেই, অন্তত ঘরে এমন কোনো পুরুষ নেই, যে তার সালামের জবাব দিতে পারে।

আর যদি কেউ ধৈর্য ধরে ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়েই থাকতে চায়, তবে তারও অনুমতি আছে, কিন্তু শর্ত এই যে, দুয়ারে দাঁড়িয়েই অবিশ্রান্তভাবে ডাকা-ডাকি ও চিল্লাচিল্লি করতে থাকতে পারবে না। একথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতাংশে ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ - (الحجرات : ٥)

তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষায় থাকত যতক্ষণ না তুমি ঘর থেকে বের হচ্ছ, তাহলে তাদের জন্যে খুবই কল্যাণকর হতো।

আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে রাসূলে করীম (স)-এর প্রসঙ্গে; কিন্তু এর আবেদন ও প্রয়োগ সাধারণ। কোনো কোনো কিতাবে এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)— যিনি ইসলামের বিষয়ে মস্তবড় মনীষী ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন— হযরত উবাই ইবনে কা'আবের বাড়িতে কুরআন শেখার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতেন। তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কাউকে ডাক দিতেন না, দরজায় ধাক্কা দিয়েও ঘরের লোকদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন না। যতক্ষণ না হযরত উবাই নিজ ইচ্ছেমতো ঘর থেকে বের হতেন, ততক্ষণ এমনিই দাঁড়িয়ে থাকতেন।

(روح المعانى- ج: ٢٢، ص: ١٤٤)

পুরুষ উপস্থিত নেই— এমন ঘরের মেয়েদের কাছ থেকে যদি কোনো সাধারণ দরকারী জিনিস পেতে হয়; কিংবা একান্তই জরুরী কোনো কথা, কোনো সংবাদ জানতে হয়, তাহলে পর্দার বাইরে দাঁড়িয়েই তা চাইতে হবে, জিজ্ঞেস করতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ - (الاحزاب : ٥٣)

আর তোমরা যখন তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস পেতে চাইবে, তাহলে তা পর্দার আড়ালে বাইরে দাঁড়িয়েই তাঁদের নিকট চাইবে। বস্তুত এ নীতি তোমাদের ও তাদের দিলের পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী, অনুকূল।

আয়াতটি যদিও স্পষ্ট রাসূলে করীমের বেগমদের সম্পর্কে অবতীর্ণ এবং এ নির্দেশও বিশেষভাবে রাসূলের বেগমদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু এ আয়াতেরও একটি সাধারণ আবেদন রয়েছে এবং এ নির্দেশও সাধারণ মুসলিম সমাজের মহিলাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য হবে। কেননা, তাদের কাছ থেকে কিছু পেতে হলেও তো সে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়েই চাইতে হবে এবং বিনানুমতিতে তাদের ঘরেও প্রবেশ করা যাবে না।

উপরে উদ্ধৃত নির্দেশসমূহ পুরুষদের লক্ষ্য করেই বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তাই বলে মেয়েরা তার বাইরে নয়, তাদের পক্ষে এর কোনোটিই নয় লংঘনীয়। মেয়েদের লক্ষ্য করে আরো অতিরিক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন মেয়েরা তা পালন করে নিজেদেরকে পরপুরুষের দৃষ্টি ও আকর্ষণের পংকিলতা থেকে পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারে।

মেয়েদের পক্ষে যদি বাইরের পুরুষদের সাথে কথা বলা একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে এবং তা না বলে কোনো উপায়ই না থাকে, তাহলে কথা বলতে হবে বৈ কি; কিন্তু সেজন্যেও কিছুটা স্পষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে, যা লংঘন করা কোনো ঈমানদার মহিলার পক্ষেই জায়েয নয়।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا - (الاحزاب : ٣٢)

তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্ ভীরু হয়ে থাক, তাহলে কস্মিনকালেও নিম্নস্বরে কথা বলবে না। কেননা সেরূপ কথা বললে রোগগ্রস্ত মনের লোক লোভী ও লালসা-কাতর হয়ে পড়বে। আর তোমরা প্রচলিত ভালো কথাই বলবে।

'নিম্নস্বরে কথা বলবে না' মানে ঃ

لاتجبن بقو لكن خاضعا اى لينا خناثا على سنن المريبات والمومسات- (روح المعانى : ج -٢٢، ص -٥)

তোমাদের কথাকে বিনয় নম্রতাপূর্ণ ও নারীসুলভ কোমল ও নরম করে বলবে না, যেমন করে সংশয়পূর্ণ মানসিকতা সম্পন্ন ও চরিত্রহীনা মেয়েলোকেরা বলে থাকে।

কেননা এ ধরনের কথা শুনলে লালসাকাতর ব্যক্তিরা খুবই আশাবাদী হয়ে পড়ে। তাদের মনে মনে এ লোভ জাগে যে, হয়ত এর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে। কেবল মেয়েদেরই নয়, পুরুষদেরও অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নিহায়া কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخضع الرجل الغير امراته اى يلين لها بالقول بما يطمعها منه - (تفسيرا المظهرى : ج -٧، ص - ٣٦٨)

নবী করীম (স) পুরুষকে তার নিজের স্ত্রী ছাড়া ভিন্ মেয়েলোকের সাথে খুব নরম সুরে ও লালসা পিচ্ছিল কণ্ঠস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, যে কথা শুনে সেই মেয়েলোকের মনে কোনো লালসা জাগতে পারে।

'মানসিক রোগাক্রান্ত লোকেরা লালসাকাতর হতে পরে'— একথা বলার বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, ভিন্ মেয়েলোকের কাছ থেকে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন সম্ভাবনার আশা করা কেবল এ ধরনের লোকদের পক্ষেই সম্ভব। ঈমানদার লোক কখনো এরূপ হয় না।

فان المؤمن الكامل الذى مطمئن بالايمان ويرى برهان ربه لايطمع فيما حرمه الله تعالى والذى ايمانه ضعيف كان فيه شائبة النفاق يشتهى الى ماحرم الله عليه - (تفسير المظهرى : ج -٧، ص -٣٦٨)

কেননা কামিল ঈমানদার ব্যক্তির দিল ঈমানের প্রভাবে শান্ত-তৃপ্ত-সমাহিত। সে সব সময় আল্লাহ্র সুস্পষ্ট ঘোষণাবলী দেখতে পায়— মনে রাখে। ফলে সে আল্লাহ্র হারাম করা কোনো কিছু পেতে লোভ করে না। কিন্তু যার ঈমান দুর্বল, যার দিলে মুনাফিকী রয়েছে, সে-ই কেবল হারাম জিনিসের প্রতি লোভাতুর হয়ে থাকে।

কিন্তু যে মেয়েলোকের সাথে কথা বলা হচ্ছে, সে যদি স্পষ্ট ভাষায় ও অকাট্য শব্দে ও স্বরে কাটাকাটা ভাবে জরুরী কথা কয়টি বলে দেয়, তাহলে এ মানসিক রোগাক্রান্ত লোকেরা লোভাতুর হবে না, তারা নিরাশ হয়েই চলে যেতে বাধ্য হবে। আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

لا تلن القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المريبات من النساء فانه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة – (فتح القدير : ج -٤، ص -٣٦٨)

লোকদের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর মিহি করে বলো না। যেমন সন্দেহপূর্ণ চরিত্রের মেয়েরা করে থাকে। কেননা এ ধরনের কথা বলাই অনেক সময় বিরাট নৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে থাকে।

শয়তান প্রকৃতির ও চরিত্রহীন লোকেরা নারী শিকারে বের হয়ে সাধারণত সেসব জায়গায়ই ঢু' মারে, যেখান থেকে কিছুটা সুযোগ লাভের সম্ভবনা মনে হয়। আর এ উদ্দেশ্যে স্বামী কিংবা বাড়ির পুরুষদের অনুপস্থিতি তারা মহা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। নারী শিকারীর এ ধরনের মৃগয়া কেবল সেখানেই সার্থক হয়ে থাকে, যেখানে নারী নিজে দুর্বলমনা, প্রতিরোধহীন, যে শিকার হবার জন্যে— পর পুরুষের হাতে ধরা দেবার জন্যে কায়মনে প্রস্তুত হয়েই থাকে। নারীদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে তোলবার জন্যেই আল্লাহ্‌র এ নির্দেশবাণী অবতীর্ণ হয়েছে। অপরদিকে সাধারণভাবে সব পুরুষকেই রাসূলে করীম (স) স্বামী বা বাড়ির পুরুষের অনুপস্থিতিতে ঘরের মেয়েদের সাথে কথা বলতেই নিষেধ করেছেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّكَلِّمَ النِّسَاءَ اِلَّا بِاِذْنِ اَزْوَاجِهِنَّ – (طبرانى)

নবী করীম (স) মেয়েলোকদের সাথে তাদের স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

মেয়েরা যদি ভিন পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্যই হয়, না বলে যদি কোনো উপায়ই না থাকে, তাহলে কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا —খুব ভাল ও প্রচলিত ধরনের কথা বলবে।

এ আয়াতাংশের তাফসীরে আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا عِنْدَ النَّاسِ بَعِيْدًا مِّنَ الرِّيْبَةِ عَلٰى سُنَنِ الشَّرْعِ لَا يَنْكُرُ مِنْهُ مُسَامِعَهُ شَيْئًا وَّلَا يَطْمَعُ مِنْهُنَّ اَهْلَ الْفِسْقِ وَالْفُجُوْرِ – (فتح القدير :ج -٤ ،ص -٢٦٨)

তারা বলবে সাধারণভাবে লোকদের কাছে পরিচিত ও প্রচলিত কথা, যার মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের লেশমাত্র থাকবে না এবং যা হবে শরীয়তের রীতিনীতি অনুযায়ী, যে কথা শুনে শ্রোতা অপছন্দও কিছু করবে না এবং পাপী ও চরিত্রহীন লোকেরা অবৈধ সম্পর্কের লোভে লালায়িতও হবে না।

সে সঙ্গে একথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, মেয়েদের সাধারণ কথাবার্তা খুবই নিম্নস্বরে হওয়া বাঞ্চনীয়। উচ্চৈস্বরে বা তীব্র কণ্ঠে কথা বলা মেয়েদের শোভা পায় না। দ্বিতীয়ত উচ্চৈস্বরে কথা বললে দূরের লোকেরা পর্যন্ত তার কথা শুনতে পাবে। পূর্বোক্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যায় আল্লামা আবূ বকর আল-জাস্‌সাস লিখেছেন ঃ

والدلالة على ان الاحسن بالمراة ان لاترفع صلوتها بحيث يسمعها الرجال –
(احكام القران : ج -٣، ص-٤٤٣)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হবে না, অন্য লোকরা তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না— এই হচ্ছে মেয়েদের জন্যে অতি উত্তম নীতি।

বস্তুত একথা ভুলা যেতে পারে না যে, মেয়েদের শরীরের ন্যায় তাদের কণ্ঠস্বরও পর্দায় রাখতে হবে। দেহকে যেমন ভিন্ পুরুষের সামনে অনাবৃত করা যায় না, কণ্ঠস্বরকেও তেমনি ভিন পুরুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করানো যায় না। ইমাম ইবনুল হাম্মাম বলেছেন ঃ

اِنَّ نَغْمَةَ الْمَرْاَةِ عَوْرَةٌ —নিশ্চয়ই মেয়েলোকের সুরেলা কণ্ঠস্বর ভিন পুরুষ থেকে লুকোবার জিনিস।

ঠিক এজন্যেই নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

التكبير للرجال والتصفيق للنساء - (بخارى، مسلم)

নামাযে ইমামের ভুল হলে সেই জামা'আতে শরীক পুরুষেরা তাকবীর বলবে আর মেয়েরা হাত মেরে শব্দ করবে।

এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের কণ্ঠস্বর অবশ্য গোপনীয়, ভিন্ পুরুষ থেকে তা অবশ্যই লুকোতে হবে। (روح المعانى- ج- ١، ص- ١٤٦)

এরই ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, মেয়েরা নামাযে যদি উচ্চৈস্বরে কুরআন পাঠ করে তবে তাতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (المظهر ى- ج ٣ ص -٣٩٢)

শুধু কণ্ঠস্বরই নয়, মেয়েদের অলংকারাদির ঝংকারও ভিন্ পুরুষদের কর্ণকুহর থেকে গোপন করতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ - (النور : ٣١)

এবং তারা যেন নিজেদের পা মাঠির ওপর শক্ত করে না ফেলে, কেননা তাতে করে তাদের গোপনীয় অলংকারাদির ঝংকার শুনিয়ে দেয়া হবে।

আর জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা পায়ে পাথরকুচি ভরে মল পরত আর তারা যখন চলাফেরা করত, তখন শক্ত করে মাটিতে পা ফেলত। এতে পা ঝংকার দিয়ে উঠত। এ আয়াতে তা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম বায়যাবী লিখেছেন ঃ

هوابلغ من النهى عن ابداء الزينة

وادل على المنع من رفع الصوت لها،

অলংকারাদি জাহির করার ব্যাপারে এটা পূর্ণমাত্রার নিষেধ এবং মেয়েদের কণ্ঠস্বর উচ্চ করা যে নিষেধ, তাও এ থেকে প্রমাণিত।

কেননা অলংকারের ঝংকার শুনতে পেলেও ভিন পুরুষের মনে অতি সহজেই যৌন আকর্ষণ জেগে ওঠে। তাই নিখুঁত পর্দা রক্ষার জন্যে অলংকারের ঝংকারও পরপুরুষ থেকে লুকোতে হবে। আল্লামা যামাখশারী এ আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেন ঃ

واذنهين عن اظهارصوت الحلى علم بذلك ان النهى عن اظهار مواضع الحلى ابلغ -
(محاسن التاويل : ج -١٢، ص -٤٤١٥)

মেয়েদেরকে যখন অলংকারের শব্দ জাহির করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন জানা গেল যে, অলংকার ব্যবহারের অঙ্গসমূহ গোপন করা আরো বেশি করে নিষিদ্ধ হবে।

ভিন্ স্ত্রী-পুরুষের গোপন সাক্ষাতকার

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মেয়ে পুরুষের অবাধ দেখা-সাক্ষাতের জন্যে একটা পরিসর রয়েছে এবং সে পরিসরের বাইরে মেয়ে পুরুষের দেখা-সাক্ষাত করা, কথাবার্তা বলা ও গোপন অভিসারে মিলিত হওয়া সম্পূর্ণ হারাম। যে আয়াতে ঘরের মেয়েলোকদের কাছে কোনো জরুরী জিনিস চাইতে হলে পর্দার আড়ালে থেকে বাইরে বসে চাইতে হবে বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে আয়াতেরই ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

فی هذا ادب لکل مؤمن وتحذ یرله من ان یثق بنفسه فی الخلوة مع من لاتحل له والمکالمة من دون الحجاب لمن تحرم علیه - (فتح القدیر : ج-٤، ص -٢٨٨)

এ আয়াত প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্যে একটি নীতি শিক্ষা দেয় এবং গায়র-মুহাররম মেয়েলোকদের সাথে গোপনে মিলিত হওয়া ও পর্দার অন্তরাল ছাড়াই পরস্পরে কথাবার্তা বলা সম্পর্কে স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

নবী করীম (স)-ও একথাই বলেছেন নিম্নোদ্ধৃত হাদীসে ঃ

لا تلجوا علی المغیبات فان الشیطٰن یجری من احدکم مجری الدم - (ترمذی)

যে সব মহিলার স্বামী বা নিকটাত্মীয় পুরুষ অনুপস্থিত, তাদের কাছে যেও না। কেননা তোমাদের প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি ধমনীতে শয়তানের প্রভাব রক্তের মতো প্রবাহিত হয়।

অন্যত্র আরো কঠোর ভাষায় বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْ مِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِاِمْرَاَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُوْمُحَرَّمٍ مِّنْهَا فَاِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطٰنِ - (مسند احمد، بخاری، مسلم)

আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোনো ব্যক্তিই যেন এমন মেয়েলোকের সাথে গোপনে মিলিত না হয়, যার সাথে তার আপন মুহাররম কোনো পুরুষ নেই। কেননা গোপনে মিলিত এমন দুজন স্ত্রী পুরুষের সাথে শয়তান তৃতীয় হিসেবে উপস্থিত থাকে। ঠিক এ কারণেই সতীসাধ্বী স্ত্রী হওয়ার জন্য অপরিহার্য গুণ হিসেবে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لا تاذن فی بیته الا باذنه - (بخاری)

স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ছাড়া কোনো লোককেই প্রবেশ করতে দেবে না।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এ হাদীসের অর্থ লিখেছেন এ ভাষায় ঃ

ای لا تاذن المراة فی بیت زوجها لا لرجل ولا لامراة یکر هها ز وجهالان ذلك یوجب سوء الظن ویبعث علی الغیرة التی هی سبب القطعیة (عمدة القاری : ج -٢، ص -١٨٥)

অর্থাৎ স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে স্বামীর পছন্দ নয়— এমন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না। কেননা এতে করে খারাপ খারাপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে স্বামীর মনে আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র হয়ে উঠে দাম্পত্য সম্পর্ককেই ছিন্ন করে দিতে পারে।

স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ তার স্ত্রীর কাছে কোনো গায়র-মুহাররম পুরুষের উপস্থিতি এবং তার ঘরে প্রবেশ করা ইসলামী শরীয়তে বড়ই গুনাহের কাজ, নিষিদ্ধ এবং অভিশপ্ত। হাদীসে এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) একদা বাইরে থেকে এসে

তাঁর ঘরে তাঁর স্ত্রীর কাছে বনু হাশিম বংশের কিছু লোককে উপস্থিত দেখতে পান। তিনি গিয়ে নবী করীম (স)-এর কাছে বিষয়টি বিবৃত করেন এবং বলেন যে, ঘটনা এই; কিন্তু ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখতে পাইনি; তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذٰلِكَ —খারাবী থেকে আল্লাহ্ তাঁকে মুক্ত করেছেন।

অতঃপর তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন ঃ

لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِيْ هٰذَا عَلٰى مُغِيْبَةٍ اِلَّا وَ مَعَهُ رَجُلٌ اَوْ اِثْنَانِ - (مسند احمد، مسلم)

আজকের দিনের পর কোনো পুরুষই অপর কোনো ঘরের স্ত্রীর কাছে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে কখনো প্রবেশ করবে না, যদি না তার সাথে আরো একজন বা দুইজন পুরুষ থাকে।

হযরত ফাতিমা (রা)- এর ঘরে প্রবেশ করার জন্যে হযরত আমর ইবনে আ'স (রা) একদিন বাইরে থেকে অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওখানে আলী উপস্থিত আছে কি ? বলা হল ঃ 'না, তিনি নেই।" একথা শুনে হযরত আমর ফিরে চলে গেলেন। পরে আবার এসে অনুমতি চাইলে হযরত আলী উপস্থিত কিনা জিজ্ঞেস করলেন। বলা হলো— তিনি ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। অত ঃপর হযরত আমর প্রবেশ করলেন। হযরত আলী জিজ্ঞেস করলেন ঃ

مَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلَ حِيْنَ لَمْ تَجِدْ نِيْ هٰهُنَا -

আমাকে এখানে অনুপস্থিত পেয়ে তুমি ঘরে প্রবশ করলে না কেন— কে নিষেধ করেছিল ?

তখন হযরত আমর বললেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اَنْ نَّدْخُلَ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ - (مسند احمد)

যে মেয়েলোকের স্বামী উপস্থিত নেই, তার ঘরে প্রবেশ করতে রাসূলে করীম (স) আমাদের নিষেধ করেছেন।

এ পর্যায়ে অধিকতর কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ قَعَدَ عَلٰى فِرَاشِ مُغِيْبَةٍ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَانًا - (مسند احمد، الجا الصغير)

যে পুরুষ লোক স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো মেয়েলোকের শয্যায় বসবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার উপর (তার শাস্তির জন্যে) একটি বিষধর অজগর নিযুক্ত করে দিবেন।

আল্লামা আহমাদুল বান্না এসব হাদীসের ভিত্তিতে লিখেছেন ঃ

اَحَادِيْثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلٰى تَحْرِيْمِ دُخُوْلِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى الْمُغِيْبَاتِ وَالْخَلْوَةِ بِالْمَرْاَةِ الْاَجْنَبِيَّةِ وَهٰذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ - (بلوغ الامانى : ج -٥، ص -٨٤)

এ পর্যায়ের সমস্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর কাছে কোনো একজন পুরুষের প্রবেশ করা এবং ভিন-গায়র মুহাররম মেয়েলোকের সাথে গোপনে মিলিত হওয়া সম্পূর্ণ হারাম এবং এ সম্পর্কে সকল ইসলামবিদ সম্পূর্ণ একমত।

ইমাম নববী লিখেছেন ঃ দুইজন- তিনজন পুরুষের প্রবেশ জায়েয প্রমাণিত হয় যে, হাদীস থেকে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এজন্যে একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে কোনো দুষ্কৃতির কল্পনা করা যায় না। অন্যথায়, তা সত্ত্বেও যদি দুষ্কার্য হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তবে তাও হারাম। (بلوغ الامانى : ص :٨٥)

স্বামীর উপস্থিতিতেও যেমন এ কাজ করা যেতে পারে না, তেমনি তার অনুপস্থিতিতেও করা যেতে পারে না। বরং স্বামীর অনুপস্থিতিতে এ কাজ এক ভয়ানক অপরাধে পরিণত হয়ে যায়।

বস্তুত স্বামীর নিকটাত্মীয় বন্ধুদের সাথে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর নিকটাত্মীয় বান্ধবীদের সাথে স্বামীর— মুহাররম নয় এমন সব মেয়ে পুরুষের— গোপন সাক্ষাতকার বড়ই বিপদজনক হয়ে থাকে। উপরোক্ত হাদীসে মেয়েদেরকে যেমন সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়িয়ে চলবার জন্যে, তেমনি নিম্নোদ্ধৃত হাদীসে সাবধান করে দেয়া হয়েছে পুরুষদের।

রাসূলে করীম (স) কড়া ভাষায় বলেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلُ عَلَى النِّسَاءِ - (بخارى)

তোমরা পুরুষেরা গায়র-মুহাররম মেয়েলোকের কাছে যাওয়া-আসা থেকে দূরে থাকো— সাবধান থাক।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

احدهم عدم جواز اختلاء الرجل بامرأة اجنبية والثانى عدم جواز الدخول على المغيبة

(عمدة القارى : ج -٢٠، ص- ٢١٣)

এ হাদীস থেকে যে দুটি কথা প্রমাণিত হয়, তার একটি হচ্ছে, ভিন্ মেয়েলোকদের সাথে পুরুষের নিরিবিলিতে গোপনভাবে মিলিত হওয়া নিষেধ; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, স্বামী বা ঘরের পুরুষ উপস্থিত নেই এমন মেয়েলোকের ঘরে প্রবেশ করা নিষেধ।

রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশের ফলে এ দুটো কাজই হারাম। এ পর্যায়ে দেবর-ভাসুর সম্পর্কে পুরুষদের সাথে মেয়েদের একাকীত্বের সাক্ষাত সর্বাধিক বিপদজনক এবং এ ব্যাপারে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করার জন্যে স্পষ্ট নির্দেশও রয়েছে।

রাসূলে করীম (স)-এর উপরোক্ত কথা শুনে একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ اَلْحَمْوَ -

হে রাসূল, দেবর-ভাসুর প্রভৃতি স্বামীর নিকটাত্মীয় পুরুষদের সম্পর্কে আপনি কি নির্দেশ দিচ্ছেন ? জবাবে তিনি বলেন ঃ

اَلْحَمْوُ اَلْمَوْتُ। —স্বামীর এসব নিকটাত্মীয়রাই হচ্ছে মৃত্যুদূত।

الحمو। শব্দের অর্থ কি ?— এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন কথা উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ

اَلْحَمْوُ اَخُو الزَّوْجِ —'হামো' মানে স্বামীর ভাই— স্বামীর ছোট হোক কি বড়।

ইমাম লাইস বলেছেন ঃ

هو اخو الزوج واشبه من اقارب الزوج - (نيل الاوطار : ج -٦، ص -٢٤٤)

'হামো' হচ্ছে স্বামীর ভাই, আর তারই মতো স্বামীর অপরাপর নিকটবর্তী লোকের যেমন চাচাত, মামাত, ফুফাত ভাই ইত্যাদি।

ইমাম নববীর মতে 'হামো' মানে হচ্ছে ঃ

اقارب الزوج غير ابائه وابنائه لانهم محارم الزوجة يجوز لها الخلوة بها ولايو صفون بالموت -

স্বামীর নিকটবর্তী লোক— আত্মীয়, স্বামীর বাপ ও পুত্র সন্তান— এর মধ্যে শামিল নয়। কেননা তারা তো স্ত্রীর জন্যে মুহাররম। এদের সঙ্গে একাকীত্বে একত্রিত হওয়া শরীয়তে জায়েয। কাজেই এদেরকে মৃত্যুদূত বলে অভিহিত করা যায় না।

বরং এর সঠিক অর্থে বোঝা যায় ঃ

স্বামীর ভাই, স্বামীর ভাইপো, স্বামীর চাচা, চাচাত ভাই, ভাগ্নে এবং এদেরই মতো অন্যসব পুরুষ যাদের সাথে এ মেয়েলোকের বিয়ে হতে পারে, যদি না সে বিবাহিতা হয়।

কিন্তু নবী করীম (স) এদেরকে মৃত্যু বা মৃত্যুদূত বলে কেন অভিহিত করেছেন ? এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ

جرت العادة بالتسا هل فيه فيخلو الاخ بامراة اخيه فشبه بالموت -

সাধারণ প্রচলিত নিয়ম ও লোকদের অভ্যাসই হচ্ছে এই যে, এসব নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। (এবং এদের পারস্পরিক মেলা-মেশায় কোনো দোষ মনে করা হয় না) ফলে ভাই ভাইর বউর সাথে একাকীত্বে মিলিত হয় এ কারণেই এদেরকে মৃত্যু সমতুল্য বলা হয়েছে। আল্লামা কাযী ইয়ায বলেছেন ঃ

اَلْخِلْوَةُ بِالْاَحْمَاءِ مُوَدِّيَةٌ اِلَى الْهَلَاكِ فِى الدِّيْنِ -

স্বামীর এসব নিকটাত্মীয়ের সাথে স্ত্রীর (কিংবা স্ত্রীর এসব নিকটাত্মীয়ের সাথে স্বামীর) গোপন মেলামেশা নৈতিক ধ্বংস টেনে আনে।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন ঃ

اِنَّهٗ يُفْضِىْ اِلٰى مَوْتِ الدِّيْنِ اَوْ اِلٰى مَوْتِهَا بِطَلَاقِهَا عِنْدَ غَيْرَةِ الزَّوْجِ اَوْ بِرَجْمِهَا اَنْ زَنَتْ مَعَهٗ -

(عمدة القارى شرح البخارى : ج - ٢٠، ص - ٢١٣-٢١٤)

এ ধরনের লোকদের সাথে গোপন মিলন নৈতিক ও ধর্মের মৃত্যু ঘটায় কিংবা স্বামীর আত্মসম্মানবোধ তীব্র হওয়ার পরিণামে তাকে তালাক দেয় বলে তার দাম্পত্য জীবনের মৃত্যু ঘটে। কিংবা এদের কারোর সাথে যদি জ্বেনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে সঙ্গেসার কারার দন্ড দেয়া হয়, ফলে তার জৈবিক মৃত্যুও ঘটে।

স্বামী বা স্ত্রীর নিকটাত্মীয়-আত্মীয়দের ব্যাপারে শরীয়তে যখন এত কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন স্বামীর পুরুষ বন্ধুদের সাথে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর বান্ধবীদের সাথে স্বামীর অবাধ মেলামেশা, বাড়িতে-পার্কে, হোটেল-রেস্তোরায় আর পথে-ঘাটে কি অফিসে-ক্লাবে গোপন অভিসার কিভাবে বিধিসঙ্গত হতে পারে! অথচ তাই চলছে বর্তমান সমাজের সর্বস্তরে। এখনকার সমাজে শালার বউ আর বউর বোন অর্ধেক বধু। স্ত্রীর বান্ধবী আর স্বামীর বন্ধুরাই হচ্ছে নিঃসঙ্গের সঙ্গী— আসর বিনোদনের সামগ্রী, আনন্দের ফল্গুধার। ভাবীর বোন আর বোনের ননদও এ ব্যাপারে কম যায় না। বন্ধুর বাড়িতে বন্ধুর স্ত্রীর আদর-আপ্যায়ন ও খাবার টেবিলে পরিবেশন না করলে বন্ধুত্বই অর্থহীন। শ্বশুর বাড়িতে শালার বউ আদর-যত্ন না করলে শ্বশুর বাড়িতে আর মধুর হাঁড়ির সন্ধান পাওয়া যায় না। বোনের সহপাঠিনী আর সহপাঠির বোনেরা তো নিত্য সহচরী, গোপন অভিসারের মধু-মল্লিকা। কিন্তু এর পরিণামটা কি হচ্ছে ? নৈতিক পবিত্রতা বিলীন হচ্ছে। বিয়ের আগেই যৌন কার্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হচ্ছে; আর যুবক-যুবতীরা হারাচ্ছে তাদের মহামূল্য কুমারিত্ব।

নর-নারীর অবাধ মেলামেশার এ মারাত্মক পরিণতি অনিবার্য বলেই আল্লাহ্ তা'আলা তা চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন। অন্যথায় এর মূলে নারী-পুরুষের প্রতি কোনো খারাপ ধারণার স্থান নেই। মানব

চরিত্র ও মানুষের স্বভাবই এমন যে, তার জন্যে এরূপ নিয়ম বিধান না থাকলে মানুষের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। শুষ্ক খড় কুটোর স্তূপের কাছাকাছি আগুন নিয়ে খেলা করতে দিয়ে যে কোনো মুহূর্তে সে আগুন লেগে সব জ্বলে ভস্ম হয়ে যেতে পারে, তাতে আর সন্দেহ কি।

ইসলামে যেহেতু মানুষের নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা এবং পারিবারিক স্থায়িত্বই হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান ও সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং যে কোনো মূল্যে তা রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এ জন্যেই ইসলাম এমন কিছুই বরদাশত করতে রাজি নয়, যার ফলে এক্ষেত্রে ভাঙন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্যে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اِيَّا كُمْ وَالْخَلْوَةِ بِالنِّسَاءِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَاخَلَا رَجُلٌ بِاِمْرَاَةٍ اِلَّا دَخَلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا -

তোমরা গায়র-মুহাররম মেয়েলোকদের সাথে গোপনে ও একাকীত্বে মিলিত হবে না। আল্লাহ্‌র শপথ, যেখানেই একজন পুরুষ একজন ভিন্ মেয়েলোকের সাথে গোপনে মিলিত হবে, সেখানেই তাদের দুজনার মধ্যে শয়তান অবশ্যই প্রবেশ করবে ও প্রভাব বিস্তার করবে।

ব্যাপারটিকে আমরা এভাবেও বুঝতে পারি যে, ইলেকট্রিক লাইনের দুটো করে তার থাকে, একটি 'পজিটিভ' আর অপরটি 'নেগেটিভ'। এ দুটোই অপরিহার্য, একটি ছাড়া অপরটি অর্থহীন। কিন্তু এ দুটো থেকে সত্যিকার আলো জ্বলা বা পাখা চলার কাজ পাওয়া যেতে পারে তখন, যখন উভয় তারকে বিশেষ এক ব্যবস্থাধীন পরস্পরের সাথে যুক্ত করা হয়। কিন্তু দুটো পাশাপাশি চলতে গিয়ে চলাবস্থাতে যদি পারস্পরিক ব্যবচ্ছেদ ছিন্ন করে দিয়ে মিলিত হয়ে পড়ে তাহলে তাতে আলো জ্বলবে না, পাখা চলবে না, বরং এমন আগুন জ্বলে উঠবে, তার ফলে গোটা ঘর-সংসার জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

নারী-পুরুষও নেগেটিভ-পজিটিভ দুই বিপরীতমুখী, বিপরীত গুণ-সম্পন্ন শক্তি। এ দুয়ের সমন্বয়ে যদি মানবতার কল্যাণ লাভ করতে হয় তাহলে অবশ্যই এক নির্দিষ্ট নিয়মে উভয়ের মিলন সম্পন্ন করতে হবে। ঘাটে-পথে, হাটে-মাঠে পার্কে-ক্লাবে আর হোটেল-রেস্তোরায় যদি এদের অবাধ মেলামেশাকে সম্ভব করে দেয়া হয়, তাহলে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু অনিবার্য; দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা আর পারিবারিক সুস্থতা ও শান্তি-তৃপ্তি নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই। বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকার সমাজে এ কথাই অকাট্য হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে। বস্তুত যে সমাজে একটি কুমারী মেয়েও সন্ধান করে পাওয়া যায় না সে সমাজ যে মানুষের সমাজ নয়, নিতান্ত পশুর— পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতম জীবনের সমষ্টি, তাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিই বলেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ - (التين : ٤-٥)

মানুষকে অতীব উত্তম মানদন্ডে সৃষ্টি করেছি বটে; কিন্তু অতঃপর তাদের অমানবিক কার্যকলাপের দরুনই তাদের নামিয়ে দিয়েছি চরমতম নিম্ন পংকে।

ঘরের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা সংরক্ষণ

একটি ঘরকেই কেন্দ্র করে সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। স্বামী ও স্ত্রীর ভালোবাসা, পরস্পরের সহানুভূতি, সংবেদন ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে গড়ে ওঠে এক নতুন সংসার। ইসলাম এ ঘর ও সংসারের সম্ভ্রম, মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবিধ ব্যবস্থা পেশ করেছে। এ উদ্দেশ্যে কতগুলো জরুরী নিয়ম বিধান— যা যথাযথভাবে পালন করলে পারিবারিক জীবনে মাধুর্যময় ও নিশ্চয়তা ভিত্তির আস্থা ও বিশ্বাসপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং স্বামী স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি— সকলেই সেখানে নিরবচ্ছিন্ন আশার ও শান্তি-সুখ লাভ করত পারে। প্রত্যেকেই পূর্ণ আযাদী, সম্ভ্রম ও পূর্ণ সংরক্ষণের মধ্যে কালাতিপাত করতে পারে।

ঘরের পরিবেশকে পবিত্রময় করে গড়ে তোলার জন্যে সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটির দিকে লক্ষ্য দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা নবীর বেগমদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا - (الاحزاب : ٣٤)

এবং তোমরা স্মরণ করো— স্মরণে রাখো তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত ও হিকমতের কথা তিলাওয়াত করা হয়, তা। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূক্ষ্মদর্শী, অনুগ্রহসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ে অবহিত।

রাসূলের বেগমদের লক্ষ্য করে বলা এ কথা সাধারণভাবে সব মেয়ের প্রতিই প্রযোজ্য, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব এ নির্দেশ পালিত হওয়া উচিত সব মুসলিম ঘরে ও সংসারে।

'আল্লাহ্র আয়াত ও হিকমত' বলতে বোঝানো হয়েছে কুরআন মজীদ এবং রাসূলের সুন্নাত। কেননা এ দুয়ের মধ্যেই রয়েছে জীবন ও সৌভাগ্য, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শের পূর্ণ শিক্ষা। আর যা তিলাওয়াত করা হয়, মানে— এ দুটো জিনিসের শিক্ষা, প্রচার এবং আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া উচিত প্রত্যেকটি মুসলিমের ঘরে— ঘরের স্ত্রী পুত্র পরিজন সকলের সামনে এবং সে তিলাওয়াত জীবনে একবার কি বছরে বা নামকাওয়াস্তে হলে চলবে না। হর-হামেশা পারিবারিক কার্যসূচীর অপরিহার্য অংশ হিসেবে তা রীতিমতই হওয়া কর্তব্য। বিশেষ করে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ, উপদেশ-নসীহত ও বিধি-বিধান এবং রীতিনীতি তো অবশ্যই আলোচিত হতে হবে। অন্যথায় পারিবারিক জীবন আল্লাহ্র অনাবিল ও অফুরন্ত রহমত লাভ করতে ব্যর্থ হবে।

কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের আদেশ-উপদেশসমূহ এভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করতে নির্দেশ দেয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তদনুযায়ী পারিবারিক জীবন চালিত হয়, পরিবারের প্রত্যেকটি নর-নারী বাস্তবভাবে পালন করে চলে আল্লাহ্ ও রাসূলের দেয়া বিধিব্যবস্থা। আর এ কাজ তখনি সুষ্ঠুভাবে হতে পারে, যখন কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হয় পরিবারের লোকজনকে। আর কেবল শিক্ষা দিয়েই যেন ক্ষান্ত করা না হয়, বরং নিত্যনৈমিত্তিক কার্যসূচী হিসেবে তা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

বস্তুত 'স্মরণ করো' মানেই হচ্ছে আমল করো। আর আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী যে ঘরে ও পরিবারে সঠিকভাবে আমল করা হবে, তা যে বাস্তবিকই পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্ভেজাল প্রেম-ভালোবাসায় পূর্ণ হবে, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না।

প্রত্যেকটি পরিবারেরই এমন এক নির্ভরযোগ্য নিজস্ব পরিমন্ডল প্রয়োজন, যার মধ্যে কেউ অনধিকার প্রবেশ করতে পারবে না। যেখানে পরিবার, পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই নিজস্বতায় পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত, সেখানে যেমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিই পূর্ণ স্বাধীনতা ও মানসম্ভ্রমসহ দিনাতিপাত করতে পারবে, তেমনি পারবে সকলের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও নির্ভরতায় এক অখণ্ড পরিবার সংস্থা গড়ে তুলতে। এজন্যে বাইরের লোকদের যেমন বিনানুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করার অধিকার দেয়া হয়নি, তেমনি একই ঘরের লোকদেরও বিশেষ কয়েকটি সময়ে একে অপরের নিজস্ব কক্ষে বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ - (سور النور : ٥٨)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমাদের ক্রীতদাস-দাসী এবং অপূর্ণ বয়স্ক ছেলেপেলেরা যেন তিনবার তোমাদের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করার জন্যে, ফযরের নামাযের পূর্বে দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা জামা-কাপড় খুলে ফেল এবং এশার নামাযের পর। এই তিনটি সময় হচ্ছে তোমাদের জন্যে অবশ্য গোপনীয়। এ ছাড়া অন্যান্য সময় তোমাদের কাছে বিনানুমতিতে আসা-যাওয়ায় তোমাদের কোনো দোষ হবে না— তাদেরও হবে না। তোমাদের পরস্পরের কাছে তো বারবার আসা-যাওয়া করতেই হয়।

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন ঃ

هذه الايات الكريمة اشتملت على استئذان الاقارب بعضهم على بعض -

(تفسير القران العظيم : ج-٣، ص -٣٠٢)

এ আয়াত কয়টি হচ্ছে কাছাকাছির ও একই বাড়িতে অবস্থানরত আপন লোকদের পরস্পরের কাছে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা সম্পর্কে।

এ আয়াত একথাও প্রমাণ করে যে, ঘরের কাজকর্ম করার জন্যে দাস-দাসী যেমন নিয়োগ করা যেতে পারে তেমনি চাকর-চাকরাণীও নিয়োগ করা যায়। তবে চাকরদের অবশ্য অল্প বয়স্ক— অন্তত অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা বিগত যৌবনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ আয়াতে তিনটি সময়কে প্রত্যেকের জন্যে একান্ত নিজস্ব করে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

প্রথম হচ্ছে ফযরের নামাযের পূর্ব সময়। কেননা এ সময়টিতে মানুষ সাধারণত নিজেদের শয্যায় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। কে কি অবস্থায় ঘুমিয়ে রয়েছে, পূর্ণ শরীর ঢেকে রয়েছে, না উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে আছে তার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। তাছাড়া একাকী এক বিছানায় শুয়ে আছে, না স্বামী-স্ত্রীতে মিলে একান্ত নিবিড় হয়ে রয়েছে, তারও কোনো ঠিক-ঠিকানা থাকবার কথা নয়। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে— এ সময় অপর কোনো লোক— সে যতই কাছের হোক না কেন; এমনকি দাস-দাসী আর অল্প বয়স্ক চাকর চাকরাণীই হোক না কেন— অনুমতি না নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে না। কেননা বিনানুমতিতে প্রবেশ করলে কোনো অবাঞ্ছিত দৃশ্য তাদের চোখে পড়া এবং তা সকলের পক্ষে লজ্জার বা অপমানের কারণ হওয়া বিচিত্র নয়।

দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিপ্রহরে। যখন লোকেরা— মেয়েরা পুরুষরা— কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে নগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে, স্বামীতে স্ত্রীতে মিলে একান্তে শয্যাশায়ী হতে পারে। আর সে অবস্থায় অপর কারো সামনে যেতে বা কারো চোখে পড়তে কেউই রাজি হতে পারে না। আর তৃতীয় হচ্ছে এশার নামাযের পর। কেননা এ সময় লোকেরা সারা দিনের যাবতীয় কাজকর্ম চুকিয়ে দিয়ে শয্যার ক্রোড়ে একান্তভাবে ঢলে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হয়। কে কিভাবে শুতে যায়, একাকী এক শয্যায় শয়ন করে কি স্ত্রীকে কাছে ডেকে নেয়, তা অপর কারো জানা থাকার কথা নয়। কাজেই এ সময়ও প্রত্যেক ব্যক্তির থাকা উচিত পূর্ণ স্বাধীনতা, একান্ত নিশ্চিন্ততা ও সুগভীর নিবিড়তা। বিনানুমতিতে কারো প্রবেশ তাতে অবশ্যই ব্যাঘাত জন্মাবে। এসব কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এ তিনটি সময়কে বলেছেন عورات আর ইমাম রাগিবের ভাষায় তার মানে হচ্ছে ঃ

سَوْاَةُ الْاِنْسَانِ وَذٰلِكَ كِنَايَةٌ وَ اَصْلُهَا مِنَ الْعَارِ وَذٰلِكَ لِمَا يَلْحِقُ فِىْ ظُهُوْرِهِ مِنَ الْعَارِاَىِ الْمُذَ مَّةِ

(مفردات :ص - ٣٥٨)

মানুষের লজ্জা-শরম। এ শব্দটি রূপক। এর আসল অর্থ হচ্ছে শরম লজ্জা। কেননা এ এমন ব্যাপার যা প্রকাশিত হলে লজ্জা ও অপমান দেখা দিতে পারে।

বস্তুত কুরআন নির্দেশিত এ তিনটি সময়ও এমনি, যখন আকস্মিকভাবে অপর কারো নজরে পড়লে লজ্জা বা দুর্নামের কারণ ঘটতে পারে। এ তিনটি সময় ছাড়া অন্যান্য সময় এমন, যখন কারো পক্ষেই অসতর্ক ও অসংবৃত্ত হওয়ার সাধারণত সম্ভাবনা থাকে না, সে কারণে অন্যান্য সময়ে সাধারণত ঘরে লোকদের পরস্পরের কাছে অনুমতি চাইবার দরকার করে না। বিশেষত ঘরের চাকর-বাকরদের পক্ষে যদি সব সময়ই অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে অনেক কাজই সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। কেননা তারা তো طوافون عليكم —তোমাদের চারপাশে ঘোরাফেরা করে, কাজ করবে এজন্যেই নিয়োজিত হয়েছে। আর চাকর-বাকরদের ব্যাপারে অনেক কিছুই এমন হয়, যা বাহ্যত আপত্তিকর হলেও সেখানে আপত্তি করা চলে না। ঠিক এ কারণেই রাসূলে করীম (স) বিড়াল-বিড়ালী সম্পর্কে বলেছেন ঃ

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ الطَّوَّافَاتِ -

বিড়াল-বিড়ালী নাপাক নয়, কেননা ওরা তো তোমাদের চারপাশে সব সময় ঘোরাফেরা করতেই থাকে।

এ আয়াতটি সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে, তা পূর্ণ মর্যাদা সহকারে বহাল এবং তার কার্যকরতা শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, লোকেরা এ আয়াত অনুযায়ী আমল করে খুবই কম। এ আয়াতটি সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ السِّتْرَ - (ابوداؤد)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন সর্বাধিক পরিমাণে গোপনতা বিধানকারী। কাজেই তিনি গোপনতা অবলম্বনকে খুবই ভালোবাসেন, পছন্দ করেন।

ইমাম সুদ্দী বলেছেন ঃ

كان ناس من الصحابة يحبون ان يواقعو انساء هم فى هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوالى الصلوة فامرهم الله ان يامر والمملوكين والغلمان ان لا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات الاباذن -

(تفسير القران العظيم :ج -٣، ص- ٣٠٣)

সাহাবীদের অনেকেই এই এই সময়ে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হওয়া পছন্দ করতেন, যেন তারপর গোসল করে তাঁরা নামাযের জন্যে চলে যেতে পারেন। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের এ নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন তাদের চাকর-গোলামদের এই সময়ে বিনানুমতিতে তাঁদের ঘরে প্রবেশ করতে না দেন।

নির্দিষ্ট তিনটি সময় ছাড়াও একই ঘরের নিকটাত্মীয়দের পরস্পরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করার জন্যে অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন ঃ

عليكم الاذن على امهاتكم -

তোমাদের মা'দের কক্ষে প্রবেশ করার জন্যে পূর্বাহ্নে অনুমতি গ্রহণ তোমাদের কর্তব্য।

তাউস তাবেয়ী বলেন ঃ

مَا مِنْ اِمْرَأَةٍ أَكْرَهُ إِلَيَّ أَنْ أَرَى عَوْرَتَهَا مِنْ ذَاتِ مُحَرَّمٍ -

কোনো মুহাররম মেয়েলোকের লজ্জাস্থান দেখা অপেক্ষা অধিক ঘৃণার ব্যাপার আমার কাছে আর কিছু নেই।

আতা ইবনে আবূ রিবাহ্ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

اِنَّ لِیْ اَخْوَاتٌ اَیْتَا مًا فِیْ حُجْرِیْ مَعِیْ فِیْ بَیْتٍ وَّاحِدٍ اَفَاسْتَاْذِنُ عَلَیْهِنَّ -

আমার কয়েকটি ইয়াতিম বোন রয়েছে, যারা আমার কোলে লালিতা-পালিতা, আমার সাথে একই ঘরে বসবাস করে, তাদের সামনে যেতেও কি আমি পূর্বাহ্নে অনুমতি গ্রহণ করব ?

হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই অনুমতি নেবে। পরে বললেন ঃ

اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً -

তুমি কি তাদের ন্যাংটা ও উলঙ্গ দেখা পছন্দ করো ?

আতা বললেন ঃ না, কখনই নয়। তিনি বললেন ঃ "তা হলে অবশ্যই অনুমতি গ্রহণ করবে।"

নিজ স্ত্রীর ঘরে প্রবেশের পূর্বে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে কিনা— এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আতা বলেন ঃ 'না'। কিন্তু আল্লামা কাসীর লিখেছেন ঃ তার মানে স্ত্রীর ঘরে প্রবেশের পূর্বে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ 'ওয়াজিব' নয়; অন্যথায় ঃ

فَالْاَوْلٰى اَنْ يُّعْلِمَهَا بِدُخُوْلِهٖ وَ لَا يُفَاجِئَهَا بِهٖ لِاحْتِمَالِ اَنْ تَكُوْنَ عَلٰى هَيْئَةٍ لَا تُحِبُّ اَنْ يَّرَ هَا عَلَيْهَا -

ঘরে প্রবেশের পূর্বে স্ত্রীকে জানিয়ে দেয়া ভালো যে, সে তার ঘরে প্রবেশ করছে। তার সামনে হঠাৎ করে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। কেননা সে হয়ত এমন অবস্থায় রয়েছে, যে অবস্থায় স্বামী তাকে দেখতে পাক— তা সে আদৌ পছন্দ করে না।

আপন মা, বোন ও স্ত্রীর ঘরে প্রবেশের পূর্বে যখন অনুমতি গ্রহণ এবং প্রবেশ সম্পর্কে আগাম জানান দেয়া সম্পর্কে এত তাগিদ, তখন ভিন ও গায়র-মুহাররম মেয়েদের— তারা যত নিকটাত্মীয়া হোক না কেন— নিকট বিনানুমতিতে প্রবেশ করাকে ইসলাম কি বরদাশ্‌ত করতে পারে ?

এ অনুমতি নিয়ে কারো ঘরে প্রবেশ করা সম্পর্কিত নির্দেশের ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে আল্লামা যামাখ্‌শারী লিখেছেন ঃ

وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْاِسْتِيْذَ اَنْ لَمْ يَشْرَعْ لِئَلَّا يَطَّلِعَ الدَّارَ عَلٰى عَوْرَةٍ وَ لَا تَسْبِقُ عَيْنُهٗ اِلٰى مَا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ اِلَيْهِ فَقَطْ وَاِنَّمَا شُرِعَ لِئَلَّا يُوْقِفَ عَلَى الْاَحْوَالِ الَّتِيْ يُطْوِيْهَا النَّاسُ فِي الْعَادَةِ عَنْ غَيْرِهِمْ وَيَتَحَفَّظُوْنَ مِنْ اِطِّلَاعِ اَحَدٍ عَلَيْهَا وَلِاَنَّهٗ تَصَرُّفٌ فِيْ مِلْكِ غَيْرِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ بِرَضَا وَ اِلَّا اَشْبَهُ الْمُعَنَّفُ وَالتَّغَلُّبُ - (الكشاف)

এর কারণ এই যে, অনুমতি লওয়া কেবল এ জন্যেই বিধিবদ্ধ করা হয়নি যে, কোনো সহসা অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তি কোনো গোপনীয় জিনিস দেখে ফেলতে পারে এবং হালাল নয় এমন জিনিসের ওপর তার নজর পড়ে যেতে পারে। বরং এ জন্যেই তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যেন বাইরে থেকে আসা কোনো ব্যক্তি ঘরের এমন সব অবস্থাও জানতে না পারে, যা মানুষ সাধারণত অপরের কাছ থেকে গোপনই রাখতে চায় এবং অপর লোক যাতে তা জানতে না পারে, তার জন্যে চেষ্টা করে। এরূপ অবস্থায় বিনানুমতিতে প্রবেশ করলে অপর লোকের নিজস্ব কর্তৃত্বের এলাকার ওপর অনধিকার চর্চা হয়। অতএব কারো ঘরে প্রবেশ তার অনুমতি ছাড়া হওয়া উচিত নয়।

অন্যথায় তার মনে ক্রোধ প্রবল হয়ে ওঠার ও অন্যের প্রাধান্য অস্বীকার করার প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠবার আশংকা রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়

পর্দার দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে ঘরের বাইরে বেরুলে বয়স্ক নারী পুরুষকে যে পর্দা ব্যবস্থা পালন করে চলতে হবে, তা-ই। এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনার প্রথম ভিত্তি হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে উদ্ধৃত আয়াতের দ্বিতীয় অংশ। পূর্ব আয়াতটি আবার পাঠ করতে হচ্ছে। বলা হয়েছে ঃ

وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى - (الاحزاب : ٣٣)

এবং তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে মজবুত হয়ে স্থিতি গ্রহণ করো— স্থায়ীভাবে বসবাস করো এবং তোমরা প্রথম কালের জাহিলিয়াতের নারীদের মতো নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িও না।

আয়াতের প্রথম অংশে মেয়েলোকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের ঘরেই স্থায়ীভাবে দৃঢ়তা সহকারে বসবাস করে। আর দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে, ঘরের বাইরে গিয়ে জাহিলী যুগের নারীদের মতো লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ভিন পুরুষদের সামনে হেসে গলে ঢলে পড়ো না, নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহের কান্তি দেখিয়ে বেড়িও না, আয়াতের প্রথমাংশ ঘর সম্পর্কে আর দ্বিতীয়াংশ ঘরের বাইরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আয়াতে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়নি, নিষেধ করা হয়েছে জাহিলী যুগের নারীদের মতো নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করতে।

এ আয়াতে মুসলিম নারীদের যে ঘর থেকে বের হতে চূড়ান্তভাবে নিষেধ করা হয়নি, তার প্রথম প্রমাণ এই যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরও মুসলিম মহিলারা ঘরের বাইরে গিয়েছেন। মসজিদে নামায পড়তে, হজ্জ করার জন্যে, বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করতে, পিতামাতা-নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা করতে এবং আরো অনেক অনেক কাজে। এ আয়াতে যদি ঘরের বাইরে যেতে নিষেধই করা হতো তাহলে নিশ্চয়ই রাসূলে করীম (স) এসব কিছুতেই বরদাশ্‌ত করতেন না। কিন্তু রাসূলের জীবদ্দশায়, সাহাবীদের যুগে এ কাজ যখন অবাধে সম্পন্ন হয়েছে, তখন সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতে মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে যেতে সম্পূর্ণরূপে ও অকাট্যভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়নি। নিষেধ করা হয়েছে অন্য কিছু, যা শরীয়তে প্রকৃতই নিষিদ্ধ।

বরং দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (স) মুসলিম মহিলাদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

أُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ - (الحديث الصحيح كما قال الوسى فى تفسيره)

(فى البخارى بغير الفظ لكم)

তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের দরুন ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অপর এক হাদীসে কথাটি আরো অকাট্য ঃ

ليس للنساء نصيب فى الخروج الامضطرة ليس لها خادم - (طبرانى)

মেয়েরা ঘর থেকে বাইরে বের হবার কোনো অধিকারই রাখে না, তবে যদি কেউ খুব বেশি নিরুপায় হয়ে যায় বরং তার চাকরও না থাকে তবে সে প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে বের হতে পারবে।

আল্লামা আলূসী এ পর্যায়ে লিখেছেন ঃ

ان الامر بالا ستقرار فى البيوت والنهى عنى الخروج ليس مطلقا والا لما اخرجهن صلى الله عليه وسلم بعد نزول الاية للحج والعمرة ولما ذهب بهن فى الغزوات ولما حرحضهن الزيارة الوالدين وعيادة المريض وتعزية الاقارب - (روح المعانى : ج -٢٢٠ ،ص- ٩)

ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ ও বাইরে যাওয়ার নিষেধ অকাট্য ও শর্তহীন নয়। তা যদি হতো তাহলে নবী করীম (স) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মহিলাদের নিশ্চয়ই হজ্জ, উমরা ইত্যাদির জন্যে কখনো ঘরের বাইরে যেতে দিতেন না, যুদ্ধে জিহাদে তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন না এবং বাপ-মার সাথে সাক্ষাতের জন্যে, রোগীকে দেখার জন্যে এবং নিকটাত্মীয়দের শোকে শরীক হওয়ার জন্যে কখনো বাইরে যেতে তাদের অনুমতি দিতেন না।

তাহলে এ আয়াতের সঠিক অর্থ কি হবে ? আল্লামা আলূসীর ভাষায় বলা যায় ঃ

المراد بالامر بالاستقرا رالذى يحصل به وقارهن وامتيازهن على سائر النساء بان يلا زمن البيوت فى اغلب اوقاتهن ولايكن خراجات ولاجات طوافات فى الطرق والاسواق وبيت الناس - (ايضا)

মেয়েদেরকে ঘরে অবস্থান করতে নির্দেশ করা হয়েছে, কেননা এরই দ্বারা তাদের মর্যাদা ও বিশিষ্টতা সাধারণত মেয়েদের ওপর প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এর সঠিক অর্থ এই যে, তারা বেশির ভাগ সময় ও সাধারণত নিজেদের ঘরেই অবস্থান করবে এবং তারা খুব বেশি বাইরে গমনকারিণী, খুব বেশি লোকজনের ভীড়ে প্রবেশকারিণী এবং ঘাটে-পথে, হাটে-বাজারে, দোকানে-বিপনীতে ও লোকদের ঘরে ঘরে যাতায়াতকারিণী হবে না।

সানাউল্লাহ্ পানিপত্তী লিখেছেন ঃ

ليس فى الاية نهى عن الخروج من البيت مطلقا وان كانت للصلوة اولحج اولحاجة الانسان -

(المظهرى : ج-٧، ص-٣٦٩)

আয়াতে ঘর থেকে বের হতে একেবারে নিষেধ করে দেয়া হয়নি— যদিও নামায, হজ্জ কিংবা অপর কোনো মানবীয় জরুরী কাজে হোক না কেন।

আয়াতে বলা হয়েছে 'তাবাররুজ' করো না। এ 'তাবাররুজ' শব্দ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আল্লামা জামালুদ্দীন আল-কাসেমী লিখেছেন ঃ

التبرج التبختر والتكسر فى المشىء وباظهار الزينة وما يسدعى به شهوة الرجل ويلبس رقيق الثياب التى لا توارى جسد ها ويابدا محاسن الجيد والقلائد والقرط وكل ذلك مما يشلمه النهى لما فيه من المفسدة والتعرض الكبيرة - (محاسن التاويل :ج -١٣، ص -٤٨٤٩)

'তাবাররুজ' মানে— হাস্যলাস্য ও লীলায়িত ভঙ্গীতে চলা, রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করা, ভিন্ পুরুষের মনে যৌন স্পৃহা জাগিয়ে তোলা, খুব পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরা— যা মেয়েদের শরীর আবৃত করে না, গলদেশ, কণ্ঠহার ও কানের দুল-বালার চাকচিক্য জাহির করা এবং এ ধরনেরই অন্যান্য কাজ। আয়াতে এসবকেই নিষেধ করা হয়েছে, কেননা এরই ফলে আসে নৈতিক বিপর্যয় আর মহাগুনাহের দিকে পদক্ষেপ।

মুব্‌রাদ বলেন ঃ

اِنْ تُبْدِىَ مِنْ مَحَاسِنِهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُهٗ -

মেয়েলোকের যে রূপ-সৌন্দর্য ঢেকে রাখা কর্তব্য, তাকে জাহির করাই হচ্ছে 'তাবাররুজ'।

লাইস বলেছেন ঃ

يُقَالُ تَبَرَّجَتِ الْمَرْاَةُ اِذَا اَبْدَتْ مَحَاسِنَهَا مِنْ وَجْهِهَا وَجَسَدِ هَا وَيُرِىَ مَعَ ذٰلِكَ مِنْ عَيْنِهَا حُسْنَ نَظْرٍ -

কোনো মেয়েলোক যখন তার মুখ ও দেহের সৌন্দর্য প্রকাশ করে আর সেই সঙ্গে তার ডাগর চোখের সৌন্দর্যভরা দৃষ্টিও পড়ে, তখন বলা হয় মেয়েলোকটি 'তাবাররুজ' করেছে।

আবূ উবায়দা বলেছেন ঃ

اَنْ تُخْرِجَ مِنْ مَحَاسِنِهَا مَا تَسْتَدْعِىْ بِهٖ شَهْوَةً لِلرِّجَالِ -

মেয়েরা যখন তাদের দেহের এমন সৌন্দর্য লোকদের সামনে প্রকাশ করে, যা পুরুষদের যৌন স্পৃহা উত্তেজিত করে তুলে, তখন তারা 'তাবাররুজ' করে।

মুব্‌রাদ আরো বলেছেন ঃ

كانت المراة تجتمع بين زوجها وخدنها للزوج نصفها الاسفل وللخدن نصفها الاعلى يتمتع به فى التقليبل والترشف - (روح المعانى :ج -٢٢، ص - ٨)

জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা স্বামী ও প্রণয়ী যুগপতভাবে গ্রহণ করত। স্বামীর জন্যে তার দেহের নিম্নার্ধ নির্দিষ্ট রাখত, আর উর্ধ্বাংশ ছেড়ে দিত পুরুষ বন্ধু ও প্রণয়ীর ব্যবহারে। তারা স্পর্শ, চুম্বন ও লেহন দিয়ে তাকে ভোগ করত।

আল্লামা শাওকানীও এ কথাই লিখেছেন ঃ

وكان نساء الجاهليه تظهر ما يقبح الظهاره حتى كانت المراة تجلس مع زوجها وخليلها فينفرد خليلها بما فوق الازار الى على وينفرد زوجها بمادون الازار الى اسفلها وربما سال احدهما صاحبه البدل - (فتح القدير : ج -٤، ص -٢٦٩)

জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা তাদের দেহের অশ্লীল অঙ্গসমূহ উন্মুক্ত ও অনাবৃত করে চলত। এমনকি এক-একজন মেয়েলোক তার স্বামী ও প্রণয়ীকে নিয়ে একসঙ্গে বসত। প্রণয়ী তার বস্ত্রের উপরিভাগ নিয়ে সুখ ভোগ করত আর স্বামী পরিতৃপ্ত হত তার দেহের বস্ত্রাবৃত নিম্নভাগ ব্যবহার করে। আবার কখনো সখনো একজন অপর জনের কাছ থেকে তার জন্যে নির্দিষ্ট অংশ অদল-বদল করে নিতেও চাইত।

এ সব উদ্ধৃতি থেকে জাহিলিয়াতের নারী চরিত্র ও তদানীন্তন সমাজের বাস্তব ও প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটিত ও উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা ঘর থেকে বেরুতে পারে, আয়াতে তা নিষেধ করা হয়নি; নিষেধ করা হয়েছে বাইরে গিয়ে এসব কাজ করতে, যা উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে প্রতিভাত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ-ই হচ্ছে জাহিলিয়াত— জাহিলিয়াতের 'তাবাররুজ'— যার সাথে এ যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতিসম্পন্ন নারী সমাজের পূর্ণ মিল ও সাদৃশ্য স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে হাটে-বাজারে, দোকানে-বিপণীতে, পথে-পার্কে, হোটেল-রেস্তোরাঁয় ও ক্লাবে-মিটিং-এ। আর কুরআন মজীদে উপরোক্ত আয়াতাংশে এ সব কাজকেই নিষেধ করা হয়েছে, চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

ঘরের বাইরে পর্দা

উপরে আমরা এ কথা প্রমাণিত করেছি যে, মেয়েদের যে একান্তভাবে ঘরের অভ্যন্তরেই বসে থাকতে হবে দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা, সারা মাস বছর, সমগ্র জীবন, আর ঘর থেকে তারা আদৌ বাইরে বেরুতেই পারবে না, নিতান্ত প্রয়োজনেও নয়, এমন কথা কুরআন মজীদে বলা হয়নি, রাসূলে করীম (স) বলেন নি। সাহাবী, তাবেয়ীন ও পরবর্তীকালের মুজতাহিদীন— কেউই সে মত প্রকাশ করেননি। তাঁরা সকলেই কুরআন থেকে এ কথাই বুঝেছেন যে, মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে যেতে নিষেধ নেই। তবে নিষেধ হচ্ছে বাইরে গিয়ে তাদের পর্দা নষ্ট করা, রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষদের মনে নিদ্রাতুর যৌন পশুকে প্রচণ্ড হুংকারে ক্ষিপ্ত করে দেয়া। এ না করলে তাদের বাইরে যেতে— প্রয়োজন মতো ঘর থেকে বের হতে, এমনকি দোকানে-বাজারে যেতে, রাস্তাঘাটে চলতে কোনোই দোষ নেই। তবে শর্ত এই যে, তা অবশ্যই বিনা কারণে আর বিনা প্রয়োজনে হবেনা; শুধু ঘুরেফিরে হাওয়া খেয়ে গাল-গল্প করে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে হবে না।

প্রয়োজনে আর জরুরী কাজে ঘর থেকে বেরুতে হলে মেয়েদের সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ পূর্ণ মাত্রায় আবৃত করা। কুরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াতে ঘরের বাইরে মেয়েদের অবশ্য পালনীয় হিসেবে বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ أَدْنٰٓى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (الاحزاب : ٥٩)

হে নবী, তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুসলিম মেয়েলোকদের বলো, তারা যেন সকলেই ঘরের বাইরে বের হওয়াকালে তাদের মাথার ওপর তাদের চাদর ঝুলিয়ে দেয়। এভাবে বের হলে তাদের চিনে নেয়া খুব সহজ হবে। ফলে তাদের কেউ জ্বালাতন করবে না। আল্লাহ্ প্রকৃতই বড় ক্ষমাশীল, দয়াবান।

আয়াতে উদ্ধৃত শব্দ جلابيب বহু বচন। এক বচনে جلباب 'জিলবাব' বলা হয় ঃ

اَلثَّوْبُ الَّذِىْ يُسْتَرُ بِهِ الْبَدَنُ -

যে কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা হয়।

আল্লামা রাগিব ইসফাহানী লিখেছেন ঃ

الجلابيب القمص والخمر - (مفردات ص : ٩٢)

জিলবাব হচ্ছে কোর্তা ও ওড়না— যা দিয়ে শরীর ও মাথা আবৃত করা হয়।

ইবনে মাসঊদ, উবাদাহ, কাতাদাহ্, হাসান বসরী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইবরাহীম নখ্য়ী, আতা প্রমুখ বলেছেন ঃ

اَلْجِلْبَابُ هُوَ الرِّدَآءُ فَوْقَ الْخِمَارِ -

ওড়নার উপরে যে চাদর পরা হয়, তাই 'জিলবাব'।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ

جلبا بن هوالذى يستر من فوق الى اسفل -

যে কাপড় উপর থেকে নিচের দিকে পরে সমস্ত শরীর আবৃত করা হয়, তাই জিলবাব।

ইবনে যুবাইর বলেছেন ঃ المقنعة. 'বোরকা', কেউ বলেছেন ঃ الملحفة চাদর, যা সমস্ত দেহ পেচিয়ে পরা হয়।

আল্লামা যামাখশারী লিখেছেন ঃ

اَلْجَلْبَابُ ثَوْبٌ وَاسِعٌ - اَوْسَعُ مِنَ الْخِمَارِ وَ دُوْنَ الرِّدَاءِ تَلْوِيْهِ الْمَرْاَةُ عَلٰى رَاْسِهَا وَيَبْقِىْ مَا تُرْسِلُهُ عَلٰى صَدْرِهَا -

'জিলবাব' হচ্ছে একটি প্রশস্ত কাপড়— তা ওড়না-দোপাট্টা থেকেও প্রশস্ত অথচ চাদরের তুলনায় ছোট। মেয়েরা তা মাথার উপর দিয়ে পরে, আর তা ঝুলিয়ে দেয়, তার দ্বারা বক্ষদেশ আবৃত রাখে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

اَلرِّدَاءُ الَّذِىْ يُسْتَرُ مِنْ فَوْقٍ اِلٰى اَسْفَلَ - (محاسن التاويل : ج -١٣، ص -٤٤٠٨)

জিলবাব হচ্ছে এমন চাদর, যা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঢেকে দেয়।

মুফাস্‌সিরদের মতে ঃ

كل ثوب تلبسه المراة فوق ثيابها - (روح المعانى :ج -٢٢، ص -٨٨)

মেয়েরা পরিধেয় কাপড়ের উপরে যা পরে তাই জিলবাব। এক কথায় এ কালের 'বোরকা'।

হযরত ইবনে আব্বাস এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اَمَرَ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ فِىْ حَاجَةٍ اَنْ يُّغَطِّيْنَ وَجُوْهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِنَّ بِالْجَلَابِيْبِ وَ يُبْدِيْنَ عَيْنًا وَاحِدَةً - (تفسير القران العظيم لابن كثير : ج -٣، ص -٥١٨)

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন মেয়েলোকদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যখন তাদের ঘর থেকে বের হবে, তখন তাদের মাথার উপর দিয়ে চাদর দ্বারা মুখমণ্ডলকে ঢেকে নেবে এবং একটি মাত্র চোখ খোলা রাখবে— এ অত্যন্ত জরুরী।

অপর এক বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন ঃ

تغطى الحرة اذ خرجت جبينها و رأسها - (احكام القران : ج- ٣ ،ص -٤٥٨)

স্বাধীনা— ক্রীতদাসী নয়— এমন মেয়েলোক যখন ঘর থেকে বাইরে যাবে, তখন তাদের মুখমণ্ডল ও মাথা আবৃত করে নেবে।

আল্লামা আবূ বকর আল-জাস্‌সাস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

فى هذه الاية دلالة على ان المراة الشابة ما مورة يستر وجهها عن الاجنبيين (ايضا)

এ আয়াত বলে দিচ্ছে যে, যুবতী মেয়েদেরকে ভিন্ন পুরুষ থেকে নিজেদের মুখমণ্ডলকে ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস ও আবূ উবায়দা বলেছেন ঃ

امرنساء المؤمنين ان يغطين رؤسهن ووجوههن بالجلابين الاعينا واحد ليعلم انهن الحرائر - (محاسن التاويل :ج -١٣، ص -٤٩٠٩) (المظهرى :ج -٧، ص- ٤١٩)

মু'মিন মেয়েদের আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন তাদের মুখমণ্ডল ও মাথা পূর্ণ মাত্রায় ঢেকে রাখে, তবে একটি মাত্র চোখ খোলা রাখতে পারে। এ থেকে জানা যাবে যে, তারা স্বাধীন মহিলা— ক্রীতদাসী নয়।

ইবনুল আরাবী লিখেছেন ঃ

تغطى به وجهها حتى لايظهر منها الاعيها اليسرى - (احكام القران :ج -٣، ص -٥٧٤)

মেয়েরা তাদের মুখমণ্ডলকে এমনভাবে ঢাকবে যে, বাম চক্ষু ছাড়া তাদের শরীরের অপর কোনো অংশ দেখা যাবে না।

অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ - (النور : ٣١)

এবং মেয়েরা তাদের অলংকার ভিন পুরুষের সামনে প্রকাশ করবে না, তবে যা আপনা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা প্রকাশ হতে দিতে নিষেধ নেই এবং তাদের বক্ষদেশের উপর ওড়না-দোপাট্টা ফেলে রাখবে।

এ আয়াতের তরজমা ইমাম ইবনে কাসীর লিখেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

اى لايظهرن شيئا من الزينة للاجانب الامالا يمكن اخفاؤه - (تفسير القران العظيم : ج -٣، ص -٢٨٣)

অর্থাৎ মেয়েরা তাদের অলংকারাদি ভিন পুরুষদের সামনে প্রকাশ করবে না, তবে যা লুকানো সম্ভব হবে না তার কথা ভিন্ন।

জীনাত কি, কাকে বলে ? ইমাম কুরতবী ও আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেছেন ঃ

জীনাত দুরকমের। একটি হচ্ছে সৃষ্টিগত আর অপরটি উপার্জনগত। সৃষ্টিগত সৌন্দর্য বলতে বোঝায় মুখমণ্ডল, চেহারা (Apearance)। কেননা তাই হচ্ছে সমস্ত রূপ ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মূল উৎস কেন্দ্র। নারী জীবনের মাহাত্ম, মাধুর্য এখানেই নিহিত। আর দ্বিতীয় হচ্ছে উপার্জিত সৌন্দর্য।

فهى ماتحاوله المرأة فى تحسين خلقتها بالصنع كالثياب والحلى والكحل والخضاب -
(احكام القران : ج -٣، ص - ١٣٥٦)

যা মেয়েরা তাদের সৃষ্টিগত রূপ-সৌন্দর্যকে অধিকতর সুন্দর করে তোলবার জন্যে কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করে, যেমন কাপড়, অলংকারাদি, সুরমা মাখা চোখ, রং, খেজাব, মেহেন্দি।

এ দু'রকমের জিনাতকেই বাইরের লোক— ভিন্ পুরুষদের সামনে প্রকাশ করতে আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

الاماظهرمنها 'তবে যা' আপনা থেকে প্রকাশিত হয়। ইমাম ইবনে কাসীরের তরজমা অনুযায়ী 'যা লুকানো সম্ভব হয় না'— যা জাহির হতে না দিয়ে পারা যায় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কি ?

ইবনুল আরাবী বলেন ঃ প্রথমে যা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পরে যা প্রকাশ হতে না দিয়ে পারা যায় না বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এ দুটো এক জিনিস নয়। দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস হতে হবে, তাহলে পরবর্তী জীনাত কি, যা জাহির না করে পারা যায় না, যা গোপন রাখা সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে।

এক— তা হচ্ছে কাপড়। কেননা মেয়েরা বোরকা পরেও বাইরে বের হলে অন্তত তার বোরকার বাইরের দিকটি লোকদের সামনে প্রমাশমান হবেই; তা তো আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

দুই— সুরমা ও অঙ্গুরীয়। এ হচ্ছে ইবনে আনাসের মত।

তিন— মুখমন্ডল ও দুই হস্ত।

ইবনুল আরাবী বলেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মত আসলে একই। কেননা সুরমা মুখেরদিকে ব্যবহার করা হয়, আর অঙ্গুরীয় ব্যবহার করা হয় হাতের দিকে— আঙ্গুলে।

যাঁদের মতে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় প্রকাশ নিষেধের আওতার মধ্যে গণ্য নয়, বরং এ দুটো ভিন্ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা যায় বলে মনে করেন, তাঁরাও সুরমা মাখা চোখ মুখ আর অঙ্গুরীয় পরা হাত ভিন্ পুরুষের সামনে জাহির করা জায়েয মনে করেন না। যে মুখে ও হাতে তা না থাকবে, তাই শুধু বের করা চলবে। যদি সুরমা ও অঙ্গুরীয় ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই ভিন্ পুরুষের দৃষ্টি থেকে লুকোতে হবে। তখন তা প্রথম পর্যায়ের অলংকারের মধ্যে গণ্য হবে, তা লুকানো ওয়াজিব।

আর ভেতর দিকের জীনাত হচ্ছে কানবালা, কণ্ঠহার, বাজুবন্দ আর পায়ের মল ইত্যাদি। ইমাম মালিকের মতে মুখ চুলের রং বাইরের দিকে 'জীনাত' নয়, হাতের চুড়ি-বালা ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ

هى من الزينة الظاهرة لانها فى اليدين -

তা বাহ্যিক জীনাতের মধ্যে গণ্য, কেননা তা দুই হাতে পড়া হয়।

আর মুজাহিদ বলেছেন ঃ

هى من الزينة الباطنة لانها خارجة عن الكفين - (احكام القران لابن العر بى :ج -٣، ص -١٣٥٧)

তা লুকিয়ে রাখার মতো ভেতর দিকের জীনাত। কেননা, তা কব্জাদ্বয়ের বাইরের জীনাত।

আর রং যদি পায়ে লাগানো হয়, তবে তা অবশ্যই গোপনীয় জীনাতের মধ্যে গণ্য হবে। অতএব রং— আলতা পরা পা ভিন্ পুরুষকে দেখানো যাবে না।

মনে রাখা আবশ্যক যে, এখানে এসব জীনাত ভিন্ পুরুষের সামনে প্রকাশ করতে নিষেধ করার মানে কেবল জীনাত না দেখানোই নয়, বরং এ সব জীনাত যেসব অঙ্গে— দেহের যে সব জায়গায়— পরা হয়, তাও ভিন পুরুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লামা কাসেমী লিখেছেন ঃ

ذَكَرَ الزِّيْنَةَ دُوْنَ مَوَاقِعِهَا لِلْمُبَالِغَةِ فِى الْاَمْرِ بِالْحُصُوْنِ وَالتَّسَتُّرِ لَاِنَّ هٰذِهِ الزِّيْنَ وَاقِعَةٌ عَلٰى مَوَاضِعَ مِنَ الْجَهْدِ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ اِلَيْهَا لِغَيْرِ هٰؤُلَاءِ - (محاسن التاويل : ج -١٢، ص -٤٥١٠)

আয়াতে কেবল জীনাতের (অলংকার) উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন অঙ্গে তা পরা হয় তার উল্লেখ করা হয়নি, গোপনীয়তা ও সংরক্ষণের অধিক প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার জন্যে মাত্র। কেননা এ অলংকারগুলো দেহের এমন সব অঙ্গে পরা হয়, যার দিকে কেবল মুহাররম পুরুষ ছাড়া আর কারো তাকানো হালাল নয়।

তার মানে এই যে, এসব অলংকারের দিকেই যখন ভিন পুরুষের নজর পড়া— নজর পড়তে দেয়া নিষেধ, তখন তা যেসব অঙ্গে পরা হয়েছে, তার দিকে তাকানো বা তাকানোর সুযোগ দেয়া আরো বেশি নিষিদ্ধ হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তী লিখেছেন ঃ

لا يجو زللمرأة الحرة ابداء وجهها الرجل ذى ارية غيرالزوج والمحوم فان عامة محاسنها فى وجهها فخوف الفتنة فى النظرا لى وجهها اكثر منه فى النظرا لى سائرا عضائها - (المظهرى :ج- ٦، ص-٤٩٥)

কোন স্বাধীনা— ক্রতদাসী নয়— এমন মহিলার পক্ষে নিজ স্বামী ও মুহাররম পুরুষ ছাড়া অন্য কারো সামনে তার মুখমণ্ডল প্রকাশ করা আদৌ জায়েয নয়। কেননা নারীর সাধারণ ও আসল সৌন্দর্যই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তার মুখমণ্ডলে। এ কারণে একজন নারীর সমগ্র দেহ অপেক্ষা তার মুখমণ্ডল দেখায় নৈতিক বিপদ ঘটার সর্বাধিক আশংকা বিদ্যমান।

নবী করীম (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। বলেছেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا اَخْرَجَتْ اِسْتَشْرَ فَهَا الشَّيْطَانُ - (ترمذى)

নারীর আপাদমস্তক— পূর্ণাবয়বই হচ্ছে গোপন করার জিনিস। এ কারণে সে যখন ঘরের বাইরে যায়, তখন শয়তান তার সঙ্গী হয়ে পিছু লয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে পানিপত্তী লিখেছেন ঃ

هذا الحديث يدل على انها كلها ععورة غيران الضرورات مستثناء اجماعا - (ايضا)

এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, নারীর সমগ্র শরীরই হচ্ছে গোপন রাখার বস্তু। তবে নিতান্ত প্রয়োজনের সময় তা প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে সকল ইসলামবিদ সম্পূর্ণ একমত।

সে প্রয়োজন কি হতে পারে, যখন নারীর কোনো না কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়া অপরিহার্য হয়। এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন কোনো যুবতী নারীর এমন কোনো পুরুষ নেই, যে তার হাট-বাজারের প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারে, জরুরী জিনিস ঘরে এনে দিতে পারে। তখন সে বোরকা পরে শুধু পথ দেখার কাজ চলে চোখের জায়গায় এমন ফাঁক রেখে ঘরের বাইরে যাবে এবং প্রয়োজনীয় জায়গায় গিয়ে দরকারী জিনিসপত্র খরিদ করে ঘরে ফিরে আসবে। যদি তার বোরকা না থাকে, না থাকে তা যোগার করার সামর্থ্য, তাহলে সে যে কোনো একখানা কাপড় দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পূর্ণাবয়ব আবৃত করে নিয়ে বের হবে।

এছাড়া দুটো ক্ষেত্র আছে, যখন ভিন্ পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল কিংবা দেহের কোনো না কোনো অঙ্গ প্রকাশ করতে হয়, যেমন ডাক্তার-চিকিৎসকের সামনে অথবা আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো বিষয়ে জবানবন্দী বা সাক্ষ্য দেয়ার সময়ে। তখন মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করা সর্ববাদী সম্মতভাবে জায়েয।

তাহলে আল্লাহ্র বাণী— 'তবে যা আপনা থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে' কথাটির দুটো অর্থ দাঁড়াল। একটি এই যে, নারীর দেহের পূর্ণাবয়ব পর্দা, অতএব তা ভালো করে আবৃত করেই ঘরের বাইরে বের হবে। তখন সে বোরকা বা যে চাদর— কাপড় দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা হলো, তার বাইরের দিক ভিন পুরুষ দেখলে কোনো দোষ হবে না। কেননা তা লুকানো তো আর সম্ভব নয়। এখন তা দেখেও যদি কোনো পুরুষ কাবু হয়ে পড়ে, তবে তাকে 'পুরুষ' মনে করাই বাতুলতা। অন্তত তাতে নারীর কোনো ক্ষতি নেই, তার কোনো গুনাহ্ হবে না।

আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, দেহের যে অঙ্গ প্রকাশ না করে পারা যায় না, যা লুকিয়ে রাখার উপায় নেই— বিশেষ প্রয়োজনের দৃষ্টিতে, যেমন ডাক্তারের কাছে দেহের বিশেষ কোনো রোগাক্রান্ত অঙ্গ প্রকাশ করা, ইনজেকশন দেয়া, অপারেশন করা কিংবা রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তা দেখানো কোনো দোষ নেই, সে নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণের সীমা পর্যন্ত— তার বাইরে নয়। অথবা যেমন সাক্ষ্য দেয়া বা জবানবন্দী শোনানোর জন্যে বিচারকের কাছে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ দুটো কথাই আল্লাহ্র বাণী الاماظهرمنها 'তবে যা জাহির হয়ে পড়া'র মধ্যে শামিল এবং তা প্রকাশ করা সম্পূর্ণ জায়েয। আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

ان المرأة لاتبدى شيئا من الزينة وتخفى كل شئى من زينتها و وقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة - (فتح القدير : ج -٤، ص -٢١)

মেয়েলোক কোনো সৌন্দর্যই প্রকাশ করবে না। তার সৌন্দর্যের সব জিনিসই আবৃত করে রাখবে। প্রয়োজনের কারণে যা প্রকাশ না করে পারা যায় না, তা-ই বাদ পড়বে।

বলা বাহুল্য, এসব আলোচনাই স্বাধীনা রমনী সম্পর্কে, ক্রীতদাসীদের সম্পর্কে নয় এবং নয় বৃদ্ধা, বিগতা যৌবনা নারীদের সম্পর্কে। কুরআন মজীদেই বলা হয়েছে ঃ

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ ط وَ اَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - (النور : ٦٠)

যেসব মেয়েলোক ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসব থেকে চূড়ান্ত অবসর গ্রহণ করেছে, যারা বিয়ের বা স্বামী সহবাসের কোনো আশা পোষণ করে না, তাদের দেহাবরণ পরিত্যাগ করলে তাতে কোনো গুনাহ্ হবে না। তবে সে অবস্থায়ও তাদের সৌন্দর্য আর অলংকার প্রদর্শন করে বেড়ানো চলবে না। আর তারা যদি তা থেকেও পবিত্রতা অবলম্বন করে ও তা পরিহার না করে, তবে তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর, মঙ্গলজনক। আর আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

আল্লামা আলূসীর মতে এরা হচ্ছে العجائز বৃদ্ধা। আর বৃদ্ধাদের অধিক উপবেশনকারী বলা হয়েছে এ কারণে যে ঃ

لانهن يكثرن القعود لكبر سنهن -

কেননা তারা বার্ধক্যের কারণে বেশি সময় বসেই কাটায়।

রবী'আ বলেছেন ঃ

العجائز اللاتى اذا راهن الرجال استقذر وهن فاما من كانت فيها بقية جمال وهى محل للشهوة فلا تدخل فى هذه الاية - (المظهرى :ج -٦، ص- ٥٥٩)

যে সব বৃদ্ধা, যাদের দেখলে পুরুষেরা ঘৃণা বোধ করে, তাদের জন্যে এ হুকুম। যাদের রূপ-সৌন্দর্য অধিক বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের জন্যে এ আয়াত প্রযোজ্য।

আল্লামা পানিপত্তী লিখেছেন ঃ

يفيد تقييد عدم الجناح فى وضع ثياب العجائز ان يكون ذلك من غير ارادة اظهار الزينة للرجال فمن كانت منهن ارادت بها التبرج فذلك عليها حرام - (ايضا)

বৃদ্ধাদের বাইরের আচ্ছাদন পরিহার করার ব্যাপারে পুরুষদের সৌন্দর্য দেখাবার ইচ্ছা না হওয়াকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা থেকে বোঝা গেল যে, যে বৃদ্ধা সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করে, তার পক্ষে বাইরের আচ্ছাদন পরিহার করা হারাম।

পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার উপলক্ষ হিসেবে মুজাহিদ সূত্রে নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ একবার নবী করীম (স) খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে শরীক ছিল কিছু সংখ্যক সাহাবী। হযরত আয়েশা (রা)-ও তাঁদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তির হাত হযরত আয়েশার হাতে লেগে যায় এবং নবী করীম (স)-এর কাছে ব্যাপারটি খুবই খারাপ বিবেচিত হয়। এর পরই পর্দার আয়াত নাযিল হয়। (عمدة القارى : ج-٢، ص :٢٨٤ بحواله تفسير ابن جرير طبرى)

পর্দার এ নির্দেশ মেয়েলোক ও পুরুষ লোকের মাঝখানে এক স্থায়ী অন্তরাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এ অন্তরাল ভাঙ্গতে পারা যায় প্রথমে মুহাররম সম্পর্কের দরুন আর দ্বিতীয় বিয়ের সম্বন্ধের দ্বারা। অন্যথায় এ অন্তরাল অন্য কোনভাবে ভঙ্গ করা শুধু ইসলামী শরীয়তের বিধানই নয়, মানব-মানবীর স্বভাব-প্রকৃতির ওপরও একান্তই অন্যায়-অনাচার বটে। ঘরের বাইরে পূর্ণাবয়ব আচ্ছাদিত করে বের হওয়ার সংক্রান্ত উক্ত আয়াত ও আহকাম নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল— আরবের অবাধ নীতিতে চলতে অভ্যস্ত মেয়েরা ঘর থেকে বের হতে গিয়ে তাদের মাথার উপর কালো চাদর ফেলে তা দিয়ে সমস্ত মাথা, মুখমণ্ডল ও সমগ্র শরীর পূর্ণমাত্রায় আবৃত করে নিতে শুরু করে দিয়েছে। নারী সমাজে এক আদর্শিক বিপ্লবের প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল। উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ আর রূপ-যৌবন প্রকাশকারী পোশাক সাধারণভাবে বর্জিত হলো, কোনো মেয়েই তা পরে ঘরের বাইরে যেতে রাজি হচ্ছিল না। উচ্ছৃঙ্খলতা ও নির্লজ্জলতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হলো। এ আয়াত অনুযায়ী সে কালে মেয়েদের আদত ছিল একটা বড় আকারের চাদর দিয়ে মাথা, মুখমণ্ডল ও সমস্ত দেহাবয়ব আবৃত করা। বলা যায়, এ চাদরই ক্রমবিবর্তনের ধারায় বর্তমান সভ্যতায় এসে বোরকা'র রূপ পরিগ্রহ করেছে। অতএব একালে কুরআনের এ নির্দেশ পালনের জন্যে মুসলিম মেয়েদেরকে বোরকা পরেই ঘর থেকে বের হতে হবে। অনাগত ভবিষ্যতে ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী কোনো স্তরে পৌঁছে বোরকা যদি এমন কোনো রূপান্তর গ্রহণ করে যা দিয়ে আরো উন্নত ও সুন্দরতরভাবে মাথা, মুখমণ্ডল ও সমগ্র দেহ আচ্ছাদিত করা যেতে পারে, তবে তাই হবে সে সমাজের জিলবাব এবং তা পরেই কুরআনের এ আয়াত অনুযায়ী মেয়েদেরকে প্রয়োজনে বাইরে যেতে হবে। এক কথায়, বিগতা যৌবনা নয়— এমন সব মুসলিম মেয়েকেই সব সমাজে, সব দেশে, সব রকমের আবহাওয়ায় এবং ইতিহাসের সব পর্যায় ও স্তরেই মাথা, মুখমণ্ডল ও সমগ্র দেহাবয়ব আবৃত করা না হলে মুসলিম মহিলা বলে অভিহিত হওয়ার কোনো অধিকারই তার থাকবে না এ আয়াত অনুযায়ী।

বস্তুত যেসব মেয়ে বোরকা পরে সমস্ত শরীর, মুখ ও মাথা আবৃত করে ঘর থেকে বের হয়, তাদের দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, এরা পর্দানশীল মহিলা। দুষ্ট চরিত্রের বখাটে চরিত্রের লোকেরা তাদেরকে চরিত্রবতী ও সতীত্বসম্পন্না মেয়ে মনে করে তাদের সম্পর্কে নৈরাশ্য পোষণ করতে বাধ্য হয়। ফলে কেউ তাদের পিছু নেবে না, তাদের আকৃষ্ট করার জন্যে কিংবা নিজেদেরকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্যে চেষ্টাও করবে না।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين –অংশে একথাই বলে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু যারা উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে বোরকা ছাড়াই নিজেদের মাথা, গলা, বুক ও বাহুযুগল উন্মুক্ত রেখেই রাস্তা-ঘাটে, দোকানে, পার্কে-হোটেল-রেস্তোরাঁয় চলাফেরা করে, তাদের সম্পর্কে দুষ্ট লোকদের মনে এর বিপরীত ধারণা জাগ্রত হবে। তারা এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে আলাপ পরিচয় করবে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, নিজেদেরকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে এবং তাদের সাথে অবাধ ও অবৈধ প্রণয় চর্চা করতে চেষ্টা করবে নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে। কেননা তাদের উক্তরূপ অবস্থায় রাস্তায় বের হওয়ার মানেই হচ্ছে তারা অপর যে কোনো পুরুষের কাছে ধরা দিতে কিছুমাত্র অরাজি নয়। অন্তত কেউ যদি তাদের পেতে চায়, তবে তারা কিছুমাত্র আপত্তি জানাবে না। বরং স্পষ্ট মনে হয়, তারা তাদের রূপ-যৌবনের মধুকেন্দ্রের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দুনিয়ার সব মধু মক্ষিকাকে। উলঙ্গভাবে চলাফেরাকারী মেয়েদের শতকরা আশিভাগের অবস্থাই যে এমনি, তা আজকের কোনো সমাজচরিত্রবিদই অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজবিদ আবূ হায়ান একথাই বলেছেন ঃ

لِاَنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا كَانَتْ فِيْ غَايَةِ التَّسَتُّرِ وَالْاِنْضِمَامِ لَمْ يَقْدِمْ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُتَبَرِّجَةِ فَاِنَّهَا مَطْمُوْعٌ فِيْهَا -

(روح المعان : ج -٢٢، ص -٩٠)

কেননা পূর্ণমাত্রায় পর্দা ও শালীনতা রক্ষাকারী মেয়েলোক দেখলে তার দিকে কেউই অগ্রসর হতে সাহস পাবে না। কিন্তু উলঙ্গভাবে চলা-চলকারী মেয়েদের কথা আলাদা। কেননা তাদের প্রতি তো লোকেরা বড়ই আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হাজার দু'হাজার, কি ছ' হাজার বছর আগেকার জাহিলিয়াতে এবং এ যুগের অত্যাধুনিক (Ultra modern) জাহিলিয়াতে একাকার হয়ে একই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এ দুয়ের মাঝে মৌলিক কোনোই পার্থক্য নেই, না স্বভাব-প্রকৃতি, না বাহ্যিক প্রকাশে, অনুষ্ঠানে। আসল কথাও তাই। জাহিলিয়াতের সে যুগে আর এ যুগে যেমন কোনোই তারতম্য নেই, ইসলামেও নেই তেমনি কোনো পার্থক্য সেকালে ও একালে। অন্য কথায় ইসলামও পুরাতন, যত পুরাতন মানবতা। আধুনিক জাহিলিয়াতও তেমনি পুরাতন, যত পুরাতন শয়তানের ইবলিশী ভূমিকা। কাজেই যারা উলঙ্গভাবে যত্রতত্র চলাফেরা— অবাধ মেলা-মেশা ও যুব সম্মেলন করে ছেলে-মেয়েদের ফষ্টি-নষ্টির অবাধ সুযোগ করে দেয়া অত্যাধুনিক সভ্যতার অবদান বলে মনে করে, আর মনে মনে গৌরব বোধ করে ঃ আমরা আর সেকেলে নই, মধ্যযুগের ঘুণেধরা সংস্কৃতি (?) মেনে আমরা চলছি না, আমরা একান্তই আধুনিক-আধুনিকা— তারা যে কতখানি বোকা, নির্বোধ ও স্থূল জ্ঞানসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম জ্ঞান বঞ্চিত তা জাহিলিয়াতের ইতিহাসই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। তারা অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে মোটেই বুঝতে পারছে না যে, তারা যা কিছু করছে, তার কোনোটাই নতুন নয়, নয় আনকোরা এবং এসব করে তারা মোটেই আধুনিক হওয়ার প্রমাণ দিতে পারছে না, বরং তারাও যে পুরাতন— অতি পুরাতন— ঘুণে ধরা সংস্কৃতিরই অন্ধ অনুসারী, এতটুকু বুঝবার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলেছে পাশ্চাত্য নগ্নতার প্রতি আকর্ষণ ও ইসলামের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ পোষণের কারণেই মাত্র— এতে কোনো সন্দেহ নেই।

নামাযের জন্যে মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া

পূর্বেই আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মেয়েদের আসল স্থানই হচ্ছে তার ঘর। এমন কি নামাযের জন্যে তাদের বাইরে যাওয়াও দরকারী নয়, পছন্দনীয় নয়। তবে ঘরের মধ্যে অবরোধবাসীনী হয়ে থাকাও ইসলামের কোনো বিধান নয়। প্রয়োজন হলে, নিরুপায় হলে তারা অবশ্য ঘরের বাইরে যেতে পারে, কিন্তু যেতে হবে পূর্ণাবয়ব আবৃত করে, পুরামাত্রায় পর্দা রক্ষা করে। এখন প্রশ্ন এই, নামাযও তেমন কোনো প্রয়োজন কিনা, যার জন্যে ঘর থেকে মসজিদে কিংবা ময়দানে যাওয়া যেতে পারে। এ সম্পর্কে সম্যক আলোচনা আমরা এখানে পেশ করতে চাই।

মেয়েদের মসজিদে যাওয়া সম্পর্কে তিন ধরনের হাদীস একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। এক ধরনের হাদীসে মেয়েদের মসজিদে যেতে নিষেধ না করতে আদেশ করা হয়েছে। তার মানে সে হাদীসমূহে মসজিদে মেয়েদের যাওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অনুমতি রয়েছে। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا تَمْنَعُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ مَسٰجِدَ اللّٰهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا تَمْنَعُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ اَنْ يُّصَلِّيْنَ فِى الْمَسْجِدِ -

(مسند احمد)

তোমরা আল্লাহ্র বাঁদীদের আল্লাহ্র মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র বাঁদীদেরকে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করো না।

হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ أَهْلَهُ أَنْ يَأْتُوا الْمَسَاجِدَ – (مسند احمد)

কোনো ব্যক্তিই যেন তার পরিবার-পরিজনকে মসজিদে যেতে কখনোই নিষেধ না করে।

তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের বিলাল নামক এক পুত্র বলে উঠল ঃ আমরা তো নিষেধ করবই। তখন ইবনে উমর বললেন ঃ

আমি তো তোমাকে রাসূলে করীম (স)-এর হাদীস শোনাচ্ছি, আর তার মুকাবিলায় তুমি এ ধরনের কথাবার্তা বলছ ?

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُ هٰذَا فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللّٰهِ حَتّٰى مَاتَ – (مسند احمد)

হাদীস বর্ণনাকারী বলেন যে, এ ঘটনার পর হযরত ইবনে উমর তাঁর এ পুত্রের সাথে মৃত্যু পর্যন্ত আর কথা বলেন নি।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَا تَمْنَعُوْا النِّسَاءَ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ – (مسند احمد)

মেয়েরা মসজিদে যাওয়ার জন্যে তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অধিকার ভোগ থেকে নিষেধ করো না।

হাদীসের ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়েদের মসজিদে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। আর সে অধিকার তারা ভোগ ও ব্যবহার করতে চাইলে তা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখার অধিকার কারোরই নেই।

বুখারী উদ্ধৃত এক হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, বিশেষ করে রাতের বেলা যদি মেয়েরা মসজিদে যেতে চায়, তাহলে তাদের নিষেধ করা নিষেধ।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاءُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ – (بخاری)

তোমাদের মেয়েরা যদি রাতের বেলা মসজিদে যাওয়ার জন্যে তোমাদের কাছে অনুমতি চায়, তবে অনুমতি দাও।

অনুমতি চাইলে অনুমতি দিতে নবী করীম (স) নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলে করীম (স)-এর এ নির্দেশ কি অবশ্য পালনীয়— অথবা পালনীয় নয় ? দ্বিতীয়ত প্রথম দিকে উল্লিখিত হাদীসমূহে রাতের বেলার কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু বুখারী উদ্ধৃত এ হাদীসে রাতের বেলার শর্ত রয়েছে। তার মানে, রাতের বেলা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তখন মেয়েদেরকে বিশেষভাবে এ অনুমতি দিতে স্বামী বা ঘরের মুরব্বী অবশ্যই বাধ্য হবে।

দ্বিতীয় ধরনের হাদীস থেকে জানা যায় যে, সুগন্ধি ব্যবহার করে মেয়েদের মসজিদে যেতে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। এ ধরনের এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَا مِنْ اِمْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللّٰهُ لَهَا صَلَاةً حَتّٰى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اِغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

(مسند احمد)

কোনো মেয়েলোক সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে গেলে আল্লাহ্ তার নামায কবুল করবেন না, যতক্ষণ সে ফরয গোসলের মতো গোসল করে সেই সুগন্ধি দূর করে নামাযে না দাঁড়াবে অর্থাৎ

সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে গেলে ও নামায পড়লে সেই নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কখনো কবুল হবে না।

এক হাদীসে মহিলাদের লক্ষ্য করে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اِذَا اَخْرَجَتْ اِحْدَا كُنَّ اِلَى الْعِشَاءِ فَلَا تَمُسَّ طِيْبًا - (مسند احمد)

তোমাদের কেউ যখন এশার নামাযের জন্যে ঘর থেকে বের হবে, তখন সুগন্ধি স্পর্শ পর্যন্ত করবে না।

আর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

وليخرجن تفلات (مسند احمد)

আকর্ষণীয় সুগন্ধি না দিয়ে যেন মেয়েরা ঘরের বাইরে যায়।

আর তৃতীয় ধরনের হাদীসে মেয়েদের নামাযের জন্যে মসজিদ অপেক্ষা তাদের ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠরীই অধিক ভালো বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যার দুটি হাদীস উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

এ সব ধরনের হাদীস সামনে রেখে মেয়েদের নামাযের জন্যে মসজিদে গমন সম্পর্কে শরীয়তের লক্ষ্য জানবার জন্যে মুহাদ্দিস ও ইসলামী মনীষীবৃন্দ চেষ্টা-গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁদের গবেষণার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

প্রখ্যাত 'হিদায়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

يُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُوْرَالْجَمَاعَاتِ -

নামাযের বিভিন্ন জামা'আতে মেয়েলোকদের শরীক হওয়া 'মাকরূহ'।

কোন্ মেয়ের শরীক হওয়া মাকরূহ ? এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, যুবতী মেয়েদের পক্ষে শরীক হওয়া মাকরূহ্। আর 'নামাযের জামা'আত' বলতে জুম'আ, ঈদ, সূর্যগ্রহণ, ইস্তিসকা, পানির জন্য প্রার্থনা প্রভৃতি নামাযে যেসব প্রকাশ্য জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তা সবই এর মধ্যে শামিল। ইমাম শাফেয়ীর মত হচ্ছে ঃ

يُبَاحُ لَهُنَّ الْخُرُوْجُ -

নামাযের জন্যে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়া মুবাহ্।

হানাফী মাযহাবের মনীষীদের দৃষ্টিতে তা জায়েয নয়। তার কারণ দর্শাতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন ঃ

لِاَنَّهُ فِىْ خُرُوْجِهِنَّ خَوْفُ الْفِتْنَةِ وَهُوَ سَبَبٌ لِلْحَرَامِ وَمَا يُفْضِىْ اِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ -

(عمدة القارى : ج-٥، ص-١٥٧)

কেননা মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়াই হচ্ছে নৈতিক বিপদের কারণ, আর তাই হচ্ছে হারাম কাজের নিমিত্ত। আর যাই হারাম কাজ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়, তাই হারাম।

এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বলা যায়, যারা এ কাজকে মাকরূহ্ বলেছেন, সে মাকরূহ্ মানেই হচ্ছে হারাম— বিশেষ করে বর্তমান যুগ-সমাজে। কেননা এ সমাজে বিপদের কারণ সর্বত্র ও সর্বাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা এও বলেছেন যে ঃ

لَا بَاْسَ لِلْعَجُوْزِ اَنْ تَخْرُجَ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِحُصُوْلِ الْاَمْنِ وَهٰذَا عِنْدَا بِىْ حَنِيْفَةَ - (ايضا)

বৃদ্ধা মেয়েলোকদের পক্ষে ফজর, মাগরিব ও এশার জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্যে বাইরে যাওয়ায় কোনো দোষ নেই। কেননা তাদের ব্যাপারে পূর্ণ নৈতিক নিরাপত্তা বিদ্যমান। আর এ মত হচ্ছে কেবল ইমাম আবূ হানীফার।

কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে বৃদ্ধা মেয়েরা তো সব রকমের নামাযের জামা'আতেই শরীক হতে পারে। কেননা তাদের প্রতি পুরুষ লোকদের আগ্রহ-কৌতুহল কম হওয়ার কারণে কোন বিপদের আশংকা থাকবার কথা নয়।

'মেয়েরা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের অনুমতি দাও'— রাসূলে করীম (স)-এর বাণীর ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন ঃ

وَفِيْهِ اَنَّهُ يَنْبَغِىْ اَنْ يَّاذَنَ لَهَا وَ لَا يَمْنَعُهَا مِمَّا فِيْهِ مَنْفِعَتُهَا وَذٰلِكَ اِذَا لَمْ يَخْفَ الْفِتْنَةَ عَلَيْهَا وَ لَابِهَا - (عمدة القارى)

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মেয়েদের অনুমতি দেয়াই বাঞ্ছনীয়, যে কাজে তার ফায়দা, তা থেকে তাকে নিষেধ করা যায় না। এ কথা তখনকার জন্যে, যখন বাইরে গেলে মেয়েদের ওপর কোনো বিপদ ঘটার কিংবা মেয়েদের নিয়ে অপর কোনো বিপদ সংঘটিত হওয়ার কোনোই আশংকা বা ভয়-ভীতি থাকবে না।

এ কথারই প্রমাণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিম্নোদ্ধৃত বাণী। তিনি বলেছেন ঃ

لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْدَثُ النِّسَاءِ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ - (بخارى)

এ মেয়েরা কি নতুন চাল-চলন গ্রহণ করেছে, তা যদি রাসূলে করীম (স) দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি এদেরকে মসজিদে যেতে অবশ্যই নিষেধ করতেন, যেমন নিষেধ করা হয়েছিল বনী ইসরাইলের মেয়েদের।

ইমাম মালিক (রহ) বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَنَحْوَهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى الْعَجَائِزِ -

মসজিদে যাওয়ার অনুমতি সংক্রান্ত এ হাদীসের মতো অন্যান্য হাদীসে কেবলমাত্র বৃদ্ধাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

কিন্তু ইমাম নববী বলেছেন ঃ

لَيْسَ لِلْمَرْاَةِ خَيْرٌ مِّنْ بَيْتِهَا وَاِنْ كَانَتْ عَجُوْزًا -

মেয়েদের জন্যে— সে বৃদ্ধাই হোক না-কেন— নিজেদের ঘরের তুলনায় আর কোনো জায়গা কল্যাণকর হতে পারে না— নেই।

তিনি প্রথম প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন হযরত ইবনে মাসউদের নিম্নোদ্ধৃত কথা। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمَرْاَةُ عَوْرَةٌ وَ اَقْرَبُ مَاتَكُوْنُ اِلَى اللّٰهِ فِىْ قَعْرِبَيْتِهَا فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَ فَهَا الشَّيْطَانُ -

মেয়েদের আপাদমস্তকই পর্দার জিনিস। তাদের ঘরের গোপন কোঠায় থাকাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পক্ষে অধিক উপযোগী। কেননা তারা যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাদের পিছু নেয়।

একটি মেয়েলোক হযরত ইবনে মাসউদের কাছে জুম'আর দিন মসজিদে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বললেন ঃ

صَلَاتُكِ فِيْ مَخْدَعِكِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ بَيْتِكِ وَصَلَاتُكِ فِيْ بَيْتِكِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ حُجْرَتِكِ وَ صَلَاتُكِ فِيْ حُجْرَتِكِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ - (عمدة القارى : ج -٥، ص -١٥٧)

তোমার বড় ঘরের অভ্যন্তরীণ কোঠায় তোমার নামায পড়া তোমার প্রশস্ত ঘরে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। তোমার প্রশস্ত ঘরে নামায পড়া তোমার বাড়ির এলাকার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা তোমার জন্যে উত্তম।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক বলেছেন ঃ

আজকের যুগে মেয়েদের ঈদের নামাযের জন্যে বের হয়ে যাওয়া আমি পছন্দ করিনে। যদি কোনো স্ত্রীলোক বের হতেই জিদ ধরে তবে তার স্বামীর উচিত তাকে অনুমতি দেয়া এই শর্তে যে, সে তার পুরানো পোশাক পরে যাবে এবং অলংকারাদি পরে যাবে না। আর সেভাবে বের হতে রাজি না হলে সুসাজে সজ্জিতা হয়ে যেতে স্বামী নিষেধ করতে পারে। (ترمذى : ج -١، ص-٨٢)

আল্লামা শাওকানী এ পর্যায়ের যাবতীয় হাদীস একসঙ্গে সামনে রেখে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

এ হাদীসসমূহ একসঙ্গে প্রমাণ করে যে, দুই ঈদের নামাযে মেয়েদের ময়দানে বের হয়ে যাওয়া শরীয়তসম্মত কাজ, এতে কুমারী বা অকুমারী, যুবতী আর বৃদ্ধা মেয়েদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই— যদি না সে ইদ্দত পালনে রত কিংবা তার বের হয়ে আসায় কোনো বিপদ বা তার নিজের কোনো ওযর-অসুবিধা থাকে। (نيل الاوطار -ج:٣، ص: ٣٥٤)

অতঃপর তিনি মুসলিম মনীষীদের এ পর্যায়ে দেয়া মত উল্লেখ করেছেন। তার একটি মত হচ্ছে এই যে, মেয়েদের বের হওয়ার জন্যে অনুমতি চাইলে পর অনুমতি দেয়া সম্পর্কে রাসূলের নির্দেশ পালন মুস্তাহাব। আর এ মুস্তাহাব বৃদ্ধ-যুবতী সব মেয়ের পক্ষেই। হাম্বলী মাযহাবের আবূ হামেদ, শাফিয়ী মাযহাবের ইমাম জুরজানীও এ মত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় মত হচ্ছে— যুবতী ও বৃদ্ধাদের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য করতে হবে। তৃতীয় মত হচ্ছে, মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া জায়েয, মুস্তাহাব নয়— ইবনে কুদামাহ উদ্ধৃত কথার বাহ্যিক অর্থ এই। চতুর্থ, মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া মাকরূহ। এ কথাটি ইমাম আবূ ইউসুফের এবং তা ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন সওরী ও ইবনুল মুবারক থেকে। ইবনে শায়বা নখয়ীর মত উদ্ধৃত করে বলেছেন, যুবতী মেয়েদের ঈদের নামাযে যাওয়া মাকরুহ।

পঞ্চম মত ঃ

اِنَّهُ حَقٌّ عَلَى النِّسَاءِ الْخُرُوْجِ اِلَى الْعِيْدِ -

ঈদের নামাযের জন্যে বাইরে যাওয়া মেয়েদের বিশেষ অধিকার রয়েছে।

কাযী ইয়ায হযরত আবূ বকর, হযরত আলী ও হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে এ মত বর্ণনা করেছেন। ইবনে শায়বা হযরত আবূ বকর ও হযরত আলী (রা)-এর নিম্নোদ্ধৃত কথাটির উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ

حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نُطَاقٍ اَلْخُرُوْجُ اِلَى الْعِيْدَيْنِ -

দুই ঈদের নামাযের জন্যে প্রত্যেক সক্ষম মেয়েলোকেরই যাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এটা ন্যায্য অধিকার।

আল্লামা শওকানী বলেন, যাঁরা এ কাজকে মাকরূহ বা হারাম বলেন, তাঁদের কথা মেনে নিলে সহীহ্ হাদীসকে অযৌক্তিক মত দ্বারা বাতিল করে দেয়া হয়। কেননা সহীহ্ হাদীসে মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অনুমতি চাইলে স্বামী বা গার্জিয়ান অনুমতি দিতে বাধ্য এবং সেজন্য রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশ রয়েছে। আর যারা যুবতী ও বৃদ্ধা মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং বৃদ্ধাদের জন্যে বাইরে যাওয়া জায়েয— যুবতীদের পক্ষে জায়েয নয় বলে রায় দিয়েছেন, তাঁরাও সর্ববাদীসম্মত সহীহ্ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন অথচ তা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

(نيل الاوطار -ج:٣، ص: ٣٥٣)

ইমাম তিরমিযী উম্মে আতীয়াতা বর্ণিত হাদীসটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন ঃ

حَدِيْثُ اُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

উম্মে আতীয়াতা বর্ণিত হাদীসটি অতি উত্তম এবং সহীহ্ সনদে বর্ণিত।

তারপর লিখেছেন ঃ

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ وَ رَخَّصَ النِّسَاءِ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْعِيْدَيْنِ وَكَرِهُوْا بَعْضُهُمْ -

(ترمذى : ج- ٢، ص -٨٦)

মনীষীদের একদল এ হাদীস অনুযায়ী মত দিয়েছেন এবং মেয়েদেরকে দুই ঈদের নামাযের জন্যে ময়দানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর কেউ কেউ তা অপছন্দ করেছেন।

পূর্বে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের দৃষ্টিতে হযরত আয়েশার আশংকাবোধকে কোনো গুরুত্ব দেয়া যায় না, অন্তত কেবলমাত্র ঈদের নামাযের জন্যে বের হওয়ার ব্যাপারে। কেননা ঃ

قَالَتْ ذٰلِكَ بِنَاءً عَلٰى ظَنٍّ ظَنَّتْهُ فَقَالَتْ لَوْرَاهُ لَمَنَعَ فَيُقَالُ عَلَيْهِ لَمْ يَرَوْ لَمْ يَمْنَعْ وَظَنُّهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ -

(نيل الاوطار : ج- ٣، ص -١٦٢)

হযরত আয়েশা এ কথাটি বলেছিলেন নিজস্ব ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে। এ কারণেই তাঁর কথার ধরন এমনি হয়েছে যে, রাসূল যদি এ অবস্থা দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি নিষেধ করতেন। আর তাঁর নিজস্ব ধারণা-অনুমান শরীয়তের কোনো প্রমাণ হতে পারে না।

আল্লামা আহমাদুল বান্না 'মুসনাদে আহমাদ'-এ উদ্ধৃত এ সম্পর্কিত যাবতীয় হাদীস সামনে রেখে বলেছেন ঃ

এসব হাদীসই নামাযের জন্যে মসজিদে গমন মেয়েদের জন্যে জায়েয বলে প্রমাণ করে। তবে তা শর্তহীন নয়। দ্বিতীয়, এতে নিষেধও রয়েছে— যদি মেয়েরা তীব্র সংক্রামক সুগন্ধি ব্যবহার করে নামাযের জন্যে যায় (তবে তা জায়েয হবে না)। তৃতীয়, যদি কোনো মেয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে কোনো না কোনো প্রয়োজনে মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করতে বাধ্য হয়, তবে তাও সে করতে পারে। আর চতুর্থ এই যে, মেয়েরা নামাযের জামা'আতে সকলের পিছনের কাতারে দাঁড়াবে এবং পুরুষদের বের হওয়ার বহু পূর্বেই তারা মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে যাবে। (بلوغ الامانى- ج: ٥، ص: ٢٠٥)

বস্তুত সমাজ-চরিত্র ও সমাজ-পরিবেশ যতই খারাপ হোক না কেন, এ সব শর্তের ভিত্তিতে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া ও ঈদের নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়া কোনোক্রমেই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হতে পারে না।

তার কারণ এই যে, বহু সংখ্যক সহীহ্ হাদীসে ঈদের জামা'আতে সব শ্রেণীর মহিলার উপস্থিতি হওয়া সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর স্পষ্ট নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। এখানে 'মুসনাদে আহমাদ' থেকে এ পর্যায়ের কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

عن جابربن عبدا لله رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى العيدين و يخرج اهله -

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ নবী করীম (স) দুই ঈদের জামা'আতে নিজে বের হয়ে যেতেন এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকেও বের করে নিতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بناته ونسائه ان يخرجن فى العيدين -

নবী করীম (স) তাঁর মেয়েদের ও স্ত্রীদের দুই ঈদের নামাযের জন্যে বের হয়ে যেতে হুকুম দিতেন।

উমরা বিনতে রওয়া আল-আনসারী নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

وَجَبَ الْخُرُوْجُ عَلٰى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ -

প্রত্যেক কোমরবন্ধ পরিহিতা মেয়েলোকেরই ঈদের ময়দানে বের হয়ে যাওয়া ওয়াজিব।

হযরত উম্মে আতীয়াতা বলেন ঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَبِىْ وَ اُمِّىْ اَنْ نُّخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوٰتِ الْخُدُوْرِ وَالْحِيَضِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ -

نقلت الاحاديث من مسند احمد مع شرح بلوغ الامانى (ج -٦، ص -١٢٥-١٢٤)

রাসূলে করীম (স) আমাদেরকে সব যুবতী মেয়ে পর্দানশীল ও হায়েয-সম্পন্ন মেয়েকেই ঈদের ময়দানে বের করে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تخرج النساء فى العيد قال نعم قيل فالعواتق قال نعم فان لم يكن لهاثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاجتها - (طبرانى فى الاوسط)

রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ মেয়েরা কি ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্যে ঘর থেকে বের হবে ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। তার নিজের কাপড় না থাকলে তার কোনো সখীর কাপড় পরে বের হবে।

এ সব হাদীস সনদের দিক দিয়ে যেমন নিঃসন্দেহ, কথার দিক দিয়েও তেমনি অকাট্য, সুস্পষ্ট। এসব হাদীস যে কোনো ঈমানদার ব্যক্তির মন কাঁপিয়ে না দিয়ে পারে না। বর্তমানে মুসলিম সমাজে এসব হাদীস সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। অতএব শরীয়তের নিয়ম-নীতি পালনের মধ্যে দিয়ে ঈদের ময়দানে এক পাশে মেয়েদের জন্যে যদি পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করা হয় তবে তাতে সমাজের মেয়েরা কেন শরীক হবে না বা হতে পারবে না এবং শরীক হলে তা দোষের হবে কেন— তা সত্যিই বোঝা যাচ্ছে না।

শুধু ঈদের নামাযই নয়, পর্দা রক্ষা করে মুসলিম মহিলারা সব রকমের জাতীয় কল্যাণমূলক

অনুষ্ঠানে ও সভা-সম্মেলনে দাওয়াতেও শরীক হতে পারে। এ পর্যায়ে বুখারী শরীফে উদ্ধৃত একটি দীর্ঘ হাদীসের একাংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

لِيَخْرُجَ الْعَوَاتِقَ وَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَالْحَيِّضُ وَ يَعْتَزِلُ الْحُيِّضُ الْمُصَلّٰى وَ لْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (باب اذا لم يكن لها جلباب فى العيد)

যুবতী পুরাবাসিনী ও ঋতুবতী মেয়েলোক ঈদের নামাযের জন্যে অবশ্যই ঘরের বাইরে যাবে। তবে ঋতুবতী মেয়েরা নামাযে শরীক হবে না। তারা অবশ্যই উপস্থিত হবে সব রকমের জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে ও অনুষ্ঠানে, মুসলমানদের সামগ্রিক দো'আ-প্রার্থনার অনুষ্ঠানে, দাওয়াত ও যিয়াফতে।

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম নববী লিখেছেন ঃ

فِيْهِ اِسْتِحْبَابٌ حُضُوْرِ مَجَامِعَ الْخَيْرِ وَدُعَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَحِلَقِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ وَ نَحْوِ ذٰلِكَ -

(نبوى :ج -١، ص -٢٩١)

সব কল্যাণকর কাজে ও সমাবেশে, মুসলমানদের সামষ্টিক দো'আ-প্রার্থনা মজলিসে দ্বীনী ইলম চর্চা ও ইসলামী বিষয়ে আলোচনা সভায় মেয়েদের শরীক হওয়া যে খুবই ভালো ও পছন্দনীয় কাজ, তা এ হাদীস থেকেই প্রমাণিত হয়।

اِحْدَانَا لَا يَكُوْنُ لَهَا جَلْبَابٌ -

আমাদের এমন মেয়ে, যার মুখ ঢাকা চাদর বা বোরকা নেই, সে কি করবে ?

জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

لِتُلْبِسَهَا اُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا -

এরূপ অবস্থায় তার কোনো বোন তার নিজের বোরকা তাকে পরিয়ে দেবে।

একথা থেকে দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি এই যে, এ ধরনের অনুষ্ঠানাদিতে সব মেয়েলোকেরই— এমন কি যারা সাধারণত ঘর থেকে বেরই হয় না, যারা পুরাবাসিনী, তাদেরও হাজির হওয়া উচিত। আর দ্বিতীয় এই যে, মেয়েরা ঘর থেকে বের হলেই তাকে মুখাবয়ব অবশ্যই ভালোভাবে ঢেকে নিতে হবে। মুখ খোলা রেখে, বুক পিঠ না ঢেকে ঘর থেকে বের হতে পারবেনা। এভাবে ঢাকবার কাপড়— বোরকা— কোনো মেয়ের যদি নাও থাকে, তাহলে অন্য মেয়েলোকের কাছ থেকে তা ধার করে নেবে। আর এক্ষেত্রে যারই বোরকা আছে— সে সময় তার প্রয়োজন না থাকলে প্রয়োজনশীল অপর বোনকে তা অবশ্যই ধার দেবে। কোনো মেয়েলোকই যাতে করে খোলা মুখে ও খোলা বুক-পিঠ নিয়ে বাইরে বের না হয়, তার জন্যেই এ ব্যবস্থা।

রাসূলে করীম (স)-এর যুগে মেয়েরা ঈদের নামাযে রীতিমত শরীক হতেন এবং তিনি মেয়েদেরকে স্বতন্ত্রভাবে একত্র করে ওয়াজ-নসীহত করতেন। হাদীসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ فَرَاٰى اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَاَتَا هُنَّ فَذَكَّرَ هُنَّ وَ وَعَظَهُنَّ وَ اَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ - (مسلم)

আমি রাসূলে করীম (স) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি খোত্‌বা দেয়ার আগেই নামায পড়ে নিতেন। এমনি একদিন তিনি নামায পড়ালেন, পড়ে খোত্‌বা দিলেন। পরে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, নামাযের জন্যে সমবেত মহিলাদের তিনি স্বীয় ভাষণ শোনাতে পারেননি। তাই তিনি পরে তাদের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাদের নসীহত করলেন— দ্বীন ইসলামের জন্যে দান করতে ও রীতিমত যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিলেন।

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে ঃ

اِنَّ النِّسَاءَ اِذَا حَضَرَتْ صَلٰوةَ الرِّجَالِ وَمَجَا مِعَهُمْ يَكُنْ بِمَعْزَلٍ عَنْهُمْ خَوْفًا مِنْ فِتْنَةٍ اَوْ نَظْرَةٍ اَوْفِكْرَةٍ وَ نَحْوَهُ - (نبوى :ج -١، ص -٢٨٩)

মেয়েরা যখন পুরুষদের সাথে নামায কিংবা অন্য কোনো সমাবেশে উপস্থিত হতো, তখন তারা পুরুষদের থেকে খানিকটা দূরে স্বতন্ত্র স্থানে আসন গ্রহণ করত। আর তা করত কোনো নৈতিক বিপদ, চোখাচোখি কিংবা খারাপ চিন্তা উদ্ভব হওয়ার ভয় থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে।

মেয়েদের হজ্জ যাত্রা ও বিদেশ সফর

মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে উপরে যে আলোচনা পেশ করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোনো গায়র-মুহাররম পুরুষের সাথে নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়া কোনো মেয়েলোকের পক্ষেই জায়েয নয়। এ পর্যায়ে প্রশ্ন ওঠে— কোন মেয়েলোকের ওপর যদি হজ্জ ফরয হয়, আর তার স্বামী বা এমন কোনো মুহাররম পুরুষও না থাকে যে তাকে সঙ্গে করে হজ্জ সফরে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে তখন সে কি করবে?

আল্লামা আহ্‌মাদুল বান্নার বিশ্লেষণ এই যে, এ সম্পর্কে যত হাদীসই পাওয়া যায়, তা সবই একসঙ্গে প্রমাণ করে যে, মুহাররম সাথী ছাড়া মেয়েলোকের বিদেশ সফর আদৌ জায়েয নয়। তা হজ্জের সফরেই হোক আর অন্য কিছুর।

ইবনে দকীকুল রীদ বলেছেন ঃ বিষয়টিকে দুটো পরস্পর বিরোধী সাধারণ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। একদিকে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا -

আল্লাহ্‌রই জন্যে আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করা এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপরই কর্তব্য, যার সে পর্যন্ত পৌঁছবার সামর্থ্য রয়েছে।

এ সাধারণ নির্দেশ পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে সামর্থ্যবতী মেয়েলোকদের ওপরও প্রযোজ্য। যে মেয়েলোকের মক্কা গমনের সামর্থ্য রয়েছে, তাকেই হজ্জ করতে হবে— ফরয।

অপরদিকে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ اِلَّا مَعَ ذِىْ مُحْرِمٍ -

মেয়েলোক আদৌ বিদেশ সফর করবে না— তবে কোনো মুহাররম পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে করতে পারে।

এ কথাটি সব রকমের সফর প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য, অতএব কোনো মেয়েলোকই মুহাররম পুরুষ সাথী ছাড়া আদৌ কোনো সফর করবে না, তা হজ্জের সফরই হোক না কেন।

এক্ষণে এ দুটি সাধারণ নীতির একটিকে অপরটির ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সেই অগ্রাধিকার দানের কারণ বাইরে থেকে নিতে হবে।

ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ এ পর্যায়ের হাদীসসমূহ কুরআনের উক্ত আয়াতের সাথে মোটেই সাংঘর্ষিক নয়। কেননা আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্যে যে সামর্থ্যের শর্ত আরোপ করা হয়েছে মেয়েদের ক্ষেত্রে একজন মুহাররম সাথী লাভ সেই শর্তেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব যার মুহাররম সাথী জুটছে না, হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তও সেখানে পুরামাত্রায় পূরণ হচ্ছে না। কাজেই আয়াত ও হাদীসের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

এ কারণেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন ঃ

لَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمَرْأَةِ اِذَا لَمْ تَجِدْ مُحَرَّمًا -

মুহাররম পুরুষ সাথী না পেলে মেয়েলোকের ওপর হজ্জই ওয়াজিব হয় না।

ইমাম মালিক অবশ্য ফরয সফর আদায় করার ব্যাপারে মুহাররম সাথী পাওয়াকে শর্ত হিসাবে গণ্য করতে রাজি নন। ইমাম শাফেয়ী ফরয হজ্জের সফরকে সাধারণ প্রয়োজনের সফর থেকে আলাদা করে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, সাধারণ প্রয়োজনের সফর সম্পর্কেই এ সর্ববাদীসম্মত মত যে, তা মুহাররম সাথী ছাড়া করা জায়েয নয়। অতএব ইখতিয়ারী ও ইচ্ছাকৃত সফরকে এর সমতুল্য মনে করা যেতে পারে না।

দারেকুতনী বর্ণিত এ পর্যায়ের একটি হাদীসের বিশেষ অংশ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَحُجَّنَّ اِمْرَاَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ - (ابوعوانه)

স্বামীর সঙ্গে ছাড়া কোনো মেয়েলোকই কখ্খনো হজ্জ করতে পারে না।

আবূ আমামা রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ

وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ سَفَرَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ تَحُجُّ اِلَّا وَ مَعَهَا زَوْجُهَا -

এবং মেয়েলোক স্বামীকে সঙ্গী না বানিয়ে একাকী তিন দিনের দূরত্বের পথে সফর করবে না এবং হজ্জ করতেও যাবে না।

এসব হাদীস সামনে রাখলে হজ্জের সফরকে অন্যান্য সাধারণ সফর থেকে আলাদা করে বিবেচনা করা চলে না।

ইমাম আবূ হানীফা, নখয়ী ও ইস্হাক ইবনে রাওয়া প্রশ্ন তুলেছেন ঃ

هَلْ هُوَ شَرْطُ اَدَاءٍ اَوْ شَرْطُ وَجُوْبٍ - (مسند احمد وشرحه بلوغ الامانى : ج -٥، ص- ٩١-٩٠)

মেয়েদের হজ্জ সফর প্রসঙ্গে মুহাররম সাথী হওয়া কি হজ্জ ফরয হওয়ার জন্যে শর্ত, না হজ্জ আদায় করার জন্যে ? (আর এ দুটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান।)

কেউ কেউ বলেছেন ঃ মুহাররম সাথী হওয়ার শর্ত কেবল যুবতী মেয়েদের জন্যে, বৃদ্ধাদের জন্যে তা শর্ত নয়। কেননা বৃদ্ধাদের প্রতি কারোরই কোনো আগ্রহ হওয়ার কথা নয়।

রাসূলে করীম (স) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ

فَارْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا - (مسند احمد، مسلم، بخارى)

তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জ করতে চলে যাও।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করেন যে, স্ত্রীর ওপর হজ্জ ফরয হলে এবং তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে অপর কোনো মুহাররম পুরুষ যদি না পাওয়া যায়, তাহলে স্বামীকেই তার সঙ্গে যেতে হবে— যাওয়া স্বামীর পক্ষে ওয়াজিব। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম শাফেয়ীরও এই মত। আর স্বামী ছাড়া অপর কোনো মুহাররম পুরুষের সাথে স্ত্রী যদি হজ্জে গমন করতে চায়, তাহলে তাকে যেতে না দেয়া স্বামীর অধিকার নেই। (بلوغ الاما نى ج ص ٨٥)

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে অতি সহজেই চিন্তা করা যায় যে, হজ্জের মতো একটি ফরয আদায়ের সফর সম্পর্কে যখন এতদূর কড়াকড়ি ইসলামে রয়েছে, তখন প্রমোদ সফর, শিক্ষা সফর, সাংস্কৃতিক দৌত্যের সফর ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি হতে পারে। ছাত্রী, শিল্পী, শিক্ষয়িত্রী কিংবা রাষ্ট্রদূত— যিনিই হোন না কেন, কারো পক্ষেই স্বামী কিংবা কোনো মুহাররম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া বিদেশ সফর আদৌ জায়েয নয়— হতে পারে না, সে সফর উচ্চশিক্ষার জন্যে হোক, উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্যে হোক, সাংস্কৃতিক চুক্তির ভিত্তিতে হোক আর রাষ্ট্রীয় দৌত্যের জন্যে হোক, তার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না এবং কোনো সফরই জায়েয নয়, একথা বলাই বাহুল্য।

মেয়েদের পোশাক প্রসাধন

মেয়েদের ঘরের বাইরে যেতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়নি, অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে সে অনুমতি দুটো শর্তের অধীন ঃ

প্রথম শর্ত, বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ানো চলবে না। প্রয়োজন— নিতান্ত অপরিহার্য প্রয়োজন থাকলেই সেই প্রয়োজন পরিমাণ সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বাইরে বের হতে পারে।

আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, নিজের মুখ-মাথা-বুক-পিঠ এবং সমগ্র শরীর ভালোভাবে আবৃত আচ্ছাদিত করে তবে বের হওয়া চলবে। মুখ-বুক উন্মুক্ত রেখে, গায়ের বর্ণ ও যৌবনোজ্জ্বল দেহাবয়ব প্রকাশ করে ঘর থেকে বের হওয়া মেয়েদের জন্যে সুস্পষ্ট হারাম। রাসূলে করীম (স) এ পর্যায়ে বড় কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন এবং এভাবে চলার মারাত্মক পরিণামের কথাও উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেছেন ঃ

نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يَجِدْنَ رِيْحُهَا وَ اِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَ كَذَا - (مسلم :ج -٢)

সেসব নারী যারা পোশাক পরিধান করেও ন্যাংটা, যারা নিজেদের কুকর্মকে অন্য লোকের কাছে জানান দিয়ে চলে, যারা বুক-স্কন্ধ বাঁকা করে একদিকে ঝুঁকিয়ে চলে, যাদের মাথা ষাঁড়ের চুটের মত ডান বামে ঢুলে ঢুলে পড়ে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং বেহেশতের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না, যদিও তার সুগন্ধি বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে।

'মুয়াত্তা ইমাম মালিক'-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

وَرِيْحُهَا تُوْجَدُ مَسِيْرَةٌ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ -

বেহেশতের সুগন্ধি পাঁচশ বছর দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী লিখেছেন ঃ

واما مائلات معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظ مميلات اى يعلمن غير هن فعلهن المذ موم ويمشين متبخترات مميلات لاكتانهن يمشين المشية المائلة وهى مشية البغايا -

(نبوى شرح مسلم : ج-٢)

মানে তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সীমা লংঘন করেছে, যা যা রক্ষা করা ও হেফাযত করা দরকার, তার হেফাযত ক্ষুণ্ন করেছে, নিজেদের পঙ্কিল ঘৃণার্হ কাজের জানান দেয় অপর লোকদের, বুক টান করে পথে-ঘাটে বীরদর্পে চলাফেরা করে, কাঁধ বাঁকা করে হাঁটে আর অসৎ মেয়েদের মতো লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পথ অতিক্রম করে। এসব মেয়েলোক কখনো জান্নাতবাসী হতে পারবে না।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

وَالْاِخْبَارُ بِاَنَّ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَ اِنَّهٗ لَا يَجِدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ مَعَ اَنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ وَ عِيْدٌ شَدِيْدٌ يَدُلُّ عَلٰى تَحْرِيْمِ مَااشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيْثُ - (نيل الاوطار : ج -٢، ص-١١٦)

এ ধরনের কাপড় যে মহিলা পরবে ও যে এভাবে চলাফেরা করবে, সে জাহান্নামী হবে এবং সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবেনা— যদিও তা পাঁচশ বছর পথের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে— এ বড় কঠিন ও কঠোর শাস্তির খবর। এ জিনিস প্রমাণ করে যে, হাদীসে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা করা সম্পূর্ণ হারাম।

বর্তমান সময়ে মেয়েরা যেমন মাথার ওপর সবগুলো চুল চাপিয়ে বেঁধে রাখে, যা দেখলে মনে হয় (পুরুষদের ন্যায়) মাথায় যেন পাগড়ি বাঁধা হয়েছে, এরূপ চুল বেঁধে রাজপথে ও বাজারে মার্কেটে চলাফেরা করা এ হাদীসে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। এ ধরনের চুল-বাঁধা মাথাকে ষাঁড়ের পিঠে অবস্থিত চুটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কাপড় পরেও ন্যাংটা থাকার অর্থে বলা হয়েছে ঃ

تَسْتُرُ بَعْضَ بَدَنِهَا وَتَكْشِفُ بَعْضَهُ اِظْهَارًا لِجَمَالِهَا وَنَحْوِهٖ وَقِيْلَ تَلْبِسُ ثَوْبًا رَقِيْقًا يَصِفُ لَوْنَ بَدَنِهَا - نبوى شرح مسلم : ج-٢)

মেয়েরা দেহের কতকাংশ আবৃত রাখে আর কতকাংশ রাখে খোলা, উন্মুক্ত, অনাবৃত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ভিন্ পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা অথবা অত্যন্ত পাতলা কাপড় পরে, যার ফলে দেহের কান্তি বাইরে ফুটে বের হয়ে পড়ে।

এসব মেয়েলোককে কাপড় পরেও 'ন্যাংটা' বলে অভিহিত করা যেমন যথার্থ, তেমনি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লামা ইবনে আবদুল বার্ ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দিহলভী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ

هُنَّ اللَّاتِىْ يَلْبِسُ مِنَ الثِّيَابِ الشَّىْءِ الْخَفِيْفِ الَّذِىْ يَصِفُ مَا تَحْتَهٗ لَهُنَّ كَاسِيَاتٍ بِالْاِسْمِ عَارِيَاتٍ فِىْ الْحَقِيْقَةِ - (المسوى شرح الموطا : ج-٢، ص -٣٩٥)

কাপড় পরেও ন্যাংটা থেকে যায় যেসব মেয়েলোক, যারা খুব পাতলা মিহিন কিংবা জালের ন্যায় কাপড় পরে, যার নীচের সব কিছু স্পষ্টভাবে দ্রষ্টার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অতএব এরা কাপড় পরিহিত হয় নামে মাত্র— বাহ্যত, কিন্তু আসলে এরা ন্যাংটা-উলঙ্গ।

হযরত উসামা ইবনে যায়দ বলেন ঃ রাসূলে করীম (স) আমাকে খুব পাতলা মিহিন এক কিব্তী চাদর পরিয়ে দিলেন। আমি তা আমার স্ত্রীকে পরিয়ে দিলাম। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ কি হলো কিবতী চাদরটি তুমি পরলে না ? আমি বললাম, আমি তা আমার স্ত্রীকে পরিয়ে দিয়েছি। তখন তিনি বললেন ঃ

مُرْهَا لِتَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةً اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَصِفَ حُجْمَ عِظَامِهَا - (مسند احمد)

তোমার স্ত্রীকে বলো, সে যেন সেই কাপড়ের নিচে আর একটি কাপড় পরে। কেননা আমার ভয় হচ্ছে কেবল সেই একটি কাপড় পরলেই তার দেহাবয়ব প্রকাশ হয়ে পড়বে।

এত দেশের মেয়েরা শাড়ির নিচে যেমন ছায়া পরিধান করে, এখানে ঠিক তা পরবার জন্যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লামা আহমাদুল বান্না এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

المعنى ان ثوب المرأة اما ان يكون كثيفا اى غليظا صيقا يصف فقاسيم جسم المرأة واما ان يكون رقيقا يصف لون بشرتها وكلاهما غير جائز والمطلوب ان يكون ثوب المرأة الظاهر امام الناس واسعا كثيفا لايصف جسما ولا بشرة - (بلوغ الامانى : ج-١٧، ص-٣٠١)

অর্থাৎ মেয়েদের কাপড় যদি মোটা, অমসৃণ ও আঁটসেঁটে হয়, তাহলে দেহাবয়ব তার পূর্ণ আকার-আকৃতিসহ স্পষ্ট দেখা যাবে। আর যদি খুব পাতলা হয়, তাহলে চামড়ার কান্তি বাইরে প্রস্ফুট হয়ে পড়বে। এ কারণে এ দুরকমেরই কাপড় ব্যবহার করা মেয়েদের জন্যে জায়েয নয়। রাসূলের উপরোক্ত বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মেয়েদের এমন কাপড় পড়তে বলা, যা বাহ্যত কেবল কাপড়ই দেখা যাবে, তা প্রশস্ত ও ঢিলে-ঢালা হবে, মোটা হবে এবং এসব কারণে নারীদেহের কোনো অংশ প্রকাশ করবে না, যাতে চামড়ার কান্তি বাইরে থেকে দেখা যাবে।

আধুনিকা মেয়েদের টাইট পোশাক এবং গলা, পিঠ ও পেট ন্যাংটা করে অজন্তা ফ্যাশনে পরা পোশাক এজন্যেই জায়েয নয়। আবদুর রহমানের কন্যা হাফ্সা হযরত আয়েশার খেতমতে হাজির হয়। সে তখন খুবই পাতলা কাপড় পরিধান করেছিল। তা দেখে হযরত আয়েশা (রা) তার সে পাতলা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দেন এবং একখানা মোটা গাঢ় কাপড় পড়িয়ে দেন। (مؤطاامام مالك)

যে সব পুরুষ তাদের ঘরের মেয়েদেরকে খুব পাতলা কাপড় পরতে দেয়, এমন কাপড় পরতে দেয় যা পরার পরেও দেহের কান্তি বাইরে ফুটে বের হয় কিংবা দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ অনাবৃতই থেকে যায়, হাদীসে সেসব পুরুষের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে كاشباء الرجال তারা পুরুষের মতো আর তার মানে ঃ

اِنَّهُمْ رِجَالٌ فِىْ الْحِسِّ لَا فِى الْمَعْنٰى اِذَا الرِّجَالُ الْكَوَامِلُ اَيَتْرُكُوْنَ نِسَاءَ هُمْ تَلْبِسُ ثِيَابًا لَا تَسْتُرًا جِسَامَهُنَّ - (بلوغ الامانى)

তারা বাহ্যত পুরুষ হলেও প্রকৃত পক্ষে তারা তা নয়। কেননা যথার্থ পুরুষ মানুষ কখনো তাদের স্ত্রী-কন্যা-বোন-নিকটাত্মীয়া প্রভৃতি মেয়েদের এমন কাপড় কখনই পরতে দিতে পারে না, যা তাদের দেহকে ভালোভাবে আবৃত করে না।

বর্তমানে যাদের মেয়েরা টাইট পোশাক পরে, শাড়ি ও ব্লাউজ এমনভাবে পরে যে, বুক-পিঠ-পেট সবই থাকে উন্মুক্ত কিংবা এমন শাড়ি পরে যা দেহের সমস্ত উচ্চ-নীচ সব অঙ্গের আকার-আকৃতি

দর্শকের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে তোলে এবং পুরুষের লালসা-পংকিল দৃষ্টিকে করে আকৃষ্ট, তারা যে কি ধরনের পুরুষ তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুত এসব পুরুষের মধ্যে পৌরুষ বা মনুষ্যত্ব নামের কোনো 'বস্তু' থাকলে তারা তা কিছুতেই বরদাশত করত না।

বর্তমানে কিছু কিছু মেয়েলোককে অবিকল পুরুষের পোশাকও পরতে দেখা যায়। কিন্তু ইসলামের এ যে কত বড় নিষিদ্ধ কাজ, তা নিম্নোদ্ধৃত হাদীস থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ (مسند احمد)

যে মেয়েলোক পুরুষের বেশ ধারণ করবে আর যে সব পুরুষ মেয়েলোকের বেশ ধারণ করবে— তারা কেউই আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।

এ প্রসঙ্গেই রাসূল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبِسُ لُبْسَةَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبِسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ - (مسند احمد)

যে পুরুষ মেয়েদের পোশাক পরিধান করে, আর যে মেয়েলোক পরে পুরুষের পোশাক, রাসূলে করীম (স) তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبِسُ لَبْسَ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةَ تَلْبِسُ لَبْسَ الرَّجُلِ - (ابو داؤد، احمد)

নবী করীম (স) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন সেসব পুরুষের ওপর, যারা মেয়েলী পোশাক পরে এবং সেসব মেয়েলোকের ওপর, যারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে।

আল্লামা শাওকানী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

اَلْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلٰى تَحْرِيْمِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ لِاَنَّ اللَّعْنَ لَا يَكُوْنَ اِلَّا عَلٰى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ وَ اِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ - (نيل الاوطار : ج-٢، ص-١١٢)

এ পর্যায়ের যাবতীয় হাদীস প্রমাণ করে যে, পুরুষদের মেয়েলী বেশ ধারণ এবং মেয়েদের পুরুষালী বেশ ধারণ করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা এ কাজে অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে, আর হারাম কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করা হয় না— সকল বিশেষজ্ঞের এই হচ্ছে সুসংহত অভিমত।

হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মেয়ে আর পুরুষ আল্লাহ্‌র দুই স্বতন্ত্র সৃষ্টি। কাজেই প্রত্যেকের জন্যে শোভনীয় বিশেষ পোশাকই তাদের পরিধান করা উচিত, তার ব্যতিক্রম করা হলে আল্লাহ্‌র মর্জির বিপরীত কাজ করা হবে। আর তাতেই নেমে আসে আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

পোশাক সম্পর্কে একটি মূল কথা অবশ্যই সকলকে স্মরণে রাখতে হবে। সে মূল কথাটি বলা হয়েছে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ - (الاعراف : ٢٦)

হে আদম সন্তান, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্যে এমন পোশাক নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে এবং ভূষণও। আর তাকওয়ার পোশাক, সে তো অতি উত্তম—

কল্যাণকর। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি। সম্ভবত লোকেরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে।

প্রথমত আয়াতে গোটা মানব জাতিকে— সমস্ত আদম সন্তানদের সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই এর মধ্যে শামিল অর্থাৎ পরবর্তী কথা সমস্ত মানুষের পক্ষেই অবশ্য পালনীয়।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পোশাক ও ভূষণ নাযিল করেছেন। পোশাক এমন, যা মানুষের— স্ত্রী-পুরুষ— সকলের লজ্জাস্থানসমূহকে পূর্ণ মাত্রায় আবৃত করে, তার কোনো অংশই অনাবৃত-উলঙ্গ থাকে না। আল্লাহ্ শুধু পোশাকই নাযিল করেন নি সেই সঙ্গে তিনি ভূষণ— শোভাও মানুষের জন্যে নাযিল করেছেন। অন্য কথায়, একটা পোশাক পরাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে যথেষ্ট নয়, যবুথবুভাবে দেহাবয়ব আবৃত করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে তাকে ভূষণ— শোভা বৃদ্ধিকারকও হতে হবে।

আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

اَلْمُرَادُ بِالرِّيْشِ هِنَالِبَاسُ الزِّيْنَةِ -

রীশ অর্থ এখানে সৌন্দর্য্যের পোশাক, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শোভা বৃদ্ধিকারী পোশাক।

'আল কামুস'-এ 'রীশ' শব্দের অর্থ লিখেছেন لباسافاخرا। 'গৌরবজনক পোশাক'।

তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ

انزلنا لباسا يوارى سؤتكم وانزلنا لباسافاخرا تتجملون فيها - (المظهرى : ج-٢، ص -٣٨٤)

আমরা নাযিল করেছি লজ্জাস্থান আবৃতকারী পোশাক এবং গৌরবমণ্ডিত পোশাক, যা পরে তোমরা শোভামণ্ডিত হবে।

আল্লামা বায়যাবীও লিখেছেন ঃ الريش الجمال। রীশ মান সৌন্দর্য, শোভা।

তৃতীয় বলা হয়েছে, তাকওয়া-আল্লাহ্‌ভীরুতামূলক পোশাকই উত্তম অর্থাৎ পোশাককে প্রথমত লজ্জাস্থান আবরণকারী, লজ্জা নিবারণকারী হতে হবে, দ্বিতীয়ত কেবল লজ্জা নিবারণই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়, বরং পোশাক হতে হবে শোভা বৃদ্ধিকারী। তৃতীয়, শোভাবর্ধক পোশাক যাই পরা হোক না কেন তার তাকওয়ামূলক, আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পোশাক হতে হবে। তাকওয়া-বিরোধী শোভামণ্ডিত পোশাক আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আরব কবি বলেছেন ঃ

اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى ۞ تقلب عريانا وان كان كاسيًا -

ব্যক্তি যখন তাক্ওয়ামূলক পোশাকই পরল না, তখন সে পোশাক পরেও উলঙ্গে পরিণত হয়ে যায়।

আয়াতের শুরুতে বনী আদম— আদম সন্তানদের সম্বোধন করা হয়েছে, যা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে বাবা আদম ও মা হাওয়া বিবস্ত্র হয়ে পড়ার ঘটনার দিকে। আর পরবর্তী আয়াতেই কথাটিকে আরো স্পষ্ট করে তোলার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا -

(الاعراف : ٢٧)

হে আদম সন্তান, শয়তান যেন তোমাদের বিপদে ফেলে দিতে না পারে, যেমন করে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে বিপদে ফেলেছিল। তখন সে দুজনার পোশাক টেনে ফেলে দিয়েছিল, যেন দুজনেরই লজ্জাস্থান প্রকাশিত ও দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ে।

শয়তান আদম জাতিকে সর্বপ্রথম যে বিপদে ফেলেছিল, তা হলো আদম-হাওয়া— দুজনারই কাপড় খুলে পড়ে যাওয়া, উলঙ্গ হয়ে পড়া। অতএব তোমরা তাঁদেরই সন্তান বিধায় তোমাদের প্রতিও শয়তান দুশমনি দেখাবে তোমাদেরকে উলঙ্গ করে দিয়ে। অতএব তোমরা সাবধান।

এ আয়াত মানব জাতির জন্যে বড়ই সাবধান বাণী, নগ্নতা, অর্ধোলঙ্গ ও কাপড় পরেও না পরার মতোই দেহের সর্বাঙ্গ দেখতে পারা শয়তানেরই প্ররোচনা। অতএব নগ্নতা আর কাপড় পরে থাকা থেকে তোমাদের সাবধান থাকতে হবে। কেননা উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ হওয়ার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে গুনাহ, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। বস্তুত লজ্জা-শরম মানুষের প্রকৃতিগত বলেই আদম-হাওয়া সঙ্গে সঙ্গেই গাছের পাতা দিয়ে দেহাবয়ব আবৃত করতে শুরু করেন। বনী আদমেরও কর্তব্য হচ্ছে নগ্নতা ও অর্ধ নগ্নতা পরিহার করে তাকওয়ামূলক পোশাক পরিধান করা।

মেয়েদের সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কেও আমরা এ পর্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখব। বিশেষ করে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা মেয়েদের পক্ষে জায়েয নয়। এ সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর বড় কঠোর বাণী উচ্চারিত ও হাদীসের কিতাবসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। একটি হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর কথা নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

اَيُّهَا اِمْرَاةٍ اِسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِىَ زَانِيَةٌ - (مسند احمد)

যে মেয়েলোক সুগন্ধি (আতর-গোলাপ-সেন্ট ইত্যাদি) লাগিয়ে ঘরের বাইরে লোকদের কাছে যাবে এ উদ্দেশ্যে, যেন তারা সে সুগন্ধি শুঁকতে পারে, তবে সে ব্যভিচারী গণ্য হবে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আহমাদুল বান্না লিখেছেন ঃ

فِيْهِ تَشْدِيْدٌ وَ تَشْنِيْعٌ عَلٰى مَنْ تَسْتَعْمِلُ الطِّيْبَ مِنَ النِّسَاءِ لِلْخُرُوْجِ وَتَشْبِيْهٌ لَهَا بِالزَّانِيَةِ لاَنَّهَا تُهَيِّجُ بِالتَّعَطُّرِ شَهْوَاتِ الرِّجَالِ وَتَفْتِحُ بَابَ عُيُوْنِهِمْ لِلنَّظْرِ اِلَيْهَا وَذٰلِكَ مَقَدِّمَاتِ الزِّنَا -

(بلوغ الامانى : ج ٢١، ص-٢٠٨)

এ হাদীসে সে মেয়েলোক সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ভাষা প্রয়োগ ও তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে, যে বাইরে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাকে ব্যভিচারিণীও বলা হয়েছে। তার কারণ সুগন্ধির তীব্র ক্রিয়া দ্বারা সে পুরুষদের মনে যৌন উত্তেজনা জাগিয়ে তোলে এবং তার দিকে তাকাবার জন্যে দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। আর এ হচ্ছে কার্যত ব্যভিচারের পূর্বাভাষ।

এক হাদীসে দৃঢ় ভাষায় বলা হয়েছে, সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে নামায পড়লে সে নামাযও আল্লাহ্‌র কাছে কবুল হবে না। নামায এবং মসজিদের জন্যে সুগন্ধি লাগানোর ব্যাপারে যখন কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তখন বাইরের হাটে-বাজারে, ক্লাবে, রেস্তোরাঁয়, মিটিং-এ পার্টিতে গমনের জন্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা যে কতখানি অপরাধ, তা সহজেই অনুমেয়।

এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস হচ্ছে এই— নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

لَا تَمْنَعُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلَيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ - (ابوداؤد، احمد)

তোমরা আল্লাহ্‌র বাঁদীদের আল্লাহ্‌র মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তারা খুব সাদাসিধেভাবেই ঘরের বাইরে যাবে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে আবদুল বার লিখেছেন ঃ

وَاِنَّمَا اُمِرْنَ بِذٰلِكَ وَنُهِيْنَ عَنِ التَّطَيُّبِ لِئَلَّا يُحَرِّكْنَ الرِّجَالَ بِطِيْبِهِنَّ - (نيل الاوطار : ج-٣، ص-١٦١)

মেয়েদেরকে বাইরে যেতে নিষেধ করতে বারণ করা এবং তাদের সুগন্ধি মেখে বের হতে নিষেধ করার কারণ হলো, তাদের সুগন্ধির মাদকতায় পুরুষ লোকদের মন উতলা হয়ে উঠতে পারে।

বলা বাহুল্য, সুগন্ধি বলতে সব রকমের সুগন্ধিই বোঝায়। চোখ ঝলসানো ও চাকচিক্যপূর্ণ পোশাকও এ পর্যায়ে পড়ে।

এ কারণে নবী করীম (স) সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

وَ لَا وَطِيْبُ الرَّجُلِ رِيْحٌ لَا لَوْنَ لَهٗ وَطِيْبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَارِيْحَ لَهٗ - (ابوداؤد)

সাবধান, পুরুষদের সুগন্ধ হচ্ছে এমন জিনিস, যাতে গন্ধ আছে (রং নেই), আর মেয়েদের সুগন্ধ হচ্ছে যাতে রং আছে, গন্ধ নেই।

তার মানে, চারদিকে আলোড়িত করে তোলা সুগন্ধি ব্যবহার করে ঘরের বাইরে যাতায়াত করা মেয়েদের জন্যে জায়েয নয়, এ কারণেই মেয়েদের পক্ষে মেহেন্দি, আলতা, সুরমা ইত্যাদি ধরনের ভালো সৌখিন, রূপচর্চা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির দ্রব্যাদি ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া অন্য কোনো তীব্র সুগন্ধিযুক্ত জিনিস ব্যবহার করা জায়েয নয়।

এ জন্যে রাসূলে করীম (স) মেয়েদেরকে 'খেজাব' ব্যবহার করতে বলতেন। তিনি এক মহিলাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

اِخْتَضِبِىْ تَتْرُكُ اِحْدَاكُنَّ الْخِضَابَ حَتّٰى تَكُوْنَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ - (مسند احمد)

খেজাব লাগাও, তোমরা খেজাব লাগাও না বলে তোমাদের হাত পুরুষদের হাতের মতোই বর্ণহীন হয়ে থাকে।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে— এ মেয়েলোকটি অতঃপর কখনোই হয়ত খেজাব লাগান পরিত্যাগ করেনি।

এমনি অপর একটি মেয়েলোক পর্দার আড়ালে থেকে হাত বাড়িয়ে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট একখানি চিঠি পেশ করে। নবী করীম (স) সে চিঠি না ধরে বলে উঠলেন ঃ

مَا اَدْرِىْ اَيَدُ رَجُلٍ اَوْيَدُ اِمْرَاَةٍ -

বুঝতে পারলাম না, এ কি কোনো পুরুষের হাত, না কোনো মেয়েলোকের হাত ?

মেয়েলোকটি পর্দার আড়ালে থেকেই বলে উঠল ঃ মেয়েলোকের হাত। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

لَوْ كُنْتِ اِمْرَاَةً لَغَيَّرْتِ اَظْفَارَكِ بِالْحِنَاءِ - (مسند احمد)

তুমি যদি মেয়েলোকই হতে, তাহলে তোমার হাতের নখগুলোতে অবশ্যই হেনার রঙ লাগাতে।

'তুমি যদি মেয়েলোকই হতে' মানে তুমি মেয়েলোক হয়ে যদি মেয়েদের ভূষণ ও সাজসজ্জাকে যথারীতি পালন করে চলতে অর্থাৎ 'নখ পালিশ' লাগানো মেয়েদের ভূষণ ও প্রসাধনের মধ্যে গণ্য।

এ থেকে জানা যায় যে, মেয়েদের হাতে-পায়ে মেহেন্দি ও নখে হেনার (মেহেন্দি) রং লাগানো উচিত। বর্তমানে আলতা, নখ-পালিশ ও লিপিস্টিক ব্যবহারেও কোনো দোষ নেই।

বস্তুত মেয়েদের রূপ চর্চা— ইসলামে কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে যে রূপচর্চা বাইরের লোকদের দেখাবার, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ও তাদের মনে যৌন উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়ে

তাদেরকে উন্মাদ করে তোলার উদ্দেশ্য হওয়া একেবারেই উচিত নয়। এ যদি কেউ করে তবে তার এ কাজ নিজের দেহ মনকে পর-পুরুষের কাছে সঁপে দেয়ারই শমিল হবে।

আর তাই হচ্ছে জ্বেনা। তা সবই হওয়া উচিত তার স্বামীর জন্যে, কেবলমাত্র যার পক্ষে তাকে দেখা, তার রূপ ও যৌবন উপভোগ করা ইসলামে হালাল। স্বামীর জন্যে রূপচর্চা করার ব্যাপারে কেবল চাকচিক্যপূর্ণ রঙ ব্যবহারই জায়েয নয়, তারও অধিক ঘরের মধ্যে থেকে তীব্র মন মাতানো সুগন্ধি ব্যবহার করাও জায়েয। এজন্যে উল্লিখিত আলোচনার পরে আহমাদুল বান্না লিখেছেন ঃ

وَ اِمَّا اِذَا كَانَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلْيَتَطَيَّبْ بِمَاشَاتْ - (بلوغ الامانی : ج-١٧، ص-٢٠٨)

মেয়েলোক যখন স্বামীর কাছে থাকবে তখন যে কোনো জিনিস দিয়ে নিজ-ইচ্ছে ও মনোবাঞ্ছা মতো প্রসাধন করতে পারে।

মেয়েদের পর্দা সহকারে জরুরী কাজ বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বাইরের পথে চলাচলের একটা নিয়মও তাদের জন্যে করে দেয়া হয়েছে। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের কখনো পথের মাঝখান দিয়ে ভিন পুরুষদের সাথে গা ঘষাঘষি করে, ভীড় ঠেলে ধাক্কা খেয়ে চলা উচিত নয়। নবী করীম (স) একটা মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে লোকদের পথ চলা লক্ষ্য করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, পথে পুরুষ ও মহিলারা পরস্পরের গা ঘেষে পাশাপাশি চলছে। তখন তিনি মেয়েদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ

اِسْتَأْخِرْنَ فَاِنَّهٗ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ وَعَلَيْكُنَّ بِحَفَاتِ الطَّرِيْقِ - (ابوداؤد)

তোমরা একটু দেরী করো, একটু পিছিয়ে পড়। কেননা পথের মাঝখান দিয়ে চলা তোমাদের উচিত নয়; বরং তোমাদের উচিত পথের একপাশ দিয়ে চলা।

হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রাসূলে করীম (স)-এর নির্দেশের পরে মহিলারা ঠিক পথের কিনারা দিয়ে প্রাচীরের পাশ ঘেষে চলতে আরম্ভ করে। ফলে এ অবস্থাও দেখা যায় যে, মেয়েদের কাপড় পথের কিনারায় প্রাচীরের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে।

(ابودؤد- باب ماجاء فی مشی النساء فی الطریق - محاسن التاویل : ج-١٣، ص -٤٥١١)

নবী করীম (স)-এর স্থায়ী রীতি ছিল, তিনি জামা'আতের নামায সম্পূর্ণ করে পুরুষ নামাযীদের নিয়ে এতটুকু সময় দেরী করে মসজিদ থেকে বের হতেন, যার মধ্যে মেয়েরা মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে পৌছতে পারত। অপর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মসজিদে নববীতে মহিলা নামাযীদের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের জন্যে একটি আলাদা দরজা করে দেয়া হয়েছিল। (আবূ দাঊদ)

বস্তুত মেয়েদের বাইরে পথ চলার ব্যাপারটি মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা শত বোরকা পরে, শরীর-মুখ-মাথা পূর্ণমাত্রায় ঢেকেও যদি তারা ঘরের বাইরে যায়, আর যদি পথিমধ্যেই নানা পুরুষের দ্বারা দলিত মথিত ও মর্দিত হয়, তাহলে সে বোরকা আর দেহাবয়ব আচ্ছাদনের এক কানা-কড়িও মূল্য থাকে না। বিশেষত বর্তমান সময়ের মেয়েদের রাজপথে চলাচলের ধরন দেখলে রাসূলে করীম (স)-এর এ নির্দেশের গুরুত্ব খুবই তীব্রভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

মহিলাদের সামাজিক দায়িত্ব

পূর্ববর্তী আলোচনায় অকাট্য দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে একথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মেয়েদের প্রকৃত স্থান এবং আসল কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর। তাদের স্বাভাবিক দায়িত্বও ঠিক তাই, যা তারা প্রধানত ঘরের চার-প্রাচীরের অভ্যন্তরে বসেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে এবং যে কাজই মূলত

ঘর কেন্দ্রিক, ঘরের নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যেই যা সীমাবদ্ধ। ঠিক এ কারণেই মহিলাদের ওপর বাইরের সামাজিক ও সামগ্রিক পর্যায়ের কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

পুরুষ নারী উভয়ই মানুষ; কিন্তু শুধু মানুষ বললে এদের আসল পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। পুরুষরা শুধু মানুষই নয়, তারা 'পুরুষ মানুষ' তেমনি মেয়েরাও শুধু মানুষ নয়, তারা 'মেয়ে মানুষ'। মানুষের এ শ্রেণীবিভাগ মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য ও কাজকে স্বভাবতই দু'পর্যায় ভাগ করে দেয়। একটি পর্যায়ের কাজ হচ্ছে ঘরে, পারিবারিক চতুঃসীমার মধ্যে, আর এক প্রকারের কাজ হচ্ছে বাইরের। এ উভয় প্রকারের কাজের স্বভাব ও ধরনের কোনো মিল নেই, সামঞ্জস্যও নেই। দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের স্বতন্ত্র প্রকৃতির কাজ বিধায় এ দুক্ষেত্রের জন্যে এ দু'ধরনের মানুষের প্রয়োজন ছিল, যা পূরণ করা হয়েছে নর ও নারী সৃষ্টি করে। পুরুষকে দেয়া হয়েছে বাইরের কাজ আর তা সম্পন্ন করার জন্যে যে যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও কাঠিন্য (Hardship) অনমনীয়তা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, দুর্ধর্ষতার প্রয়োজন, তা কেবল পুরুষদেরই আছে। আর মেয়েদের আছে স্বাভাবিক কোমলতা, মসৃণতা, অসীম ধৈর্যশক্তি, সহনশীলতা, অনুপম তিতিক্ষা। ঘরের অঙ্গনকে সাজিয়ে গুছিয়ে সমৃদ্ধশালী করে তোলা, মানব বংশের কুসম-কোমল কোরকদের গর্ভে ধারণ, প্রসবকরণ, স্তন দান ও লালন পালন করার জন্যে একান্তই অপরিহার্য। তাই এ কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের ওপর অর্পন করা হয়েছে। ফলে পুরুষেরা বাইরের কর্মক্ষেত্রের কর্তা আর মেয়েরা হচ্ছে ঘরের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় ব্যাপারের কর্ত্রী। এ দুটি কর্মক্ষেত্র মিলিয়েই যেমন হয় দুনিয়ার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড জীবন, তেমনি পুরুষ আর নারীর সমন্বয়েই মানুষ, মানুষের সম্পূর্ণতা।

ঠিক এজন্যেই ইসলামী শরীয়ত মেয়েদের ওপর ঠিক সে ধরনের কাজেরই দায়িত্ব দিয়েছে, যা তাদের ছাড়া আর কারোর করার সাধ্য নেই। সে কাজ যেন তারা অখণ্ড নির্লিপ্ততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ মনোযোগ সহকারে সম্পন্ন করতে পারে, ইসলাম সে ধরনেরই পরিবার ও সমাজ কাঠামো পেশ করেছে, আইন বিধান দিয়েছে এবং অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে বলেছে।

এ উদ্দেশ্যেই ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অনেক বাধ্যবাধকতা থেকে নারী সমাজকে এক প্রকার মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গিয়ে জামা'আতে শরীক হয়ে পড়া ইসলামের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু নারীদের তা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। তার মানে এ নয় যে, জামা'আতে নামায পড়ার ফযিলত ও অতিরিক্ত সওয়াব থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। বরং ঘরের নিভৃত কোণে বসে একান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে নামায পড়লেই তাদের সে ফযিলত লাভ হতে পারে বলে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে। (مسند احمد-ج: ٤، ص: ٢٩٧)

অনুরূপ কারণে জুম্'আর নামাযও মেয়েদের ওপর ফরয করা হয়নি। রাসূলে করীম(স) বলেছেন ঃ

اَلْجُمْعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةٌ عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْصَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ - (ابوداؤد)

জুম্'আর নামায জামা'আতের সাথে পড়া সব মুসলমানদের ওপরই ধার্য অধিকার— ফরয। তবে চার শ্রেণীর লোকদের তা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে ঃ ক্রীতদাস, মেয়েলোক, বালক ও রোগী।

আল্লামা খাত্তাবী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

اَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلٰى اَنَّ النِّسَاءَ لَا جُمْعَةَ عَلَيْهِنَّ - (معالم السنن : ج-١، ص-٢٤٤)

মেয়েলোকদের ওপর জুম্'আর নামায ফরয নয়, এ সম্পর্কে সব মাযহাবের ফিকাহবিদরাই সম্পূর্ণ একমত।

জানাযার নামাযে শরীক হওয়া এবং জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত গমন করা থেকেও মহিলাদের বিরত থাকতে বলা হয়েছে। যদিও জানাযা অনুসরণ করা মেয়েদের জন্যে হারাম নয়, মাকরূহ তানজীহী মাত্র। কাযী ইয়ায বলেছেন ঃ বেশির ভাগ আলেমই মেয়েদের জানাযায় যেতে নিষেধ করেছেন। তবে মদীনার আলেমগণ অনুমতি দিয়েছেন এবং ইমাম মালিকও মনে করেন যে, অনুমতি আছে বটে, তবে যুবতী মেয়েদের জন্যে নৈতিক বিপদের আশংকায় তা অনুচিত। (نبوی-ج: ١، ص: ٢٠٤)

হজ্জ ফরয হলেও একাকিনী হজ্জে গমন করতে মেয়েদের জন্যে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা মেলে। মূলতগতভাবে মেয়েদের ওপর বাইরের কোনো কাজেরই দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি। কিন্তু তাই বলে তারা যদি নিজেদের পর্দা রক্ষা করে পারিবারিক স্বাভাবিক দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করার পরও সামাজিক কাজ করতে সমর্থ হয় তবে তাও নিষেধ নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে পূর্ণ ভারমাস্য Balance রক্ষা করাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত কঠিন কাজ। নারীদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ঘরে। তাই বলে ঘরের চার প্রাচীরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবে, অবরুদ্ধ জীবন যাপন করবে, ইসলাম তা চায় না। নারীদের ওপর বাইরের সামাজিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়নি তাই বলে যদি কেউ তা পর্দা রক্ষা করে নিজেদের প্রাথমিক ও স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পর বাইরের সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে ইসলাম তাতে বাধ সাধবে না। এভাবে উভয় দিকের সঙ্গে পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে চলাই ইসলামের লক্ষ্য।

কিন্তু বর্তমানে সে ভারসাম্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এ যাবত যারা কেবল ঘরের মধ্যে রয়েছে, তারা ঘরের বাইরে বের হওয়া এবং সামাজিক দায়িত্বে শরীক হওয়াকে সম্পূর্ণ হারাম বলে ধরে নিয়েছে। এক্ষণে যেসব মেয়েলোক ঘরের বাইরে আসতে শুরু করেছে, তারা পারিবারিক জীবনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলতে আরম্ভ করেছে। এক কালে মেয়েরা যেমন ছিল নিতান্ত পুরবাসিনী, একান্তই স্বামী অনুগতা, ঘর-গৃহস্থালী করা আর সন্তান গর্ভে ধারণ ও লালন-পালনই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। বর্তমানে তেমনি মেয়েরা ঘর ছেড়ে দিচ্ছে, স্বামী-আনুগত্য পরিহার করছে। ঘর-গৃহস্থালী করাকে দাসীবৃত্তি— অতএব পরিত্যাজ্য বলে মনে করছে। আর সন্তান গর্ভে ধারণের সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আজ গর্ভ নিরোধের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হচ্ছে। পূর্ব অবস্থায় যেমন ইসলামী আদর্শের পূর্ণ স্ফূরণ হচ্ছিল না, তেমনি বর্তমান অবস্থায়ও কিছুমাত্র ইসলামী আদর্শানুরূপ নয়। দুটো অবস্থাই ভারসাম্য রহিত।

আজকের নারী ছাত্র-শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তার-নার্স, ব্যবসায়ী-সেলসম্যান, নর্তকী-গায়িকা, রেডিও আর্টিস্ট, ঘোষণাকারিণী, সমাজনেত্রী, রাজনীতি পার্টি কর্মী, সমাজ সেবিকা, উড়োজাহাজের হোস্টেস, বিদেশে রাষ্ট্রদূত, অফিসের ক্লার্ক আর কারখানার মজুর-শ্রমিক প্রভৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বকাজেই অগ্রসর। কিন্তু এদিকে ঝুঁকে পড়ে তারা তাদের আসল কর্মক্ষেত্র থেকে একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। বিশেষ কোনো পুরুষের স্ত্রী হয়ে পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে নতুন করে এক ভারসাম্যহীন জীবনধারার সূচনা হয়ে সামগ্রিক ক্ষেত্রে এনে দিচ্ছে এক সর্বাত্মক বিপর্যয়। ইউরোপের মহিলা সমাজ সর্বাগ্রে এদিকে পদক্ষেপ করেছে। এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা একদিকে খুইয়েছে তাদের পারিবারিক জীবন কেন্দ্রের স্থিতি, আর অপর দিকে সর্বক্ষেত্রে ভিন পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করে তারা হারিয়েছে তাদের নৈতিকতার অমূল্য সম্পদ। শুধু তাই নয়, তাদের নারীত্ব— মূলত সকল কোমলতা, মাধুর্য, শ্রীলতা-শালীনতা ও পবিত্রতা— খতম হয়ে গেছে, আর তারই ফলে গোটা মানব বংশকে তারা ঢেলে দিয়েছে এক মহাসংকটের মুখে।

প্রশ্ন হচ্ছে— নারীদেরও এসব ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া কি নিতান্তই অপরিহার্য ছিল ? এমন অবস্থা তো নিশ্চয়ই দুনিয়ার কোনো দেশে কোনো সমাজে দেখা দেয়নি যে, কর্মক্ষম পুরুষের অভাব পড়ে গেছে

কিংবা কর্মক্ষম সব পুরুষেরই কর্মে নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বিধায় নারীদেরও এ পথে টেনে আনতে হয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। যেখানে যত নারীকেই বিভিন্ন সামাজিক কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে, সেখানেই দেখা গেছে যে, যে কোনো পুরুষকে এ কাজে নিয়োগ করা যেত অতি সহজে এবং শোভনীয়ও তাই ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রের এমন কোন কাজটির নাম করা যেতে পারে, যা যে কোনো পুরুষের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না ? এতদসত্ত্বেও এসব ক্ষেত্রে নিয়োগ করে একদিকে যেমন কর্মক্ষম পুরুষ শক্তির অপচয়ের কারণ ঘটানো হয়েছে, তেমনি অপরদিকে নারীদেরকে পুরুষদের কাছাকাছি ও পাশাপাশি থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত ধরে কাজ করতে বাধ্য করে উভয়ের নৈতিক শ্লীলতা বোধটুকুকেও চিরতরে খতম করার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে।

নারী-পুরুষের এরূপ অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেয়ার পর নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করে নিজস্ব পারিবারিক জীবনের স্থিতি রক্ষা করে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব হতে পারে না। না ইউরোপ-আমেরিকায় তা সম্ভব হয়েছে, না সম্ভব হচ্ছে বর্তমানের এশিয়া ও আফ্রিকায়। এ ধরনের সমাজে কেবল নৈতিক বিপর্যয়ই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠেনি, সুষ্ঠুভাবে গঠিত এবং সম্প্রীতি ও বাৎসল্যপূর্ণ পারিবারিক জীবনও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। দুজন রেডিও আর্টিস্ট, একজন চার সন্তানের পিতা আর একজন তিন সন্তানের জননী। রেডিও স্টেশনের পরিবেশে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্ত্রী-স্বামী ও নিষ্পাপ শিশু-সন্তানের কথা ভুলে গিয়ে নতুনভাবে মধুযামিনী যাপনে উদ্যোগী হতে দেখা গেছে। একই অফিসের দুই ক্লার্ক— নারী ও পুরুষ, পরস্পরের কাছে মজে গিয়ে নিজ নিজ পারিবারিক পবিত্র জীবনের কথা বিস্মৃত হয়েছে। এসব কাহিনীর সংখ্যা এত বেশি, যা নির্ধারণ করে সংকলিত করা সম্ভব নয়। তাই সুষ্ঠু ও নির্দোষ-নির্ভেজাল ও নির্লিপ্ত পারিবারিক জীবনের পক্ষে নারীদের ঘরের বাইরে সামাজিক কাজে-কর্মে যোগদান ও সেখানে ভিন পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ যে অত্যন্ত মারাত্মক, তা আজকের সমাজতত্ত্ববিদ কোনো লোকই অস্বীকার করতে পারে না।

নারীরা কি শুধু সন্তান প্রজননের যন্ত্র বিশেষ, তাদের মধ্যে কি মনুষ্যত্ব নেই ?........তা যদি হবে, তাহলে তারা কেন কেবলমাত্র স্ত্রী হয়ে ঘরের কোণে বন্দী হয়ে থাকবে— অত্যাধুনিকা নারীদের সামনে এ প্রশ্ন অত্যন্ত জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এ প্রশ্ন করে নারী সমাজকে ঘায়েল করা আজ খুবই সহজ। নারীরা নিছক সন্তান প্রজননের যন্ত্র বিশেষ নয়, নয় তারা মানুষ ছাড়া আর কিছু— এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে ভাবাবেগে চালিত হওয়া বড়ই মারাত্মক। নারীরা কেবলমাত্র সন্তান প্রজননের যন্ত্র নয়, তারা আরো কিছু, সেই সঙ্গে সন্তান প্রজননের যন্ত্র যে কেবল তাদের মধ্যেই বর্তমান— এ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা যেতে পারে কিরূপ ? আজকের নারীরা যদি সন্তান গর্ভে ধারণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে মানব বংশই যে লোপ পেয়ে যাবে। স্বভাবের তাগিদে যৌন মিলনে প্রস্তুত হওয়া যেমন সত্য, তেমনি সত্য সেই যৌন মিলনের পরিণামে নারীদের গর্ভে সন্তানের সঞ্চার হওয়া। প্রথম ব্যাপারটিকে যদি অস্বীকার করা না যায় বা না হয়, তাহলে তার পরিণামকে অস্বীকার করা কি শুধু নারীত্বেরই নয়, মনুষ্যত্বেরও বিরোধিতা হবে না ? হবে না কি তাদের অপমান ? তাহলে ভাবাবেগ চালিত হয়ে এমন সব কাজে ও এমন সব ক্ষেত্রে নারীদের ঝাঁপিয়ে পড়া বা টেনে নেয়া— যেতে প্রলোভিত করা কি কখনো সমীচীন হতে পারে, যার দরুন যৌন মিলনের নিশ্চয়তা ও পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে, দেখা দিতে পারে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা এবং যার দরুন সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব ও পালনের সুষ্ঠুতা হবে ব্যাহত, বিঘ্নিত ?

অতএব নারীকে তার আসল স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখার এবং যারা সেখান থেকে নির্মূল হয়েছে তাদের সেখানে পুনঃপ্রতিষ্টিত করাই হচ্ছে নারী কল্যাণের সর্বোত্তম ব্যবস্থা। তাই ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে, "হে নারীরা! তোমরা তোমাদের ঘরকেই আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করো, তাকে কেন্দ্র করে জীবন গঠন করো, আর যত কাজই করো না কেন, তা তাকে বিঘ্নিত করে নয়, তাকে সঠিকভাবে রক্ষা করেই করবে।

অর্থোপার্জনে নারী

বর্তমান যুগ অর্থনৈতিক যুগ, অর্থের প্রয়োজন আজ যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণ বেশি বেড়ে গেছে। অর্থ ছাড়া এ যুগের জীবন ধারণ তো দূরের কথা, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণও যেন সম্ভব নয়— এমনি এক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে জীবন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে। তাই পরিবারের একজন লোকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা, এক ব্যক্তির উপার্জনে গোটা পরিবারের সব রকমের প্রয়োজন পূরণ করা আজ যেন সুদূরপরাহত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের লোকদের মনোভাব এমনি। তারা মনে করে, জীবন বড় কঠিন, সংকটময়, সমস্যা সংকুল। তাই একজন পুরুষের উপার্জনের ওপর নির্ভর না করে ঘরের মেয়েদের-স্ত্রীদেরও উচিত অর্থোপার্জনের জন্যে বাইরে বেরিয়ে পড়া। এতে করে একদিকে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে স্বামীর সাথে সহযোগিতা করা হবে, জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। অন্যথায় বেচারা স্বামীর একার পক্ষে সংসার তরণীকে সুষ্ঠুরূপে চালিয়ে নেয়া এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বেলাভূমে পৌঁছিয়ে দেয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। আর অন্যদিকে নারীরাও কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের কর্মক্ষমতার স্ফূরণ ও বিকাশ সাধনের সুযোগ পাবে।

এ হচ্ছে আধুনিক সমাজের মনস্তত্ত্ব। এর আবেদন যে খুবই তীব্র আকর্ষণীয় ও অপ্রত্যাখ্যানীয়, তাতে সন্দেহ নেই। এরই ফলে আজ দেখা যাচ্ছে, দলে দলে মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ছে। অফিসে, ব্যবসা কেন্দ্রে, হাসপাতালে, উড়োজাহাজে, রেডিও, টিভি স্টেশনে— সর্বত্রই আজ নারীদের প্রচণ্ড ভীড়।

এ সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত মৌলিক, একটি পারিবারিক-সামাজিক ও নৈতিক আর দ্বিতীয়টি নিতান্তই অর্থনৈতিক।

নারী সমাজ আজ যে ঘর ছেড়ে অর্থোপার্জন কেন্দ্রসমূহে ভীড় জমাচ্ছে, তার বাস্তব ফলটা যে কী হচ্ছে তা আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। পরিবারের মেয়েরা নিজেদের শিশু সন্তানকে ঘরে রেখে দিয়ে কিংবা ধাত্রী বা চাকর-চাকরাণীর হাতে সঁপে দিয়ে অফিসে, বিপণীতে উপস্থিত হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে— দিন-রাতের প্রায় সময়ই— শিশু সন্তানরা মায়ের স্নেহমায়া থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হচ্ছে আর তারা প্রকৃতপক্ষে লালিত-পালিত হচ্ছে ধাত্রীর হাতে, চাকর-চাকরাণীর হাতে। ধাত্রী আর চাকর-চাকরাণীরা যে সন্তানের মা নয়, মায়ের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করাও তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়— এ কথা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন করে না অথচ ছোট ছোট মানব শিশুদের পক্ষে মানুষ হিসেবে লালিত-পালিত হওয়ার জন্যে সবচাইতে বেশি প্রয়োজনীয় হচ্ছে মায়ের স্নেহ-দরদ ও বাৎসল্যপূর্ণ ক্রোড়।

অপরদিকে স্বামীও উপার্জনের জন্যে বের হয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে স্ত্রীও। স্বামী এক অফিসে, স্ত্রী অপর অফিসে, স্বামী এক কারখানায়, স্ত্রী অপর কারখানায়। স্বামী এক দোকানে, স্ত্রী অপর এক দোকানে। স্বামী এক জায়গায় ভিন মেয়েদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কাজ করছে আর স্ত্রী অপর এক স্থানে ভিন পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রুজী-রোজগারে ব্যস্ত হয়ে আছে। জীবনে একটি বৃহত্তম ক্ষেত্রে স্বামী আর স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের বন্ধনে ফাঁটল ধরা— ছেদ আসা যে অতি স্বাভাবিক তা বলে বোঝাবার অপেক্ষা রাখে না। এতে করে না স্বামীত্ব রক্ষা পায়, না থাকে স্ত্রীর সতীত্ব। উভয়ই অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভরশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজস্ব পদ ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে আত্মচিন্তায় মশগুল। প্রত্যেকেরই মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবধারায় চালিত ও প্রতিফলিত হতে থাকে স্বাভাবিকভাবেই। অতঃপর বকি থাকে শুধু যৌন মিলনের প্রয়োজন পূরণ করার কাজটুকু। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের পর এ সাধারণ কাজে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া— বিশেষত বাইরে যখন সুযোগ-সুবিধার কোনো অবধি নেই— তখন একান্তই অবাস্তব ব্যাপার। বস্তুত এরূপ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আকর্ষণ ক্ষীণ হয়ে

আসতে বাধ্য। অতঃপর এমন অবস্থা দেখা দেবে, যখন পরিচয়ের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হলেও কার্যত তারা এক ঘরে রাত্রি যাপনকারী দুই নারী পুরুষ মাত্র। আর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া তাদের ক্ষেত্রে বিচিত্র কিছু নয়। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি, নির্লিপ্ততা, গভীর প্রেম-ভালোবাসা শূন্য হয়ে এরা বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থোপার্জনে যন্ত্র বিশেষে পরিণত হয়ে পড়ে। এ ধরনের জীবন যাপনের এ এক অতি স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া আর কিছু নয়।

একথা সুস্পষ্ট যে, যৌন মিলনের স্বাদ যদিও নারী পুরুষ উভয়েই ভোগ করে, কিন্তু তার বাস্তব পরিণাম ভোগ করতে হয় কেবলমাত্র স্ত্রীকেই। স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান সঞ্চারিত হয়। দশ মাস দশ দিন পর্যন্ত বহু কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ সহকারে সন্তান গর্ভে ধারণ করে তাকেই চলতে হয়, সন্তান প্রসব এবং তজ্জনিত কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ তাকেই পোহাতে হয়। আর এ সন্তানের জন্যে স্রষ্টার তৈরী খাদ্য সন্তান জন্মের সময় থেকে কেবলমাত্র তারই স্তনে এসে হয় পুঞ্জীভূত। কিন্তু পুরুষ এসব কিছু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জনেন্দ্রিয়ে শুক্রকীট প্রবিষ্ট করানোর পর মানব সৃষ্টির ব্যাপারে পুরুষকে আর কোনো দায়িত্বই পালন করতে হয় না। এ এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাপার, যৌন মিলনকারী কোনো নারীই এ থেকে রেহাই পেতে পারে না।[১] এখন এহেন নারীকে যদি পরিবারের জন্যে উপার্জনের কাজেও নেমে যেতে হয়, তাহলে তাকে কতখানি কষ্টদায়ক, কত মর্মান্তিক এবং নারী সমাজের প্রতি কত সাংঘাতিক জুলুম, তা পুরুষরা না বুঝলেও অন্তত নারী সমাজের তা উপলব্ধি করা উচিত।

পারিবারিক জীবনের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ দুটো। একটি হচ্ছে পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ আর অপরটি হচ্ছে মানব বংশের ভবিষ্যৎ রক্ষা। দ্বিতীয় কাজটি যে প্রধানত নারীকেই করতে হয় এবং সে ব্যাপারে পুরুষের করণীয় খুবই সামান্য আর তাতেও কষ্ট কিছুই নেই, আছে আনন্দ-সুখ ও স্ফূর্তি, এ তো সুস্পষ্ট কথা। তা হলে যে নারীকে মানব বংশের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যে এতো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, তাকেই কেন আবার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণেরও দায়িত্ব বহন করতে হবে? এটা কোন ধরনের ইনসাফ! দুটো কাজের একটি কাজ যে স্বাভাবিক নিয়মে একজনের ওপর বর্তিয়েছে, ঠিক সেই স্বাভাবিক নিয়মেই কি অপর কাজটি অপর জনের ওপর বর্তাবে না? নারীরাই বা এ দুধরনের কাজের বোঝা নিজেদের স্কন্ধে টেনে নিতে ও বয়ে বেড়াতে রাজি হচ্ছে কেন?

ইসলাম এ না-ইনসাফী করতে রাজি নয়। তাই ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় গোটা পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব একমাত্র পুরুষের। দুটি কাজ দু'জনের মধ্যে যে স্বভাবিক নিয়মে বণ্টিত হয়ে আছে ইসলাম সে স্বাভাবিক বণ্টনকেই মেনে নিয়েছে। শুধু মেনে নেয়নি, সে বণ্টনকে স্বাভাবিক বণ্টন হিসাবে স্বীকার করে নেয়ায়ই বিশ্বমানবতার চিরকল্যাণ নিহিত বলে ঘোষণাও করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী মহাসম্মানিত মানুষ, তাদের নারীত্ব হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে সম্মানার্হ। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ সম্মান ও মর্যাদা নিহিত রেখেছেন তাদের কাছে অর্পিত বিশেষ আমানতকে সঠিকভাবে রক্ষার কাজে। এতেই তাদের কল্যাণ, গোটা মানবতার কল্যাণ ও সৌভাগ্য। নারীর কাছে অর্পিত এ আমানত সে রক্ষা করতে পারে কোনো পুরুষের স্ত্রী হয়ে, গৃহকর্ত্রী হয়ে, মা হয়ে। এ ক্ষেত্রেই তার প্রকৃত ও স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। নারীকে যদি পরিবারের সুরক্ষিত ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যদি দেয়া যায় তার সব অধিকার, সঠিক মর্যাদা যথাযথভাবে ও পরিপূর্ণ মাত্রায়, তবেই নারীর জীবন সুখ-সম্ভারে সমৃদ্ধ হতে পারে। নারী যদি সফল স্ত্রী হতে পারে, তবেই সে হতে পারে মানব সমাজের সর্বাধিক মূল্যবান ও সম্মানীয় সম্পদ। তখন তার দরুন একটা ঘর ও সংসারই শুধু প্রতিষ্ঠিত ও ফুলে ফলে সুশোভিত হবে না, গোটা মানব সমাজও হবে যারপরনাইভাবে উপকৃত।

---

১. বর্তমানে গর্ভ ধারণের এ ঝামেলা থেকে তাদের মুক্ত রাখার জন্যেই আবিষ্কৃত ও উৎপাদিত হয়েছে জন্মনিরোধের যাবতীয় আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম। তার সফল ব্যবহার যেসব নারী সক্ষম হয়, কেবল তারাই গর্ভ ধারণ থেকে নিষ্কৃত পেয়ে যায়।

অনুরূপভাবে নারী যদি মা হতে পারে, তবে তার স্থান হবে সমাজ-মানবের শীর্ষস্থানে। তখন তার খেদমত করা, তার কথা মান্য করার ওপরই নির্ভরশীল হবে ছেলে সন্তানদের জান্নাত লাভ। 'মায়ের পায়ের তলায়ই রয়েছে সন্তানের বেহেশত'।

নারীকে এ সম্মান ও সৌভাগ্যের পবিত্র পরিবেশ থেকে টেনে বের করলে তার মারাত্মক অকল্যাণই সাধিত হবে, কোনো কল্যাণই তার হবে না তাতে।

তবে একথাও নয় যে, নারী অর্থোপার্জনের কোনো কাজই করতে পারবে না। পারবে, কিন্তু স্ত্রী হিসেবে তার সব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার পর; তাকে উপেক্ষা করে, পরিহার করে নয়।

ঘরের মধ্যে থেকেও মেয়েরা অর্থোপার্জনের অনেক কাজ করতে পারে এবং তা করে স্বামীর দুর্বহ বোঝাকে পারে অনেকখানি হালকা বা লাঘব করতে। কিন্তু এটা তার দায়িত্ব নয়, এ হবে তার স্বামী-প্রীতির অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

কিন্তু আবার স্মরণ করতে হবে যে, সফল স্ত্রী হওয়াই নারী জীবনের আসল সাফল্য। সে যদি ঘরে থেকে ঘরের ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠরূপে চালাতে পারে, সন্তান লালন-পালন, সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষাদান, সামান্য ও সাধারণ রোগের চিকিৎসার প্রয়োজনও পূরণ করতে পারে, তবে স্বামী-প্রীতি আর স্বামীর সাথে সহযোগিতা এর চাইতে বড় কিছু হতে পারে না। স্বামী যদি স্ত্রীর দিক দিয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারে, ঘরের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে হতে পারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তাহলে সে বুকভরা উদ্দীপনা আর আনন্দ সহকারে দ্বিগুণ কাজ করতে পারবে। স্বামীর পৃষ্ঠপোষকতা এর চাইতে বড় আর কি হতে পারে।

নারী স্ত্রী হয়ে কেবল সন্তান উৎপাদনের নির্জিব কারখানাই হয় না, সে হয় সব প্রেম-ভালোবাসা ও স্নেহ মমতার প্রধান উৎস, স্বামী ও পুত্র কন্যা সমৃদ্ধ একটি পরিবারের কেন্দ্রস্থল। বাইরের ধন-ঐশ্বর্যের ঝংকার অতিশয় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চাকচিক্য আর হাস্য-লাস্যের চমক-ঠমক, গৃহাভ্যন্তরস্থ এ নিবিড় সুখ ও শান্তির তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ, অতিশয় হীন ও নগণ্য। এ দুয়ের মাঝে কোনো তুলনাই হতে পারে না।

আজকের দিনে যেসব নারী গৃহকেন্দ্র থেকে নির্মূল হয়ে বাইরে বের হয়ে পড়েছে, আর ছিন্ন পত্রের মতো বায়ূর দোলায় এদিক থেকে সেদিকে উড়ে চলেছে, আর যার তার কাছে হচ্ছে ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা— তারা কি পেয়েছে কোথাও নারীত্বের অতুলনীয় সম্মান ? পেয়েছে কি মনের সুখ ও শান্তি ? যে টুপি অল্প মূল্যের হয়েও মাথায় চড়ে শোভাবর্ধন করতে পারে, তা যদি স্থানচ্যুত হয়ে যায়, তবে ধূলায় লুণ্ঠিত ও পদদলিত হওয়া ছাড়া তার আর কি গতি হতে পারে ?

বস্তুত বিশ্বমানবতার বৃহত্তম কল্যাণ ও খেদমতের কাজ নারী নিজ গৃহাভ্যন্তরে থেকেই সম্পন্ন করতে পারে। স্বামীর সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম সাথী হওয়া, স্বামীর হতাশাগ্রস্থ হৃদয়কে আশা আকাংক্ষায় ভরে দেয়া এবং ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলার কাজ একজন নারীর পক্ষে এ ঘরের মধ্যে অবস্থান করেই সম্ভব। আর প্রকৃত বিচারে এই হচ্ছে নারীর সবচাইতে বড় কাজ। এতে না আছে কোনো অসম্মান, না আছে লজ্জা ও লাঞ্ছনার কোনো ব্যাপার। আর সত্যি কথা এই যে, বিশ্বমানবতার এতদাপেক্ষা বড় কোনো খেদমতের কথা চিন্তাই করা যায় না। এ কালের যেসব নারী এ কাজ করতে রাজি নয় আর যে সব পুরুষ নারীদের এ কাজ থেকে ছাড়িয়ে অফিসে কারখানায় আর হোটেল-রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায়, তাদের চিন্তা করা উচিত, তাদের মায়েরাও যদি এ কাজ করতে রাজি না হতো, তাহলে এ নারী ও পুরুষদের দুনিয়ায় আসা ও বেঁচে থাকাই হতো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

তাই ইসলাম নারীদের ওপর অর্থোপার্জনের দায়িত্ব দেয়নি, দেয়নি পরিবার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের কর্তব্য। তা সত্ত্বেও যে নারী গৃহকেন্দ্র অস্বীকার করে বাইরে বের হয়ে আসে, মনে করতে হবে তার শুধু রুচিই বিকৃত হয়নি, সুস্থ মানসিকতা থেকেও সে বঞ্চিতা।

সামাজিক ও জাতীয় কাজে-কর্মে নারী-বিনিয়োগের ব্যাপারটি কম রহস্যজনক নয়। এ ধরনের কোনো কাজে নারী- বিনিয়োগের প্রশ্ন আসতে পারে তখন, যখন সমাজের পুরুষ শক্তিকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। তার পূর্বে পুরুষ-শক্তিকে বেকার করে রেখে নারী নিয়োগ করা হলে, না বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে, না পারে নতুন দাম্পত্য জীবনের সূচনা, নতুন ঘর-সংসার ও পরিবারের ভিত্তি স্থাপিত করতে। কেননা সাধারণত কোনো সভ্য সমাজেই নারীরা রোজগার করে পুরুষদের খাওয়ায় না, পুরুষরাই বরং নারীদের ওপর ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম ও লালন-পালনের ভার দিয়ে তাদের যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। বিশেষত পুরুষরা যদি বাইরের সমাজের কাজ না করবে, জরুরী-রোজগারের কাজে না লাগবে, তাহলে তারা করবেটা কি! স্ত্রীর রোজগারে যেসব পুরুষ বসে খায়, তারা নিষ্কর্মা থেকে থেকে কর্মশক্তির অপচয় করে। এভাবে জাতির পুরুষ শক্তির অপচয় করার মতো আত্মঘাতী নীতি আর কিছু হতে পারে না। অথচ এসব কাজে নারীর পরিবর্তে পুরুষকে নিয়োগ করা হলে একদিকে যেমন জাতির বৃহত্তর কর্মশক্তির সঠিক প্রয়োগ হবে, বেকার সমস্যার সমাধান হবে, তেমনি হবে নতুন দম্পতি ও নতুন ঘর-সংসার-পরিবার প্রতিষ্ঠা। এক-একজন পুরুষের উপার্জনে খেয়ে পরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে পারবে বহু নর, নারী, শিশু। এতে করে পুরুষদের কর্মশক্তির যেমন হবে সুষ্ঠু প্রয়োগ, তেমনি নারীরাও পাবে তাদের স্বভাব-প্রকৃতি ও রুচি-মেজাজের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ কাজ। এভাবেই নারী আর পুরুষরা বাস্তবভাবে হতে পারে সমাজ শংকটের সমান ভারপ্রাপ্ত চাকা। যে সমাজে এরূপ ভারমাস্য স্থাপিত হয়, সে সমাজ শকট (গাড়ি) যে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুতগতিতে মঞ্জিলে মকসুদ পানে ধাবিত হতে পারে, পারে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির উচ্চতম প্রকোষ্ঠে আরোহণ করতে, তা কোনো সমাজ অর্থনীতিবিদই অস্বীকার করতে পারেনা।

তাই এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক ও জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নারীদের ভীড় জমানো কোনো কল্যাণই বহন করে আনতে পারে না— না সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিতে, না নিতান্ত অর্থনৈতিক বিচারে।

এ নীতিগত আলোচনার প্রেক্ষিতে আধুনিক ইউরোপের এক বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করা কম রুচিকর হবেনা।

এক বিশেষ রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে, লন্ডন শহরে ৭৫৭৩টি পানশালা রয়েছে। আর সেখানে কেবল মদ্যপায়ী পুরুষরাই ভীড় জমায় না, বিলাস-স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়া বহু নারীও সেখানে পদধুলি দিতে কসুর করে না। লন্ডনে নারী মদ্যপায়িনীর সংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বর্তমানে তাদের জন্যে বিশেষ পানশালা প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। কিন্তু নারীদের জন্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত এ পানশালা সমূহে কেবলমাত্র সাদাসিধে গৃহকর্ত্রীরাই এসে থাকে। বিলাসী যুবতী ও চটকদার রসিক মেয়েরা কিন্তু সাধারণ পানশালাতেই উপস্থিত হয়। নারীদের মদ্যপান স্পৃহার এ তীব্রতা প্রথমে গুরুতর বলে মনে করা হয়নি। বরং মনে করা হয়েছে, তাদের এ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাইলে ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে। কিন্তু মদাসক্ত ও অভ্যস্ত মদ্যপায়িনী নারীদের স্বামীরা এখন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তারা তাদের স্ত্রীদের এ মদাসক্তির ফলে তাদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন ধ্বংশোন্মুখ হতে দেখতে পাচ্ছে। তারা অনুভব করছে— পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক আবেগপ্রবণ ও অটল স্বভাবের হয়ে থাকে। ফলে তারা খুব সহজেই অভ্যস্ত মদ্যপায়িনীতে পরিণত হচ্ছে। আর তাদের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হচ্ছে, পারিবারিক বাজেট শূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং সর্বোপরি ঘর-সংসারের শৃঙ্খলা মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হচ্ছে।

এ মদ্যপায়ী নারীদের অধিকাংশই হচ্ছে তারা, যারা শহরের বিভিন্ন অফিসে নানা কাজে নিযুক্ত রয়েছে। তাদের অফিস গমনের ফলে অফিসের নির্দিষ্ট সময় তাদের ঘর-সংসার তাদের প্রত্যক্ষ

দেখাশোনা, পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। অফিসের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে তারা পানশালায় গমন করে। আর রাতের বেশির ভাগ সময়ই তারা অতিবাহিত করে মদের নেশায় মত্ত হয়ে। ফলে না থাকে তাদের স্বামীদের প্রতি কোনো আগ্রহ আকর্ষণ ও কৌতুহল, না শিশু সন্তানদের জন্য কোনো মায়া-মমতা তাদের মনে।

এসব স্ত্রীর স্বামীরাই নিজেদের সান্ধ্যকালীন ও নৈশ একাকীত্ব ও নিঃসংগতাকে ভরে তোলে, সরল ও রঙীন করে তোলে নৈশ ক্লাবে গমন করে। ফলে এদের সন্তানদের মনে মা-বাবা ও নৈতিক মূল্যমানের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাভক্তি থাকতে পারে না। বর্তমান ইউরোপের নতুন বংশধররা যে সামাজিক পারিবারিক বন্ধনের বিদ্রোহী হয়ে উঠছে, শত্রু হয়ে উঠছে নৈতিকতা শালীনতা পবিত্রতার, আসলে তারা পূর্বোক্ত ধরনের মদ্যপায়ী মা-বাবার ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেছে। বর্তমান ইউরোপ এ ধরনেরই নৈতিকতার সব বাঁধন বিধ্বংসী ময়লার স্রোতে রসাতলে ভেসে যাচ্ছে। ইউরোপের সবচেয়ে বড় সম্পদ শক্তি এটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমাও এ স্রোতকে রুখতে পারে না, ঠেকাতে পারে না ইউরোপ-আমেরিকার নিশ্চিত ধ্বংসকে। দৈনিক কুহিস্তান, লাহোর, দৈনিক দাওয়াত, দিল্লী-১৩-৪-৬৫ইং

রাজনীতি ও নারী সমাজ

রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহ মানব সমাজের জন্যে সাধারণভাবেই অত্যন্ত জরুরী এবং অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের প্রাথমিক যুগে পুরুষদের সমান মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও নারী সমাজ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছে বলে কোনো প্রমাণ নেই। রাসূলে করীম(স)-এর ইন্তেকালের পরে পরে সাকীফায় বনী সায়েদায় অনুষ্ঠিত খলীফা নির্বাচনী সভায় মহিলারা যোগদান করেছে বলে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়নি। খুলাফায়ে রাশেদুনও জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি মীমাংসার্থে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভাসমূহেও নারী সমাজের সক্রিয়ভাবে যোগদানের কোনো উল্লেখ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখতে পাওয়া যায় নি। রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জটিলতার বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে— এমন কথাও কেউ বলতে পারবে না।

অথচ ইতিহাসে— কেবল ইতিহাসে কেন, কুরআন মজীদেও— এ কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যে, নবী করীম(স) পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদের নিকট থেকেও ঈমান ও ইসলামী আদর্শানুযায়ী জীবন যাপনের 'বায়'আত'— ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি— গ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিন এরূপ এক 'বায়'আত' গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ 'বায়'আতে' নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অংশ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এসব কথাকে যারা 'মেয়েরাও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছে' বলে প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে চান, তারা মরুভূমির বুকের ওপর নৌকা চালাতে চান, বলা যেতে পারে।

ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ অবশ্যই পওয়া যায় যে, রাসূলের জামানায় পুরুষদের মতোই কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবীও রাসূলে করীম (স)-এর অনুমতিক্রমেই যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে তাঁরা যোদ্ধাদের পানি পান করানোর কাজ করেছেন, নানা খেদমত করেছেন, নিহত ও আহতদের বহন করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তারা তাদের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। রুবাই বিন্‌ত মুয়াকেয (রা) বলেন ঃ

كُنَّا نَغْزُوْمَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنُسْقِى الْقَوْمَ وَنَخْدِ مُهُمْ وَنَرُدُّ وَالْجُرْحٰى الْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ - (بخارى)

আমরা মেয়েরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করেছি। আমরা সেখানে লোকদের পানি পান করানো, খেদমত ও সেবা-শুশ্রূষা ও নিহত-আহতদের মদীনায় নিয়ে আসার কাজ করতাম।

হযরত উম্মে আতীয়াতা আনসারী বলেন ঃ

غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَخْلُفُهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ فَاَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَ اُدَاوِى الْجَرْحٰى وَ اَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى - (مسلم)

আমি রাসূলে করীম (স)-এর সাথে একে একে সাতটি যুদ্ধে যোগদান করেছি। আমি পুরুষদের পিছনে তাদের জন্তুযানে বসে থাকতাম, তাদের জন্যে খাবার তৈরী করতাম, আহতদের ঔষধ খাওয়াতাম ও রোগাক্রান্তদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম।

হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম খঞ্জর নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ

اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ خَنْجَرًا - (مسلم)

উম্মে সুলাইম হুনাইন যুদ্ধের দিন খঞ্জর হস্তে ধারণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ

هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْ بِالنِّسَاءِ -

রাসূলে করীম (স) কি মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে গমন করতেন ?

জবাবে তিনি জানিয়েছিলন ঃ

وَقَدْ كَانَ يَغْزُوْ بِهِنَّ فَيُدَاوُ مَنَّ الْجَرْحٰى - (مسلم)

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মেয়েলোকদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যেতেন। মেয়েরা সেখানে আহতদের ঔষধ দেয়ার কাজ করত।

অনেক সময় যুদ্ধের ময়দানের একদিকে তাঁবু ফেলা হতো এবং তাতে মেয়েরা অবস্থান করত। কেউ অসুস্থ বা আহত হলে তাকে সেখানে স্থানান্তরিত করার জন্যে রাসূলে করীম (স) নির্দেশ দিতেন।

ঐতিহাসিক এবং প্রামাণ্য হাদীসের কিতাবে এ সব ঘটনার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, ইসলামী সমাজে মহিলাদের পক্ষে প্রকাশ্য রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে যোগদান করা শরীয়তসম্মত। এ থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে কেবলমাত্র জরুরী পরিস্থিতিতে— যুদ্ধ জিহাদে সাধারণ ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর, গোটা সমাজ ও জাতি যখন জীবন মরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে, তখন পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও কর্তব্য তার মুকাবিলা করার জন্যে বের হয়ে পড়া। আর ঠিক এরূপ পরিস্থিতিতে এহেন কঠিন সংকটপূর্ণ সময়ে— তা যখনই যেখানে এবং ইতিহাসের যে কোনো স্তরেই হোক না কেন— নারীদের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া অপরিহার্য এবং ইসলামী শরীয়তেও তা জায়েয, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এ হচ্ছে নিতান্তই জরুরী পরিস্থিতির (Emergency time) ব্যাপার এবং জরুরী পরিস্থিত হচ্ছে বিশেষ (extraordinary situation) আর বিশেষ পরিস্থিতি যেমন সাধারণ পরিস্থিত নয়, তেমনি বিশেষ পরিস্থিতি যা কিছু সঙ্গত, যা করতে মানুষ বাধ্য হয়, না করে উপায় থাকে না, তা সাধারণ পরিস্থিতিতে করা কিংবা তা করার জন্যে আবদার করা কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না, যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক দলীল থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে মুসলিম মহিলারা যোগদান করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে তারা আলাদাভাবে পুরুষদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তারা পুরুষদের সঙ্গে দুধে-কলায় মিশে একাকার হওয়ার মতো

অবস্থায় পড়েন নি, পড়তে রাজি হন নি। তাঁরা রোগী ও আহতের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন, ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়েছেন, ব্যান্ডেজ বেঁধেছেন আর এসবই তারা করেছেন যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের ময়দানে, নিতান্ত জরুরী পরিস্থিতিতে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সকল কালের মুসলিম মহিলাদের পক্ষে যে বিশেষ ধরনের কাজ করা সঙ্গত, আজও এ নিয়মে কোনোরূপ রদবদল করার প্রয়োজন নেই, কোনো দিনই সে প্রয়োজন দেখা দেবে না, কেউ সে কাজ করতে নিষেধও করবে না। কিন্তু এ সময়ের দোহাই দিয়ে সাধারণভাবে মেয়েদেরকে রাজনীতিতে ও রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক জটিল ব্যাপারাদিতে টেনে আনতে চেষ্টা করলে তা যেমন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তেমনি তার পরিণামও কখনো শুভ হতে পারে না।

আমরা এও জানি, ইসলামের প্রথম পর্যায়ে মেয়েরাও পুরুষদের ন্যায় বিরাট কুরবাণী দিয়েছেন। দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যার কোনো তুলনা হয় না। তাঁরা মেয়ে মহলে ইসলাম প্রচারের কাজও করেছেন, এখনো করবেন— করতে কোনোই বাধা নেই; বরং এজন্যে দেয়া নির্দেশ চিরদিনই বহাল থাকবে। কিন্তু তাই বলে তাদের প্রকাশ্য রাজনীতির ময়দানে টেনে আনা, রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্ম তৎপরতায় শরীক করা কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না। কেননা তা করতে গেলে তাদের দ্বারা পারিবারিক জীবনের গুরুদায়িত্ব পালন সম্ভব হবে না। আর মেয়েদের বৃহত্তম দায়িত্ব হচ্ছে পারিবারিক দায়িত্ব পালন। যে কাজে তা যথাযথভাবে পালন করা নিশ্চিতভাবে বিঘ্নিত হবে, তা করতে যাওয়া নারী জাতির নারীত্বেরই চরম অবমাননা, সন্দেহ নেই।

রাসূলের যামানায় মেয়েরাও ঈদের জামা'আতে শরীক হয়েছে, রাসূলে করীমের ওয়ায-নসীহত শোনবার জন্যে উপস্থিত হয়েছে,— এখনো এ কাজ হতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেই মেয়েরা যেমন পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রয়েছে, তেমনি পর্দা ব্যাহত হতে পারে— এমনভাবে আজো করা চলবে না।

যুদ্ধের ময়দানে মেয়েরা গিয়েছে, নার্সিং, সেবা-শুশ্রুষার কাজ করেছে, ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধেছে, কিন্তু প্রত্যেক মেয়েই করেছে তার নিজস্ব মুহাররম পুরুষের। আর ভিন পুরুষের মধ্যেও তা করে থাকলে তাতে তার পর্দার হুকুম অমান্য হতে দেয়নি। আল্লামা নববী লিখেছেন ঃ

وَهٰذِهِ الْمُدَوَاةُ لِمَحَارِمِهِنَّ اَزْوَاجِهِنَّ وَمَا كَانَ لِغَيْرِهِمْ لَا يَكُوْنُ فِيْهِ مَسُّ الْبِشْرَةِ اِلَّا فِيْ مَوْضَعِ الْحَاجَةِ -

(بنوى : ج-٢، ص-١١٦)

মেয়েদের এ ঔষধ খাওয়ানো বা লাগানোর কাজ হতো তাদের মুহাররম পুরুষদের জন্যে— তাদের স্বামীদের জন্যে। এদের ছাড়া আর কারো জন্যে তা করা হলে তা স্পর্শকে এড়িয়ে চলা হয়েছে। আর স্পর্শ করতে হলেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থানে করা হয়েছে।

একথাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) 'জামাল' যুদ্ধে এক পক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, তিনি তা করেছেন উষ্টের পৃষ্টে 'হাওদাজের' মধ্যে বসে পর্দার অন্তরালে থেকে। প্রকাশ্যভাবে পুরুষদের সামনে তিনি বের হন নি, তাদের সঙ্গে তিনি খোলামেলাভাবে মিলিতও হন নি।

দ্বিতীয়ত তিনি যা কিছু করেছিলেন, পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই সে সম্পর্কে গভীরভাবে অনুতাপ করেছেন। কেননা প্রথমত নারী আর দ্বিতীয়ত রাসূলের বেগম হিসেবে তাঁর ঘর ছেড়ে যুদ্ধের ময়দানে বের হয়ে পড়া সঙ্গত ছিল না। এজন্যে তিনি আল্লাহ্র কাছে দোষ স্বীকার করে তওবাও করেছেন।

কাজেই তাঁর এ কাজকে একটি প্রমাণ বা দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে না এবং এর ভিত্তিতে বলা যেতে পারে না যে, মেয়েদেরও রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ঝামেলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

কেননা এ হচ্ছে একটি দুর্ঘটনা, একটি ভুল— ভুলবশত করা একটি কাজ। আর তা থেকে কখনো সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে না।

ইসলাম ও মুসলিম জাতির ইতিহাসে এমন সব অধ্যায়ও অতিবাহিত হয়েছে, যখন মেয়েলোক কোনো রাষ্ট্রের কর্ত্রী হয়ে বসেছেন। এঁদের অনেকে আবার তাদের স্বামীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রাজ্য শাসনের কর্তৃত্ব দখল করেছে। শিজ্‌রাতুত-দূর ও হারুন-অর রশীদের স্ত্রী জুবাইদার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু এসবও নিতান্তই আকস্মিক ও অসাধারণ ব্যাপার, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বিশেষ। তাদের এ কাজ ইসলামী শরীয়তের দলীল হতে পারে না। কেননা প্রথমত স্বামীর ওপর প্রভাবের ফলেই তা হওয়া সম্ভব হয়েছিল, সরাসরি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ফলে নয়। অথচ আজকের দিনের রাজনীতিতে তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করছে। দ্বিতীয়ত কোনো মুসলিমের শরীয়ত বিরোধী কাজের অনুসরণ করতে মুসলমানরা বাধ্য নন।

এ আলোচনার ফলে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, মুসলিম মহিলাদের রাজনীতিতে কার্যত অংশ গ্রহণ সঙ্গত নয়, সমীচীন নয়। নয় বলেই অতীত ইতিহাসে মেয়েদেরকে রাজনীতির ঝামেলা-জটিলতা পড়তে দেখা যায়নি। কিন্তু কেন ? ইসলাম নারীদের মর্যাদা উন্নত করেছে, পুরুষদের দাসত্ববৃত্তি থেকে তাদের চিরদিনের তরে মুক্তি দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এরূপ হওয়ার কারণ কি ?

ইসলাম মহিলাদের হারানো সব অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে, উপযুক্ত মানবীয় মর্যাদা দিয়ে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সমাজের ওপর, পুরুষের সমান মৌলিক অধিকার দিয়েছে— এ সবই সত্য; কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামী রাজনীতির ঝামেলা-সংকুল জটিলতা থেকে মহিলাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখাতেই নিজেদের, জাতির এবং গোটা মানব সমাজের কল্যাণ মনে করেছে। এ কারণেই তাদের ওপর অর্থোপার্জনের দায়িত্ব চাপানো হয়নি, বরং তা পিতা, ভাই, স্বামী, পুত্র ও নিকটাত্মীয় মুরব্বী গার্জিয়ানের উপর অর্পণ করা হয়েছে। যদিও ক্রয়-বিক্রয় ও কামাই-রোজগার করার যোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে তাদের রয়েছে এবং কাজ হিসাবে এগুলো কোনো অন্যায় বা নাজায়েয কিছু নয়, তবুও মেয়েদেরকে এসব ব্যাপারের দায়িত্ব দিয়ে পারিবারিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা, পবিত্র-সমৃদ্ধি বিনষ্ট করতে ইসলাম রাজি নয়। নারী পিতা ও ভাইয়ের আশ্রয়ে লালিতা-পালিতা হবে এবং স্বামীর ঘর করার জন্যে তৈরী হবে দেহ ও মনে। বিয়ের পর সে হবে স্বামীর ঘরের রাণী, কর্ত্রী, সন্তানের স্নেহময়ী জননী— এই তার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা। পিতা ও ভাইয়ের সে গলগ্রহ নয়, অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী, আদরের ধন। আর স্বামীর ঘরেও সে দয়ার পাত্রী নয় কারো। সে পালন করবে তার নিজের দায়িত্ব আর স্বামী পালন করবে তার নিজের দায়িত্ব। সে আদায় করবে স্বামীর অধিকার। ফলে তা মনিবী আর দাসত্বর ব্যাপার হয় না, হয় দুই সমান সত্তার পারস্পরিক অধিকার আদায়ের অংশীদারিত্ব। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তিও এখানেই নিহিত। ঘর ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে অপর কারো কাছে চাকরি-বাকরি করে নির্দিষ্ট পরিমাণে কিছু টাকা মাসান্তর নিজ হাতে পাওয়াই নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হতে পারে না। নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি বলতে যাঁরা এটাকে মনে করেন তাঁরা নারী হলে কঠিনভাবে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত এবং পুরুষ হলে তারা মস্তবড় প্রতারক।

ইসলাম নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করেনি। তা না করেই তার মর্যাদাকে উন্নত করেছে, তার সামাজিক মান-সম্ভ্রমকে রক্ষা করেছে। কিন্তু পুরুষরা যেসব কাজ করে ও যেখানে যেখানে করে সেখানে সেখানে ও সে সব কাজে যোগ দিয়ে নারীকে ঘরবাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেনি। রাজনৈতিক অধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে অধিকার আদায় ও ভোগ করতে গিয়ে পারিবারিক দায়িত্বে অবহেলা জানাবার অধিকার দেয়া হয়নি। তাদের রাজনীতির নেত্রী, রাষ্ট্রের কর্ত্রী আর রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার পরিবর্তে কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মা হওয়াই যে তাদের জীবনের কল্যাণ ও সার্থকতা নিহিত— একথা

উপলব্ধি করার জন্যে ইসলাম তাদের প্রতি তাগিদ জানিয়েছে। আর তাই হচ্ছে চিরদিনের তরে বিশ্ব মুসলিম মহিলাদের অনুসরণীয় আদর্শ। তা সত্ত্বেও তারা মাতৃভূমির রাজনীতি— রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ও উদাসীন হয়ে থাকবে, সে ব্যাপারে তাদের কোনো সচেতনতাও থাকবে না, এমন কথা কিন্তু ইসলাম বলেনি। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মত জানাবার সাধারণ সুযোগকালে তাকেও স্বীয় মত জানাতে হবে। তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

ভোটদানের অধিকার

দেশের জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান ও আইন পরিষদসমূহের সদস্য কিংবা দেশের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা নির্বাচনের ব্যাপারে নারীদেরও ভোটদানের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার দান ইসলামের বিপরীত কিছু নয়। কেননা নির্বাচন শরীয়তের দৃষ্টিতে উকীল নির্ধারণের (فـوكـيـل) মতোই। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা উচ্চতর স্তরে আইন প্রণয়ন করে ও জনগণের অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আর ইসলামের দৃষ্টিতে এ কোনো নিষিদ্ধ কাজ নয় যে, সে একজনকে উকিল নিযুক্ত করবে, সে গিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে নারীর মতামত, ইচ্ছা-বাসনা, আশা-আকাংক্ষা এবং প্রয়োজন ব্যাখ্যা করবে এবং তার অধিকার রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

এ ব্যাপারে একটি মাত্র বিষয়ই দূষণীয় আর তা হচ্ছে ভোটদানের সময় ভিন পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও মেলা-মেশার আশংকা এবং তার ফলে পর্দা নষ্ট হওয়া। কিন্তু এ আশংকা যদি না থাকে, যদি তাদের ভোটকেন্দ্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কায়েম করা হয় এবং সেখানে পর্দার যাবতীয় নিয়ম-বিধান রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকে, তাহলে পর্দা সহকারে ভোটকেন্দ্রে গমন ও নিজ ইচ্ছামতো যে কোনো প্রার্থীকে ভোট দান করায় কোনো দোষ থাকতে পারে না।

জন-প্রতিনিধি হওয়ার অধিকার

পর্দা রক্ষা করে ভোট দান করা যদি নারীদের পক্ষে দূষণীয় এবং আপত্তিকর কিছু না হয়, তাহলে সে নারীর পক্ষে বিভিন্ন পরিষদে ও নির্বাচনী সংস্থার প্রতিনিধি হওয়া কি দূষণীয় হবে?

এ প্রশ্নের জবাব দানের পূর্বে প্রতিনিধিত্ব ও জাতীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করে নেয়া আবশ্যক।

মনে রাখা দরকার, প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্বের দুটো প্রধান দায়িত্ব রয়েছে। একটি হচ্ছে আইন প্রণয়ন, জাতীয় শাসন-বিচার ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে জরুরী নিয়ম-নীতি রচনা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে পর্যবেক্ষণ, প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ, ক্ষমতা প্রয়োগ ও জনসাধারণের সাথে তার আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জটিল বিষয়ের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করা।

প্রথম পর্যায়ের দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং বিদ্যা অপরিহার্য। একদিকে যেমন ব্যক্তিগতভাবে জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির এবং অপরদিকে সমষ্টিগতভাবে গোটা জাতির সমস্যা, জটিলতা ও প্রয়োজনাবলী সম্পর্কে সূক্ষ্ম, নির্ভুল ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আবশ্যক। আর একজন নারীর পক্ষে এ জ্ঞান অর্জন নিষিদ্ধ যেমন নয়, তেমনি কঠিন বা অসম্ভবও কিছু নয়। উপরন্তু ইসলাম নির্বিশেষে সকলকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের অধিকারই দেয় না, তা ফরয বলেও ঘোষণা করেছে। অতএব বলা যায়, নারীর পক্ষে আইন-প্রণেতা— আইন পরিষদের সদস্য হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়। ইসলামের ইতিহাসে এমন বহু সংখ্যক নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ও ইসলামী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছেন।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ, এ কাজের সারকথা হচ্ছে "আম্‌র বিল মারুফ ও নিহি আনিল মুন্‌কার"— ভালো ও ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দান এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে

নিষেধকরণ। আর ইসলামে এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْ مِنتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - (التوبة : ٧١)

মু'মিন পুরুষ স্ত্রী পরস্পরের সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক; সকলে মা'রুফ কাজের আদেশ করে ও অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে নিষেধ করে।

এ আয়াতে মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীদের সমান পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সকলের জন্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজের রূপ ও প্রকৃতি একই নির্ধারণ করা হয়েছে। পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের বন্ধু, সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দ্বীন পালন, দ্বীন প্রচার ও দ্বীনের বিপরীত কার্যাদির প্রতিরোধের ব্যাপারে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা পুরুষ ও নারীর স্থায়ী পরিচয় এবং গুণ। এ আয়াত অনুযায়ী কাজ করা পুরুষ স্ত্রী— সকলেরই কর্তব্য। অতএব ইসলামে এমন কোনো সুস্পষ্ট দলীল নেই, যার ভিত্তিতে মেয়েদের 'প্রতিনিধি' (Representative) হওয়ার অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা যেতে পারে, সে প্রতিনিধির কাজ আইন প্রণয়ন ও শাসন কার্য পরিচালন, পর্যবেক্ষণ— যাই হোক না কেন, তাদের এ কাজের যোগ্যতা নেই, তা বলারও কোনো ভিত্তি নেই।

কিন্তু বিষয়টিকে অপর এক দৃষ্টিতে বিচার করে দেখা যায় যে, নারীর এ ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রয়োগ করার পথেই ইসলামের প্রাথমিক নিয়ম-কানুন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যোগ্যতা না থাকার কারণে এ বাধ্য নয়, বাধা হচ্ছে সামাজিক ও সামগ্রিক কল্যাণের দৃষ্টি।

নারীর স্বাভাবিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে তাকে অন্যসব দিকের ছোট বড় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে থাকতে হবে এবং তার সে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কোনো প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি করা কিছুতেই উচিত হবে না।

'প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা নারীর আছে'— স্বীকার করলেও প্রশ্ন থেকে যায়, এ কাজ করতে গিয়ে তার অপরাপর স্বাভাবিক দায়িত্বসমূহ পালন করা তার পক্ষে সম্ভব কি? তাকে পারিবারিক জীবন যাপন, গর্ভ ধারণ, সন্তান প্রসব, সন্তান পালন ও ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষ তৈরীর কাজ সঠিকভাবে করতে হলে তাকে কিছুতেই প্রতিনিধিত্বের ঝামেলায় নিক্ষেপ করা যেতে পারে না। আর যদি কেউ সেখানে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে তার পক্ষে সেই একই সময় উপরোক্ত স্বাভাবিক দায়িত্বসমূহ পালন করা সম্ভব নয়।

নারীকে এ কাজে টেনে আনলেও এ দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করতে হলে তাকে অবশ্যই ভিন্ পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশা করতে হবে, নিরিবিলি ও একাকীত্বে সম্পূর্ণ গায়র-মুহাররম পুরুষদের সাথে একত্রিত হতে হবে। আর এ দুটো কাজই ইসলামে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। এমন কি মুখমণ্ডল ও হাত-পা ভিন্ পুরুষে সামনে উন্মুক্ত করা— যা না হলে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব কিছুতেই পালন হতে পারে না— একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তা নয়, তাকে একাকী ভিন্ পুরুষদের সাথে— নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে ভিন্ন ও দূরবর্তী শহরেও গমন করতে হবে। কিন্তু ইসলামে তাও কিছুমাত্র জায়েয নয়।

এ চারটি ব্যাপারে ইসলামী সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত ও একান্তই মৌলিক এবং এ কারণে নারীর পক্ষে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন— হারাম না হলেও— কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোনো মুসলিম নারীই এসব মৌলিক নিষেধকে অস্বীকার করে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হবার সাহস করতে পারে না। অতএব বলা যায়, জাতীয় প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা নারীর রয়েছে বটে;

কিন্তু একদিকে নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতা, অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা এবং অপরদিকে প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ প্রকৃতির দৃষ্টিতে নারীকে এ কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং স্বতন্ত্র করে রাখায়ই জাতীয় ও ধর্মীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আরো গভীরভাবে নারীর প্রতিনিধি হওয়ার পরিণাম চিন্তা ও বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এর ক্ষতি ব্যাপক এবং অত্যন্ত ভয়াবহ।

নারী যদি প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে চায়, তাহলে প্রথমত তাকে তার ঘর-বাড়ি, শিশু-সন্তান ছেড়ে বাইরে যেতে হবে। এর ফলে অবহেলিত ঘর-বাড়ি ও সন্তান স্বামীর সঙ্গে অন্তর মনের দূরত্ব এক স্থায়ী ভাঙ্গনের সৃষ্টি করতে পারে। এতদ্ব্যতীত স্বামীর সাথে রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে পারস্পরিক কঠিন মনোমালিন্য অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকার এক নির্বাচনে কোনো এক স্ত্রী তার স্বামীকে হত্যা করে শুধু এ কারণে যে, স্ত্রী স্বামীর বিপরীত এক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনে দলের প্রার্থী হয়েছিল এবং এজন্যে উভয়ের মধ্যে বিরাট ঝগড়া ও বিবাদের সৃষ্টি হয়। বস্তুত নারীকে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক তৎপরতায় যোগদান করতে দিলে পারিবারিক জীবনে যে ভাঙন ও বিপর্যয় দেখা দেবেই, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

নারীর পক্ষে এ কাজ আরো অবাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে তখন, যখন নারী হয় যুবতী ও সুন্দরী। নারীর রূপ-সৌন্দর্যকে নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রে জয়লাভের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিশেষত সেই যুবতী সুন্দরী নারী নিজেই যদি নির্বাচনে প্রার্থী হয়, তাহলে তার গুণাগুণ বিচার না করে কেবল এ রূপের জন্যে মুগ্ধ একদল যুবক কর্মী তার চারপাশে একত্রিত হয়ে যাবে, মধুর চাকার সঙ্গে যেমন জড়িয়ে থাকে মৌ-পোকার দল। আর এর পরিণাম নৈতিক-রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই যে কত মারাত্মক হতে পারে, তা বিশ্লেষণ করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

জনগণের প্রতিনিধিত্ব নারীর পক্ষে যারা সহজ কাজ বলে ধারণা করে, তারা প্রতিনিধিত্বের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে কিছুমাত্র সচেতন নয় বলে ধরা যেতে পারে। প্রতিনিধিদের একদিকে যেমন পদের দায়িত্ব পালন করতে হয়, অপর দিকে তার চাইতেও বেশি নির্বাচকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ ও তাদের মন সন্তুষ্টি সাধনের প্রতি পুরাপুরি লক্ষ্য আরোপ করতে হয় অন্যথায় এ দুটো দিকই সমানভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হবে এবং এ প্রতিনিধিত্ব হবে শুধু নামে মাত্র, কার্যত তা কিছুই হবে না। কিন্তু চিন্তার বিষয় এটা যে, নারীর পক্ষে কি এ দুটো দিকেরই দায়িত্ব সমান গুরুত্ব সহকারে একই সঙ্গে প্রতিপালিত হওয়া বাস্তবিকই সম্ভব; পার্লামেন্টের পরিষদের বৈঠক সমূহে কেবল উপস্থিত থাকাই কি তার পরবর্তী সাফল্যের জন্যে যথেষ্ট ?

এতদ্ব্যতীত সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন, এহেন প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সম্পন্ন নারীর পক্ষে কি কারো সফল স্ত্রী হওয়া এবং সন্তানের মা হওয়া সম্ভব ? অন্য কথায়, সেই নারী যদি কারো স্ত্রী এবং সন্তানের মা হয়, তাহলে একদিকে ঘরের ভিতরকার বিবিধ দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের প্রতিনিধি হওয়ার দায়িত্বও পূর্ণমাত্রায় পালন করতে হবে; কিন্তু তা কি বাস্তবিকই সম্ভব হতে পারে ? আর তা যদি সম্ভবই না হয়,— আর কেবল বলতে পারে যে, তা সম্ভব ?— তাহলে জনপ্রতিনিধিত্বশীল নারীকে কি স্ত্রী ও মা হওয়ার দায়িত্ব বা অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে হবে ? বঞ্চিত রাখা হলে তা কি তার স্বভাব-প্রকৃতির দাবির বিপরীত পদক্ষেপ হবে না ? আর ঘরের এসব দায়িত্ব পালন সহকারেও যদি প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব তার মাথায় চাপানো হয়, তাহলে তার প্রতিনিধিত্বের কাজকে কি প্রতি মাসে দশদিন এবং বছর-দুবছরে অন্তত একবার করে দশ বারো মাসের জন্যে মুলতবী রাখা হবে ? কেননা নারীর জন্যে— বিশেষ করে বিবাহিতা নারীর পক্ষে এ তো একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার। এ সময় গুলো নারীর পক্ষে বড়ই সংকটের সময়। এ সময় নারীর মেজাজ প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই বিগড়ে যায়। প্রায় সব কাজ থেকেই তার মন মেজাজ থাকে বিরূপ, কিছুই তার ভালো লাগে না এ সময়ে।

এমতাবস্থায় তার পক্ষে বাইরে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের জন্যে বছরে কতটুকু নিরংকুশ অবসর নির্লিপ্ততার সময় পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

এতসব ঝামেলা অনিবার্য হওয়া সত্ত্বেও নারীকে রাজনীতির এ চক্রজালে জড়িয়ে দেয়ায় জাতির ও সমাজের যে কি শুভ ফল লাভ হতে পারে, তা বোঝা কঠিন। তারা কি এক্ষেত্রে এতই দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছে যে, সেই কাজ তাদের বাদ দিয়ে কেবল পুরুষদের দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়?— কী এমন সে কাজ যা পুরুষরা করতে সক্ষম নয়?.......কে এর জবাব দেবে?

কেউ কেউ বলেন, এতে করে নারীর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, নারী মানুষ হওয়ার— সমাজের, দেশের পুরুষদের সমপর্যায়ের সদস্য বা নাগরিক হওয়ার বোধ লাভ করতে পারে।

আমরা প্রশ্ন করব, নারীদের যদি প্রতিনিধিত্বের ময়দানে, রাজনীতির মঞ্চে অবতরণ থেকে বঞ্চিতই করে দেয়া হয়, তাহলে তাতে কি একথাই প্রমাণিত হবে যে, নারীর না আছে কোনো সম্মান, না মনুষত্ববোধ? প্রত্যেক জাতির পুরুষদের মধ্যেই কি একটি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এমন থাকে না, যাদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ কেউই মেনে নিতে রাজি নয়?..... যেমন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মচারী এবং সৈন্যবাহিনী? তাহলে তাদের সম্পর্কে কি ধরে নিতে হবে যে, তাদের কোনো সম্মান নেই আর নেই তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ।

বস্তুত প্রত্যেক সমাজে ও প্রত্যেক জাতিরই অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুতা বিধান ও যাবতীয় কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করানোর জন্যে কর্মবন্টন নীতি অবশ্যই কার্যকর করতে হয়। এ নীতি অনুযায়ী কোনো মানব সমষ্টিকে (group of people) কোনো বিশেষ কাজের দায়িত্ব দিলে এবং এ দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে— এমন সব কাজ থেকে তাদের দূরে রাখা হলে তাতে তাদের না মান-সম্মান নষ্ট হতে পারে, না তাদের মনুষ্যত্ব লোপ পেতে পারে আর না তাদের কোনো হক্ (Right) নষ্ট বা হরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা যেতে পারে। ঠিক এ দৃষ্টিতেই নারী সমাজকে যদি তাদের বৃহত্তর ও স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে স্বামী ও সন্তানের অধিকার রক্ষার কারণে— বাইরের সব রকমের দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং রাখা হয় সমাজ, জাতি ও বৃহত্তর মানবতার কল্যাণের দৃষ্টিতে, তবে তাকে কি কোনো দিক দিয়েই অন্যায় বা জুলুম বলে অভিহিত করা যেতে পারে? সৈনিকদের যেমন রাজনীতির ঝামেলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়, কঠোর দৃঢ়তা সহকারে। সৈনিকদের রাজনীতি করতে না দেয়ায় যেমন কোনো লোকসান নেই? ঠিক তেমনিভাবে নারীদেরও যদি দূরে রাখা হয়, তবে তাতে কি জাতীয় কল্যাণের কোনো লোকসান হতে পারে।

এ পর্যায়ে যে শেষ কথাটি বলতে চাই, তা হলো এই যে, নারীদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে যে উৎসাহ আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে, তার কারণ ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ, পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মানসিক গোলামী এবং বিবেচনাহীন অযৌক্তিক আবেগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইউরোপে তো রেনেসাঁর প্রায় একশ বছর পর নারীরা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করেছে। জিজ্ঞেস করতে পারি কি, ইউরোপীয় সমাজে এ অভিজ্ঞতার কি ফল পাওয়া গেছে?

ইউরোপীয় সমাজ এ ব্যাপারে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভের পর এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে যে, নারীদের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের কোনো ফায়দা নেই, বরং পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহই হয়েছে ইউরোপে। সেখানে এর ফলে ঘর ভেঙ্গেছে, পরিবার ভেঙ্গেছে, পথে-ঘাটে সন্তান জন্মানোর কলংকের সৃষ্টি হয়েছে, আর রাজনীতিক নারীকে নিয়ে পুরুষদের মধ্যে টানাটানির হিড়িক পড়েছে। এক্ষেত্রে বৃটেনে ক্রীস্টান কীলারের ব্যাপারটি অতি সাম্প্রতিক ঘটনা, যেখানে নারীর সরাসরি রাজনীতিক হওয়ার ব্যাপার নেই, কেবলমাত্র এক রাষ্ট্রীয় দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে অবৈধ যোগাযোগের পরিণামই বৃটিশ সরকারের পক্ষে মারাত্মক হয়ে

দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে পর ফ্রান্সের নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন ঃ রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারিণী ও প্রভাব-শালিনা মেয়েরাই আমাদের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা একথা জোরের সঙ্গেই বলব, আমাদের সমাজে নারীদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে টেনে আনার ফলও অনুরূপ মারাত্মক হবে, এতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। জাতীয় বা জেলা পরিষদসমূহে নারীদের সদস্যপদের কার্যত কোনো সুফল হতে পারে না বলে তা যত তাড়াতাড়ি বন্ধ করা হবে, ততই মঙ্গল।

নারীর প্রতিনিধিত্বের সঠিক পন্থা

কিন্তু তাই বলে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব নারী করবে— এ অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করার কথা আমি বলতে চাইনি। বরং তাদের এ অধিকার সুষ্ঠুরূপে কার্যকর হতে পারে তখন, যখন নারীদেরকে নারীদেরই প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেয়া হয়। আর তা হতে পারে এভাবে যে, নারী সমাজের ভোটে কিছু সংখ্যক নারীকে নির্বাচিত করে তাদের সমন্বয়ে একটি মহিলা বোর্ড গঠন করা হয় এবং তাদের দায়িত্ব এই দেয়া হয় যে, তারা সাধারণভাবে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে নারীদের সাধারণ ও নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা ও শিশু পালন, শিশু শিক্ষা— তথা সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরদের গঠন-উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ তৈরী করে জাতীয় পরিষদের সামনে তদনুযায়ী আইন রচনার উদ্দেশ্যে পেশ করবে। আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় পরিষদের সদস্য করে দেশের সাধারণ কাজ-কর্মে নারীদের যদি নিয়োগ করা হয়, তাহলে তাদের প্রতিনিধিত্বের শুভ ফল ও বিশেষ কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হতে পারে এবং এ প্রতিনিধিত্বকারী মহিলাগণ নিজেদের পারিবারিক দায়িত্ব পালন থেকেও বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হবেন না।

ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের কাজের ভিত্তি পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর ফুফাত বোন ছিলেন হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা)। তিনি যেমন ছিলেন বিদূষী, বুদ্ধিমতি, তেমনি ছিলেন পুরামাত্রায় দ্বীনদার। তিনি একদিন রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে এসে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ

انی رسول من ورائی من جماعة نساء المسلمین کهن یقلن بقولی وعلی مثل رائی - ان الله تعالی بعثك الی الرجال والنساء فامنابك واتبعناك ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بیوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات اولادهم وان الرجال فضلو بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد واذا اخرجو للجهاد حفظنا اموالهم وربینا اولادهم افنشارك هم فی الاجر یارسول الله ؟ (الاستیعاب : ج-٢، ص-٧٠٦)

আমি আমার পশ্চাতে অবস্থিত মুসলিম নারী সমাজের প্রতিনিধি, তারা সকলেই আমার কথায় একমত এবং আমি তাদের মতই আপনার কাছে প্রকাশ করছি। কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি। আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনাকে অনুসরণ করে চলছি। কিন্তু আমরা— নারীরা— পর্দানশীল ও ঘরের অভ্যন্তরে বসে থাকি, পুরুষদের লালসার কেন্দ্রস্থল আমরা এবং তাদের সন্তানদের বোঝা বহন করি মাত্র। জুম'আ ও জানাযার নামায এবং জিহাদে শরীক হওয়ার একচ্ছত্র অধিকার পেয়ে পুরুষরা আমাদের ছাড়িয়ে গেছে অথবা তারা জিহাদের জন্যে ঘরের বাইরে চলে যায়, তখন আমরাই তাদের ঘর-বাড়ি দেখাশোনা করি এবং তাদের সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করি। এমতাবস্থায় সওয়াব পাওয়ার দিক দিয়েও কি আমরা তাদের সঙ্গে ভাগীদার হতে পারব হে

রাসূল?.........রাসূলে করীম (স) একথা শুনে উপস্থিত সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা অপর কোনো নারীকে কি এর অপেক্ষা অধিক সুন্দর করে দ্বীন-ইসলামের বিধান সম্পর্কে সওয়াল করতে পেরেছে বলে জানো ? তাঁরা সকলেই বললেন ঃ না, আল্লাহ্র শপথ হে রাসূল! অতঃপর রাসূলে করীম (স) হযরত আসমা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে আসমা, তুমি আমায় সাহায্য ও সহযোগিতা করো। যে সব নারী তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছে তাদেরকে আমার তরফ হতে একথা পৌঁছিয়ে দাও যে, ভালোভাবে ঘর-সংসারের কাজ করা, স্বামীদের সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করা এবং তাদের সাথে মিলমিশ রক্ষা করণার্থে তাদের কথা মেনে চলা— পুরুষদের যেসব কাজের উল্লেখ তুমি করেছ তার সমান মর্যাদাসম্পন্ন।

হযরত আসমা রাসূলে করীমের কথা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্টি সহকারে আল্লাহ্র প্রশংসা ও শোকর করতে করতে উঠে চলে গেলেন।

ইসলামী ইতিহাসের এ বিশেষ ঘটনা থেকে প্রথমত এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সমাজের নারীদের অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া ও মনের কথাবার্তা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের কাছে সুষ্ঠুরূপে পৌঁছাবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক এবং এ ব্যবস্থা হতে পারে তখন, যদি নারী সমাজেরই প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কোনো কোনো মহিলা বোর্ড গঠন করা হয় এবং তাদের এ কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়। এতদাপেক্ষা অপর কোনো ব্যবস্থা— জাতীয় পার্লামেন্ট পুরুষদের পাশাপাশি সকল বিষয়ে মাথা গলাবার সুযোগ বা দায়িত্ব দিয়ে তাদের আসল দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা কিছুতেই কল্যাণকর হতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়

পারিবারিক জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য

পারিবারিক জীবন যাপনের মুখ্যতম লক্ষ্য স্ত্রী-পুরুষের যৌন জীবনে পরম শান্তি, নির্লিপ্ততা, নিরবচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক অকৃত্রিম নির্ভরতা, উভয়ের মনের স্থায়ী শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ। কিন্তু একথাই চূড়ান্ত নয়। বরং বংশ সৃষ্টির সদ্যজাত শিশু-সন্তানদের আশ্রয়দান, তাদের সুষ্ঠু লালন-পালন ও পরিধানও এর চরম ও বৃহত্তম লক্ষ্যের অন্যতম। মানব সন্তানের জন্ম হয়ত বা পারিবারিক জীবন ছাড়াও সম্ভব, কিন্তু তার পবিত্রতা বিধান, সুষ্ঠু লালন-পালন, সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পারিবারিক জীবন ব্যতীত আদৌ সম্ভব নয়।

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তা থেকে সুস্পষ্ট মনে হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত জীবন যাপনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান জন্মদান। মানুষের বংশ বৃদ্ধি সম্ভবই হয়েছে আদি পিতা ও আদি মাতার স্বামী-স্ত্রী হিসেবে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে।

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি এ পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً - (النساء : ١)

হে মানুষ, তোমরা ভয় করো তোমাদের সেই পরোয়ারদিগারকে, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণী থেকে এবং সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জুড়িকে এবং এ দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক।

এখানে মানব সৃষ্টির ইতিহাস ও তত্ত্বকথা খুব সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আদমকে সৃষ্টি করলেন। এর পর তাঁরই থেকে সৃষ্টি করলেন 'হাওয়া'কে তাঁরই জুড়ি হিসেবে। পরে তাঁরা দু'জন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করতে থাকেন। এ স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের ফলেই দুনিয়ায় এ বিপুল সংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব ও বিস্তার লাভ সম্ভব হয়েছে।

কুরআনের উপস্থাপিত মানুষের এ ইতিহাস প্রথম নরনারী স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পারিবারিক জীবন যাপনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। দ্বিতীয়ত প্রমাণ করে যে, এ পারিবারিক জীবন যাপনও উদ্দেশ্যহীন নয়, পাশবিক লালসাসর্বস্ব নিরুদ্দেশ যৌন চর্চা নয়— বরং তার মূলে বৃহত্তর লক্ষ্য হচ্ছে সন্তান জন্মদান, সন্তানদের লালন-পালন, তাদের এমনভাবে যোগ্য করে তোলা, যেন তারা ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

বস্তুত প্রথম নর সৃষ্টির পরই তার জুড়ি হিসেবে প্রথম নারী সৃষ্টির তাৎপর্য এই হতে পারে। এই প্রথম মানব পরিবারে বিশজন পুত্র সন্তান এবং বিশজন কন্যা সন্তান (মোট চল্লিশজন) রীতিমত হিসাব করে দেয়া হয়েছিল[১] এ উদ্দেশ্যেই যে, এই প্রথম পরিবারটির পরেও যেন নরনারীর পারিবারিক জীবন

---

১. ইসহাক ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ولد لاوم اربعون ولد اعشرون غلاما وعشرون جاري – আদমের মোট চল্লিশটি সন্তান হয়, তাদের মধ্যে বিশজন ছেলে ও বিশজন মেয়ে।

যাপন অব্যাহত গতিতে চলতে পারে এবং সে সব পরিবারেও যেন ছেলে ও মেয়ের জন্মের ফলে পারিবারিক জীবন ধারার অগ্রগতি সম্ভব হতে পারে। অপর আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছেঃ

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ - وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ - (البقرة : ٢٢٣)

তোমাদের স্ত্রীলোক তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, অতএব তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন করো যেমন করে তোমরা চাও এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্যে এখনি ব্যবস্থা গ্রহণ করো। আল্লাহ্কে ভয় করো; ভালোভাবে জেনে রাখো, তোমরা সকলে নিশ্চয়ই একদিন তাঁর সাথে মিলিত হবে। আর ঈমানদার লোকদের সুসংবাদ দাও।

এ আয়াতে প্রথমত স্বামী-স্ত্রীর যৌন জীবনকে লক্ষ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ। কথাটি দৃষ্টান্তমূলক এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কুরআনের শব্দ حرث এর অর্থ হচ্ছে ঃ

اَلْقَاالْبَذْرِ فِى الْاَرْضِ وَ تَهَيُّؤُ هَا لِلزَّرْعِ - (مفردات : ص-١١٠)

জমিনে বীজ বপন করা এবং জমিনকে ফসলের উপযোগী করে তোলা।

আর কুরআনে স্ত্রীদের حرث বলা তাৎপর্য এই যে ঃ

فَبِالنِّسَاءِ زَرْعُ مَا فِيْهِ بَقَاءُ نَوْعِ الْاِنْسَانِ كَمَا اَنَّ بِالْاَرْضِ زَرْعُ مَابِهِ بَقَاءُ اَشْخَاصِهِمْ - (مفردات : ص - ١١١)

মেয়েলোকদের সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে এমন জিনিস চাষের, যার ওপর মানব বংশের স্থিতি ও রক্ষা নির্ভর করে, যেমন করে জমিনের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে এমন জিনিস চাষের, যার ওপর সে ফসলের প্রজাতিক অস্তিত্ব রক্ষা নির্ভর করে।

মওলানা মওদূদী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন, তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ

আল্লাহ্র কায়েম করা ফিতরাত মেয়েদেরকে পুরুষদের জন্যে বিহার কেন্দ্ররূপে বানায় নি। বরং মেয়ে ও পুরুষদের মাঝে ক্ষেত ও কৃষকের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ক্ষেতে কৃষক কেবল স্ফূর্তি করার উদ্দেশ্যে গমন করে না বরং গমন করে এ উদ্দেশ্যে যে, তা থেকে ফসল লাভ করবে। মানব বংশের কৃষককেও মানবতার এ ক্ষেতে যাওয়া দরকার এ উদ্দেশ্য নিয়ে যে, সেখান থেকে মানব বংশের ফসল লাভ করা হবে। আল্লাহ্র শরীয়ত এ নিয়ে কোনো আলোচনা করে না যে, তোমরা এ ক্ষেতে চাষ কিভাবে করবে, অবশ্য শরীয়তের দাবি এই যে, তোমরা এ ক্ষেতে যাবে এবং এ উদ্দেশ্য নিয়েই যাবে যে, সেখান থেকে তোমাদের ফসল লাভ করতে হবে।

(تفهيم القران-ج: ١، ص: ١٢٠)

স্ত্রী সহবাসের উদ্দেশ্য যে সন্তান লাভ, তা আয়াতের শেষাংশ "তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্যে এখনি ব্যবস্থা গ্রহণ করো" থেকে প্রমাণিত হয়। কেননা আয়াতের এ অংশের অর্থ আল্লামা পানিপত্তীর ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

يَعْنِىْ لَا تَقْصُدُوْا بِالنِّكَاحِ الْحُظُوْظَ الْعَاجِلَةَ فَقَطْ بَلْ اقْصِدُوْا الْمَنَا فِعَ الرَّاجِعَةَ اِلَى الدِّيْنِ مِنْ تَحْصِيْنِ الْفَرْجِ وَالْوَلَدِ الصَّالِحِ يَدْعُوْ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُ - (تفسير المظهرى : ج-١، ص-٢٨٥)

অর্থাৎ তোমরা বিয়ে দ্বারা উপস্থিত স্বাদ গ্রহণকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করো না, বরং তা থেকে এমন কিছু লাভ করতে চেষ্টা করো, যার ফলে দ্বীনের কোনো ফায়দা হবে। যেমন যৌন অঙ্গের পবিত্রতা বিধান এবং নেক ও সৎ স্বভাবের সন্তান লাভ, যার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করবে ও মাগফিরাত কামনা করবে।

কুরআন মজীদে স্বামী-স্ত্রী সহবাস সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

فَالْئٰنَ بٰشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ - (البقرة : ١٨٧)

এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন মিলন সম্পন্ন করো এবং কামনা করো যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

এখানে 'মুবাশিরাত' মানে যৌন মিলন, সঙ্গম-ক্রিয়া। আর 'আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন' বলতে বোঝানো হয়েছে সন্তানাদি— যা লওহে মাহফুযে সকলের জন্যে ঠিক করে রাখা হয়েছে।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে স্ত্রী-সহবাস করে সন্তানাদি লাভের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা। হযরত ইবনে আব্বাস, জহাক, মুজাহিদ প্রমুখ তাবেয়ী এ আয়াত থেকে এ অর্থই বুঝেছেন। আল্লামা আ-লুসী এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

وَفِى الْاٰيَةِ دَ لَا لَةٌ عَلٰى اَنَّ الْمُبَاشِرَ ينبغى ان يتحرى بالنكاح حفظ النسل لا قضاء الشهوة فقط - لانه سبحانه وتعالى جعل لنا شهوة الجماع لبقاء نوعنا الى غاية كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء اشخا صناالى غاية ومجردقضاء الشهوة لاينبغى ان يكون الاللبهائم - (روح المعانى : ج - ٣، ص -٦٩)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, স্ত্রী সঙ্গমকারীর কর্তব্য হচ্ছে, সে বিয়ে ও যৌন ক্রিয়ার মূলে বংশ রক্ষাকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করবে— নিছক যৌন-লালসা পূরণ নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রজাতীয় অস্তিত্বকে একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে— যেমন আমাদের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন আমাদের ব্যক্তিদের জৈব জীবন একটা সময় পর্যন্ত বাচিয়ে রাখার জন্যে। নিছক যৌন স্পৃহা পূরণ তো নিম্নস্তরের পশু ছাড়া আর কারোর কাজ হতে পারে না।

আল্লামা শাওকানী এ আয়াতের অর্থ লিখেছেন ঃ

اى ابتغوا بمبا شرة نسائكم حصول ماهو معظم المقصود من النكاح وهو حصول النسل -

(تفسير فتح القدير : ج-١، ص-١٥٣)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন ক্রিয়ার দ্বারা বিয়ের বৃহত্তর উদ্দেশ্য লাভের বাসনা পোষণ করো এবং তা হচ্ছে সন্তান ও ভবিষ্যৎ বংশধর লাভ।

ইমাম রাগিব ইসফাহানী লিখেছেন ঃ

فِى الْاٰيَةِ اِشَارَةٌ فِىْ تَحَرِّى النِّكَاحِ اِلٰى لَطِيْفَةٍ - وَهِىَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ لَنَا شَهْوَةَ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ نُوْعِ الْاِنْسَانِ اِلٰى غَايَةٍ كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء اسخا صنا الى غاية فحق الانسان ان تحرى النكاح ماجعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل و الديانة - فمتى تحرى به حفظ النفس وحصن النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ماكتب الله له - (محاسن التاويل : ج-٣، ص -٤٥٤)

আয়াতে বিয়ের ইচ্ছা করা সম্পর্কে এক সূক্ষ্ম কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে যৌন স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন একটা সময় পর্যন্ত মানব বংশের সংরক্ষণ ও স্থিতির জন্যে, যেমন আমাদের জন্যে খাদ্য স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন আমাদের ব্যক্তিদের জৈব সত্তা একটা সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। অতএব মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বিয়ে করে সে উদ্দেশ্য লাভ করা, যা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও ন্যায়পরতার দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা ঠিক করে দিয়েছেন। আর যখনি কেউ বিয়ের সাহায্যে শরীয়ত মুতাবিক আত্মসংযম ও সংরক্ষণের কাজ করবে, সে আল্লাহ্র লিখন অনুযায়ী উদ্দেশ্য লাভে নিয়োজিত হলো।

কুরআন মজীদের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ - (الشورى - ١١)

আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তোমাদের মানুষের মধ্য থেকেই জুড়ি বানিয়েছেন, জন্তু জানোয়ারের জন্যেও তাদের জুড়ি বানিয়েছেন, তিনিই তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন।

অর্থাৎ

خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ جِنْسِكُمْ نِسَاءً -

তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মানুষ জাতির মধ্য থেকেই মেয়েলোক এবং মেয়েলোকের জন্যে পুরুষ লোক সৃষ্টি করেছেন।

আর "সংখ্যা বৃদ্ধি করেন" মানে ঃ

يُكَثِّرُ كُمْ بِجَعْلِكُمْ اَزْوَاجًا لِاَنَّ ذٰلِكَ سَبَبُ النَّسْلِ - (فتح القدير : ج-٤، ص-٥١٣)

তোমাদের জোড়ায়-জোড়ায় বানিয়ে তোমাদের সংখ্যা বিপুল করেছেন। কেননা বংশ বৃদ্ধির এই হলো মূল কারণ।

মুজাহিদ বলেছেন ঃ

اَىْ يَخْلُقُكُمْ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ -

অর্থাৎ তোমাদেরকে বংশের পর বংশে ও যুগের পর যুগে ক্রমবর্ধিত করে সৃষ্টি করেছেন।

বস্তুত সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনই হচ্ছে ইসলামের পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য এবং যে মিলন এ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়, তাই ইসলামসম্মত মিলন। এ মিলনের ফলে সন্তান যখন স্ত্রীর গর্ভে স্থান লাভ করে তখন একাধারে স্বামী ও স্ত্রীর ওপর এক নবতর দায়িত্ব অর্পিত হয়। তখন স্ত্রীর দায়িত্ব এমনভাবে জীবন যাপন ও দিন-রাত অতিবাহিত করা, যাতে করে গর্ভস্থ সন্তান সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে, বেড়ে ওঠার ব্যাপারে কোনোরূপ বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় এবং কর্তব্য হচ্ছে এমন সব কাজ ও চাল-চলন থেকে বিরত থাকা, যার ফলে সন্তানের নৈতিকতার ওপর দুষ্ট প্রভাব পড়তে না পারে। এ পর্যায়ে পিতার কর্তব্যও কিছুমাত্র কম নয়। তাকেও স্ত্রীর স্বাস্থ্য, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং মা ও সন্তান— উভয়ের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় যত্ন ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে।

গর্ভে সন্তান সঞ্চার হওয়ার পর মায়ের কর্তব্য স্বীয় স্বাস্থ্য এবং মন উভয়কেই যথাসাধ্য সুস্থ রাখতে চেষ্টা করা। কেননা গর্ভস্থ ভ্রূণের সাথে মায়ের দেহ-মনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সময় মা যদি অধিক মাত্রায় শারীরিক পরিশ্রম করে, তবে গর্ভস্থ সন্তানের শরীর গঠন ও বাড়তির উপর তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি ও নর্তন-কুর্দনও ভ্রূণের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর।

শুধু তাই নয়, গর্ভবতী নারীর চাল-চলন, চিন্তা-বিশ্বাস, গতিবিধি ও চরিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে গর্ভস্থ সন্তানের মন ও চরিত্রে ওপর। এ সময় মা যদি নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করে, করে কোনো লজ্জাকর কাজ, তবে তার গর্ভস্থ সন্তানও অনুরূপ নির্লজ্জ ও চরিত্রহীন হয়ে গড়ে উঠবে এবং তার বাস্তব প্রকাশ দেখা যাবে তার যৌবনকালে। পক্ষান্তরে এ সময় মা যদি অত্যন্ত চরিত্রবতী নারী হিসাবে শালীনতার সব নিয়ম-কানুন মেনে চলে, তার মন-মগজ যদি এ সময় পূর্ণভাবে ভরে থাকে আল্লাহ্‌র বিশ্বাস, পরকাল ভয় এবং চরিত্রের দায়িত্বপূর্ণ অনুভূতিতে, তবে সন্তানও তার জীবনে অনুরূপ দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন, চরিত্রবান ও আল্লাহানুগত হয়ে গড়ে উঠবে। ভ্রূণের সঙ্গে মায়ের কেবল দেহেরই নয়, মনেরও যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, সে দৃষ্টিতে বিচার করলে উপরের কথাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এ জন্যে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কর্তব্য এ সময় শালীনতা ও লজ্জাশীলতার বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে সব সময় আল্লাহ্‌র মনোযোগ রক্ষা করা, কুরআন তিলাওয়াত ও নিয়মিত নামায পড়া। 'ভালো মা হলে ভালো সন্তান হবে, আমাকে ভালো মা দাও আমি ভালো জাতি গড়ে দেব'— নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সে কথাটির কার্যকরিতা ঠিক এ সময়ই হয়ে থাকে।

সূরা 'আল-বাকারার' পূর্বোক্ত আয়াতে 'قد موالا نفسكم' এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনার জন্যে এমনি ব্যবস্থা গ্রহণ করো' অংশের দুটো অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে ঃ দুনিয়ার বৈষয়িক কাজে-কর্মে এত দূর লিপ্ত হয়ে যেও না, যার ফলে তোমরা দ্বীনের কাজে গাফিল হয়ে যেতে পারো। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী-সহবাস করবে তোমরা এ নিয়ত সহকারে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে যেন সন্তান লাভ করতে পার এবং দুনিয়ার জীবনে সে সন্তান তোমাদের কাজে লাগতে পারে। তোমরা যখন বৃদ্ধ, অকর্মণ্য ও উপার্জনক্ষমতায় রহিত হয়ে যাবে, তখন যেন তারা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। আর তারা তোমাদের জন্যে— তোমাদের রূহের শান্তি ও মাগফিরাতের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতে পারবে। এভাবেই পিতামাতার মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ রচিত হতে পারে। এ ভবিষ্যৎ ইহকালীন যেমন, পরকালীনও ঠিক তেমনি।

সন্তানের বিপদ

গর্ভস্থ সন্তানের ওপর নানারূপ বিপদ আসতে পারে। তার মধ্যে অনেকগুলো নৈসর্গিক, অনেকগুলো গর্ভবতী স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যগত কারণে। আবার পিতামাতার ইচ্ছাকৃত বিপদ আসাও অসম্ভব নয়। সে বিপদ কয়েক রকমের হতে পারে। পিতামাতা গর্ভপাতের ব্যবস্থা করতে পারে, পারে এমন অবস্থা করতে যার ফলে গর্ভের সন্তান অঙ্কুরিতই হতে পারবে না, গর্ভসঞ্চার হওয়াই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

সন্তান যাতে জন্মাতে না পারে তার জন্যে প্রাচীনকাল থেকে নানা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, নানা প্রকারের উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রাচীন কালের লোকেরা এ উদ্দেশ্যেই আজল করত। আজল মানে ঃ

العزل بعد الايلاج لينزل قارج الفرج -

পুরুষাঙ্গ স্ত্রী অঙ্গের ভেতর থেকে বের করে নেয়া, যেন শুক্র স্ত্রী-অঙ্গের ভেতরে স্খলিত হওয়ার পরিবর্তে বাইর স্খলিত হয়।

জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা এ কাজ করত গর্ভ সৃষ্টি না হয়— এ উদ্দেশ্যে। যদিও তার ফলে গর্ভসঞ্চারিত হবে না— তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। জাহিলিয়াতের যুগে সন্তানের আধিক্য কিংবা আদৌ সন্তান হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে লোকেরা সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুটা বড় হলে তাকে হত্যা করত। কেবল কন্যা সন্তানই নয়, পুত্র সন্তানকেও এ উদ্দেশ্যে হত্যা করা হতো।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগে এ উদ্দেশ্যে বহু উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। যৌন অঙ্গে হালকা-পাতলা রবারের টুপি পরাবার রেওয়াজ চলছে। যৌন মিলনের পর নানা কসরত করে গর্ভ সঞ্চারে প্রতিবন্ধকতা

সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে, নানা ঔষধ ব্যবহার করে সন্তানকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ব্যবস্থাও আজ করা হচ্ছে। এক কথায় বলা যায়, গর্ভ নিরোধের প্রাচীন ও আধুনিক যত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে ও হচ্ছে সবই গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে— তথা মানব বংশের পক্ষে কঠিন বিপদ বিশেষ।

গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত, ভ্রূণ হত্যা কিংবা সদ্যপ্রসূত সন্তান হত্যা করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর প্রয়োজন হলে অন্য কথা এবং তা নেহায়েত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো দিক দিয়েই এ কাজকে সমর্থন করা হয়নি। নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক— সর্বোপরি মানবিক সকল দিকদিয়েই এ কাজ শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, অত্যন্ত মারাত্মক। যে পিতামাতা নিজেরাই নিজেদের সন্তানের জানের দুশমন হয়ে দাঁড়ায়, তারা যে গোটা মানব জাতির দুশমন এবং কার্যত সে দুশমনি করতে একটুও দ্বিধা করছে না। কেননা নিজ ঔরসজাত, নিজ গর্ভস্থ বা গর্ভজাত সন্তানকে নিজেদের হাতেই হত্যা করার জন্যে প্রথমত নিজেদের মধ্যে অমানুষিক নির্মমতা, কঠোরতা ও নিতান্ত পশুবৃত্তির উদ্ভব হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় এ রকম কাজ কারো দ্বারা সম্ভব হতে পারে না, তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। ব্যক্তির এ নির্মমতা ও কঠোরতাই সংক্রমিত হয়ে গোটা জাতিকে গ্রাস করে, গোটা জাতির প্রতিই তা শেষ পর্যন্ত আরোপিত হয়। বস্তুত নিজেদের সন্তান নিজেরাই ধ্বংস করে— এর দৃষ্টান্ত প্রাণী জগতে কোথাও পাওয়া যায় না।

প্রাচীনকালে আরব সমাজে 'আজল' করার যে প্রচলন ছিল, ইসলাম তা সমর্থন করেনি। এ সম্পর্কে হাদীসে বিস্তারিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে তার সম্যক আলোচনা পেশ করা যাচ্ছে।

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ

كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ – (بخاری، مسلم)

আমরা রাসূলের জীবদ্দশায় 'আজল' করতাম অথচ তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল।

অর্থাৎ কুরআন মজীদে আজল সম্পর্কে কোনো নিষেধবাণী আসেনি। আর রাসূলে করীমও তা নিষেধ করেন নি।

হযরত আবূ সাঈদ বলেন ঃ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ فَاَشْهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ ﷺ فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ كَتَبَ مَا هُوَ خَالِقٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ – (بخاری، مسلم)

আমরা রাসূলে করীম (স)-এর সঙ্গে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে বের হয়ে গেলাম। সেখানে কিছু সংখ্যক আরবকে বন্দী করে নিলাম, তখন আমাদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের প্রতি আকর্ষণ জাগে, যৌন ক্ষুধাও তীব্র হয়ে ওঠে এবং এ অবস্থায় 'আজল' করাকেই আমরা ভালো মনে করলাম। তখন এ সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি তা করো তাতে তোমাদের ক্ষতি কি ? কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করবেন তা তিনি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং তা অবশ্যই সৃষ্টি করবেন।

নবী করীম (স) 'আজল' সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اَنْتَ تَخْلُقُهُ اَنْتَ تَرْزُقُهُ اَقِرَّهُ قَرَارَهُ فَاِنَّمَا ذٰلِكَ الْقَدْرُ – (مسند احمد)

তুমি কি সৃষ্টি করো ? তুমি কি রিযিক দাও ? তাকে তার আসল স্থানেই রাখো; আসল স্থানে সঠিকভাবে তাকে থাকতে দাও। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত ফয়সালা রয়েছে।

উপরে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাইদ বর্ণিত হাদীসে যেখানে ما عليكم "তোমাদের কি ক্ষতি হয়" বলা হয়েছে, সেস্থলে বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত ভাষ্য হচ্ছে لا عليكم ان لاتفعلوا না, তোমাদের এ কাজ না করাই কর্তব্য।

ইব্‌নে সিরীন-এর মতে এ বাক্যে 'আজল' সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধ না থাকলেও এ যে নিষেধের একেবারে কাছাকাছি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর হাসানুল বাসরী বলেছেন ঃ

وَاللّٰهِ لَكَانَ هٰذَا زَجْرًا -

আল্লাহ্‌র শপথ, রাসূলের এ কথায় আজল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভর্ৎসনা ও হুমকি রয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন ঃ সাহাবিগণ রাসূলে করীম (স)-এর উক্ত কথা থেকে নিষেধই বুঝেছিলেন। ফলে এ অর্থ দাঁড়ায়— রাসূলে করীম (স) যেন বলেছেন ঃ

لَا تَعْزِلُوْا وَ عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوْا -

তোমরা আজল করো না, তা না করাই তোমাদের কর্তব্য।

বাক্যের শেষাংশে প্রথমাংশের তাগিদস্বরূপ বলা হয়েছে। হযরত জাবির বলেছেন ঃ নবী করীম (স)-এর খেদমতে একজন আনসারী এসে বললেন ঃ

اِنَّ عِنْدِىْ جَارِيَةً وَ اَنَا اَعْزِلُ عَنْهَا -

আমার কাছে একটি ক্রীতদাসী রয়েছে এবং আমি তার থেকে আজল করি।

তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِنَّ ذٰلِكَ لَمْ يَمْنَعْ شَيْئًا اَرَادَ اللّٰهُ - (نسائی)

আল্লাহ্ যা করার ইচ্ছে করেছেন, তা বন্ধ করার সাধ্য আজলের নেই।

জুজামা বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (স) 'আজল' সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اِنَّ ذٰلِكَ الْوَادُ الْخَفِىُّ

নিশ্চয়ই এ হচ্ছে গোপন নরহত্যা।

হযরত আবূ সাঈদ বর্ণিত এক হাদীসে এ কথাটিকে ইহুদীদের উক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইহুদীদের একথা শুনে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

كَذَّبَتْ يَهُوْدُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَوْ اَرَادَ اَنْ يَّخْلُقَ شَيْئًا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدٌ اَنْ يَّصْرِفَهُ - (مسند احمد، ابو داود)

ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে, আল্লাহ্ যদি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তবে তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা কারো নেই।

হযরত আবূ সাঈদ থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসের শেষাংশে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত কথা উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا هِىَ كَائِنَةٌ - (مسند احمد، ابو داؤد)

কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রাণীই জন্ম নেবার রয়েছে, তা অবশ্য অবশ্যই জন্ম নেবে।

ইমাম তাহাভী বলেছেন ঃ জুজামার হাদীসে প্রথমকার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কেননা প্রথম দিক দিয়ে আহলি কিতাবদের অনুসরণে অনেক কাজ করা হতো, তার পরে প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে ওহী নাযিল

হলে পরে রাসূলে করীম (স) ইহুদীদের এ কথাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ইবনে রুশদ ও ইবন আরাবী বলেছেন ঃ নবী করীম (স) ইহুদীদের অনুসরণ করে কোনো জিনিস হারাম করবেন এবং পরে আবার তাদের মিথ্যাবাদী বলবেন, তা বিশ্বাস করা যায় না। জুজামার হাদীসকে অনেক মুহাদ্দিসই সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। আর তার বিপরীত অর্থের হাদীস সনদের দুর্বলতার কারণে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

বিশেষত এ কারণেও জুজামার হাদীস গ্রহণ করা দরকার যে, জুজামা মক্কা জয়ের বছর ইসলাম কবুল করেছেন বিধায় তাঁর বর্ণিত হাদীস এ পর্যায়ে সর্বশেষ এবং অন্য হাদীসকে বাতিল করে দিয়েছে।

জুজামা বর্ণিত হাদীসকে ভিত্তি করে ইবরাহীম নখয়ী, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ এবং তায়ূস প্রমুখ তাবেয়ী মত প্রকাশ করেছেন যে, আজল করা মাকরূহ। এর কারণস্বরূপ তাঁরা বলেছেন ঃ

لِاَنَّهُ صَلَّى ﷺ جَعَلَ الْعَزْلَ بِمَنْزِلَةِ الْوَادِ اِلَّا اَنَّهُ خَفِىٌّ لِاَنَّ مَنْ يَعْزِلُ عَنِ الْمَرْاَتِهِ اِنَّمَا يَعْزِلُ هَرَبًا مِّنَ الْوَلَدِ فَلِذٰلِكَ سُمِّىَ الْمَوْدَةُ الصُّغْرٰى وَالْمَوْدَةُ الْكُبْرٰى هِىَ الَّتِىْ تُدْفَنُ وَ هِىَ حَيَّةٌ -

(عمدة القارى : ج-٢٠، ص-١٩٥)

যেহেতু আজল করাকে রাসূলে করীম (স) হত্যা-অপরাধের সমতুল্য করে দিয়েছেন। তবে পার্থক্য এই যে, তা হচ্ছে গোপন হত্যা। কেননা যে লোক আজল করে, সে তা করেই সন্তান হওয়ার আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে। এ কারণেই 'আজল'-কে 'ছোট হত্যা' বলা হয়েছে। আর 'বড় হত্যা' হচ্ছে জীবন্ত অবস্থায় কবরে পুঁতে দেয়া।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম বলেছেন ঃ

আজল করলে আর গর্ভ সঞ্চারে আশংকা থাকে না এবং এতে বংশ বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়া ইহুদীদের এ ধারণাকেই রাসূলে করীম (স) মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

اِنَّهٗ لَا يَمْنَعُ الْحَمْلَ اِذَا شَاءَ اللّٰهُ خَلْقَهٗ وَاِذَا لَمْ يَرِدْ خَلْقَهٗ لَمْ يَكُنْ وَ اَدًا خَفِيًّا -

আল্লাহ্ই যদি সৃষ্টি করতে চান তাহলে আজলের ফলে গর্ভ সঞ্চার হওয়া বন্ধ হতে পারে না। আল্লাহ্ই যদি সৃষ্টি করার ইচ্ছা না করে থাকেন তাহলে 'আজল' করলে তাতে গোপন হত্যা হবে না।

'আজল' করলে গর্ভ সঞ্চারের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং গর্ভ সঞ্চার না হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়— এ কথা যে একেবারেই ঠিক নয়, তা রাসূলে করীম (স)-এর অপর একটি বাণী থেকেও অকাট্য প্রমাণিত হয়। এক ব্যক্তি 'আজল' করা সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ

لَوْ اَنَّ الْمَاءَ الَّذِىْ يَكُوْنُ مِنْهُ الْوَلَدُ اَهْرَقْتَهٗ عَلٰى صخْرَةٍ لَا اَخْرَجَ اللّٰهُ مِنْهَا الْوَلَدَ -

(مسند احمد، البزار، ابن حبان، طبرانى)

যে শুক্রে সন্তান হবে তা যদি তুমি প্রস্তরের উপরও নিক্ষেপ করো, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তা দিয়েও সন্তান পয়দা করবেন।

আর জুজামার হাদীসে 'আজল'কে গোপন হত্যা বলে অভিহিত করার কারণ এই যে, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার ভয়ে লোকেরা 'আজল' করে। ফলে যা উদ্দেশ্য— সন্তান হওয়া— তাকে সন্তান হত্যার

পর্যায়ের কাজ বলে ধরে নেয়া হয়েছে, যদিও এ দুটোর মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রকাশ্য হত্যার উদ্দেশ্য এবং কাজ এক ও অভিন্ন আর 'আজল' ও হত্যায় কেবল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ঐক্য রয়েছে।

আজল ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ

তবুও 'আজল'কে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে কেউ কেউ জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে কেবলমাত্র হযরত জাবির বর্ণিত হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, "কুরআন নাযিল হচ্ছিল আর আমরা 'আজল' করছিলাম।" তার মানে কুরআনে এ সম্পর্কে কোনো নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়নি। আর রাসূলে করীম (স)-ও তা জানতেন; কিন্তু তিনিও নিষেধ করেন নি। কিন্তু একথা যে হাদীসভিত্তিক আলোচনায়ও টেকে না, তা পূর্বেই বলেছি। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সে কালের 'আজল'কে জায়েয মনে করে একালের জন্ম নিয়ন্ত্রণ (Birth control)-কে কেউ কেউ জায়েয বলতে চান। তাঁরা বলেন ঃ প্রাচীন কালের 'আজল' ছিল সেকালেরই উপযোগী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পন্থা। একালে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যা করা হচ্ছে, ঠিক তাই করা হতো সেকালের এ অবৈজ্ঞানিক উপায়ে। কিন্তু এরূপ বলা যে কতখানি ধৃষ্টতা বরং নির্বুদ্ধিতা এবং আল্লাহ্‌র শরীয়তের সঙ্গে তামাসা করা, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়।

প্রথমত দেখা দরকার, এ কালে জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি এবং ঠিক কোন কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে লোকেরা প্রস্তুত হচ্ছে। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই বর্তমান দুনিয়ার লোকেরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাচ্ছে, অন্তত জোর গলায় তাই প্রচার করা হয়। কখনো কখনো পারিবারিক সুখ-শান্তি ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দোহাই যে দেয়া হয়, তাও দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে এ এক ব্যাপক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু 'আজল' কোনো দিনই এমন ছিল না। অর্থনৈতিক কারণে সেকালে আজল করা হতো না।

বড় জোর বলা যায়, সামাজিক ও সাময়িক জটিলতা এড়ানোর উদ্দেশ্যেই তা করা হতো। আর কারণের দিক দিয়ে এ দুটোকে কখনই অভিন্ন মনে করা যায় না। বিশেষত খাদ্যভাব ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে 'আজল' করা সঙ্গত মনে করা হলে তার অর্থ.হয় ঃ 'আজল'কে জায়েয প্রমাণকারী হাদীসসমূহ আল্লাহ্‌র রিযিকদাতা হওয়ার বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন করে দিচ্ছে। কুরআন মজীদে সন্তান হত্যা নিষেধ করে যে সব আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, তার ভিত্তিই হচ্ছে এ কথার ওপর ঃ نحن نرزقهم وايا كم 'আমিই তাদের রিযিক দেব, তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি।'

এক্ষণে দারিদ্র্য ও অভাবের ভয়ে 'আজল' করা যদি সঙ্গত হয়, তাহলে তার মানে হবে, আল্লাহ্‌র রিযিকদাতা হওয়ার বিশ্বাসই খতম হয়ে গেছে এবং যে ভিত্তিতে সন্তান হত্যা নিষেধ করা হয়েছে, তাই চুরমার হয়ে যায় 'আজল'-কে শরীয়তসম্মত মনে করলে।

আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে লোকদের বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝিই হচ্ছে এরূপ ধারণার প্রধান কারণ। 'আজল'-এর অনুমতিকে তার আসল পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাপার মনে করে নিলে এ ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক— এমন কোনো হাদীসই পাওয়া যাবে না, যাতে দারিদ্র্য ও অভাবের কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণকে ঘৃণা সহকারে হলেও বরদাশ্‌ত করার কথা বলা হয়েছে। আর নবী করীম (স)-ই বা কেমন করে এমন কাজের অনুমতি দিতে পারেন, যে কাজকে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলাই স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দিয়েছেন ? কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। সূরা 'আল-আন আম'-এ বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ - (الانعام - ١٥١)

এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না দারিদ্র্যের কারণে, আমিই তোমাদের রিযিক দান করি এবং তাদেরও আমিই করব।

এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত দারিদ্র্যের কারণে সন্তান 'হত্যা' করতে নিষেধ করছে। যারা বর্তমানে দারিদ্র্য, অভাবগ্রস্থ, নিজেরাও খাবে সন্তানদেরও খাওয়াবে এমন সম্বল যাদের নেই, তারা আরো সন্তান জন্মদান করতে রীতিমত ভয় পায়; মনে করে আরও সন্তান হলে মারাত্মক দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হতে হবে, দেখা দেবে চরম খাদ্যাভাব। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তা হবে একান্তই দুর্বহ। উপরোক্ত আয়াত কিন্তু তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধবাণী এবং রিযিক দানের নিশ্চয়তাসূচক ওয়াদার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

সূরা বনী ইসরাইলে বলা হয়েছে ঃ

وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا -

(بنی اسرئيل : ٣١)

এবং তোমরা হত্যা করো না তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে। আমিই তাদের রিযিক দেব এবং তোমাদেরও; নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা বিরাট ভুল।

ভবিষ্যতে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকায় যারা সন্তান জন্মদানে ভয় পায়, যারা মনে করে আরো অধিক সন্তান হলে জীবনযাত্রার বর্তমান 'মান' (standard) রক্ষা করা সম্ভব হবে না এবং এজন্যে জন্মনিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের পন্থা গ্রহণ করে, উপরোক্ত আয়াতে তাদের সম্পর্কেই নিষেধবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে— বর্তমানে তোমাদের যেমন আমিই রিযিক দিচ্ছি, তোমাদের সন্তান হলে ভবিষ্যতে আমিই তাদের রিযিক দেব, ভয়ের কোনো কারণ নেই।

কেউ কেউ বলেন, কুরআনে তো সন্তান হত্যা قتل করতে নিষেধ করা হয়েছে, নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ তো নিষিদ্ধ হয়নি, আর 'আজল' এবং জন্মনিরোধের আধুনিক পক্রিয়ায় গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পথই বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাতে সন্তান হত্যার কোনো প্রশ্নই নেই। তাই কুরআনের এ নিষেধবাণী এ কাজকে নিষিদ্ধ করেনি এবং এ প্রসঙ্গে তা প্রযোজ্যও নয়। কিন্তু একথা যে কতখানি ভ্রান্ত, দুর্বল ও অমূলক তা আয়াত দু'টি সম্পর্কে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ দুটো আয়াতে সর্বাবস্থায়ই সন্তান হত্যা নিষেধ করে দিয়েছে, প্রতিক্রিয়া তার যাই হোক না কেন। আর 'কতল' শব্দের অর্থও কোনো জীবন্ত মানুষকে তরবারির আঘাতে হত্যা করাই কেবল নয়। কুরআন অভিধানে এবং তাফসীরে এর বিভিন্ন অর্থ দেখা যায়। আরবী অভিধান 'আল কামুস'-এ বলা হয়েছে القتل। মানে الاماتة। মেরে ফেল— যে কোন উপায়েই হোক না কেন। তাফসীর 'রুহুল বয়ান'-এ বলা হয়েছে ঃ القتل। মানে الاهلاك। হালাক করে দেয়া, ধ্বংস করা। রাগিব ইসফাহানীর আল মুফ্‌রাদাত-এ বলা হয়েছে ঃ

اَصْلُ الْقَتْلِ اِزَالَةُ الرُّوْحِ عَنِ الْجَسَدِ كَالْمَوْتِ -

'কতল' শব্দের আসল অর্থ দেহ থেকে প্রাণ বের করে দেয়া— যেমন মৃত্যু।

আর উপরোক্ত আয়াত দু'টোতে যা বলা হয়েছে, রাগিব ইসফাহানীর মতে তা হচ্ছে ঃ

نَهْىٌ عَنْ تَضْيِيْعِ الْبَذْرِ بِالْعُزْلَةِ وَ وَضْعِهٖ فِىْ غَيْرِ مَوْضَعِهٖ -

আজল করে শুক্র বিনষ্ট করা এবং তাকে তার আসল স্থান ছাড়া অপর কোনো স্থানে নিক্ষেপ করা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিষেধ।

এ অর্থ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায়, কুরআন মজীদ কেবল আরব জাহিলিয়াতের ন্যায় জীবন্ত সন্তান হত্যা করতেই নিষেধ করেনি বরং যেকোনো ভাবেই হত্যা করা হোক না কেন, তাকেই নিষেধ করেছে। শুধু তাই নয়, শুক্র নিষ্ক্রমিত হওয়ার পর তার জন্যে আসল আশ্রয় স্থান হচ্ছে স্ত্রীর জরায়ূ—

গর্ভধারা। সেখানে তাকে প্রবেশ করতে না দিলে কিংবা কোনোভাবে তাকে বিনষ্ট, ব্যর্থ ও নিষ্ফল করে দিলেই তা এ নিষেধের আওতায় পড়বে এবং তা হবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট হারাম কাজ। প্রাচীন কালের 'আজল' এবং একালের জন্ম নিরোধ বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ— সবই এ দৃষ্টিতে হারাম কাজ হয়ে পড়ে। কেননা এ প্রক্রিয়ায় বাহ্যত প্রাণী হত্যা বা জীবন্ত সন্তান হত্যা না হলেও প্রথমত শুক্রকে বিনষ্ট করা হয় এবং দ্বিতীয়ত শুক্রকীট— যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জীবন্ত তাকে তার আসল আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করতে না দিয়ে পথিমধ্যেই খতম করে দেয়া হয়। ঠিক যে কারণে জীবিত সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ, ঠিক সেই কারণেই জীবিত শুক্রকীট বিনষ্ট করাও নিষিদ্ধ। কেননা এ শুক্রকীটই তো সন্তান জন্মের মৌল উপাদান। তাফসীরে 'রুহুল বয়ান'-এ একথাই বলা হয়েছে ঃ

وَ اِنَّمَا حَرَّمَ قَتْلَ الْاَوْلَادِ لِمَا فِيْهِ مِنْ هَدَمِ بُنْيَانِ اللّٰهِ وَ مَلْعُوْنٌ مَنْ هَدَمَ بُنْيَانَهُ وَفِيْهِ اِبْطَالُ ثَمَرَةِ شَجَرَتِهِ وَ مَحْصُوْدِهِ وَقَطْعُ نَسْلِهِ -

সন্তান হত্যা করাকে হারাম করা হয়েছে এজন্যে যে, এর ফলে আল্লাহ্র সংস্থাপিত মানব বংশের ভিত্তিই চূর্ণ হয়ে যায়, আর আল্লাহ্র সংস্থাপিত এ ভিত্তিকে যারা ধ্বংস করে, তারা অভিশপ্ত। কেননা এতে করে আল্লাহ্র বপিত বৃক্ষের ফল নষ্ট করা, তাকে কেটে নেয়া এবং মানুষের বংশকে শেষ করে দেয়া হয়।

শুধু তাই নয়, এ কাজ তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহ্কে রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করতে পারে না রিযিকের ব্যাপারে। তাফসীরে রুহুল বয়ান-এ এই বলা হয়েছে ঃ

وَفِيْهِ تَرْكُ التَّوَكُّلِ فِىْ اَمْرِ الرِّزْقِ يُؤَدِّى اِلٰى تَكْذِيْبِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّهٗ قَالَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -

এ কাজে রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল পরিহার করা হয় তার ফলে আল্লাহ্র ওয়াদাকে অবিশ্বাস করা হয় অথচ তিনি বলেছেন ঃ জমিনে কোনো প্রাণীই নেই যার রিযিক সরবরাহের দায়িত্ব আল্লাহ্র ওপর অর্পিত নয়।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও আজল— এ দুটোর মাঝে এদিক দিয়েও পার্থক্য আছে যে, 'আজলে' যেখানে শতকরা নব্বই ভাগই গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা থেকে যায়, সেখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আধুনিক প্রক্রিয়ায় সম্ভাবনাকে একেবারেই বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। রাসূলে করীম (স) থেকে 'আজল' সম্পর্কে বর্ণিত প্রায় সব হাদীসেই এ ধরনের একটি কথা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করতে চান, তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই— চেষ্টা করলেও তা সম্ভব নয়। ফলে 'আজল' ও জন্ম নিয়ন্ত্রণে মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই নিছক বোকা লোক ছাড়া এ দুটো প্রক্রিয়াকে এক ও অভিন্ন— আর বড়জোর সেকাল ও একালের পার্থক্য মাত্র বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে।

এ সম্পর্কে শেষ কথা এই যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের এমন কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বন, যার ফলে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রিত কিংবা অবরুদ্ধ হয়ে যায়— কোনো দিক দিয়েই বিন্দুমাত্র কল্যাণকর হতে পারে না; না পারিবারিক জীবনে তার ফলে কোনো শান্তি সুখ আসতে পারে, না অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে।

কুরআন মজীদ এ সম্পর্কে স্পষ্টভাষী। বলা হয়েছে ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ - (الانعام : ١٤٠)

যারা নিজেরা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে নির্বুদ্ধিতাবশত কোনো প্রকার জ্ঞান-তথ্যের ভিত্তি ছাড়াই এবং আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিককে নিজেদের জন্যে হারাম করে নেয়— আল্লাহ্‌র ওপর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা আরোপ করে— তারা সকলেই ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তারা নিশ্চিতই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা কখনো সঠিক পথে আসবে না।

সন্তান হত্যা— আর আধুনিক পদ্ধতি— জন্ম নিয়ন্ত্রণ, জন্মনিরোধ কোনো বুদ্ধিসম্মত কাজ নয়, চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ। কোনো অকাট্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও জ্ঞান-তথ্যের ওপর ভিত্তিশীল নয়, নিছক আবেগ উচ্ছ্বাস মাত্র; এতে করে আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক— সন্তানকে— নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া হয়— সন্তান হতে দিতে অস্বীকার করা হয় অথবা এ সন্তানের ফলে আল্লাহ্ যে অতিরিক্ত রিযিক দিতেন তা থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করা হয়; আর তা করা হয় আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা পোষণ করে, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করে যে, আরো সন্তান হলে তিনি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন না বা করবেন না। তার ফলে এ কাজ যারা করে তারা ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ ক্ষতি কেবল নৈতিক নয়, বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতেও তা অপূরণীয়; ইহকালীন ও পরকালীন সব দিক দিয়েই তার ক্ষতি ভয়াবহ। আর এ ক্ষতির সম্মুখীন তারা হচ্ছে শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানকে তারা মেনে চলতে অস্বীকার করছে, এ গুমরাহীর পথকে তারা নিজেরা ইচ্ছে করেই গ্রহণ করেছে অথচ হেদায়েতের পথ তাদের সামনে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়েছিল। তারা অনায়াসেই সে পথে চলে চিরকল্যাণের দাবিদার হতে পারত। আর সত্যি কথা এই যে, হেদায়েতের সুস্পষ্ট পথ সামনে দেখেও যারা নিজেদের ইচ্ছানুক্রমে সুস্পষ্ট গুমরাহীর পথে অগ্রসর হতে থাকে, তারা যে কোনো দিনই হেদায়েতের পথে একবিন্দু চলতে পারবে— এদিকে ফিরে আসবে, এমন কোনো সম্ভাবনাই নেই। এসব কথাই হচ্ছে উপরোক্ত আয়াতের ভাবধারা। বস্তুত জন্ম নিয়ন্ত্রণের আধুনিক প্রচেষ্টা প্রায় সবই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং এর জন্যে ব্যয় করা কোটি কোটি টাকা যে একেবারে নিষ্ফল হয়ে যায় তা আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী থেকেই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত এরূপ কাজের অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌র রিযিকদাতা হওয়ার কথায় কোনো বিশ্বাস নেই। এ কাজ ষোল আনাই বেঈমানী, নিতান্ত বেঈমান লোকদের দ্বারাই সম্ভব এ ধরনের কাজ, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা, এ কাজ চরম নির্মমতার পরিচায়ক। মনুষ্যত্বের সুকোমল বৃত্তিসমূহ মানুষকে এ কাজ করতে কখনো রাজি হতে দেয় না। তাই কুরআন মজীদের ঘোষণায় এ কাজ কেবল মুশরিকদের দ্বারাই সম্ভব বলে বলা হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُ هُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ -

(الانعام : ١٣٧)

এমনিভাবে বহু মুশরিকের জন্যে তাদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে তাদের শরীক— উপাস্য দেবতা ও শাসক নেতৃবৃন্দ খুবই চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় কাজ হিসেবে প্রতিভাত করে দিয়েছে, যেন তারা তাদের ধ্বংস করে দিতে পারে এবং তাদের জীবন বিধানকে করে দিতে পারে তাদের নিকট অস্পষ্ট ভ্রান্তিপূর্ণ।

সন্তান হত্যা— জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ যে একটা মন-ভুলানো ও চাকচিক্যময় কাজ। এ কাজের অনিবার্য ফল একটা জাতিকে নৈতিকতার দিক দিয়ে দেউলিয়া করে দেয়া, বংশের দিক দিয়ে নির্বংশ করে যুবশক্তির চরম অভাব ঘটিয়ে সর্বস্বান্ত করে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, দুনিয়ার জন্ম নিয়ন্ত্রণকারী জাতিসমূহের অবস্থা চিন্তা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ পর্যায়ে সূরা আল-আন'আমের আয়াতটি পুনরায় বিবেচ্য। এ বিবেচনা আমাদের সামনে এও পেশ করছে যে, 'সন্তান হত্যার' যে কোনো ব্যবস্থারই পরিণতিতে সমাজে ব্যাপক নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়া অতীব স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। সম্পূর্ণ আয়াতটি এই ঃ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَ لَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ج وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ج وَلَا تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ - (الانعام - ١٥١)

বলো হে নবী, তোমরা শোন, তোমাদের আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে কি হারাম করেছেন। তা হলো ঃ তোমরা তাঁর সাথে এক বিন্দু শির্ক করবে না, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যাবহার করবে। দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদের রিযিক দিই, তাদেরও দেব। তোমরা নির্লজ্জতার কাছেও যেও না, তা প্রকাশ্যই হোক, কি গোপনীয়। আর তোমরা মানুষ হত্যা করো না যা আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এই আশায় যে, তোমরা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

পারিবারিক জীবনে সন্তানের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান হচ্ছে আল্লাহ্র নিয়ামত, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের দান। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً - (النحل : ٧٢)

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এই জুড়ি থেকেই তোমাদের জন্যে সন্তান-সন্তুতি ও পৌত্র-পৌত্রী বানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত সন্তান- সন্তুতি আল্লাহ্র নিজস্ব দান বৈ কিছু নয়।

আল্লামা শাওকানী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

المعنى خلق لكم من جنسكم ازواجا لتستا نسوابها لان الجنس يانس الى جنسه ويتوحش من غير جنسه وبسبب هذه الانسية يقع بين الرجال والنساء ما هو سبب للنسل الذى هو مقصود بالزواج -

(فتح القدير : ج-٣، ص-١٧٢)

এ আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতির মধ্য থেকেই জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর সাথে অন্তরের গভীর সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হতে পারো। কেননা প্রত্যেক প্রজাতিই তার স্বজাতির প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে আর ভিন্ন প্রজাতি থেকে তার মন থাকে বিরূপ। মনের এ আকর্ষণের কারণেই স্ত্রী-পুরুষের মাঝে এমন সম্পর্ক স্থাপিত ও কার্যকর হয়, যার ফলে বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে, আর তাই হচ্ছে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য।

বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসা পরিণতি ও পরিপূর্ণতা লাভ করে এ সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। সন্তানাদি সম্পর্কে কুরআন মজীদে আরো বলা হয়েছে ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - (الكهف : ٤٦)

ধন-মাল ও সন্তান-সন্তুতি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন। আল্লামা আলুসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

المال مناط لبقاء النفس والبنون لبقاء النوع - (المعانى : ج-١١)

ধন-মাল হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্তুতি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।

বস্তুত দুনিয়ায় কত সহস্র মানুষ এমন রয়েছে, যাদের খাবার কোনো অভাব নেই, কিন্তু কে তা খাবে তার কোনো লোক নেই। মানে, হাজার চেষ্টা সাধনা ও কামনা করেও তারা সন্তান লাভ করতে পারে নি। আবার কত অসংখ্য লোক এমন দেখা যায়, যারা কামনা না করেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক, কিন্তু তাদের কাছে খাবার কিছু নেই কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে নেই। তাই বলতে হয়, সন্তান হওয়া না হওয়া একমাত্র আল্লাহ্র তরফ থেকে এক বিশেষ পরীক্ষা, সন্দেহ নেই।

শুধু তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে মানুষের গোটা জীবনই একটা বিশেষ পরীক্ষার স্থল। আল্লাহ্র দেয়া মাল, সম্পদ, সম্পত্তি আর সন্তান— পরীক্ষার বিষয়সমূহের মধ্যে এ দুটো প্রধান। এ পরীক্ষায় তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে, যারা এক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকে সুষম ও সামঞ্জস্যসম্পন্ন নীতি গ্রহণ করতে পারে। সন্তানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির একটি দিক হচ্ছে এই যে, তার প্রতি প্রেম-ভালোবাসা ও দরদ মায়া আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য বোধকেও ছড়িয়ে যাবে এবং তারা আল্লাহ্র আনুগত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে বাড়াবাড়ির অপর দিকটি হচ্ছে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা, স্নেহ-বাৎসল্য প্রদর্শন ও তাদের হক আদায় করার পরিবর্তে তাদের প্রতি অমানুষিক জুলুম করা, তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রত্যাহার বা প্রত্যাখ্যান করা। কুরআন মজীদে বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই মাল ও আওলাদকে ফেতনা বা পরীক্ষার বিষয় কিংবা দ্বীনী জিন্দেগী যাপনের পথে হুমকি স্বরূপ বলেই হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। জাহিলিয়াতের যুগে এ সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অবলম্বিত হতো না। একদিকের বাড়াবাড়ি ছিল— সন্তান হত্যা করতেও সেকালের লোকেরা কুণ্ঠিত হতো না। আর অপরদিকের বাড়াবাড়ি এই ছিল যে, সন্তান সংখ্যার বিপুলতা নিয়ে তারা পারস্পরিক গৌরব ও জনশক্তির ফখর করত, শক্তির দাপট আর ধমক দেখাত, আভিজাত্যের অহংকারে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত। আর এ কারণে তারা আল্লাহ্র কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠারও দাবি জানাত।

কুরআন মজীদ এ প্রেক্ষিতেই বলেছে ঃ

وَعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لا وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ - (الانفال : ٢٨)

তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের ধনমাল ও সন্তান-সন্তুতি ফেতনা বিশেষ; আর কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটই রয়েছে বিরাট ফল।

বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلَّا مَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ اٰمِنُوْنَ -

তোমাদের মাল এবং তোমাদের আওলাদ— কোনো কিছুই এমন নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে, সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। আমার নিকটবর্তী ও আমার নিকট মর্যাদাবান হবে তো কেবল তারা, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তাদের জন্যেই আমলের দ্বিগুণ ফল রয়েছে এবং বেহেশতের সুসজ্জিত কোঠায় তারাই অবস্থান করবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তা সহকারে।

আয়াতদ্বয় পূর্বাপর পটভূমিসহ প্রমাণ করছে যে, যেমন করে ধনমাল আল্লাহ্র দেয়া আমানত, সন্তান-সন্ততিও অনুরূপভাবে আল্লাহ্র দান। প্রথমটা যেমন একটা পরীক্ষার বিষয়, এ দ্বিতীয়টিও তেমনি একটি পরীক্ষার সামগ্রী। ধনসম্পদ অন্যায় পথে ব্যয় করলে কিংবা যথাযথভাবে ব্যয় না করলে যেমন আমানতে খিয়ানত হয়, সন্তান-সন্ততিকেও ভুল উদ্দেশ্যে ও অন্যায় কাজে নিয়োজিত করলে,

বাতিল সমাজ ব্যবস্থার যোগ্য খাদেম হিসেবে তৈরী করলেও তেমনি আল্লাহ্র আমানতে খিয়ানত হবে। আল্লামা আ-লুসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

لِاَنَّهَا سَبَبُ الْوُقُوْعِ فِى الْاِثْمِ وَالْعِقَابِ اَوْ مِحْنَةٌ مِّنَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَخْتَبِرُ كُمْ فَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ حُبُّهَا عَلَ الْخِيَانَةِ - (روح المعانى : ج-٩، ص-١٩٦)

কেননা সন্তান গুনাহ এবং আযাবে পড়বার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তা হচ্ছে আল্লাহ্র তরফ থেকে পরীক্ষার একটি সামগ্রী। অতএব, সন্তানের ভালোবাসা যেন তোমাদেরকে খেয়ানতে উদ্বুদ্ধ না করে।

সূরা আত-তাগাবুন-এ-ও মাল ও আওলাদকে ফেত্না বলা হয়েছে এবং কোনো কোনো সন্তান পিতামাতার 'দুশমন' হতে পারে বলেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, এখানে বৈষয়িক বিষয়ের দুশমনীর কথা বলা হয়নি, আল্লাহ্র আনুগত্য ও দ্বীন ইসলাম মুতাবিক জীবন যাপনের পথে সন্তান-সন্তুতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানোই হচ্ছে তাদের দুশমনী। বিশেষত তখন, যখন সন্তানের মায়া আল্লাহ্র ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা অপেক্ষা তীব্রতর হয়ে ওঠে, তখন তাদের দুশমনী সত্যিই মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে। এ কারণেই বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (১৩)

তোমরা যদি তাদের মাফ করে দাও, তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করো, করো দয়া-দাক্ষিণ্য অনুগ্রহ, তাহলে তা ভালোই হবে। কেননা আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্যে মাফকারী ও দয়াবান।

বস্তুত সন্তানদের প্রতি সব সময় ক্ষিপ্ত হয়ে, খড়গহস্ত হয়ে থাকা আর প্রতি কথায় ও কাজে তাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করা, গালাগাল করা মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ। ইসলামে যেমন সন্তানের ওপর পিতামাতার হক ধার্য করা হয়েছে, তেমনি পিতামাতার ওপর সন্তানের হক নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য

সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতার প্রতি তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কতক হক কার্যকর হতে শুরু করে এবং তখন থেকেই সে হক অনুযায়ী আমল করা পিতামাতার কর্তব্য হয়ে যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) থেকে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةُ اَشْيَاءَ اَنْ يُحْسِنَ اِسْمَهٗ اِذَا وَلَدَ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ اِذَا عَقَلَ وَ يُزَوِّجَهٗ اِذَا اَدْرَكَ - (تنبيه الغافلين للشيخ السمرقندى :ص-٤٧)

পিতামাতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমত তিনটি ঃ জন্মের পরে পরেই তার জন্যে উত্তম একটি নাম রাখতে হবে, জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়লে তাকে কুরআন তথা ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে। আর সে যখন পূর্ণবয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

বস্তুত সন্তানের ভালো নাম না রাখা, কুরআন ও ইসলামের শিক্ষাদান না করা এবং পূর্ণ বয়সের কালে তার বিয়ের ব্যবস্থা না করা মাতাপিতার অপরাধের মধ্যে গণ্য। এসব কাজ না করলে পিতামাতার পারিবারিক দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। ভবিষ্যত সমাজও ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গড়ে উঠতে পারে না। এ পর্যায়ে একটি ঘটনা উল্লেখ্য ঃ একটি লোক হযরত উমর ফারুকের কাছে একটি ছেলেকে সঙ্গে করে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ এ আমার ছেলে; কিন্তু আমার সাথে সকল সম্পর্ক

ছিন্ন করেছে। তখন হযরত উমর (রা) ছেলেটিকে বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় কর না ? পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বড়ই গুনাহের কাজ তা কি জানো না ? সন্তানের ওপর পিতামাতার যে অনেক হক রয়েছে তা তুমি কিভাবে অস্বীকার করতে পার ? ছেলেটি বলল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, পিতামাতার ওপরও কি সন্তানের কোনো হক আছে ? হযরত উমর (রা) বললেন ঃ নিশ্চয়ই এবং সেই হক হচ্ছে এই যে, (১) পিতা নিজে সৎ ও ভদ্র মেয়ে বিয়ে করবে, যেন তার সন্তানের মা এমন কোনো নারী না হয়, যার দরুন সন্তানের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হতে পারে বা লজ্জা অপমানের কারণ হতে পারে। (২) সন্তানের ভালো কোনো নাম রাখা, (৩) সন্তানকে আল্লাহর কিতাব ও দ্বীন-ইসলাম শিক্ষা দেয়া। তখন ছেলেটি বলল ঃ আল্লাহ্র শপথ, আমার এ পিতামাতা আমার এ হক গুলোর একটিও আদায় করেন নি। তখন হযরত উমর (রা) সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

تَقُوْلُ اِبْنِىْ يُعَقِّنِى فَقَدْ عَقَقْتَهُ قَبْلَ اَنْ يَّعَقَّكَ قُمْ عَنِّىْ -

তুমি বলছ, তোমার ছেলে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, আসলে তো তোমার থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আগে তুমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছ। (তার হক্ নষ্ট করেছ)। ওঠো এখান থেকে চলে যাও।

তার মানে, পিতামাতা যদি বাস্তবিকই চান যে, তাদের সন্তান তাদের হক আদায় করুক, তাহলে তাদের কর্তব্য, সর্বাগ্রে সন্তানদের হক আদায় করা এবং তাতে কোনো গাফিলতির প্রশ্রয় না দেয়া।

আকীকাহ

সন্তান জন্মের পরে-পরেই পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে তার জন্যে আকীকাহ্ করা। পিতামাতার প্রতি সন্তানের এ হচ্ছে এক বিশেষ হক্। রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهٖ تَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهٖ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْاَذٰى -

প্রতিটি সদ্যজাত সন্তান তার আকীকার সাথে বন্দী। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু যবাই করতে হয় এবং তার মাথা কামিয়ে ময়লা দূর করতে হয়।

অপর এক হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهٖ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهٖ وَ يُسَمّٰى عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَاْسُهُ - (بخارى، ترمذى)

প্রত্যেকটি সদ্যজাত সন্তান তার আকীকার নিকট বন্দী, তার জন্মের সপ্তম দিনে তার নামে পশু যবাই করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথার চুল মুণ্ডন করা হবে।

এ হাদীসদ্বয় থেকে জানা গেল যে, সন্তান জন্মের পরে তার নামে একটি জন্তু যবাই করাকেই আকীকাহ্ বলা হয়। ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

اَلْعَقِيْقَةُ الذَّبِيْحَةُ الَّتِىْ تُذْبَحُ لِلْمَوْلُوْدِ وَالْعِقُّ فِى الْاَصْلِ اَلشَّقُّ وَالْقَطْعُ - (نيل الاوطار : ج-٥، ص-٢٢٤)

আকীকাহ্ বলা হয় সেই জন্তুটিকে, যা সদ্যজাত সন্তানের নামে যবাই করা হয়। এর মূল শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ভাঙা, কেটে ফেলা। আর নবজাত শিশুর মুণ্ডিত চুলকেও আকীকাহ বলা হয়।

"নবজাত সন্তান আকীকার কাছে বন্দী" কথাটির ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ

اِنَّهٗ اِذَا مَاتَ وَهُوَ طِفْلٌ وَلَمْ يَعِقَّ عَنْهُ لَمْ يَشْفَعْ لِاَبَوَيْهِ -

শিশু অবস্থায় কোনো সন্তান যদি মারা যায় এবং তার জন্যে আকীকাহ্ করা না হয়, তবে সে তার পিতামাতার জন্যে আল্লাহ্র কাছে শাফায়াত করবে না।

অন্যান্যের মতে তার মানে—

اِنَّ الْعَقِيْقَةَ لَا زِمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا -

আকীকাহ্ করা একান্তই অপরিহার্য, তা না করে কোনোই উপায় নেই।

যেহেতু যে কোনো বন্ধকের জন্যে বন্দকী জিনিসের প্রয়োজন, এমনিভাবে যে কোনো সদ্যজাত সন্তানের জন্যে আকীকাহ্ দরকার। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 'প্রত্যেক নবজাত সন্তান আকীকার নিকট বন্দী।' আবার কেউ কেউ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, 'প্রত্যেক সদ্যজাত সন্তান আকীকার কাছে বন্দী।'— এর অর্থ আকীকাহ্ করার আগে কোনো সন্তানের না নাম রাখা যাবে, আর না মাথা মুণ্ডন করা হবে।

বস্তুত আকীকাহ্ করার রেওয়াজ প্রাচীন আরব সমাজে ব্যাপকভাবে চালু ছিল। এর মধ্যে নিহিত ছিল সামাজিক, নাগরিক মনস্তাত্ত্বিক— সর্বপ্রকারের কল্যাণবোধ। এ কারণেই নবী করীম (স) আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে এ প্রথাকে চালু রেখেছিলেন। নিজে আকীকাহ্ দিয়েছেন এবং অন্যদেরও এ কাছে উৎসাহিত করেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভীর মতে এর উপকারিতা অনেক। তার মধ্যে বিশেষ উপকারিতা হচ্ছে ঃ

التلطف باشاعة نسب الولداذ لابد من اشاعته لئلا يقال فيه ما يحبه ولا يحسن ان يدور فى السكك فينادى انه ولدلى ولدقتعين التلطف بمثل ذلك ومنها انباء داعية السخاوة وعصيان دامية الشح -

(حجة الله البالغة : ج-١)

আকীকার সাহায্যে খুব সুন্দরভাবেই সন্তান জন্মের ও তার বংশ–সম্পর্কের প্রচার হতে পারে। কেননা বংশ পরিচয়ের প্রচার একান্তই জরুরী, যেন কেউ কারো বংশ সম্পর্কে অবাঞ্ছিত কথা বলতে না পারে। আর সন্তানের পিতার পক্ষে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তার সন্তান হওয়ার কথা চিৎকার করে বলে বেড়ানোও কোনো সুষ্ঠু ও ভদ্র পন্থা হতে পারে না। অতঃপর আকীকার মাধ্যমেই এ কাজ করা অধিকতর সমীচীন বলে প্রমাণিত হলো। এ ছাড়াও এর আর একটি ফায়দা হচ্ছে এই যে, এতে করে সন্তানের পিতার মধ্যে বদান্যতা ও দানশীলতার ভাবধারা অনুসরণ প্রবল ও কার্পণ্যের ভাবধারা প্রশমিত হতে পারে।

জাহিরী মতের আলিমদের দৃষ্টিতে আকীকাহ্ করা ওয়াজিব। তবে অধিক সংখ্যক ইমাম ও মুজতাহিদের মতে তা করা সুন্নাত। যদিও ইমাম আবূ হানীফার মতে তা ফরয-ওয়াজিবও নয়, আর সুন্নাতও নয়, বরং নফল— অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ। তবে পূর্বোদ্ধৃত হাদীস থেকে আকীকাহ্ করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ সম্পর্কে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোদ্ধৃত বাণী থেকে মুবাহ ও মুস্তাহাবই মনে করা যেতে পারে। রাসূলে করীম (স)-কে আকীকাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ

لَا اُحِبُّ الْعُقُوْقَ وَمَنْ وَلَدَ لَهٗ وَلَدٌ فَاُحِبُّ اَنْ يَّنْسَكَ عَنْ وَلَدِهٖ فَلْيَفْعَلْ -

আমি 'আকীকাহ্' শব্দ ব্যবহার পছন্দ করি না। তবে যার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে যেন তার সন্তানের নামে জন্তু জবাই করে।[১] তা-ই আমি পছন্দ করি।

---

১. 'আকীকাহ্' শব্দটি শাব্দিক অর্থ ছিন্নকরণ, কর্তন বা কেটে ফেলা। এই শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে নবী করীম (স) তাঁর অপছন্দের কথা ব্যক্ত করেছেন মাত্র। কিন্তু তাতে মূল কাজটির গুরুত্ব কিছুমাত্র ব্যহত হয়নি। — গ্রন্থকার

(بداية المجتهد لابن رشد ج١ ص ٤٦٢-٤٦٣)

এ হাদীসে আকীকাহ করাকে ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়েছে। তার মানে, তা করা ওয়াজিব নয়।

অপর এক হাদীসে রাসূলে করীম (স)-এর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَ اَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى - (بخاری، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجه)

প্রত্যেক সদ্যজাত সন্তানের সঙ্গেই আকীকার কার্যটি জড়িত, অতএব তোমরা তার নামে জন্তু যবাই করে রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার মস্তক মুন্ডন করে চুল ফেলে দাও।

সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকীকাহ করার কথা বলা হয়েছে এজন্যে যে, জন্ম ও তার আকীকার মাঝ সময়ের কিছুটা ব্যবধান হওয়া আবশ্যক। কেননা নতুন শিশুর জন্ম-লাভের ব্যাপারটিও ঘরের সকলের জন্যেই বিশেষ ঝামেলা ও ব্যস্ততার কারণ হয়ে থাকে। এ থেকে অবসর হওয়ার পরই আকীকার প্রস্তুতি করা যেতে পারে। নবী করীম (স) তাঁর দৌহিত্র হাসানের নামে আকীকাহ করলেন এবং বললেন ঃ

يَا فَاطِمَةُ اَحْلِقِىْ رَاْسَهٗ وَ تَصَدَّقِىْ بِوَزْنِ شَعْرِهٖ فِضَّةً -

হে ফাতিমা, এর (হাসানের) মস্তক মুণ্ডন করে ফেল এবং তার মাথার চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সাদকা করে দাও।

আর ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَلَقَتْ شَعْرَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَ زَيْنَبَ وَ اُمِّ كُلْثُوْمَ وَ تَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذٰلِكَ فِضَّةً -

হযরত ফাতিমা হাসান, হুসাইন, জয়নব ও উম্মে কুলসুমের মাথা মুণ্ডন করেছিলেন এবং তাদের চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সাদ্‌কা করে দিয়েছিলেন।

আকীকাহ তো জন্মের সপ্তম দিনে করার নিয়ম। কিন্তু জন্মের পরে পরে যে কাজটা জরুরী, তা হচ্ছে সদ্যজাত পুরুষ শিশুর কর্ণে আযান দেয়া। হযরত হাসানের জন্ম হলে পর নবী করীম (স) তাঁর কর্ণে আযান ধ্বনি শুনিয়েছিলেন।

হযরত আবূ রাফে বলেন ঃ

رايت رسول الله ﷺ اذن فى اذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلوة - (مسنداحمد، ابوداؤد)

হযরত ফাতিমা যখন হুসাইনকে প্রসব করলেন, তখন নবী করীম (স)-কে তাঁর কানে নামাযের আযান শোনাতে আমি দেখেছি।

সন্তানের নাম রাখা সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস সময় নির্দেশ করে ঃ

ان النبى ﷺ امر بتسمية المولود يوم سبا بعه ووضع الاذى منه والعق - (ترمذى)

নবী করীম (স) সপ্তম দিনে সন্তানের নাম রাখতে, মস্তক মুণ্ডন করতে এবং আকীকাহ্ করতে আদেশ করেছেন।

আকীকায় কার জন্যে কয়টি জন্তু যবাই করা হবে, এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে ঃ

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ – (احمد، ابوداؤد، نسائی)

পুরুষ ছেলের জন্যে দু'টি ছাগল এবং মেয়ে সন্তানের জন্যে একটি ছাগল যবাই করাই যথেষ্ট হবে।

নবজাত শিশু সবার কাছেই বড় আদরণীয়। নবী করীম (স)-ও এ ধরনের শিশুদের বড্ড আদর-যত্ন করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ উম্মে সুলাইম যখন একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন তখন তাঁকে নবী করীম (স)-এর কাছে উপস্থিত করা হয় এবং তার সাথে কিছু খেজুরও পাঠিয়ে দেয়া হয়। তখন নবী করীম (স) সে খেজুর নিজের মুখে পুরে খুব চিবিয়ে নরম করে নিলেন ও নিজের মুখ থেকে বের করে তা শিশুর মুখে পুরে দিলেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ্। — বুখারী, মুসলিম

ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্র শিক্ষাদান

অত ঃপর পিতামাতার প্রতি সন্তানের সবচেয়ে বড় হক হচ্ছে, তারা তাদের সন্তান-সন্তুতিকে পরকালীন জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবার জন্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا – (تحريم : ٦)

হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার- পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

আয়াতে 'তোমাদের নিজেদেরকে বাঁচাও' প্রথমে বলার কারণ এই যে, যে লোক নিজেকে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে চায় না, সে অপরকে— নিজের সন্তান-সন্তুতি ও পরিজনকে— তা থেকে বাঁচাবার জন্যে কখনো চেষ্টা করতে পারে না। আর 'আহ্ল' বলতে স্ত্রীসহ গোটা পরিবারকে— পরিবারস্থ সমস্ত লোককে বোঝায়। একজন লোক যাদেরকে কোনো কথা বলতে পারে এবং তারা তা মেনে চলতে বাধ্য হয়— এমন সব লোকই এ আহ্ল শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের দৃষ্টিতে স্ত্রীসহ গোটা পরিবারের প্রতি পিতার— পরিবার কর্তার— প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাবার জন্যে এ দুনিয়ায়ই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, তাদের মনে পরকালীন জবাবদিহির ভয় জাগিয়ে তোলা এবং এমনভাব জীবন যাপনের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে তোলা যেন তার পরিণামে তারা কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর জাহান্নাম থেকে বাঁচবার ও বাঁচাবার উপায় হচ্ছে নিজে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পালন করা এবং তার পরিবারবর্গকেও এভাবে তৈয়ার করা। এ আয়াতের তফসীরে মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বলেছেন ঃ

المعنى قوا انفسكم واهليكم بالادب لصالح النار فى الاخرة –

এ আয়াতের মানে হচ্ছে, তোমরা তোমাদের নিজেদের ও পরিবার-পরিজনদের সুশিক্ষা ও ভালো অভ্যাসের সাহায্যে পরকালীণ জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

কাতাদাহ ও মুজাহিদ বলেছেন ঃ

قوا انفسكم بافعالكم وقوا اهليكم بوصيتكم –

তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও নিজেদের কাজের সাহায্যে আর তোমাদের পরিজনকে বাঁচাও তাদেরকে সৎ শিক্ষা ও সদুপদেশ দিয়ে।

ইমামুল মুফাস্সিরীন ইবনে জরীর তাবারী লিখেছেন ঃ

فَعَلَيْنَا اَنْ نُّعَلِّمَ اَوْلَادَنَا الدِّيْنَ وَالْخَيْرَ وَمَالَا يَسْتَغْنِىْ عَنْهُ مِنَ الْاَدَبِ –

আল্লাহ্‌র এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা আমাদের সন্তানদের দ্বীন ইসলাম ও সমস্ত কল্যাণময় জ্ঞান এবং অপরিহার্য ভালো চরিত্র শিক্ষা দেব।

হযরত আলী (রা) এ আয়াতের ভিত্তিতে লিখেছেন ঃ

عَلِّمُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمُ الْخَيْرَ وَ اَدِّبُوْهُمْ - (فتح القدير : ج-٥، ص-٢٥٦)

তোমরা নিজেরা শেখো ও পরিবারবর্গকে শিখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের সে কাজে অভ্যস্ত করে তোল।

সন্তান-সন্ততিকে উন্নতমানের ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দান ও ইসলামী আইন-কানুন পালনে— আল্লাহকে ভয় ও রাসূলে করীম (স)-কে অনুসরণ করে চলার জন্যে অভ্যস্থ করে তোলাও পিতামাতারই কর্তব্য এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের অতি বড় হক। সন্তানকে এই জ্ঞান ও অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করে দেয়ার তুলনায় অধিক মূল্যবান কোনো দান এমন হতে পারে না, যা তারা সন্তানকে দিয়ে যেতে পারেন।

হযরত লুকমানের নসীহত

এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে উল্লিখিত হযরত লুকমানের তাঁর পুত্রের প্রতি প্রদত্ত নসীহত বিশেষভাবে স্মরণীয়। সূরা লুকমান-এ এ নসীহত বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। সেই নসীহতের কথাগুলো আমরা এখানে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি।

প্রথম কথা ঃ

يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - (القمان : ١٣)

হে প্রিয় পুত্র, আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করো না, কেননা শির্‌ক হচ্ছে অত্যন্ত বড় জুলুম।

মানুষের জীবন এক বিশেষ আকীদা-বিশ্বাসের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়ে থাকে। এই বিশ্বাসই হচ্ছে সকল কর্মের মূল প্রেরণার উৎস। সেই কারণে হযরত লুকমান তাঁর ছোট্ট বয়সের প্রিয় পুত্রকে যে নসীহত করলেন, তার প্রথম কথাটিই হচ্ছে শির্‌ক পরিহার করে তওহীদ— আল্লাহ্ সম্পর্কে সর্বতোভাবে একত্বের ধারণা ও বিশ্বাস মনের মধ্যে দৃঢ়মূল ও স্থায়ী করে নেয়ার নির্দেশ। বস্তুত তওহীদের আকীদাহ যেমন ব্যক্তির জীবনে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য সংস্থাপন করে, তেমনি পরিবার ও সমাজ জীবনেও অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ইসলামের দিক দিয়ে এ হচ্ছে ঈমানের বুনিয়াদ— প্রাথমিক কথা।

দ্বিতীয় কথা ঃ

يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِىْ السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ط

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ - (القمان : ١٦)

হে পুত্র, একটা পরিমাণ শির্‌ক কোনো জিনিসে ও যদি কোনো প্রস্তরের অভ্যন্তরে কিংবা আসমান-জমিনের কোনো এক নিভৃত কোণেও লুকিয়ে থাকে, তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তা অবশ্যই এনে হাজির করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী— গোপন জিনিস সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

নসীহতের এ অংশে আল্লাহ্ তা'আলার ইল্‌ম ও কুদরতের বিরাটত্ব, ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতার অকাট্য বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পূর্বোক্ত শির্‌ক পরিহার ও তওহীদের আকীদাহ্ গ্রহণ সংক্রান্ত নসীহতের সঙ্গে এর স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ সম্পর্কে এ আকীদাহ্-ই মানুষকে সকল প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য

গুনাহ্-নাফরমানী থেকে বিরত রাখে এবং পরকালে বিচারের দিনে অণুপরমাণু পরিমাণ আমল— ভালো কিংবা মন্দ— এর ফল ভোগ করার অনিবার্যতা মানুষের মন ও মগজে দৃঢ়মূল করে দেয়।

বরং এরূপ আকীদা মানব মনে জাগ্রত ও সক্রিয় প্রভাবশীল হয়ে না থাকলে তা কখনো সম্ভব হতে পারে না।

আল্লাহ্ সম্পর্কে এ আকীদা অনুযায়ী বাস্তব জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে যে কাজ একান্তই জরুরী ও সর্বাধিক প্রভাবশালী তা হচ্ছে রীতিমত নামায পড়া। এজন্যে এর পরই বলা হয়েছে—

তৃতীয় কথা ঃ يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ —হে পুত্র, নামায কায়েম করো।

আকীদাহ্ সঠিকরূপে মন-মগজে বসিয়ে দেয়ার পর বাস্তব কর্মের নির্দেশ। আকীদার ক্ষেত্রে তওহীদ যেমন মূল, আমলের ক্ষেত্রে নামায হচ্ছে তেমনি সবকিছুর মূল। নামায হচ্ছে আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের এক বাস্তব অনুষ্ঠান। নামায কায়েম ব্যতীত সঠিকরূপে ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব নয়। নামায যদিও এক সামগ্রিক ও সমষ্টিগত কাজ, কিন্তু আমলের দৃষ্টিতে নামায এমন একটি কাজ, যা ব্যক্তির নিজ সত্তার পূর্ণত্ব ও পরিপক্কতার বিধান করে। এজন্যে সন্তান- সন্ততির আকীদাহ যেমন দুরস্ত করা প্রথম প্রয়োজন, তেমনি দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে সঠিকভাবে নামায পড়ার কায়দা-কানুন শেখানো, রীতিমত নামায পড়তে অভ্যস্থ করা। এজন্যে সূরা 'তা-হা'তে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَ اْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, অর্থাৎ এবং তোমার পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিদের নামায পড়বার জন্যে আদেশ করো এবং তা রীতিমত আদায় করায় তাদের অভ্যস্ত করে তোলো। (১৩২ আয়াত) যেন তারা আল্লাহ্র ভয়, আনুগত্য, নতি ও বিনয় সহকারে আল্লাহ্র বন্দেগী করার কাজে জীবন যাপন করার ব্যাপারে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে এবং কখনই তা থেকে বিচ্যুত হয়ে না পড়ে।

নামায সম্পর্কে হাদীসেও সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে; নবী করীম (স) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন ঃ

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْ هُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَ فَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِىْ الْمَضَاجِعِ - (ابوداؤد)

তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের নামায পড়তে আদেশ করো যখন তারা সাত বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছবে এবং নামাযের জন্যেই তাদের মারধোর করো— শাসন করো যখন তারা হবে দশ বছর বয়স্ক। আর তখন তাদের জন্যে আলাদা-আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করাও কর্তব্য।

এখানে 'সাত বছর' আর 'দশ বছর' বলার কারণ হচ্ছে, আরব অত্যন্ত গরম দেশ বলে সেখানকার বালক-বালিকারা সাত বছরেই বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে, আর দশ বছর বয়সে পূর্ণ বালেগ হয়ে যায়। আবহাওয়ার পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে এই 'প্রায়-বালেগ' ও 'পূর্ণ বালেগ' হওয়ার বয়সে তারতম্য হতে পারে এবং সে হিসেবেই রাসূলে করীম (স)-এর এ আদেশ কার্যকর করতে হবে। উল্লিখিত 'সাত' ও 'দশ' সংখ্যাই আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রায়-বালেগ ও পূর্ণ-বালেগই মূল লক্ষ্য।

চতুর্থ কথায় বলা হয়েছে ঃ

وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

এবং ভালো কাজের আদেশ করো আর অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখ।

নসীহতের এ অংশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঈমানদার ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে পারে না অপর লোকদের— তথা গোটা সমাজ ও জাতির ভালো মন্দ সম্পর্কে দায়িত্ব বোধ

করা এবং ভালো কাজের প্রচলন ও অন্যায় ও পাপ কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাও তার এক অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এমন কি কারো ব্যক্তিগতভাবে সৎ পথে চলা ও সৎ কাজ করাও পূর্ণত্ব ও যথার্থতা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না অপর লোকদেরও হেদায়েত প্রাপ্ত রূপে তৈয়ার করতে চেষ্টা করা হবে। এ কেবল হযরত মুহাম্মদ (স) প্রবর্তিত শরীয়তেরই নীতি নয়, এ হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত সমস্ত ব্যবস্থার প্রাণশক্তি। যে বালক-বালিকা ছোট্ট বয়সেই ন্যায়-অন্যায় ও পাপ-পূণ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে এবং এ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ করতে শুরু করবে, আশা করা যায়, ভবিষ্যতে তারা নিজেরাই শুধু ন্যায়বাদী ও সত্যপন্থী হবে না, অন্য মানুষকেও— সমাজ ও জাতিকেও— ন্যায়বাদী ও সত্যদর্শী বানাতে সচেষ্ট হবে।

এ প্রসঙ্গেই পঞ্চম নসীহত হচ্ছে ঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

যা কিছু দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা আসবে এ কাজে তা সব উদারভাবে বরদাশ্ত করো, কেননা এ এমন কাজ, যা সম্পন্ন করার একান্তই জরুরী ও অপরিহার্য।

'ভালো কাজের আদেশ ও অন্যায়-পাপ কাজের নিষেধ' কোনো ছেলে খেলার ব্যাপার নয়। এ হচ্ছে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ, অত্যন্ত কষ্ট ও দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় এ কাজ করতে গেলে। কাজেই বালক-বালিকাদের শিক্ষা এমনভাবে দিতে হবে, যাতে তারা শৈশবকাল থেকেই বীর সাহসী হয়ে গড়ে ওঠে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যেন তারা নির্ভীক হয়, পরম পরাক্রমশালী জালিমের মুখোমুখী দাঁড়াতে যেন একটুও ভয় না পায়। অন্যায়কে নীরবে সহ্য করার মতো কাপুরুষতা যেন তাদের ভিতরে কখনো দেখা না দেয়।

নসীহতের ষষ্ঠ কথা হচ্ছে ঃ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ -

লোকদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করো না, অহংকার করে ঘৃণা করে লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

এর তাৎপর্য হচ্ছে, তুমি নিজেকে সাধারণ লোক থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র মনে করো না। নিজেকে তাদের একজন মনে করে তাদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকো।

সপ্তম কথা ঃ

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

জমিনের ওপর গৌরব-অহংকার স্ফীত হয়ে চলাফেরা করো না কেননা আল্লাহ্ যে কোনো অহংকারী গৌরবকারীকে মোটেই পছন্দ করেন না, তাতে সন্দেহ নেই।

অহংকারী গৌরবকারী— এ আচরণ সত্যিই অমানুষিক। লোকদের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকানো, মুখ ফিরিয়ে আর একদিকে তাকিয়ে অবজ্ঞাভরে কারো সাথে কথা বলা, চিৎকার করে বুক ফুলিয়ে কথা বলা ও বাহাদুরী করা এমন আচরণ, যা সামাজিক সুস্থতা ও সমৃদ্ধির দৃষ্টিতে কিছুমাত্র বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। অপরদিকে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে, এ ধরনের অহংকারপূর্ণ আচরণ ঈমানেরও পরিপন্থী।

এ জন্যে অষ্টম নসীহতে বলা হয়েছে ঃ

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ -

মধ্যম নীতি অবলম্বন করে মাঝামাঝি ধরনের চালচলন অবলম্বন করো।

সাধারণ মানুষের একজন হয়েই সাধারণ জীবন যাপন করতে পূর্বোদ্ধৃত আদেশেরই পরিপূরক নিম্নের নবম এবং শেষ নসীহতটি ঃ

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَ صْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ -

তোমার কণ্ঠধ্বনি নিচু করো, সংযত ও নরম করো কেননা সবচেয়ে ঘৃণ্য হচ্ছে গর্দভের কর্কশ আওয়াজ।

চিৎকার করা, চিৎকার করে কথাবার্তা বলা শালীনতা বিরোধী। সাধারণ সভ্যতা-ভব্যতা ও সামাজিকতা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা কখনো পছন্দ করতে পারে না। এ বরং গৌরব অহংকারেরই সুস্পষ্ট লক্ষণ। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাই যদি জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচায়ক হতো, তাহলে বলতে হবে গাধারা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। যারা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে অভ্যস্ত, তাদের মনস্তত্ত্ব সম্ভবত এরূপ যে, আমাদের কথা উচ্চমার্গে ধ্বনিত হচ্ছে। অতএব আমার সম্মান ও মর্যাদাও সকলের কাছে স্বীকৃতব্য।

হযরত লুক্‌মানের এ নয়টি নসীহতের কথা— যা তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে বলেছিলেন— বালক-বালিকাদের সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষাদানের পর্যায়ে— এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ হচ্ছে মৌলিক মানবীয় শিক্ষার বিভিন্ন ধারা, যার ভিত্তিতে শৈশবকাল থেকেই বালক-বালিকাদের শিক্ষিত করে তোলা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য এবং এ কাজ পিতামাতাকেই সঠিকভাবে করতে হবে। পিতামাতা যদি সন্তানকে ভবিষ্যত সমাজের মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে এবং প্রকৃত মানুষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হতে পারে। এ ধরনের সন্তানই পিতামাতার পক্ষে ইহকাল-পরকাল সর্বত্র কল্যাণময় হয়ে উঠতে পারে। এজন্যে পিতামাতার প্রতি তাদের এভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে সন্তানের অনিবার্য হক। এ হক পিতামাতা আদায় করতে একান্তই বাধ্য।

এজন্যেই নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَالِدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ - (ترمذى)

কোনো পিতামাতা সন্তানকে উত্তম আদব-কায়দা ও স্বভাব-চরিত্র শিক্ষাদান অপেক্ষা ভালো কোনো দান দিতে পারে না।

অন্যত্র বলেছেন ঃ

اَكْرِمُوْا اَوْلَادَكُمْ وَاَحْسِنُوْا اٰدَابَهُمْ -

তোমাদের সন্তানদের সম্মান করো এবং তাদের ভালো স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দাও।

সন্তানকে যতদূর সম্ভব চরিত্র সম্পূন্ন করে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করা পিতামাতার কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে তার নিজস্ব চেষ্টা-সাধনা ও যত্নের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হলে চলবে না। মুমিন লোকদের তো অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারের ন্যায় এক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র ওপরই নির্ভরতা স্থাপন করতে হয়। কুরআন মজীদ পিতামাতাকে তাদের সন্তানের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করবার উপদেশ এবং শিক্ষা দিয়েছেন। সূরা আল-ফুরকান-এ আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের অন্যান্য গুণের সঙ্গে এ গুণটিরও উল্লেখ করা হয়েছে। । বলা হয়েছে ঃ

আল্লাহ্‌র নেক বান্দা তারাই, যারা সব সময় দো'আ করে এই বলে ঃ

وَالَّذِيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا -

হে আল্লাহ্, আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের দিক থেকে চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের নেতা বানাও।

'চোখের শীতলতা দান করো' মানে তুমি তাদের তোমার অনুগত ও আদেশ পালনকারী বানাও, যা দেখে চোখ জুড়াবে, দিল খুশী হবে। 'আমাদেরকে পরহেজগার লোকদের নেতা বানাও' মানে তাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় কাজ— আল্লাহ্-রাসূলের আনুগত্যের কাজে আমাকে অনুগামী বানাও ও তাদের এমন নেতা বানাও যে, তারা দুনিয়ার মানুষকে সত্যের পথ, কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করবে। বস্তুত কারো স্ত্রী ও সন্তান যদি আল্লাহ্র অনুগত হয়, আল্লাহর দ্বীন পালনে আগ্রহশীল হয় এবং সত্য পথের মুজাহিদ ও অগ্রনেতা হয়, তাহলে মুমিন ব্যক্তির চোখ সত্যিই শীতল হয়, দিল ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু ব্যাপার যদি তার বিপরীত হয়, স্ত্রী ও সন্তান হয় যদি আল্লাহ্র নাফরমান, তাহলে মু'মিন ব্যক্তির পক্ষে তার চেয়ে বড় দুঃখবোধ আর কিছুতেই হতে পারে না। এ কারণে পিতামাতার উচিত সব সময় সন্তানের কল্যাণের জন্যে তারা যাতে আল্লাহ্র নেক বান্দা হয়ে গড়ে ওঠে তার জন্যে আল্লাহর কাছে দো'আ করা।

ইসলামে পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সমধিক। জাহিলিয়াতের যুগে নারী ও কন্যা সন্তানের প্রতি যে অবজ্ঞা-অবহেলা ও ঘৃণার ভাব মানব মনে পুঞ্জীভূত ছিল, তার প্রতিবাদ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে কন্যা সন্তানদের উন্নত ও ভালো চরিত্র শিক্ষাদানের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষত নারীদের স্বাভাবিক দুর্বলতা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী হওয়ার জন্যে তাদের প্রতি পিতামাতার অধিক লক্ষ্য আরোপ করা কর্তব্য। এজন্যে নবী করীম (স) এক বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

مِنِ ابْتَلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ – (بخارى، مسلم)

যে লোককে এই কন্যা সন্তান দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হবে, সে যদি তাদের প্রতি কল্যাণময় ব্যবহার করে তবে এ কন্যারাই তার জন্যে জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হবে।

এ হলো সন্তানের প্রতি পিতামাতার আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাগত কর্তব্য; কিন্তু এ ছাড়াও কিছু কর্তব্য রয়েছে। তা হচ্ছে তাদের শিশু বয়সে খেলা ধুলা করার ব্যবস্থা করা এবং একটু বড় হলে তাদের ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী বানাবার জন্যে ব্যায়াম বা শরীর চর্চার শিক্ষা দান।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বীভৎস রূপ

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে মূলত জাহিলিয়াতের ভিত্তি। আর যে সভ্যতার ভিত্তিই হয় বস্তুবাদ, সেখানে মানুষ ও পশুতে বড় একটা পার্থক্য থাকতে পারে না। বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যতা এ বস্তুবাদী জীবন দর্শন এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপরই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ফলে সেখানকার সমাজ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্যের পিতামাতা ও সন্তান-সন্তুতির মাঝে ঠিক ততটুকু এবং সে রকমই সম্পর্ক বজায় আছে, সাধারণত যা থাকে বা রয়েছে জন্তু-জানোয়ার আর তার বাচ্চা-বাছুরদের সঙ্গে। সন্তান— সে ছেলেই হোক, আর মেয়েই হোক— পূর্ণবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিতামাতা তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, তাদের কোনো দায়িত্বই বহন করতে প্রস্তুত হয় না। ঘর থেকে তাদের বের করে দেয়। এমনকি তখনও যদি কোনো সন্তান— ছেলে কিংবা মেয়ে— পিতার ঘরের কোনো অতিরিক্ত অংশ ব্যবহার করে, তাকে তার জন্যে দস্তুরমত ভাড়া দিতে হয় এবং একজন ভাড়াটের মতই তাকে সেখানে থাকতে হয়। শুধু তাই নয়, তাদের বিয়ে শাদীরও কোনো দায়িত্ব পিতামাতা বহন করতে রাজি হয় না। সন্তান— ছেলে ও মেয়ে— যেখানে যার ইচ্ছা এবং যার সাথে যার ইচ্ছা বিয়ে করুক বা না-ই করুক, তাতে পিতামাতার কিছু যায় আসেনা।

একথাটি পুরুষ ছেলেদের সম্পর্কে ধারণা করা গেলেও কন্যা-সন্তানদের সম্পর্কে তো এরূপ ব্যাপার ধারণা মাত্রই করা যায় না। এরূপ আচরণ সত্যিই মনুষ্যত্বের ঘোর অপমৃত্যু ঘটেছে বলে প্রমাণ করে।

বস্তুত ইউরোপ-আমেরিকায় পারিবারিক জীবনে কিরূপ চরম ও মারাত্মক ভাঙন এসেছে, বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে, নিম্নোদ্ধৃত দুটি খবর থেকে তা স্পষ্ট প্রমাণিত হবে।

লন্ডনে এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো, তার পিতামাতা প্রায় ৫০ বছর থেকে এখানের অধিবাসী। সে বিয়েও করেছে এখানে। তার ছেলেমেয়েরাও পুরাপুরি ইংরেজ। কিন্তু বেচারা নিজে নিজেকে নামকাওয়াস্তে মুসলিম বলেই মনে করে। তার পিতার কাছে আমি এখানকার বিয়ে-শাদীর রেওয়াজ (রীতিনীতি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তাতে জানা গেল যে, প্রত্যেক ছেলেই তার স্ত্রী সে নিজে সন্ধান করে নিজ ইচ্ছামতোই তার সাথে বিয়ে করে। এ ব্যাপারে পিতামাতার কোনো কিছু করণীয় নেই। না তারা নিজেরা ছেলেদের বিয়ে দেবার জন্যে কোনো চেষ্টা করে, না করে তার ব্যাবস্থাপনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ছেলে কোথায় গিয়ে বউ তালাস করবে, আপনাদের সমাজে বংশীয় বা আত্মীয়তার সম্পর্কও তো তেমন নেই। বন্ধু বলল ঃ স্কুল, কলেজ কিংবা হোটেল-রেস্তোঁরায় বা মার্কেটেই খুঁজে বেড়ায়। আর মেয়েদেরও অবস্থা এরূপই। তারা তো কোনো না কোনো ছেলের সন্ধানে ঘোরাফেরা করে থাকে। নিয়ম হলো— ছেলে কোনো মেয়ের সাথে প্রথমত বন্ধুত্ব ও নিবিড় ঘনিষ্টভাবে মেলামেশা শুরু করবে। তারপরে উভয়ে রাজি হলে বিয়ে হওয়ার সিদ্ধান্ত হতে পারে। বন্ধু আরো বলল ঃ মা-বাপ সন্তানদের মধ্যে প্রকৃত বাৎসল্য ও স্নেহ কখনই গড়ে ওঠে না। ছেলে বড় হতেই তার পিতামাতা তার থেকে পুরা ব্যয়ভার আদায় করে নেয়। ছেলে যদি পিতামাতার ঘরে একই সঙ্গে থাকে, তবে তাকে ঘরের ভাড়াও দিতে হয়। মনে হয়, ছেলে বড় হলেই সে নিতান্ত পর হয়ে যায়, ঠিক পরের মতোই ব্যবহার করা শুরু করে— যেমন জন্তু-জানোয়ার ও ইতর প্রাণীকুলের মধ্যে হয়ে থাকে।

ফ্রান্সের চিঠি, সাপ্তাহিক ছিদ্‌ক, ১৯শে আগস্ট,১৯৬০

আরব জাহিলিয়াতের যুগেও প্রকৃত নৈতিকতা— আধ্যাত্মিকতা ছিল পরাজিত পর্যুদস্ত। কিন্তু বর্তমান নতুন জাহিলিয়াতের স্তরে তো মূল মনুষ্যত্বেরই চিরসমাধি ঘটেছে। এ সভ্যতার দৃষ্টিতে মানুষ 'ক্রমবিকাশমান ও উন্নত জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়। উপরের উদ্ধৃতি কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে জানা যাবে যে, নিতান্ত পাশবিকতা ও নির্মমতার সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই বরং এদিক দিয়ে ইউরোপীয় সমাজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

সিরিয়ার প্রখ্যাত ইসলামবিদ আল্লামা আলী তানতাবী আমেরিকার সমাজ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

তাদের সেখানে মেয়ে যখন বয়স্কা হয়, তখন তার বাপ তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নেয় এবং তার ঘরের দুয়ার তার জন্যে বন্ধ করে দেয়।

তাকে বলে ঃ এখন যাও উপার্জন করো এবং খাও, আমাদের এখানে আর তোমার জন্যে কোনো জায়গা নেই, কিছুই নেই। সে বেচারী বাধ্য হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং জীবনের সমস্ত কঠোরতা জটিলতার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। দ্বারে দ্বারে ঘা খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বাপ মার সেজন্যে কোনোই চিন্তা-ভাবনা হয় না। কোন দুঃখ বোধ করে না তাদেরই সন্তানের এই দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার জন্যে। সে বেচারী শেষ পর্যন্ত শ্রম-মেহনত করে রুজি-রোজগার করতে বাধ্য হয় কিংবা দেহ বিক্রি করে রোজগার করে। এ কেবল আমেরিকাতেই নয়, সমগ্র ইউরোপীয় দেশের অবস্থাই এমনি। আমার উস্তাদ ইয়াহইয়া শুমা' প্রায় ৩৩বছর পূর্বে যখন প্যারিস থেকে শিক্ষা শেষ করে ফিরে এসেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি সেখানে থাকার জন্যে একটি কামরার সন্ধানে এক বাড়িতে পৌঁছেছিলেন। সেখানে একটি কামরা ভাড়া দেয়ার জন্যে খালি ছিল। সে বাড়িতে পৌঁছবার সময় দুয়ারের কাছ থেকে একটি মেয়েকে বের হয়ে যেতে দেখতে পেলেন। মেয়েটির চোখ দুটি তখন ছিল অশ্রু-ভারাক্রান্ত। ডাঃ ইয়াহ্ইয়া বাড়ির মালিকের কাছে মেয়েটির কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, মেয়েটি বাড়ির মালিকেরই ঔরসজাত সন্তান। এখন

> সে আলাদাভাবে বসবাস করে এবং এ বাড়ির খালি কামরাটি নেয়ার জন্যে এখানে এসেছিল; কিন্তু মালিক তাকে ভাড়ায় দিতে অস্বীকার করার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, মেয়েটি মাত্র দশ ফ্রাঁ (দশ আনা সমান মুদ্রা) ভাড়া দিতে পারে, অথচ সে অন্য লোকের কাছে থেকে এর ভাড়া ত্রিশ ফ্রাঁ আদায় করতে পারে। — মাসিক রিজওয়ান, লাহোর

এ হচ্ছে বস্তুবাদী সমাজ সভ্যতার মর্মান্তিক পরিণতি। এখন পর্যন্ত প্রাচ্যের সমাজ এ রকম অবস্থার ধারণাও করতে পারে না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে— এরূপ হতে বোধ হয়ে আর বিলম্ব নেই। বস্তুত মানুষের কাজ হচ্ছে তার জীবন সম্পর্কে গৃহীত আকীদা-বিশ্বাসের এবং দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব ফল। পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেদের 'পশুমাত্র' মনে করে নিয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে ঠিক পশুত্বই পূর্ণবৈশিষ্ট্য সহকারে জেগে উঠেছে ও বিকাশ লাভ করেছে।

এর ফলে পাশ্চাত্য নারী সমাজ যে কঠিন দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, পড়েছে যে জটিল সমস্যার মধ্যে, তার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করেছেন উস্তাদ আলী তানতাবী। তিনি লিখেছেন ঃ

> আমার নিকট শেয়খ বাহজাতুল বেতার (সিরিয়ার প্রখ্যাত আলেম ও ইসলাম বিশেষজ্ঞ ও বর্তমানে দামিশকের অধিবাসী) বলেছেন ঃ তিনি আমেরিকায় 'মুসলিম নারী' বিষয়ের ওপর এক ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, আমাদের শরীয়তে অর্থনৈতিক ব্যাপারে নারীদের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তার অর্থে তার স্বামীর— এমনকি তার পিতারও কোনো অধিকার নেই। নারী দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হলে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব অর্পিত হয় তার পিতা কিংবা ভাইয়ের ওপর। আর তার বাপ বা ভাই বর্তমান না থাকলে তার নিকটাত্মীয়ের ওপর, তার চাচাতো ভাই কিংবা অপর কোনো ভাইর ওপর— যতদিন না বিয়ে হয় কিংবা তার দারিদ্র্য দূর হয়ে যায়, ততদিন তার ভরণ-পোষণের যাবতীয় খরচ বহন করতে থাকবে এসব নিকটাত্মীয়রা। বিয়ের পর তার স্বামী হবে তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের জন্যে দায়ী। সে স্বামী একজন গরীব মজুর ব্যক্তিই হোক না কেন আর স্ত্রী কোটিপতিই হোক না কেন।

ভাষণ শেষে এক আমেরিকান মহিলা— যিনি সেখানকার খ্যাতিমান সাহিত্যিক ছিলেন, দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ আপনাদের শরীয়তে নারীর যদি আপনার বর্ণনা অনুরূপই অধিকার থেকে থাকে, তাহলে আমাকে আপনাদের সমাজেই নিয়ে চলুন। সেখানে আমি শুধুমাত্র ছয় মাসকাল জীবন যাপন করব। তার পরে আমাকে হত্যা করুন, তাতে আমার কোনো আফসোস থাকবে না। (ইউরোপের মজলুম নারী) এ-ই হচ্ছে ইউরোপীয় সমাজের অবস্থা, এ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিকতার ওপর মানুষকে একান্ত জন্তু-জানোয়ার মনে করে।

কিন্তু ইসলামী পরিবারে কন্যা-সন্তানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কন্যা-সন্তানের প্রতি সাধারণভাবে মানুষ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাকে। নানাভাবে তাদের অধিকার ও মানমর্যাদা নষ্ট করতে থাকে। বিশেষ করে রাসূলে করীম (স) যে সমাজে ইসলামী দাওয়াতের কাজ করেছেন সেখানে কন্যা-সন্তানকে একটি বিপদ, লজ্জা ও অপমানের কারণ বলে মনে করা হতো। সেজন্যে তিনি নানাভাবে এ অবস্থা থেকে কন্যা-সন্তানকে মুক্তি দানের চেষ্টা করেছেন। এখানে এ প্রসঙ্গের কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা যাচ্ছে।

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ عَادَلَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ اَوْثَلَاثَ اَخْوَاتٍ اَوْ اُخْتَيْنِ اَوْ بِنْتَيْنِ فَاَدَّبَهُنَّ وَ اَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ وَ زَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ - (ترمذى الوداؤد)

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন অথবা দুটি কন্যা লালন-পালন করে এবং তাদের ভালো স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করে, তাদের বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্যে জান্নাত নির্দিষ্ট হয়েছে।

مَنْ عَادَلَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ - (مسلم)

যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে তাদের পূর্ণ বয়স্কা হওয়া পর্যন্ত, কিয়ামতের দিন সে এবং আমি একসঙ্গে থাকব।

বস্তুত কিয়ামতের দিন নবী করীম (স)-এর সঙ্গী হতে পারা অপেক্ষা বড় আনন্দের ও মর্যাদার ব্যাপার মু'মিন ব্যক্তির জন্যে আর কিছু হতে পারে না।

مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ يَعْنِي الذُّكُوْرَ عَلَيْهَا اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ - (ابوداؤد)

যার কোনো কন্যা সন্তান থাকবে, সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার না দেয় তাহলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

তদানীন্তন আরবের লোকেরা কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র-সন্তানকে অধিক ভালোবাসত। ইসলাম এ অবিচার ও পক্ষপাতিত্বের চিরতরে মূলোৎপাটন করতে চেয়েছে। এরূপ অবাঞ্ছনীয় নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে ইসলামে। পিতামাতাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে, বরং স্নেহ, যত্ন, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ— সর্বদিক দিয়েই তাদের মধ্যে ইনসাফ করে। রাসূলে করীম (স)-এর শেষোক্ত হাদীসটি এ প্রেক্ষিতেই অনুধাবনীয়।

কন্যা-সন্তানের বিয়ে দিয়ে দিলেই তার প্রতি ভালো ব্যবহারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তারপরও নানা সময়ে ও নানা অবস্থায় এর প্রয়োজন হতে পারে। আর তখনো তার প্রতি ভালো ব্যবহার করা পিতামাতার কর্তব্য। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَ لَا اَدُلُّكَ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتَكَ مَرْدُوْدَةً اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ - (ابن ماجه)

তোমাকে সর্বোত্তম দানের কথা বলব কি ? তা হলো, তোমার কন্যাকে যদি বিয়ের পর তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তখন তার জন্যে উপার্জন করার তুমি ছাড়া কেউ না থাকে, তাহলে তখন তার প্রতি তোমার কর্তব্য হবে অতীব উত্তম সাদকা।

সন্তানের অধিকার

পিতার প্রতি সন্তানের হক পর্যায়ে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তাতে নীতিগতভাবে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে সারকথা এখানে বলা যাচ্ছে।

১. সন্তানের প্রথম অধিকার হচ্ছে তার খানাপিনা, থাকা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা— বিশেষ করে যদ্দিন সে নিজস্বভাবে উপার্জন করতে অক্ষম থাকবে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

كَفٰى الْمَرْءُ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُوْتُ - (نسائی)

যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো ওপর বর্তে, সে যদি তা যথাযথভাবে পালন না করে তাদের ধ্বংস করে, তাহলে এতেই তার বড় গুনাহ হবে।

অপর হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَّحْبِسَ عَمَّنْ تَمْلِكُ قُوْتَهُ -(مسلم)

যাদের খাওয়া-পরার কর্তৃত্ব একজনের হাতে, সে যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে এ কাজই তার বড় গুণাহ্ হওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

অন্য কথায়, এ গুণাহই তার ধ্বংসের জন্যে যথেষ্ট। কেননা তারা তারই বংশ ও পরিবার-পরিজন। তাদের সব কিছু তাদেরই ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় সে যদি তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাপনার কাজ না করে, তাহলে সে লোকগুলো ভয়ানক বিপদে পড়ে যাবে। তাদের জীবন হঠাৎ করে কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হবে। (سبل السلام : ج-٢، ص-٢٢)

সন্তানদের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করাকে ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত মানুষ তার মনের স্বাভাবিক নির্দেশেই এ কাজ করে থাকে। এজন্যে বিশেষ কোনো যুক্তি বা দলীল পেশ করার প্রয়োজন করে না। তবু এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে।

اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يَنْفَقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يَنْفَقُهُ عَلٰى عِيَالِهٖ وَدِيْنَارٌ يَنْفَقُهُ عَلٰى فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يَنْفَقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম অর্থ হচ্ছে সেটি, যা সে ব্যয় করে তার পরিবারবর্গের জন্যে, যা সে ব্যয় করে জিহাদের ঘোড়া সাজানোর জন্যে এবং যা সে ব্যয় করে জিহাদের পথে সঙ্গী-সাথীদের জন্যে।

এ হাদীসে প্রথমেই সন্তান-সন্ততির জন্যে যে অর্থ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে তাই হচ্ছে সর্বোত্তম অর্থ— টাকা-পয়সা।

সন্তান বিশেষ করে পূর্ণ বয়স্ক হয়ে যাওয়ার পরও তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতামাতার ওপর বর্তে কিনা— এ এক কঠিন প্রশ্ন।

এ ব্যাপারে অধিকাংশ মনীষীর মত এই যে, পুত্র সন্তানের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্তই তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতার কর্তব্য। অবশ্য এক শ্রেণীর মনীষীর মত এই যে, সন্তানের পূর্ণ বয়স্ক হওয়া এবং তাদের প্রয়োজন পরিমাণ ধন-সম্পত্তি অর্জিত হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পিতার ওপরই অর্পিত থাকবে।

(سبل السلام : ج-٣، ص-٢٢٢)

২. শিক্ষার জন্যে অর্থ ব্যয় ঃ ছেলেমেয়েদের কেবল খাওয়া-পরা দিয়ে লালন-পালন করলেই পিতার দায়িত্ব পালন হয় না। বরং তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলবার জন্যেও অর্থ ব্যয় করা কর্তব্য। অতীতে শিক্ষা ছিল একটি ধর্মীয় কর্তব্য; কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা একটি অর্থনৈতিক প্রয়োজনও বটে। কাজেই সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এ উভয় দিক দিয়েই যোগ্য করে তোলা পিতামাতার কর্তব্য। মনীষী আবূ কালাবা বলেছেন ঃ

اَىُّ رَجُلٍ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يَنْفَقُ عَلٰى عِيَالٍ صِغَارٍ يَعْفُهُمْ اللّٰهُ بِهٖ يَنْفَعُهُمُ اللّٰهُ بِهٖ وَيُغْنِيْهِمْ - (مسلم)

যে লোক তার ছোট ছোট শিশু সন্তানদের জন্যে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করে, যাতে করে আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করে দেবেন, তাদের বৈষয়িক উপকার দেবেন, সে লোক অপেক্ষা পুরস্কার পাওয়ার দিক দিয়ে অধিক অগ্রসর আর কেউ হতে পারে না।

অর্থাৎ সন্তানদের এমন গুণে তৈরী করে তোলা, যা দ্বারা আল্লাহ্ তাদের অনেক উপকার দেবেন এবং জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার সমূহে তাদেরকে অন্যদের থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মুখাপেক্ষীহীন করে দেবেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর কাজ এবং এ কাজ যে করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার দান করবেন। এজন্যেই রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষ মুসলিমের পক্ষেই ফরয।

বস্তুত ছেলেমেয়ে হচ্ছে পিতামাতার কাছে আল্লাহ্র আমানত। তাদের আকীদা-বিশ্বাস, মন ও মগজ, চরিত্র ও অভ্যাস, জীবনযাত্রার ধারা ইত্যাদিকে সঠিকরূপে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা করা পিতামাতারই কর্তব্য। এমতাবস্থায় সন্তান-সন্ততিকে যদি এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা না হয়, যার ফলে তাদের মন-মগজ সুষ্ঠুরূপে গড়ে উঠতে পারে, তাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত হতে পারে, দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন ও কাজকর্ম সম্পাদনে পূর্ণ আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে পারে, তাহলে কিছুতেই এ আমানতের হক আদায় হতে পারে না, নিজেদেরও সন্তান-সন্ততিকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না।

সন্তানদের মধ্যে সুবিচার স্থাপন

পিতামাতার কর্তব্য হচ্ছে সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সর্বতোভাবে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও পূর্ণ নিরপেক্ষতা সহকারে প্রত্যেকের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করা— প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাদের মধ্যে সাম্য কায়েম ও রক্ষা করা। রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَاءِكُمْ اِعْدِلُوْا بَيْنَ اَبْنَائِكُمْ - (مسند احمد، ابوداؤد، نسائی)

তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সুবিচার করো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরতা সংস্থাপন করো, তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝেই ইনসাফ রক্ষা করো।

নুমান ইবনে বশীর বলেন— তাঁর পিতা তাকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলে করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ

اِنِّىْ نَحَلْتُ اِبْنِىْ هٰذَا غُلَامًا -

আমি আমার এই পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি।

তখন রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحِلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا -

তোমার সব কয়টি সন্তানকে কি এভাবে একটি দাস দান করেছ?

উত্তরে তিনি বললেন ঃ "না"। তখন রাসূল (স) বললেন ঃ فَارْجِعْهُ —এ দান তুমি ফিরিয়ে নাও।(বুখারী, মুসলিম)

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

سَوُّوْا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ فِىْ الْعَطِيَّةِ - (اطبرانی، بیهقی)

দানের ব্যাপারে তোমাদের সন্তানদের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করো।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে অনেকে বলেছেন যে, সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা রাসূলে করীম (স) সেজন্যে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। যদি বিশেষ কোনো কারণ না থাকে, তাহলে এ সমতাকে কিছুতেই ভঙ্গ করা এবং দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে তারতম্য করা উচিত হবে না। যদি কোনো সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে অপর সন্তানকে কিছু দান করা হয় তবে তা বড়ই অন্যায় হবে।

আবার অনেকে রাসূল (স)-এর আদেশকে 'মুস্তাহাব' বলে ধরে নিয়েছেন। যদি কেউ কোনো সন্তানকে অপর সন্তান অপেক্ষা বেশি কিছু দান করে, তবে সে দান ঠিকই হবে, তবে তা অবশ্য মাকরূহ্ হবে। এ পর্যায়ে এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞেস করছিলেন ঃ

اَيَسُرُّكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا لَكَ فِى الْبِرِّ سَوَاءً -

তোমার সাথে সব সন্তান সমানভাবে ভালো ব্যবহার করবে, এতে কি তুমি খুশী হবে না? সাহাবী বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

فَلَااِذَنْ -

তা হলে কোনো সন্তানকে অন্যদের তুলনায় বেশি দেয়ার অনুমতি দেয়া যেতে পার না। —মুসলিম

এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

فَالْحَقُّ اَنَّ التَّسْوِيَةَ وَاجِبَةٌ وَّ اِنَّ التَّفْضِيْلَ مُحَرَّمٌ - (نيل الاوطار : ج-٦، ص -١١٢)

সত্য কথা এই যে, সন্তানদের মধ্যে দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব, আর বেশী-কম করা হারাম।

মনে রাখা আবশ্যক যে, এসব হাদীস মিরাস বণ্টন সম্পর্কে বলা হয়নি। কেননা মিরাস বণ্টন হবে পিতার মৃত্যুর পরে, তার জীবদ্দশায় নয়। এসব হাদীস পিতার জীবদ্দশায় সন্তানের বিভিন্ন জিনিস দান করার ব্যাপারেই সমতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব কোনো পিতার পক্ষেই তার জীবদ্দশায় সন্তানদেরকে যা কিছু দান করবে তাতে তারতম্য ও বেশি-কম করা আদৌ জায়েয নয়।

সন্তানের ওপর পিতামাতার হক

উপরে পিতামাতার প্রতি সন্তানের হক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু ইসলামে যেহেতু কোনো ক্ষেত্রেই একতরফা হক ধার্য করা হয়নি বরং সেই সঙ্গে অন্যদের প্রতি কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে, তাই কেবল পিতামাতার ওপরই সন্তানের হক নেই, সন্তানের ওপরও রয়েছে পিতামাতার হক এবং এ হক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— এতদূর গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন মজীদে এ হকের স্থান হচ্ছে মানুষের ওপর আল্লাহ্র হকের পরে-পরেই।

সূরা বনী ইসরাঈলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۭ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا - (بنى اسرائيل : ٢٣-٢٤)

আদেশ করেছেন— ফয়সালা করে দিয়েছেন— তোমাদের আল্লাহ্ যে, তোমরা কেবল সেই আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোই বন্দেগী ও দাসত্ব করবে না। আর পিতামাতার সাথে অবশ্যই ভলো ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা দুইজনই যদি তোমাদের কাছে বার্ধক্যে পৌঁছায় তাহলে তখন তাদের 'উফ' বলো না এবং তাদের ভর্ৎসনা করো না। বরং তাদের জন্যে সম্মানজনক কথাই বলো। আর তাদের দুজনার জন্যেই দো'আ করো এই বলে যে, হে পরোয়ারদেগার, আমার পিতামাতার প্রতি রহমত নাযিল করো, যেমন করে তারা দুজনই আমাকে আমার ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছে।

এ আয়াত প্রথমে তওহীদ— আল্লাহ্‌কে সর্বতোভাবে এক ও লা-শরীক বলে স্বীকার করার নির্দেশ এবং এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারোই একবিন্দু বন্দেগী করতে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গেই এবং পরে পরেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার। এ দুটো নির্দেশ এক সঙ্গে ও পরপর দেয়ার মানেই এই যে, প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও পিতামাতা দুজনেরই বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী তো আল্লাহ্ এবং বান্দার ওপর সর্বপ্রথম হক তাঁরই ধার্য হবে। কিন্তু আল্লাহ্ যেহেতু এ কাজ সরাসরি নিজে করেন না, করেন পিতামাতার মাধ্যমে, কাজেই বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হকের পরপরই পিতামাতার হক ধার্য হবে।

অতঃপর পিতামাতার হক সম্পর্কে আরো বিস্তারিত কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ পিতামাতা দুজনই কিংবা তাদের একজনও যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন সন্তান যেন তাঁকে বা তাঁদের দুর্বহ বোঝা বলে মনে না করে এবং তাদের সাথে কথাবার্তা ও ব্যবহারেও যেন কোনো অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ না পায়। তাঁদের মনে কোনোরূপ কষ্ট দেয়া চলবে না, তাঁদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না যার ফলে তাঁদের মনে কষ্ট বা আঘাত লাগতে পারে। এমন কথাও বলা যাবে না, যাতে করে মনে ব্যাথা পেয়ে বলে উঠবে 'উহ্'। পক্ষান্তরে সন্তানও যেন পিতামাতার কোনো কাজে, কথায় ও ব্যবহারে 'উহ' করে না ওঠে, মন আঘাত অনুভব যেন না করে। তেমন কিছু ঘটলেও তা মনে স্থান দেবে না। কোনোরূপ বিরক্তি প্রকাশ করবে না, কোনোরূপ অপমানকর বা বেআদবী সূচক আচরণ তাঁদের প্রতি প্রদর্শন করবে না।

এখানে যেসব কাজ না করতে বলা হয়েছে, কুরআন মজীদ কেবল এ নেতিবাচক কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি— এতটুকু বলাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং ইতিবাচক কতগুলো নির্দিষ্ট কাজের নির্দেশও দিয়েছে। বলেছে ঃ তাঁদের জন্যে সম্মানজনক কথা বলো, তাঁদের প্রতি বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করো, তাঁদের খেদমতের জন্য বিনয়-নম্রতা মিশ্রিত দু'খানি হাত নিয়োজিত করে দাও। সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেছেন ঃ পিতামাতার সাথে কথা বলো ঃ

كقول العبد المذنب للسيد الفظ -

যেমন করে অপরাধী ক্রীতদাস কথা বলে রূঢ় ভাষী মনিবের সামনে।

আর মুজাহিদ বলেছেন ঃ

اذ بلغا عندك من الكبر فلا تقذر هما ولا تقل لهما اف حين طميط عنهما الخلاء والبول كما كانا يميطان عنك صغيرا -

পিতামাতা তোমার সামনে বার্ধক্যে পৌছলে তাঁদেরকে ময়লার মধ্যে ফেলে রাখবে না এবং যখন তাদের পায়খানা-পেশাব সাফ করবে তখনো তাঁদের প্রতি কোনোরূপ ক্ষোভ দেখাবে না, অপমানকর কথা বলবে না— যেমন করে তাঁরা তোমার শিশু অবস্থায় তোমার পেশাব-পায়খানা সাফ করত, ঠিক তেমনি দরদ দিয়ে করবে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ পিতামাতার খেদমতের জন্যে তোমাদের বিনয়ের হাত বিছিয়ে দাও। মানে সব সময় বিনয় সহকারে তাদের খেদমতে লেগে থাকো। কোনো সময়ই তা ত্যাগ করো না। তা থেকে বিরত থেকো না। যদি কিছু খেদমত করতে পার, তবে সেজন্যে মনে কোনো গৌরব অহংকার বোধ এবং পিতামাতার ওপর অনুগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করো না, বরং মনে অনুভব করতে থাকো যে, যা কিছু খেদমত করছ, তা যথেষ্ট নয়, আরো বেশি খেদমতের প্রয়োজন এবং এ তোমার কর্তব্য। আর তুমি এ খেদমত করে পিতামাতার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করছ না, করছ তোমার কর্তব্য পালন। আর তাতেও থেকে যাচ্ছে অসম্পূর্ণতা, থেকে যাচ্ছে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি। ঠিক যেমনটি খেদমত হওয়া উচিত, তা

যেন হচ্ছে না, হতে পারছে না, এমনি একটি অনুভূতি থাকাই উচিত। তোমার মনে জাগ্রত থাকবে তাঁদের অপরিসীম স্নেহ-যত্নের কথা এবং তাঁদের বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতার কথা। এ থেকে তোমাদের এ নসীহত গ্রহণ করা উচিত যে, এককালে তুমি নিজে ছিলে যাদের প্রতি মুখাপেক্ষী, কালের আবর্তনে আজ তারাই তোমার আদর যত্নের মুহ্তাজ হয়ে পড়েছে। এই হচ্ছে আল্লাহ্র বিধান। এ অমোঘ বিধান অনুযায়ী তোমরাও বার্ধক্যে পড়ে তোমাদের সক্ষম পুত্রদের খেদমতের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে পারো।

সুরা আল-বাকারার একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - (৮৩)

আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না— ইবাদত-বন্দেগী করো না এবং পিতামাতার সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবে।

সূরা আল-আন্কাবুত-এ বলা হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا - (৮)

মানুষ সাধারণকে তাদের পিতামাতার সঙ্গে ইহ্সান করতে নির্দেশ দিয়েছি।

'ইহসান' শব্দের মূল হচ্ছে 'হুস্নুন', মানে نهاية البر 'চরম পর্যায়ের ও পরম মানের সর্বোত্তম ভালো কাজ করা, ভালো ব্যবহার করা।' এ সব আয়াতেই পিতামাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখা, ভালো ব্যবহার করা ও তাঁদের হক আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সব জায়গাতেই প্রথমে আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য এবং তারপরই পিতামাতার প্রতি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে।

সূরা আল-আহকাফ-এ বলা হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا - (১৫)

এবং আমরা সাধারণভাবে সব মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তাদের পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবার। কেননা তাদের মায়েরা খুবই কষ্ট সহকারে তাদের গর্ভে ধারণ করেছে, বহন করেছে এবং আরো কষ্ট সহকারে তাদের প্রসব করেছে।

সূরা লুকমান-এ আল্লাহ্র সঙ্গে শির্ক না করতে এবং তা যে মস্ত বড় জুলুম, তা বলার পরই বলা হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ - (১৪)

এবং সব মানুষকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি তাদের পিতামাতা সম্পর্কে বিশেষ করে তাদের মায়েরা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাদের গর্ভে ধারণ করেছে ও বহন করেছে। (দুর্বলতার কষ্ট পর পর ভোগ করেছে), আর দু বছরকাল তাদের স্তন দিয়ে দুধ খাওয়ানোর কাজ সম্পন্ন করেছে। অতএব তুমি আমার ও তোমাদের পিতামাতার শোকর আদায় করো, মনে রেখো, শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই তোমাদের সকলেরই ফিরে আসতে হবে চূড়ান্ত পরিণতির জন্যে।

এসব আয়াতেই একবাক্যে সন্তানের প্রতি পিতামাতার অসীম ও অসাধারণ অনুগ্রহের কথা বলে তাদের প্রতি সর্বতোভাবে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ পর্যায়ে শেষ কথা বলা হয়েছে এই যে, এসব এবং এ ধরনের অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক

খেদমতের কাজ করলেই পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যায় না; বরং তাদের ইহকালীন-পরকালীন কল্যাণের জন্যে আল্লাহ্র কাছে অবিরত দো'আও করতে থাকতে হবে। সে দো'আর ভাষাও আল্লাহ্ই শিখিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে ঃ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا - (الاسراء : ٢٤)

হে আল্লাহ্ পরোয়ারদিগার, আমার পিতামাতার প্রতি রহমত নাযিল করো, যেমন করে তারা দুজনে আমাকে আমার ছোট অবস্থায় লালন-পালন করেছে।

তার মানে ঃ আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন আমার কিছুই করবার ক্ষমতা ছিল না, তখন এই পিতামাতাই স্নেহ-যত্নপূর্ণ লালন-পালন আমি লাভ করেছিলাম বলেই এ দুনিয়ায় আমার বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। তখন— আমার সে অক্ষমতার সময়ে যেমন তাদের লালন-পালন আমার জন্যে অপরিহার্য ছিল, আজ তারা তেমনি অক্ষম হয়ে পড়েছে, এখন তাদের প্রতি রহমত করা— হে আল্লাহ্— তোমারই ক্ষমতাধীন।

রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ اِنْ شِئْتَ اَوْضَيِّعْ - (مسند احمد، ترمذی، ابن ماجه، حاکم)

পিতা বেহেশত প্রবেশের মাধ্যম। অতএব তুমি চাইলে তাঁর সেই মধ্যস্থতাকে রক্ষা করতে পার, তাঁকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে পারো, আর চাইলে তা নষ্টও করে দিতে পারো।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

رضاء الله فى رضاء الوالد وسخط الله فى سخط الوالد - (ترمذی، حاکم)

আল্লাহ্র সন্তুষ্ট লাভ পিতার সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করে, আর আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি-আক্রোশ ক্রোধ— পিতার অসন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।

রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ

يا رسول الله ماحق الوالدين على ولد هما -

হে রাসূল, সন্তানের ওপর তাদের পিতামাতার অধিকার কি ?

জবাবে তিনি এরশাদ করলেন ঃ

هُمَا جَنَّتُكَ وَ نَارُكَ -

তারা দু'জনই হচ্ছে তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।

মানে জান্নাত কিংবা জাহান্নাম তাদের কারণেই লাভ হওয়া সম্ভব হবে তোমার পক্ষে।

রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

من اصبح لله مطبعا فى والديه اصبح له بابان مفتوحان من الجنة وان كان واحدا فواحدا ومن امسى عاصيا لله فى والديه اصبح له بابان مفتوحان من النار وان كان واحدا فواحدا -

যে লোক পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহ্র অনুগত হয় (আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী পিতামাতার খেদমত করে), তার জন্যে বেহেশতের দুটি দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।— একজন হলে একটি দ্বার উন্মুক্ত হবে। আর যদি কেউ পিতামাতার ব্যাপারে আল্লাহ্র নাফরমান হয়ে যায় (আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে) তবে তার জন্যে জাহান্নামের দুটো দুয়ারই খুলে যাবে আর একজন হলে একটি দুয়ার খুলবে।

অতঃপর এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! পিতামাতা যদি সন্তানের ওপর জুলুম করে আর তার ফলে সন্তানরা তাদের নাফরমানী করে বা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তবুও কি সন্তানদের জাহান্নামে যেতে হবে ?

এর জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

وَ اِنْ ظَلَمَاهُ وَ اِنْ ظَلَمَا -

হ্যাঁ, পিতামাতা যদি সন্তানের ওপর জুলুমও করে, তবুও তাদের নাফরমানী করলে জাহান্নামে যেতে হবে।

হযরত আবূ বাক্‌রা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

كل الذنوب يغفر الله منها مايشاء الاعقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه فى الحيواة قبل الممات - (روى الاحاديث الثلاثة البيهقى فى شعب الايمان)

আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে যত গুনাহ্ এবং যে কোনো গুনাহ্ই মাফ করে দেবেন। তবে পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের নাফরমানী করলে তিনি তা কখনও মাফ করবেন না। কেননা, এর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বেই এ দুনিয়ায়ই শিগগীর করে দেয়া হবে।

তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একসঙ্গে একটি সাবধান বাণী ও একটি আশার বাণী শোনানো হয়েছে। কথাটি সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথমোদ্ধৃত আয়াতের পরেই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا - (بنى اسرائيل)

তোমাদের আল্লাহ্ তোমাদের মনের অবস্থা ও ভাবধারা সম্পর্কে খুব ভালো ও সবচেয়ে বেশি অবহিত রয়েছেন। তোমরা যদি নেক্‌কার হও— হতে চাও, তাহলে তিনি তওবাকারী ও পিতামাতার হক আদায়ের জন্যে মনে-প্রাণে লোকদের ক্ষমা করে দেবেন।

এখানে এক সঙ্গে দুটি কথা বলা হয়েছে। একটি হচ্ছে সাবধান বাণী, আর তা হচ্ছে, 'তোমরা যারা পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, ভালো সম্পর্ক রেখে চলো, তাদের হক আদায় করো এবং তাদের খেদমত করো, তারা কিরূপ মনোভাব নিয়ে তা করছে, তা আল্লাহ্‌র কিছুমাত্র অবিদিত নয়, বরং তিনি খুব ভালোভাবেই তা জানেন। এখন তোমরা যদি আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করার ভয়ে এবং আল্লাহর আদেশ পালন একান্তই কর্তব্য— এ বোধ ও বিশ্বাস এবং আন্তরিক অনুভূতি ও নিষ্ঠা সহকারে এ কাজ করো, তাহলে তার উপযুক্ত পুরস্কার অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। আর আল্লাহ্ও সে পুরস্কার তোমাদের দেবেন তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে। যদি কোনো বৈষয়িক স্বার্থ বা অসদুদ্দেশ্যে করো, তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তাও লুকানো যাবে না— তাঁর কাছে তোমরা কিছুই পাবে না।

আর দ্বিতীয় কথা যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে আশার বাণী এবং এ আশার বাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের জন্যে যারা এদ্দিন ধরে পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে আসছে, তাদের হক আদায় করেনি। বলা হয়েছে, তোমরা যদি এখন অনুতপ্ত হয়ে থাকো তোমাদের এ অন্যায় ও নাফরমানী কাজের জন্যে এবং এখন তওবা করতে রাযী হও, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করতে ও তাদের হক্ যথাযথভাবে আদায় করে নেককার ও সদাচারী হতে চাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের তওবা কবুল করবেন, তোমাদের মাফ করে দেবেন।

সে সঙ্গে একথাও বোঝা যায় যে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে পিতামাতার খেদমত করলে অনিচ্ছা

সত্ত্বেও যদি কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় এবং যদি তা আদৌ ইচ্ছাকৃত না হয়, তবে আল্লাহ্ তাও অবশ্যই মাফ করে দেবেন।

সূরা আন-নিসা-তে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْبُدُو اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْابِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَاصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ - (النساء : ٣٦)

এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব করবে তোমরা, তাঁর সাথে একবিন্দু জিনিসকেও শরীক গণ্য করবে না। আর ভালো ব্যবহার করবে পিতামাতার সাথে, নিকটাত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে, আত্মীয়-প্রতিবেশীর সাথে, পাশের প্রতিবেশীর সাথে এবং পার্শ্বচরের সাথে, পথিক ও দাস-দাসীদের সাথে।

এখানেও বান্দাদের ওপর আল্লাহ্‌র হক প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, দাসত্ব কবুল করবে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র। তার পরে-পরেই বলা হয়েছে পিতামাতার হক-এর কথা। শুধু তাই নয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, সহায় সম্বলহীন পথিক এবং দাসদাসীদের নিয়ে পিতামাতা যে সমাজ, সে সমাজের প্রতিও বান্দাদের কর্তব্য রয়েছে। তবে এ পর্যায়ে পিতামাতার স্থান সর্বোচ্চ।

হাদীসে এ বিষয়ে বিশেষ তাগিদ রয়েছে। রাসূলে করীম (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ

اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى -

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কোন কাজ ?

জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا -

ঠিক সময়মত নামায পড়াই তাঁর কাছে অধিক প্রিয় কাজ।

এরপর কোন কাজ অধিক পছন্দনীয় জিজ্ঞেস করা হলে রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ بِرُّالْوَالِدَ يْنِ —'পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করা।'

পিতামাতার মধ্যে আবার মা'র অধিকার সম্পর্কে কুরআন হাদীসে অধিক বেশি তাগিদ রয়েছে।

সূরা লুকমান-এ বলা হয়েছে।

এবং মানুষকে আমি নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার সম্পর্কে বিশেষ করে তার মা, সে-ই তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব করেছে দুর্বলতার ওপর আবার এক দুর্বল অবস্থার মধ্যে এবং দু'বছর মেয়াদ পর্যন্ত দুধ সেবন করিয়ে তা সম্পূর্ণ করেছে। কাজেই হে মানুষ! তুমি আমার ও তোমার পিতামাতার শোকর আদায় করো। জেনে রাখো, শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে ঃ

আর সূরা আল-আহকাফ-এ বলা হয়েছে ঃ

এবং মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার কারার নির্দেশ দিয়েছি। বিশেষত তার মা তাকে খুবই কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ ও বহন করেছে এবং খুবই কষ্ট সহকারে তাকে প্রসব করেছে। এভাবে তাকে গর্ভে ধারণে এবং দুধ খাওয়ায়ে লালন-পালনে ত্রিশটি মাস অতিবাহিত হয়ে থাকে।

এ দুটি আয়াতেই মূলত পিতামাতা— উভয়ের প্রতিই ভালো ব্যবহারের সুস্পষ্ট নির্দেশ উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তার পরই মা সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ এবং সেই সঙ্গে মা'র অপরিসীম কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষার উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মা-বাপ উভয়ের সাথেই সন্তানকে ভালো ব্যবহার করতে হবে, উভয়েরই অনস্বীকার্য হক রয়েছে সন্তানের ওপর। কিন্তু তাদের মায়ের হক অনেক বেশি। মা'র হক-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ, প্রসব করা ও দুধ খাওয়ায়ে লালন পালন করায় মায়ের শ্রম অসীম, অবর্ণনীয় ও প্রত্যক্ষ। হাদীসেও মা সম্পর্কে এমনি ধরনের তাগিদ রয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ -

হে রাসূল, আমার উত্তম সাহচর্য পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে ?

রাসূল বললেন ঃ امك —তোমার 'মা' তার পরে কে— পর পর তিনবার জিজ্ঞেস করা হয় এবং তিনবারই উত্তর হয়— 'তোমার মা'। চতুর্থবারে জিজ্ঞেস করলে রাসূল বললেন ঃ ابوك 'তোমার বাবা।' (বুখারী, মুসলিম)

এ হাদীস সম্পর্কে কাযী ইয়াজ লিখেছেন ঃ

ذهب الجمهور الى ان الام تفضل على الاب فى البر - (سبل السلام : ج-٤، ص-١٦٤)

অধিকাংশ মনীষীর মতে সন্তানের কাছে মা বাবার চেয়ে বেশি ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। কাজেই-

اذا تعارض حق الاب وحق الام فحق الام مقدم -

মা ও বাবার হক্ যখন পরস্পর সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে— এক সঙ্গে দু'জনারই হক্ আদায় করা সম্ভব হবে না, তখন মা'র হক্ই হবে অগ্রবর্তী।

উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে মনীষিগণ বলেছেন ঃ

فانه دل على تقديم رضاالام على رضا الاب وقال ابن بطال - مقتضاه ان يكون الام ثلاثة امثال ما للاب - (سبلا السلام - ١١)

একথা প্রমাণ করে যে, বাবার সন্তুষ্টি অপেক্ষা মা'র সন্তুষ্টি অগ্রবর্তী— সর্বপ্রথম দেখার জিনিস। ইবনে বাত্তাল বলেছেন ঃ এর অর্থ এই যে, বাবার যা পাওনা, মা'র পাওনা তার তিন গুণ।

হারেস মুহাসিবী বলেছেন ঃ এ মতের ওপরই মুসলিম উম্মতের ইজমা হয়েছে।

অপর এক হাদীসে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرك ابواه عند الكبر احد هما اوكلا هما فلم يدخل الجنة (مسلم)

যে লোক তার পিতামাতা দুজনকেই কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল অথচ খেদমত করে জান্নাতবাসী হওয়ার অধিকারী হতো না, তার মতো হতভাগ্য আর কেউ নয়।

কেননা এরূপ অবস্থায় দু'জনের বা একজনের আন্তরিকভাবে খেদমত করলেই বেহেশত লাভ অনিবার্য হয়ে থাকে।

পিতামাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা কবীরা গুনাহ্

পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে যেসব তাগিদ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে, উপরে তা আমরা মোটামুটি উল্লেখ করেছি। তা থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এহেন পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের মনে কষ্ট দেয়া ও তাদের নাফরমানী করা অত্যন্ত বড় গুনাহ— সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, যারা তা করে, তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে যে মূলনীতি উল্লিখিত হয়েছে তা হচ্ছে এই ঃ (১) সূরা মুহাম্মদ-এ বলা হয়েছে ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ۞ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَ اَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ - (محمد : ٢٢-٢٣)

তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যদি জমিনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করো এবং রেহেম (রক্ত সম্পর্ক) ছিন্ন করো, তাহলে আল্লাহ্ তাদের ওপর অভিসম্পাত করবেন এবং এরপর তাদের বধির ও অন্ধ করে দেবেন।

'রেহেম' বা রক্তসম্পর্ক ছিন্ন করার মানে অতি নিকটের আত্মীয়— মানে রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দের— সাথে কথা ব্যবহার ও আর্থিক সাহায্যদান প্রভৃতির দিক দিয়ে ভালো ব্যবহার না করা। তাদের হক আদায় না করা সাধারণ নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কেই এত বড় কঠোর বাণী যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহ্র অভিশাপ হবে এবং তার ফলে তারা সত্যের আওয়াজ শ্রবণে বধির হবে ও সত্য দর্শনে হবে অন্ধ। তাহলে দুনিয়ায় সবচেয়ে সেরা আত্মীয়— সব আত্মীয়ের মূল আত্মীয়— পিতামাতার সাথে যদি কেউ খারাপ ব্যবহার করে, সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের অধিকার হরণ করে, তাহলেও যে আল্লাহ্র লা'নত হবে তাতে আর কি সন্দেহ্ থাকতে পারে ?

সূরা আর রায়াদ-এ-ও এ কথাই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ لا اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ - (رعد : ٢٥)

যে সব লোক আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি শক্ত করে বাধার পরে তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্ যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে, আর এরই ফলে দুনিয়ায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, তাদের অভিশাপ এবং তাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাপ।

এখানেও আল্লাহ্র দেয়া অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্র স্থাপিত সম্পর্ককে বিচ্ছিন্নকরণের পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে।

এসব আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলে করীম (স)-এর স্মরণীয় একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - (بخارى، مسلم)

রেহেমের সম্পর্ক কর্তনকারী কখনই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

রাসূলে করীম (স) সবচেয়ে বড় গুনাহ কি কি— বলতে গিয়ে প্রথমত উল্লেখ করেছেন ঃ

اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ -

আল্লাহ্র সাথে শিরক করা এবং পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

অপর এক হাদীসে তা কবীরা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ -

কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার পিতামাতাকে গালাগাল করাও কবীরা গুনাহ।

সাহাবীগণ একথা শুনে বলেন ঃ পিতামাতাকেও কেউ কেউ গালাগাল করে নাকি হে রাসূল ? তখন রাসূল (স) বললেন ঃ

يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ - (بخارى، مسلم)

এক ব্যক্তি অপর কারো বাপকে গাল দেয়, প্রত্যুত্তরে সে দেয় প্রথম ব্যক্তির বাপকে গাল, এমনিভাবে কেউ অপর ব্যক্তির মাকে গালাগাল করে সে ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মা'কেই গাল দেয়।

অর্থাৎ সরাসরিভাবে নিজের মা-বাপকে কেউ গালাগাল না করলেও প্রকারান্তরে— অপর লোক দ্বারা নিজ মা-বাপকে গাল খেতে বাধ্য করে। তাও তার নিজেরই গালাগালের সমান হয়ে দাঁড়ায়।

অপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَّلْعَنَ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ - (بخارى، مسلم)

কারোর নিজের বাপ-মার পর অভিসম্পাত করাও সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ।

পিতামাতাকে গালাগাল ও অভিসম্পাত করার কাজ ঔরসজাত সন্তান নিজেই করে, আবার কখনো অপরের দ্বারা গাল খাওয়ায়। এ দু' অবস্থার ফল একই। এজন্যে এরূপ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পিতামাতাকে গালাগাল করা ও অভিসম্পাত দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।— কবীরা গুনাহের মধ্যেও সবচেয়ে বড়।

একটি হাদীসে বিশেষভাবে মা'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ - (بخارى، مسلم)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মা'দের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করা, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা ও তাদের হক্ নষ্ট করাকে চিরদিনের তরে হারাম করে দিয়েছেন।

উপরে পিতামাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের হক্ আদায় করা এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে তার বিপরীত দিক সম্পর্কে যে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তাও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে বাপ-মা'র সাথে তো বটেই, তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেও ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيْهِ - (مسلم)

প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভালো ব্যবহার করাও অতি উত্তম নেক কাজ।

অপর এক হাদীসের শেষ কথাটি হচ্ছে ঃ إِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا - ابوداؤد —পিতামাতার বন্ধুদের সম্মান করাও সেলায়ে রেহমীর কাজ।

সন্তানের ধনসম্পদে পিতামাতার অধিকার

কুরআন মজীদের সূরা আল-বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ - (٢١٥)

হে রাসূল, লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কোথায় ধনমাল ব্যয় করবে। তুমি তাদের বলে দাও, তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তা করবে পিতামাতার জন্যে, নিকটাত্মীয়দের জন্যে, ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের জন্যে।

এ আয়াত সন্তানের ধনসম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিতামাতার অগ্রাধিকার স্পষ্টভাবে পেশ করছে। নওয়াব সিদ্দীক হাসান এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন ঃ

قَدَّمَهُمَا لِوُجُوْبِ حَقِّهِمَا عَلَى الْوَلَدِ لِاَنَّهُمَا السَّبَبُ فِىْ وُجُوْدِهٖ - (فتح البيان : ج-١، ص-٢٧٦)

সন্তানের অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে পিতামাতাকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, সন্তানের ওপর— তার অর্থ সম্পদের ওপর পিতামাতার যে অধিকার রয়েছে, তা আদায় করা সন্তানের জন্যে ওয়াজিব। কেননা এ পিতামাতাই হচ্ছে সন্তানের এই দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভের বাহ্যিক কারণ ও মাধ্যম।

সন্তানের ধনসম্পদে পিতামাতার এ অধিকার কেবল সন্তানের মৃত্যুর পর মিরাস হিসেবেই নয়; বরং তার জীবদ্দশায়-ই এ অধিকার স্বীকৃত। রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ اَطْيَبِ كَسَبِهٖ فَكُلُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ هَنِيًّا -

সন্তান পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ, অতএব তোমরা— পিতামাতার— সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ সহকারে পানাহার করো।

এক ব্যক্তি রাসূলের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মাল-সম্পদ রয়েছে আর সন্তান-সন্ততিও আছে। কিন্তু এমতাবস্থায় আমার বাবা আমার মাল নিতে চায়, এ সম্পর্কে আপনার কি রায় ? রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ - (ابن ماجه)

তুমি আর তোমার মাল-সম্পদ সবই তোমার বাবার।

এ পর্যায়ের কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করে তার ভিত্তিতে ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

فيدل على ان الرجل مشارك لولده فى ماله فيجوز له الاكل منه سواء اذن الولد اولم ياذن ويجوز له ايضاان يتصرف به كما يتصرف بماله مالم يكن ذلك على وجه السرف السفه -

(نيل الاوطار : ج-٦، ص-١١٧)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতা তার সন্তানের মাল-সম্পদ ন্যায়ত অংশীদার। অতএব সন্তান অনুমতি দিক আর নাই দিক পিতা তার সন্তানের মাল-সম্পদ থেকে পানাহার করতে পারে এবং তা নিজের মালের মতোই ব্যয়-ব্যবহারও করতে পারে— যতক্ষণ না সে ব্যয়-ব্যবহার অযথা, বেহুদা ও নির্বুদ্ধিতার খরচের পর্যায়ে পড়ে।

শুধু তাই নয়, সচ্ছল অবস্থায় সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে গরীব পিতামাতাকে আর্থিক সাহায্য দান। আল্লামা শাওকানী লিখেছেন ঃ

الاجماع على انه يجب على الولد المؤسرمؤنة الابوين المعسرين – (نيل الاوطار : ج-٦، ص-١١٧)

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পিতামাতার জন্যে অর্থ ব্যয় করা যে সচ্ছল অবস্থায় সন্তানের পক্ষে ওয়াজিব— এ সম্পর্কে শরীয়তবিদদের ইজ্‌মা হয়েছে।

পিতামাতার ধন-সম্পদ রক্ষা করাও সন্তানের কর্তব্য। রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

والرجل فى ماله ابيه راع ومسئول عن رعيته – (بخارى)

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পিতার ধনমাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দায়ী। সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হলো কিনা, সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে— জবাবদিহি করতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদের এ কাজ ইহকাল-পরকাল সব জায়গায়ই হতে পারে।

পিতামাতার খেদমত ও জিহাদে যোগদান

পিতামাতার অধিকার সন্তানের ওপর এত বেশি যে, তাদের অনুমতি ছাড়া জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কাজেও যোগদান করা জায়েয নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) বলেন ঃ

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَاْذَنَهُ فِىْ الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَىٌّ وَالِدَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ – (بخارى، كتاب الجهاد)

এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিহাদে যোগদান করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার পিতামাতা জীবিত আছে কি ? লোকটি বলল ঃ জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ তাহলে তুমি তাঁদের খেদমতেই প্রাণপণে লেগে যাও, এটাই তোমার জিহাদ।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হাজেমা নামক এক সাহাবী বলেন ঃ আমি রাসূলের কাছে জিহাদে শরীক হওয়া সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্যে উপস্থিত হলাম।

তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ اَلَكَ وَالِدَة —তোমার মা কি জীবিত আছেন ?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

اِذْهَبْ فَاَكْرِمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا – (نسائى، مسنداحمد)

তুমি ফিরে যাও এবং তোমার মা'র সম্মান ও খেদমতে লেগে যাও। কেননা তার দুপায়ের তলাতেই বেহেশত রয়েছে।

রাসূলে করীম (স) মক্কা ও মদীনার মাঝখানে এক বৃক্ষের তলায় সাহাবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। সহসা এক দুর্ধর্ষ বেদুঈন এসে উপস্থিত হলো এবং বলল ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ مَعَكَ وَاَجِدُلِىْ قُوَّةً وَ اُحِبُّ اَنْ اُقَاتِلَ الْعَدُوَّ مَعَكَ وَ اُقْتَلُ بَيْنَ يَدَيْكَ –

হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি আপনার সঙ্গে জিহাদে গমন করতে চাই, আমার মধ্যে শক্তিও আমি পাচ্ছি, আমি আপনার সঙ্গে মিলে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে ভালোবাসি এবং আপনার সম্মুখে নিহত হতেও পছন্দ করি।

তখন রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

هَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْنِ -

তোমার কি বাপ-মার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন ?

লোকটি বললঃ হ্যাঁ। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

فَانْطَلِقْ فَالْحِقْ بِهِمَا وَ بِرَّهُمَا وَاشْكُرْ لِلّٰهِ وَ لَهُمَا -

তাহলে তুমি ফিরে যাও, পিতামাতার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হও এবং তাদের জন্যে কল্যাণকর কাজ করো; আর আল্লাহ্ ও বাপ-মা'র শোকর আদায় করো।

সে লোকটি বলল ঃ আমি তো যুদ্ধ করার শক্তি রাখি এবং শত্রুর সাথে লড়াই করতে ভালোবাসি। তখন রাসূলে করীম (স) আবার নির্দেশ দিলেন ঃ

اِنْطَلِقْ فَالْحِقْ بِهِمَا -

যাও, তোমার বাপ-মার সাথে গিয়ে বসবাস করতে থাক।

আবূ দাউদের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজরত করে রাসূলের কাছে বসবাস করার ও জিহাদে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে মদীনায় এসে উপস্থিত হলো। রাসূলে করীম (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাড়িতে তোমার কে কে আছে ? সে বলল ঃ বাপ-মা সবই আছেন। তাদের অনুমতি নিয়ে এসেছে কিনা একথা জিজ্ঞেস করলে লোকটি বললো ঃ না, অনুমতি নিয়ে আসেনি। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

اِرْجِعْ اِلَيْهِمَا فَاسْتَاذَنْهُمَا فَاِنْ اَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَ اِلَّا فَبِرَّهُمَا -

(عمدة القارى : ج-١٤، ص-٢٥١ صحيحه ابن حبان)

তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু'জনের কাছেই অনুমতি চাও। অনুমতি দিলে ফিরে এসে জিহাদে শরীক হবে। আর অনুমতি না দিলে তুমি তাদেরই কল্যাণময় খেদমতের কাজে লেগে থাকবে।

পিতামাতার হক ছেলে-সন্তানের ওপর যে কত বেশি এবং কত তীব্র ও অনিবার্য-অপরিহার্য, তা উপরের দলীলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

পারিবারিক জীবনে বিপর্যয় ও পুনর্গঠন

পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। 'তালাক' হচ্ছে এ বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পরিণতি।

তালাক

ইসলামে তালাকের সুযোগ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে পারিবারিক জীবনের চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে স্বামী ও স্ত্রী— উভয়কে বাঁচাবার জন্যে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে ভাঙ্গন দেখা দেয়, পরস্পরে মিলেমিশে ঠিক স্বামী-স্ত্রী হিসেবে শান্তিপূর্ণ ও মাধুর্যমণ্ডিত জীবন যাপন যখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, পারস্পরিক সম্পর্ক যখন হয়ে পড়ে তিক্ত, বিষাক্ত। এক জনের মন যখন অপর জন থেকে এমনভাবে বিমুখ হয়ে যায় যে, তাদের শুভ মিলনের আর কোনো আশাই থাকে না, ঠিক তখনই এ চূড়ান্ত পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ। এ হচ্ছে নিরুপায়ের উপায়। বাঁধন যখন টুটে যাবেই, পরস্পরকে বেঁধে রাখার শেষ চেষ্টাও যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত, তখন বিয়ের রশিটুকু আনুষ্ঠানিকভাবে ছিন্ন করে না দিলে উভয়ের জীবন দুর্বিষহ— প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখন সে রশিকে কেটে দিয়ে পরস্পরের অস্তিত্বকে রক্ষা করাই এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

কুরআন মজীদে একদিকে যেমন স্বামীতে-স্ত্রীতে মিলমিশ রক্ষা করে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে, তেমনি অপরদিকে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোরও কার্যকর নিয়ম-কানুন পেশ করা হয়েছে। ইসলামের এ ব্যবস্থা কিছুমাত্র নিরর্থক নয়। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার জুলুম, অবিচার, নির্যাতন ও সীমালংঘনের অনুমতি দেয়া হয়নি, কোনো কারণ ও কল্যাণ-উদ্দেশ্য ব্যতীতই স্ত্রীকে তালাক দেয়া কিংবা স্বামীর কাছ থেকে তালাক গ্রহণের কাজকেও কিছুমাত্র পছন্দ করা হয়নি। কি স্ত্রী আর কি স্বামী— কি মেয়েলোক আর কি পুরুষ লোক, কাউকেই বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়াই ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হারাম।

তা সত্ত্বেও তালাক দেয়ার ব্যবস্থা ইসলামে কেন রাখা হয়েছে ?......রাখা হয়েছে সকল প্রকার সীমালংঘনকারী কাজ থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে রক্ষা করা এবং সকল অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ ও মাধ্যম অবলম্বন করার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে। কেননা তালাক বা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা না থাকলে যে কোনো অবস্থায়ই হোক না কেন, বিবাহ সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে মানুষ বাধ্য হয়। অথচ এমন অবস্থা দেখা দেয়া অসম্ভব নয় যে, স্বামী-স্ত্রীর একজন চরিত্রহীন হবে কিংবা উভয়ের প্রকৃতি এমন অনমনীয় হয়ে পড়বে যে, কারো পক্ষেই অপরকে বরদাশ্‌ত করা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। পরস্পরের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, চাল-চলন, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য পরস্পর বিরোধী— শুধু বিরোধীই নয়— সাংঘর্ষিক হয়ে পড়েছে, যার ফলে উভয়ের সাথে প্রতি মুহূর্ত কেবল ঝগড়া-বিবাদ তর্ক-বিতর্ক আর গালাগাল দেয়ার অবস্থারও উদ্ভব হয়ে পড়েছে। আর দুজনের কেউই না পারে শরীয়তের সীমা রক্ষা করে চলতে এবং না পারে পরস্পরের হক-হকুক্ যথাযথভাবে আদায় করতে। এরূপ অবস্থায় উভয়ের চূড়ান্ত বিচ্ছেদই উভয়ের নিকট কাম্য হয়ে থাকে। আইনসম্মতভাবে এ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা না থাকলে উভয়েরই জীবন বরবাদ হয়ে যেতে বাধ্য।

কিন্তু তাই বলে তালাক দেয়ার ব্যাপারেও অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইসলাম বরদাশ্‌ত করেনি। তালাক দেয়ার সঠিক পন্থা স্পষ্টভাবে বেঁধে দিয়েছে। এমনিতে তো বিয়ে সম্পর্কে সবদিক দিয়ে সুরক্ষিত করে

দিয়েছে। কোনো প্রকার সাময়িক বা আকস্মিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া যাতে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, তার প্রতিও পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সাধারণত আকস্মিকভাবে স্বামী ক্রোধান্ধ ও উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে উদ্যত হয় বা তালাক দিয়ে ফেলে। পরে যখন সে ক্রোধ প্রশমিত হয়, উত্তেজনার বিষবাষ্প উবে যায়, যখন ঘাটে পানি আসে, সুস্থভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে পারে, এ কাজ সে আদৌ করবে কি না। ঠাণ্ডা মন-মগজে এসব চিন্তা করার শক্তি তখন ফিরে আসে। তখন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কৃত কাজ সম্পর্কে তার মনে জাগে অনুতাপ। ....কি করে ফেললাম ভেবে অনেক মানুষই তখন দিশেহারা— পাগল হয়ে যায়।

মানুষের প্রকৃতি-নিহিত এ দুর্বলতাকে লক্ষ্য করেই ইসলাম তালাক দানের একটা অতীব ভারসাম্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে।

প্রাচীন সমাজে তালাক

প্রাচীন জাতি ও সভ্যতার কোথাও কোথাও তালাকের ব্যবস্থা ছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব ছিল না বলেই মনে হয়। হিন্দু শাস্ত্রে বিয়ে এক চিরস্থায়ী বন্ধন বিশেষ এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে স্থায়ী রাখাই কর্তব্য। এজন্যে তাতে তালাকের কোনো পথ উন্মুক্ত রাখা হয়নি। হিব্রু ভাষাভাষী জাতিগুলোর মধ্যে তালাকের ব্যবস্থা ছিল। স্বামী সাধারণ ও সামান্য কারণেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিত। অনুরূপভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় স্ত্রীরও অধিকার ছিল তালাক গ্রহণের। অবশ্য প্রাচীন রোমান সমাজে বিয়ে যেমন ছিল একটি সাধারণ পারিবারিক ব্যাপার, তেমনি তালাক দান ও গ্রহণে ছিল না কোনো প্রতিবন্ধকতা, অসুবিধা। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সেখানে তালাক দানের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী ছিল। আর সেজন্যে কোনো বিচারক বা আদালতের নিকট হাজির হওয়ারও কোনো প্রয়োজনই হতো না।

খ্রিস্টান সমাজে তালাক

প্রথম দিকে খ্রিস্টান সমাজের ওপর রোমান আইনের প্রভাব পড়েছিল বটে, কিন্তু খ্রিস্টবাদ যখন ইউরোপে ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল এবং বৈরাগ্যবাদী মতবাদ দানা বেঁধে উঠল, তখন বিয়েকে এমন এক ধর্মীয় কাজ বলে ঘোষণা করা হলো যা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত শেষ হতে পারে না। এরূপ বাধ্যবাধকতার ফলে ইউরোপীয় সমাজ সাংঘাতিক রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এ সমাজে তালাককে একটি মহা গুনাহর কাজ বলে গণ্য করা হতো, বিবাহ বিচ্ছেদকারীদের পথে ছিল নানা প্রকারের দুর্লংঘ্য প্রতিবন্ধকতা। উত্তরকালে গির্জার আইন যখন বলবৎ হলো, তখন বিয়ে ও তালাক— উভয়ের ওপর কঠিন প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দেয়া হয়। বস্তুত গির্জার এসব আইন ছিল মানব স্বভাব ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী। দৈনন্দিন জীবন তদনুযায়ী যাপন করা ছিল প্রায় অসম্ভব। ফলে গির্জার বিরুদ্ধে জনমনে বিদ্রোহের বাষ্প পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে। ষষ্ঠদশ শতকে তা প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে। এ কারণে পনের শত বছর পর্যন্ত খ্রিস্টান সমাজ গির্জার অত্যাচারী নির্যাতন, নির্মম অমানুষিক আইন-শাসনের অধীনে থেকে নিষ্পেষিত হতে বাধ্য হয়েছে।

গির্জা-বিরোধী আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হলে পরে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বিয়ে তালাকের ব্যাপারে অনেকখানি উদার নীতি অবলম্বিত হতে শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত এ দুটো ব্যাপারকেই ধর্মীয় সীমার বাইরে ফেলে দেয়া হয়। আসল ব্যাপার এই যে, প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রীদের কাছে এসব সমস্যার কোনো সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সমাধানই ছিল না, ছিল না এ বিষয়ে তাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা। ফলে 'তালাক'কে গ্রহণ করা হলো, কিন্তু তালাক দেয়ার ক্ষমতা একান্তভাবে স্বামীর কুক্ষিগত করে দেয়া হলো। আর তালাক লাভের জন্যে একমাত্র উপায় হলো পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ

উত্থাপন। সহজেই বোঝা যায়, এরূপ উপায়ে তালাক লাভের পর দু'জনের পক্ষে আর কোনো দিনই মিলিত হওয়ার আর কোনো সুযোগই থাকতে পারে না।

ইংলন্ডে তালাক

ইংলন্ডে 'পিউরিটান'দের প্রতিপত্তি শুরু হলে তারা বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটির দিকে বিশেষ নযর দেয়। প্রথমত বিয়েকে তারা ধর্মীয় সীমার বাইরে নিক্ষেপ করল। বিয়ের জন্যে ছেলের বয়স ১৬ আর মেয়ের বয়স ১৪ নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো। বিয়ে-অনুষ্ঠানের জন্যে পাদ্রীর বদলে রেজিস্ট্রিকারী নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশি দিন চলতে পারল না। পরে তা বাতিল করে প্রাচীন গির্জা-আইন পুনরায় চালু করা হলো।

এ সময়ে প্রখ্যাত ইংরেজ কবি মিল্টন তালাকের সমর্থনে এক পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করেন। তাতে স্বামী ও স্ত্রী— উভয়কেই তালাক দানের ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়, যদিও গির্জা আইন তার তীব্র প্রতিবাদ করে।

ষষ্ঠদশ শতক থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত পূর্ণ আড়াই শত বছর কাল যাবত ইংলন্ডে গির্জা-আইনের প্রবল প্রতিপত্তি থাকে, যার প্রচণ্ডতা ও অপরিবর্তনীয়তা সাধারণ মানুষকে রীতিমত ক্ষেপিয়ে তোলে। ১৮৭৫ সালে তালাক সম্পর্কে একটি আইন জারি করা হয়, যা পরে পার্লামেন্ট কর্তৃকও গৃহীত হয়। এ আইনে স্ত্রীর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে তাকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা কেবলমাত্র স্বামীকেই দেয়া হয়। কিন্তু পুরুষের জ্বেনা-ব্যভিচারকে কোনো দোষের কাজ বলে আদপেই ধরা হয় না। দ্বিতীয়ত স্ত্রী যদি তালাক গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাকে স্বামীর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার এবং সে সঙ্গে তার ওপর তার অমানুষিক অত্যাচার ও জুলুমের প্রমাণও অকাট্যভাবে পেশ করার শর্ত আরোপ করা হলো। অবশ্য ১৯২৩ সালের এক আইনে ব্যভিচারের অভিযোগে তালাক গ্রহণের সুযোগ স্বামী-স্ত্রী— উভয়কেই দেয়া হয়। ১৯৩৭ সালে তালাক আইনে আরো অনেক সংশোধন সংযোজন করা হয়। এতে করে ব্যভিচার ছাড়াও একাধিক্রমে তিন বছরকাল স্ত্রীকে নিঃসম্পর্ক করে ফেলে রাখা, নির্মমতা, অভ্যাসগত মদ্যপান, অচিকিৎসা, পাগলামী ও দুরারোগ্য যৌন ব্যধির কারণে তালাক লওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু তার সাথে শর্ত আরোপ করা হয় যে, বিয়ে হওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে তালাকের আবেদন পেশ করা যাবে না। যদিও এ আইন বলবত থাকা সত্ত্বেও ইংলন্ডে আজও ব্যভিচারই হচ্ছে তালাক গ্রহণের সবচেয়ে বড় ও কার্যকর কারণ ও উপায়। জনৈক ইংরেজ সামাজবিজ্ঞানী লিখেছেন ঃ

> ব্যভিচার ও নির্মম ব্যবহার প্রমাণ করতে পারলেই তবে আজকের ইংরেজ স্ত্রী স্বামীর কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। স্বামী তো কেবল স্ত্রীর ব্যভিচার লিপ্ততার অভিযোগ এনেই তালাক পেতে পারে; কিন্তু স্ত্রীকে সেজন্যে স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সঙ্গে সঙ্গে তার নির্মম ব্যবহারের অভিযোগও আনতে হবে— এই হচ্ছে ইংরেজদের ইনসাফ। বস্তুত আইনের এ স্বৈরাচার বেশিদিন বরদাশ্ত করা যেতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে স্বামী ও স্ত্রী— উভয়ই তালাক গ্রহণের সমান অধিকার লাভ করবেই। (اسلام اور جنسيات : ص-٢١)

তালাক ব্যবস্থার আবশ্যকতা

ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানীরা একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, যেসব দেশ ও সমাজে তালাকের ব্যবস্থা, তালাক দেয়া-নেয়ার সুবিধে আছে, সেখানে কার্যত তালাক খুব কমই সংঘটিত হয়ে থাকে। রোমানদের সম্পর্কে কথিত আছে যে, তাদের মধ্যে তালাক দেয়া-নেয়া খুবই সহজ ছিল। তথাপি কয়েক শত বছরের মধ্যে তালাকের ঘটনা দু'একটা ছাড়া বেশি ঘটেনি। পরন্তু তালাক দেয়া-নেয়া

যেখানে সহজতর, সেখান অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ঘটনা যে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম সংঘটিত হয়ে থাকে, বিশেষজ্ঞদের কাছে তাও স্বীকৃত সত্য। অপর এক মনীষীর মতে— যেসব সমাজে পতনের গতি তীব্র ও ক্রমবৃদ্ধিশীল, সেখানে তালাকের ঘটনা ঘটে এত যে, তার কোনো হিসাব-নিকাশ করা সম্ভব হয় না। ১৯১৪ সনে ইংলন্ডে ৮৫৬ টি তালাক সংঘটিত হয়, ১৯২১ সনে সেখানে ৩৫২২টি আর ১৯২৮ সনে ৪০০০ এবং ১৯৪৬ সনে ৩৫৮৭৪টি।

আমেরিকায় তালাক

বর্তমান সভ্য (?) দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকাই হচ্ছে এমন এক দেশ, যেখানে তালাক অনুষ্ঠান অস্বাভাবিক রকমে সহজ। তার প্রকৃত কারণ এই যে, এদেশের প্রাথমিক উপনিবেশ স্থাপনকারীরা ছিল ধর্মদ্রোহী, যারা গির্জার জুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এদের উপর পিউরিটানদের প্রভাব ছিল বেশী, পিউরিটানরা যে বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটিকেই ধর্মীয় সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করে রেখেছিল, তা পূর্বেই বলেছি। ফলে এদের কাছে তা ছিল নিতান্ত একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে তারা এতদূর বাড়াবাড়ি করে যে, তা নিতান্ত হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমন সব কারণেও সেখানে তালাক লাভ করা যায়, যা শুনলে হাসি সংবরণ করা সম্ভব হয় না। স্ত্রী স্বামীর কোটের বোতাম লাগায়নি, স্বামী তার পায়ের নখ কাটেনি বা ঘুমোলে একজনের নাসিকা এমনভাবে গর্জন করে যে, তাতে অপর জনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে যায়, এসব এবং এমনি ধরনের অসংখ্য নিতান্ত হাস্য উদ্রেককারী বিষয়ও সেখানে তালাক গ্রহণের বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত সেখানে বিয়ে আর দাম্পত্য জীবন সকল গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেখানে বিয়েই করা হয় এজন্যে যে, তার পরই তাতে তালাক অনুষ্ঠিত হবে। তালাকের আধিক্য সম্পর্কে বলা হয় ঃ প্রতি তিনটি বিয়ের একটির পরিণতি অনিবার্যরূপে তালাক।

নারী-পুরুষের সার্বিক সমতা এবং জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে নারীদেরও পূর্ণ মাত্রায় অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকায় স্বামীর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য সেখানে খতম হয়ে গেছে বলে তালাক আধিক্যের কারণ দর্শানো হয়ে থাকে। কেননা যেখানে নারী ও পুরুষ পূর্ণ সমান মর্যাদায় পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, যৌন ব্যাপারেও এ সমতা সেখানে কাম্য। প্রাচীনকালে যেহেতু নারী পুরুষের অধিনে থাকত, সেজন্যে তার মুখে স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো অবস্থায়ই কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হতো না।

কিন্তু বর্তমানে অবস্থার আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। যৌন পরিতৃপ্তি নারীর এক বিশেষ অধিকার বলে বিবেচিত হচ্ছে। যেখানে তার অভাব, পারস্পরিক তিক্ততা সেখানে অনিবার্য। তার শেষ পরিণতি হয় তালাক। আর কিনসের রিপোর্ট অনুযায়ী সমাজ পরিবেশ অস্বাভাবিক উত্তেজনাময় হওয়ার কারণে সেখানকার অধিকাংশ পুরুষ দ্রুত বীর্য স্খলনের রোগে আক্রান্ত। এ কারণেই সেখানে তালাকের এত মাত্রাধিক্য।

ইসলাম ও তালাক

তালাক طلاق শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ حل الوثائق

বন্ধন খুলে দেয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় 'তালাক' মানে حل عقدة النكاح বিয়ের বন্ধন খুলে দেয়া।

ইমামুল হারামাইন বলেছেন ঃ

هُوَ لَفْظٌ جَاهِلِىٌّ وَرَدَ الْاِسْلَامُ بِتَقْرِيْرِهِ - (سبل الاسلام : ج-٣، ص-١٦٧)

এ শব্দটি ইসলাম-পূর্ব জাহিলী যুগে ব্যবহৃত পরিভাষা। ইসলামও এক্ষেত্রে এ শব্দটিই ব্যবহার করেছে।

এ যুগের মিসরীয় পণ্ডিত আল-খাওলী বলেছেন ঃ

هُوَ انْفِصَالُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ -

স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া।

অথবা

فَصْمِ الرِّبَاطِ الَّذِىْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ - (المراة بين ابيت والمجتمع : ص-٥٧)

আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী একত্রিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক-রশি ছিন্ন করা।

ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে তালাক মানে—

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ - (ردالمختار : ج-٢، ص-٥٧٠)

বিয়ের বাধনকে তুলে ফেলা আর বাধন তুলে ফেলার মানে বিয়ের বাধ্যবাধকতা খতম করে দেয়া।

ইসলামে তালাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে— স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যখন এতদূর খারাপ হয়ে যাবে যে, তারা পরস্পর মিলেমিশে ও ঐক্য সৌহার্দ্য সহকারে জীবন যাপন করার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পায় না, এমনকি এরূপ অবস্থার সংশোধন বা পরিবর্তনের শেষ আশাও বিলীন হয়ে গেছে— যার ফলে বিয়ের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন উভয়ের ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও তিক্ততা-বিরক্তির বিষাক্ত পরিণতি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া।

কিন্তু তাই বলে ইসলামে তালাক বা বিচ্ছেদ কোনো পছন্দনীয় কাজ নয়। এ কাজকে কোনো দিক দিয়ে কিছুমাত্র উৎসাহিতও করা হয়নি। বরং এ হচ্ছে নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি। দাম্পত্য জীবনে মিলমিশ রক্ষার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তখন এ ব্যবস্থার সাহায্যে উভয়ের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখা— আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য।

'তালাক' যে ইসলামে কোনো পছন্দনীয় কাজ নয়, একথা হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণা থেকেই প্রমাণিত। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلَاقُ - (ابوداؤد، ابن ماجه، حاكم)

আল্লাহ্‌র কাছে সব হালাল কাজের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণার্হ ও ক্রোধ উদ্রেককারী কাজ হচ্ছে তালাক।

এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা খাত্তাবী লিখেছেন ঃ

ومعنى الكراهة فيه متصرف الى السبب الجالب للطلاق وهو سوء العشرة وقلة الموافقة لا الى نفس الطلاق فقد اباح الله الطلاق وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طلق بعض نسائه ثم راجعها- (معالم السنن : ج-١، ص-٢٣١)

তালাক ঘৃণ্য হওয়ার অর্থ আসলে সেই মূল কারণটির ঘৃণ্য হওয়া, যার দরুন একজন তালাক দিতে বাধ্য হয়। আর তা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খারাপ হওয়া— মিলমিশের অভাব হওয়া। মূল তালাক কাজটিই ঘৃণ্য নয়। কেননা এ কাজটিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুবাহ্‌ করে দিয়েছেন। আর রাসূল (স) তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে 'রাজয়ী' তালাক দিয়ে পুনরায় গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত।

আর ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল কাহলানী ছানআনী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ فِىْ الْحَلَالِ اَشْيَاءُ مَبْغُوْضَةٌ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَ اِنَّ اَبْغَضَهَا الطَّلَاقَ -

(سبل السلام : ج-٣، ص-١٦٧)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হালালের মধ্যেও কতক কাজ এমন রয়েছে, যা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য। আর এসব হালাল কাজের মধ্যে 'তালাক' হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য।

ফিকাহ্‌বিদদের মতেও তালাক মূলত নিষিদ্ধ। তবে তালাক না দিয়ে যদি কোনো উপায়ই না থাকে, তাহলে তা অবশ্যই জায়েয হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের ভাব যদি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, একত্র জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে, একত্র জীবনে আল্লাহ্‌র নিয়ম-বিধান রক্ষা করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে তখন এ তালাকের আশ্রয় নিতে হবে। (ردالمختار : ج-٢، ص -٥٧٢)

ফিকাহ্‌বিদদের মতে তালাক-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট হচ্ছে, তা অন্যায়, জুলুম ও নিদারুণ কষ্ট, জ্বালাতন ও উৎপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি লাভের পন্থা। ফিকাহর ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ مَحَاسِنِهِ التَّخَلُّصُ بِهِ مِنَ الْمَطَارِهِ -

তালাকের সৌন্দর্য হলো কষ্টকর অশান্তি থেকে অব্যাহতি লাভ।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তালাককে শরীয়তসম্মত করেছেন। কেননা পারিবারিক জীবনে এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তবে বিনা প্রয়োজনে— স্ত্রীর কোনো গুরুতর দোষ-ত্রুটি ব্যতীতই— তালাক দেয়া একান্তই এবং মারাত্মক অপরাধ। এ সম্পর্কে ইসলামের মনীষীগণ সম্পূর্ণ একমত। ইমাম আবূ হানীফার ফিকাহর আলোচনায় এ বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত সাধারণ নীতি হলো ঃ لاضرر ولاضرار 'না নিজে ক্ষতি স্বীকার করবে, না অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।' অথচ অকারণ তালাকের দরুন স্ত্রীকে অপূরণীয় ক্ষতি ও অপমান-লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়। প্রখ্যাত ফিকাহ্‌বিদ ইবনে আবেদীন বলেছেন ঃ তালাক মূলত নিষিদ্ধ, মানে হারাম; কিন্তু দাম্পত্য জীবনে সম্পর্ক যখন এতদূর বিষজর্জর হয়ে পড়ে যে, তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখন তা অবশ্যই জায়েয হবে। পক্ষান্তরে বিনা কারণেই যদি তালাক দেয়া হয়; স্ত্রীকে তার পরিবার-পরিজনকে, সন্তান-সন্ততি ও পিতামাতা, ভাই-বোনদেরকে কঠিন কষ্টদান করা ও বিপদে ফেলাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ তালাক একেবারেই জায়েয নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা কেবলমাত্র তখনই সঙ্গত হতে পারে, যখন তাদের উভয়ের স্বভাব-প্রকৃতিতে এতদূর পার্থক্যের সৃষ্টি হবে, আর পরস্পরের মধ্যে এতদূর শত্রুতা বেড়ে যাবে যে, তারা মিলিত থেকে আল্লাহ্‌র বিধানকে পালন ও রক্ষা করতে পারেই না। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হলে তালাক তার মূল অবস্থায়ই থাকবে— মানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারামই বিবেচিত হবে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْ عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا -

স্ত্রীরা যদি স্বামীদের কথামতো কাজ করতে শুরু করে, তাহলে তখন আর তাদের ওপর কোনো জুলুমের বাহানা তালাশ করো না— তালাক দিও না।

বাস্তবিকই, কোনো প্রকৃত কারণ না থাকা সত্ত্বেও যারা স্ত্রীকে তালাক দেয়, তারা মহা অপরাধী, সন্দেহ নেই। এদের সম্পর্কেই রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُوْدِ اللّٰهِ - يَقُوْلُ قَدْ طَلَّقْتُ قَدْرَاجَعْتُ - (ابن ماجه، ابن حبان)

তোমাদের এক-একজনের অবস্থা কি হয়েছে ? তারা কি আল্লাহ্‌র বিধান নিয়ে তামাসা খেলছে ? একবার বলে তালাক দিয়েছি, আবার বলে পুনরায় গ্রহণ করেছি।

বলেছেন ঃ

اَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ - (النسائى)

তারা কি আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে তামাসা খেলছে, অথচ আমি তাদের সামনেই রয়েছি।

রাসূলে করীমের ওপরে উল্লিখিত বাণীসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'তালাক' কোনো সাধারণ জিনিস নয়, মুখে এল আর তালাকের শব্দ উচ্চারণ করে ফেললাম, তা এরূপ সহজ ও হালকা জিনিস নয় আদৌ। বরং এ হচ্ছে অতি সাংঘাতিক কাজ। মানুষের জীবন, মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কাজ হচ্ছে এটা, ইসলামে তার অবকাশ রাখা হয়েছে নিষ্কৃতির সর্বশেষ উপায় হিসেবে মাত্র। হযরত মুয়ায থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষা থেকেও এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ – (دارقطنی)

আল্লাহ্ তা'আলা তালাক অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণার্হ জিনিস আর একটিও সৃষ্টি করেন নি।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলের নিম্নোক্ত বাণী থেকেও তালাকের ভয়াবহতা ও ভয়ংকরতা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। বাণীটি নিম্নরূপ ঃ

تَزَوَّجُوْا وَ لَا تُطَلِّقُوْا فَاِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ – (تفسیر قرطبی : ج-١٨، ص-٢٤٩)

তোমরা বিয়ে করো, কিন্তু তালাক দিয় না, কেননা তালাক দিলে তার দরুন আল্লাহ্র আরশ কেঁপে ওঠে।

সমাজে এমন লোকের অভাব নেই, যারা মৌমাছির মতো ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর অভ্যাসের দাস। এদের কাছে না বিয়ের কোনো মূল্য আছে, না আছে নারীর জীবন, মান-সম্ভ্রমের এক কড়া-ক্রান্তি দাম। এরা বিয়েকে দুটি দেহের একই শয্যায় একত্রিত হওয়ার মাধ্যম মনে করে এবং একটি দেহের স্বাদ আকণ্ঠ পান করার পর নতুন এক দেহের সন্ধানে বেরিয়ে পড়াই তাদের সাধারণ অভ্যাস।

এদের সম্পর্কেই রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ

تَزَوَّجُوْا وَ لَا تُطَلِّقُوْا– فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَالذَّوَّاقَاتِ – (احکام القران للجصاص : ج-٣، ص-١٣٣)

তোমরা বিয়ে করো; কিন্তু তালাক দিও না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সেসব স্ত্রী-পুরুষকে (ভালোবাসেন না) পছন্দ করেন না, যারা নিত্য নতুন বিয়ে করে স্বাদ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত।

পারিবারিক স্থিতির ইসলামী সংরক্ষণ

ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা আছে বলে পাশ্চাত্য সমাজ ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। তারা বলেছে, তালাক ব্যবস্থা থাকায় মনে হচ্ছে ইসলামে নারীর কোনো সম্মান নেই, আর বিয়েরও নেই কোনো গুরুত্ব— স্থায়িত্ব।

কিন্তু তালাকের ব্যবস্থাপনায় ইসলাম একক নয়। ইহুদী শরীয়তেও তালাকের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাচীন সমাজসমূহেও এর প্রচলন ছিল। স্বয়ং খ্রিস্টানদের মধ্যেও তালাকের ব্যবস্থা— তা অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অথচ ইসলাম এমন এক পারিবারিক ব্যবস্থা উপস্থাপিত করেছে, যা স্বামী ও স্ত্রী— উভয়েরই ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদার পূর্ণ নিয়ামক এবং তা পরিবারকে এমনি সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলে, যার ফলে মানবীয় সমাজ হয় অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। নিতান্ত প্রয়োজনের কারণেই তালাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু তবুও এ ব্যবস্থাকে কেউ খেলনার ছলে গ্রহণ করে নারীকে অযথা কষ্ট দেবে আর পরিবারের পবিত্রতা বিনষ্ট করবে, তার কোনো সুযোগই রাখা হয়নি।

ইসলাম প্রথমত বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনকে চিরদিনের তরে স্থায়ী করে তুলতে চায় এবং মৃত্যু পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী হিসেবেই বসবাস করবে— এই তার নির্দেশ। এ কারণেই ইসলামে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে

বিয়েকে জায়েয বলে গ্রহণ করা হয়নি।[১] এরূপ শর্তে কোনো বিয়ে যদি সম্পন্ন হয়ও তবে সে বিয়ে চিরদিনের জন্যে হয়ে যাবে, আর মেয়েদের সে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

বিরোধ মীমাংসার পন্থা

ইসলাম সর্বপ্রথম দাম্পত্য জীবনের সম্ভাব্য সকল প্রকার বিরোধ ও মনোমালিন্য শান্তিপূর্ণভাবে বিদূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিম্নলিখিত উপায়ে বিরোধসমূহের মীমাংসা করা সম্ভব ঃ

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই উভয়ের অধিকার ও উভয়ের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধসম্পন্ন হতে নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীমের এ মহামূল্য বাণীটি বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে ঃ

হুশিয়ার, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ -

পুরুষ দায়ী তার পরিবারবর্গের জন্যে। আর সেজন্যে সে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে।

وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا -

স্ত্রী দায়ী তার স্বামীর ঘরবাড়ি ও যাবতীয় আসবাবপত্রের জন্যে এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

বস্তুত এ দায়িত্ববোধ উভয়ের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত থাকলে পারিবারিক জীবনে কখনো ভাঙ্গন বা বিপর্যয় আসতে পারবে না, কখনো তালাকের প্রয়োজন দেখা দেবে না।

২. দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীতে যখনই কোনো প্রকার বিবাদ-বিরাগ বা মনোমালিন্য দেখা দিবে, তখনই তাদের উভয়ের জন্যে এ নসীহত রয়েছে যে, প্রত্যেকেই যেন অপরের ব্যাপারে নিজের মধ্যে সহ্য শক্তির সংবৃদ্ধি রক্ষা করে, অপরের কোনো কিছু অপছন্দনীয় হলে বা ঘৃণার্হ হলেও সে যেন দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তা অকপটে বরদাশ্‌ত করতে চেষ্টা করে। কেননা এ কথা সর্বজনবিধিত যে, পুরুষ ও স্ত্রী— স্বভাব-প্রকৃতি, মন-মেজাজ ও আলাপ ব্যবহার ইত্যাদির দিক দিয়ে পুরামাত্রায় সমান হতে পারে না। কাজেই অপরের অসহনীয় ব্যাপার সহ্য করে নেয়ার জন্যে নিজের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করা কর্তব্য।

৩. দাম্পত্য জীবন সংরক্ষণের এ ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, বিরোধ বিরাগ ও মনোমালিন্যের মাত্রা যদি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে উভয়ের নিকটাত্মীয়দের সাগ্রহে এগিয়ে আসা কর্তব্য। স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন এবং স্বামীর পক্ষ থেকে একজন পরস্পরের মধ্যে মিলমিশ বিধানের জন্যে ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে চেষ্টা চালাবে। এ যেন পারিবারিক বিরোধ মীমাংসার আদালত এবং এ আদালতের বিচারপতি হচ্ছে এ দু'জন। তারা উভয়ের মনোমালিন্যের বিষয় ও তার মূলীভূত কারণ সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান করবে। আর তার সংশোধন করে স্থায়ী মিলমিশ ও প্রেম ভালোবাসা পুনর্বহালের জন্যে চেষ্টা করবে। বস্তুত স্বামী-স্ত্রী যদি বাস্তবিকই মিলেমিশে একত্র জীবন যাপনে ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট হয় তাহলে সাময়িক ছোটখাট বিবাদ নিজেরাই

---

১. কেবলমাত্র শিয়া ফিকাহতে বিয়েকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ এক সাময়িক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে বিয়ে। আর দ্বিতীয় চিরস্থায়ী বিয়ে। কিন্তু সুন্নী ফিকাহতে এই বিভক্তি গ্রাহ্য হয়নি। نظام حقوق زن در اسلام - ازمر تضى مطهرى : ص-٢٧-٢٨

মীমাংসা করে নিতে পারে। আর বড় কোনো ব্যাপার হলেও তা এ পারিবারিক সালিসী আদালত দ্বারা মীমাংসা করিয়ে নেয়া খুবই সহজ। কুরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াতে এ ব্যবস্থারই নির্দেশ করা হয়েছেঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا - (النساء : ٣٥)

যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো বিরোধ মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে বলে ভয় করো, তাহলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। তারা দু'জন যদি বাস্তবিকই অবস্থার সংশোধন করতে চায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের সে জন্যে তওফীক দান করবেন।

'যদি তোমরা............ভয় করো' বলে আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে দেশের শাসক ও বিচারকদের, সমাজের মাতবর-সরদারদের কিংবা স্বামী-স্ত্রীর নিকটাত্মীয় ও মুরব্বীদের। (احكام القران :ج-٢، ص: ٢٣١) বলা হয়েছে ঃ তোমাদের মনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যদি কোনো প্রকারের সন্দেহের উদ্রেক হয়— সম্পর্ক মধুর নেই বলে ধারণা জন্মে, তাহলে তখন প্রকৃত ব্যাপার তদন্ত করা এবং অবস্থার সংশোধনের জন্যে চেষ্টিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গন আসতে পারে এবং তা কিছুতেই কারো কাম্য হতে পারে না— ইসলামও তা পছন্দ করে না আর এ চেষ্টার পদ্ধতি হিসেবে বলা হয়েছে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা এমন দু'জন ব্যক্তিকে মাধ্যম ও সালিস হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে, যারা কোনো কথা বলে উভয়কে মানাতে পারবে। এ দুজনকে এদের নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকেই হতে হবে।

فَاِنَّ الْاَقَارِبَ اَعْرَفُ بِبَوَاطِنِ الْاَحْوَالِ وَاَطْلَبُ لِلصَّلَاحِ - (تفسير البيضاوى : ج-١، ص-١٨٦)

কেননা, নিকটাত্মীয়রাই প্রকৃত অবস্থার গভীরতর রূপের সন্ধান পেতে পারে, সে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে এবং তারা অবশ্যই উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করার জন্যে সর্বাধিক আগ্রহী হয়ে থাকে।

বাইরের লোক এ মীমাংসা কাজে নিয়োগ না করে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আপন জন নিয়োগের নির্দেশ দেয়ার কারণ যে কি, তা আল্লামা আবূ বকর আল-জাসসাস-এর নিম্নোক্ত কথা থেকে জানা যায়। তিনি এ কারণ দর্শাতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

لِئَلَّا تَسْبِقَ الظِّنَّةُ اِذَا كَانَا اَجْنَبِيَّيْنِ بِالْمَيْلِ اِلٰى اَحَدِهِمَا فَاِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا مِنْ قِبَلِهٖ وَالْاٰخَرُ مِنْ قِبَلِهَا زَالَتِ الظِّنَّةُ وَ تَكَلَّمَ كُلٌّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا عَمَّنْ هُوَ مَنْ قِبَلِهٖ - (احكام القران : ج-٢، ص-٢٣١)

বাইরের অনাত্মীয় লোক বিচারে বসলে তাদের কোনো এক পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়ার ধারণা হতে পারে; কিন্তু উভয়েরই আপন আত্মীয় যদি এ মীমাংসার ভার গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ পক্ষের কথা বলে, তাহলে এ ধরনের কোনো ধারণার অবকাশ থাকে না— এজন্যেই আত্মীয় ও আপন লোককে এ বিরোধ মীমাংসার ভার দিতে বলা হয়েছে।

হযরত আলীর খেদমতে এক দম্পতি বহু সংখ্যক লোক সমভিব্যবহারে উপস্থিত হলে তিনি ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন ঃ এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে; তার মীমাংসা চাই। তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ উভয়ের আপন আত্মীয় থেকে এক-একজনকে এ বিরোধ মীমাংসায়

নিযুক্ত করে দাও। যখন দু'জন লোককে নিযুক্ত করা হলো, তখন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ তোমাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কতখানি তা জানো ? তার পরে তিনি নিজেই বলে দিলেন ঃ

عَلَيْكُمَا اَنْ تَجْمَعَا اِنْ تَجْمَعَا وَ اِنْ رَاَيْتُمَا اَنْ تَفَرَّقَا اَنْ تُفَرِّ قَا - (احكام القران : ج-٢، ص-٢٣٢)

তোমাদের দায়িত্ব হলো, তারা দু'জনে মিলেমিশে একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে চাইলে তার ব্যবস্থা করে দেবে। আর যদি মনে করো যে, তারা উভয়েই বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তাহলে পরস্পরকে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মিতভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

বিচারকদ্বয় সব কথা শুনে, সব অবস্থা জেনে বুঝে একটি চূড়ান্ত ফয়সালা দেবে ও উভয়কে তা মানবার জন্যে বলবে। কিন্তু যদি তারা উভয় বা একজন তা মানতে রাজি না হয়, তাহলে তাকে ফয়সালা মেনে নেয়ার জন্যে নির্দেশ দিতে হবে। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত শব্দনিচয়ের দৃষ্টিতে বলা যায়, এ দু'জন প্রথমত এক এক পক্ষ থেকে উকীল আর উকীলের কাজ হলো শুধু বলা। কিন্তু সে বলায় যদি বিরোধের চূড়ান্ত অবসান না হয়, তাহলে তারা দু'জনে বিচারকর্তার মর্যাদা নিয়ে রায় মেনে নেয়ার জন্যে নির্দেশ দেবে। এ নির্দেশ মেনে নিতে উভয়েই বাধ্য। কেননা কুরআন মজীদে তাদের বলা হয়েছে 'হাকিম' অর্থাৎ হুকুমদাতা, বিচারক, ফয়সালাকারী। ফিকাহ্র কিতাবে এ সম্পর্কিত মতভেদ ও প্রত্যেক কথার দলীলের উল্লেখ রয়েছে।

এ ধরনের যাবতীয় চেষ্টা চালানোর পরও যদি মিলেমিশে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবার কোনো উপায় না বেরোয়, বরং উভয় পক্ষই চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যে অনমনীয় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ইসলাম তাদের দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত অবসান ঘটাবার— তালাক দেয়ার— অবকাশ দিয়েছে।

ইসলামে এ তালাক দানের একটা নিয়মও বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং তা হচ্ছে এই যে, স্বামী-স্ত্রীর 'তুহর' (হায়েয না থাকা) অবস্থায় একবার এক তালাক দেবে। এ তালাক লাভের পর স্ত্রী স্বামীর ঘরেই 'ইদ্দত' পালন করবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রাখছে না— এরূপ তালাক দান ও ইদ্দত পালনের নিয়ম করার কারণ হলো— এতে করে উভয়েরই স্নায়ু মণ্ডলির সুষ্ঠু এবং তাদের অধিক সুবিবেচক হয়ে ওঠার সুযোগ হবে। চূড়ান্ত বিচ্ছেদের যে কি মারাত্মক পরিণাম তা তারা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারবে। স্পষ্ট বুঝতে সক্ষম হবে যে, তালাকের পর তাদের সন্তান-সন্ততির ও ঘর-সংসারের কি মর্মান্তিক দুর্দশা হতে পারে। ফলে তারা উভয়েই অথবা যে পক্ষ তালাকের জন্যে অধিক পীড়াপীড়ি করেছে— ঝগড়া-বিবাদ ও বিরোধ-মনোমালিন্য সম্পূর্ণ পরিহার করে আবার নতুনভাবে মিলিত জীবন যাপন করতে রাজি হতে পারে। এ সাময়িক বিচ্ছেদ তাদের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার তীব্র আকর্ষণও জাগিয়ে দিতে পারে।

যদি তাই হয়, তাহলে এক-এক তালাককে 'তালাকে রিজয়ী' বা 'ফিরিয়ে পাওয়ার অবকাশ পূর্ণ তালাক' বলা হবে। তিন মাস ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পুনর্মিলন সাধন করতে হবে। এতে নতুন করে বিয়ে পড়াতে হবে না (যদিও ইমাম শাফেয়ীর মতে মুখে অন্তত ফিরিয়ে নেয়ার কথা উচ্চারণ করতে হবে)।

৫. কিন্তু যদি এভাবে তালাক দেয়ার পর তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে গ্রহণ করা না হয়, তাহলে এ তালাক বায়েন তালাক হয়ে যাবে। তখন যদি ফিরিয়ে নিতে হয়, তাহলে পুনরায় বিয়ে পড়াতে হবে ও নতুন করে দেন-মোহর ধার্য করতে হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বাধীন— সে ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করতেও পারে, আর ইচ্ছা না হলে সে অপর কোনো ব্যক্তিকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতেও পারে। প্রথম স্বামী এ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে কোনোরূপ জবরদস্তি বা চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না এবং তার অপর স্বামী গ্রহণের পথে বাধ সাধতেও পারবে না।

৬. এক তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যেই স্ত্রীকে যদি ফিরিয়ে নেয়া হয়, আর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন শুরু করার পর আবার যদি বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে প্রথমবারের ন্যায় আবার পারিবারিক আদালতের সাহায্যে মীমাংসার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। এবারও যদি মীমাংসা না হয় তাহলে স্বামী তখন আর এক তালাক প্রয়োগ করবে। তখনও প্রথম তালাকের নিয়ম অনুযায়ীই কাজ হবে।

৭. দ্বিতীয়বার তালাক দেয়ার পর যদি স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় আর তারপর বিরোধ দেখা দেয়, তখনো প্রথম দুবারের ন্যায় মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। আর তা কার্যকর না হলে স্বামী তৃতীয়বার তালাক প্রয়োগ করতে পারে। আর এই হচ্ছে তার তালাক দানের ব্যাপারে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ক্ষমতা। অতঃপর স্ত্রী তার জন্যে হারাম এবং সেও তার স্ত্রীর জন্যে চিরদিনের জন্যে হারাম হয়ে যাবে। কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ - (البقرة : ٢٢٩)

তালাক দুবার দেয়া যায়, তার পরে হয় ভালোভাবে স্ত্রীকে গ্রহণ করা হবে, না হয় ভালোভাবে সকল কল্যাণ সহকারে তাকে বিদায় দেয়া হবে।

এ 'বিদায় করে দেয়া হবে' থেকেই তৃতীয় তালাক বোঝা গেল। তা মুখে স্পষ্ট উচ্চারণের দ্বারাই হোক, কি এমনি রেখে দিয়ে এক 'তুহর' কাল অতিবাহিত করিয়েই দেয়া হোক— উভয়ের পরিণতি একই।

নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ আয়াতে তো মাত্র দুবার তালাকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে তৃতীয় তালাক কোথায় গেল ? তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ -

'কিংবা ভালোভাবে বিদায় করে দেয়া হবে' বাক্যে-ই তৃতীয় তালাকের কথা নিহিত রয়েছে। — আবূ দাউদ

তালাক ব্যবস্থা

এই তৃতীয় তালাক— তাই যেভাবেই দেয়া হোক— এরপর স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে ও স্ত্রী হিসেবে তাকে নিয়ে বসবাস করতে পারবে না।

এ আয়াত স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছে যে, এক বা দুই তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা হোক, আর তাকে চিরদিনের তরে বিদায় করে দেয়া হোক— উভয় অবস্থায়ই স্ত্রীর প্রতি ভালো ব্যবহার করতে হবে, তার মান-মর্যাদা ও ইযযত-আবরুর এক বিন্দু ব্যাঘাত করা চলবে না। ফিরিয়ে নিলেও যাতে করে তার স্ত্রীত্বের মর্যাদা ও সম্ভ্রম কিছুমাত্র ব্যাহত হতে না পারে, আর চূড়ান্তভাবে তালাক দিয়ে পরিত্যাগ করা হলেও যাতে তার মান-সম্মান ও নৈতিকতার ওপর কোনো কলঙ্ক আরোপ করা না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। স্বামীর এ অধিকার নেই যে, এক বা দুই তালাক দেয়ার পর তাকে পুনরায় গ্রহণ করে তাকে লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা করবে, তেমনি চিরদিনের তরে বিদায় করতে হলেও তার কুৎসা প্রচার করে, তার গোপন কথা জনসমাজে বা আদালতের বিচারকমণ্ডলী ও সমবেত জনতার সামনে প্রকাশ করে দিয়ে— অতীত দাম্পত্য জীবনের সব ময়লা আবর্জনা হাটে ঘাটে ধৌত করবে, ভবিষ্যতে অপর কোনো পুরুষ তাকে আগ্রহ ও ভক্তি সহকারে স্ত্রীত্বে বরণ করবে— তার পথ বন্ধ করে দেবে না, এ অধিকার স্বামীকে আদৌ দেয়া যায় না, ইসলামে তা দেয়া হয়নি। অতএব যে ব্যবস্থাধীন তালাক কেবল আদালতেই কার্যকর হতে পারে, আর স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর বা স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর নৈতিক চরিত্রহীনতা ও দাম্পত্য জীবনে অসততার প্রমাণ না দিয়ে তালাক নেয়া বা দেয়া যায় না এবং চিরমুক্তি

লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় ব্যভিচারের অভিযোগ আনতে হয়, তা কোনোক্রমেই মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষের নীতি হতে পারে না। ইসলাম তালাকের এই পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। কুরআন তো এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে ঃ রাখো তো ভালোভাবে রাখো, না রাখো তো তার কল্যাণ ও মঙ্গলকে অক্ষুন্ন রেখেই এবং সে কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যেই চির বিদায় করে দাও, যেন সে অন্যত্র তার জুড়ি গ্রহণ করে সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারে এবং তুমিও পারো নতুন স্ত্রী গ্রহণ করে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন অতিবাহিত করার ব্যবস্থা করতে।

এ পর্যায়েই আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا – (النساء : ١٣٠)

স্বামী ও স্ত্রী যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ই, তাহলে আল্লাহ্ তাঁর ঐশ্বর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে তাদের দুজনকেই নিশ্চিত ও স্বচ্ছন্দ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা বাস্তবিকই বিশালতা দানকারী সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানী।

তার মানে, স্বামী-স্ত্রী যদি পারস্পরিক সম্পর্ককে সুষ্ঠু, নির্দোষ ও মাধুর্যপূর্ণ করে নিতে না পারে এবং শেষ পর্যন্ত যদি তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটেই যায়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের পরস্পরকে পরস্পর থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেবেন। একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তারা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। স্বামী অপর এক স্ত্রী গ্রহণ করে এবং স্ত্রী অপর এক স্বামী গ্রহণ করে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবে।

এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর তালাক গ্রহণের পরবর্তী মর্মান্তিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়কেই সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, যেন তারা শরীয়ত অনুযায়ী পারস্পরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কোনোরূপ মর্মজ্বালায় নিমজ্জিত না হয়ে বরং তালাক পরবর্তী বাস্তব অবস্থার মুখোমুখী হয়ে যেন তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। অতীতের কোনো স্মৃতিই যেন তাদের মনকে পীড়িত না করে। নতুন করে যেন তারা বিবাহিত হয়ে সুখময় জীবনের সন্ধান করে। পুরুষ যেন আবার বিয়ে করে গ্রহণ করে অপর এক মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে। মেয়ে লোকটিও যেন নতুন স্বামী গ্রহণ করে এবং এ নতুন সংসারে যেন তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করে। সেক্ষেত্রে যেন উদ্যোগ, আগ্রহ ও আন্তরিকতার কোনো অভাব দেখা না দেয়। এ আয়াতের মূল বক্তব্য এই।

বস্তুত ইসলামে তালাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে জীবন নাট্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটাবার জন্যে নয়, বরং নতুন করে এক উদ্যমপূর্ণ জীবন শুরু করাবার উদ্দেশ্যে। এ ভাঙ্গন ভাঙ্গনের জন্যে নয়, নতুন করে গড়বার জন্যে। তাই এ ভাঙ্গন কিছু মাত্র দূষণীয় নয়, নয় নিন্দনীয়, অবশ্য যদি তা গ্রহণ করা হয় সর্বশেষ ও চরম উপায় হিসেবে।

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তালাক ব্যবস্থা যদিও পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের পক্ষে এক অবাঞ্ছনীয় চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে সন্তান-সন্ততির পক্ষে তা মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু পারিবারিক জীবনের আর এক বৃহত্তর দুর্দশা থেকে নারী-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করার কল্যাণময় উদ্দেশ্যেই ইসলামে এর অবকাশ রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইসলামে তালাক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এক চরম অবস্থার প্রতিকারের বিশেষ পন্থা হিসেবে, নিরুপায়ের উপায় হিসেবে। যখন আর কোনো উপায়ই নেই, শান্তিতে বসবাস যখন সম্ভবই হচ্ছে না ঠিক সে অবস্থায় প্রয়োগের জন্যেই এ ব্যবস্থা।

তিন তালাকের পরিণতি

এক, দুই ও তিন তালাক হয়ে যাওয়ার পর স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যায়। অতঃপর এতদুভয়ের পুনরায় স্বামী স্ত্রী হিসেবে মিলিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এ সময় অবস্থা দাঁড়ায় এরূপ যে, স্বামী সেই স্ত্রীর স্বামী নয় এবং স্ত্রী সেই স্বামীর স্ত্রী নয়। যারা ছিল পরস্পরের জন্যে সম্পূর্ণ হালাল, তালাক সংঘটিত হওয়ার পর তারাই পরস্পরের জন্যে হারাম হয়ে গেছে। এ হারাম হওয়ার কথা কুরআন মজীদের সূরা আল-বাকারার ২৩০ আয়াতের প্রথমাংশ থেকেই প্রমাণিত হয়। তা হল ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ -

স্বামী যদি স্ত্রীকে তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তাহলে অতঃপর সেই স্ত্রী তার জন্যে হালাল হবে না।

তৃতীয়বার তালাক দানে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং তারা পরস্পরের জন্যে হারাম হয়ে যায়। এরূপ ঘটানোর মূলে একটি বিশেষ মানসিক কারণ নিহিত হয়েছে। কেননা এ তৃতীয়বারের তালাকেও যদি তালাক সংঘটিত না হতো, যদি একজন অন্য জনের হারাম হয়ে না যেত, তাহলে দুনিয়ার স্বামীরা স্ত্রীদের বৈবাহিক জীবন নিয়ে মারাত্মক ছিনিমিনি খেলবার সুযোগ পেত। স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে তার পাওনা অধিকার দিত না অথচ সে তার কাছ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারলে অন্যত্র বিবাহিত হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করতে পারত। সে কারণে ইসলামী শরীয়তে এ মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যথায় অবস্থা দাঁড়াত এই যে, একবার একজনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হলে জীবনে কোনো দিনই তার বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হতো না। ফলে পূর্ণ স্ত্রীত্বের অধিকারও যেমন তার কাছে পেত না, তেমনি তার কাছ থেকে চলে গিয়ে অপর একজনকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করাও সম্ভব হতো না।

ইসলামের ব্যবস্থা হচ্ছে, তিনবার তালাক হওয়ার পর এ স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জন্যে চিরদিনের তরে হারাম হয়ে গেল। কিন্তু এতদুভয়ের যদি আবার স্বামী স্ত্রী হিসেবে একত্রিত হতে হয়, তাহলে স্ত্রী লোকটির অপর একজন স্বামী গ্রহণ করতে হবে এবং স্বাভাবিক নিয়মে তার কাছে থেকে মুক্তি পেতে হবে, অন্যথায় তা কখনো হালাল হবে না।

তৃতীয়বারের তালাক সংঘটিত হওয়ার পর স্বামী স্ত্রীর পুণর্মিলনের জন্যে কুরআন মজীদে যে অপর এক ব্যক্তির সাথে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন ও তার কাছ থেকে তালাক লাভের শর্ত করা হয়েছে, তার মধ্যেও এমন মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে, যা প্রত্যেক স্বামীকে চূড়ান্তভাবে তালাক দানের উদ্যম থেকে বিরত রাখে। কেননা অপর কোনো স্বামী কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে এলে তাকে প্রথম স্বামীর পক্ষে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে খুশী মনে গ্রহণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে সব স্বামীই নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিতে খুব কমই রাজি হবে।

তালাক সম্পর্কিত এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন অত্যন্ত মহান ও সম্মানার্হ। জীবনে যাতে করে কোনো প্রকার বিপর্যয় দেখা দিতে না পারে, তার জন্যে সম্ভাব্য সবরকমের ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব বলা যায়, ইসলামের তালাক ব্যবস্থা পারিবারিক জীবনের রক্ষাকবচ।

তালাক দানের ক্ষমতা কার

উপরের আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলামে তালাক দেয়ার কাজ কেবল স্বামীর, এ ক্ষমতাও একান্তভাবে স্বামীকেই দেয়া হয়েছে। স্বামী যদ্দিন ইচ্ছা একজন স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারে। আবার যখন ইচ্ছা— কারণ কিছু থাক বা নাই থাক— স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দিতে

পারে এ ইখতিয়ারও স্বামীরই রয়েছে। কিন্তু ইসলামের এরূপ বিধান কেন ? স্ত্রীকে এ ব্যাপারে কোনো ইখতিয়ার দেয়া হয়নি কেন ? এতে করে কি স্ত্রী দাম্পত্য জীবনকে স্বামীর দয়া-অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীলা করে দেয়া হয়নি— আর এটাই কি ইনসাফ ?

বিষয়টি বিশদ আলোচনা সাপেক্ষ। তালাক দানের ক্ষমতা কাকে দেয়া যেতে পারে তা সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা নিম্নোক্ত পাঁচটি সম্ভাবনাকে সম্মুখে রেখে বিবেচনা করতে পারি ঃ

১. তালাক দানের ক্ষমতা কেবলমাত্র স্ত্রীকে দেয়া;

২. তালাক দানের কাজটি স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা করা;

৩. তালাক দানের ক্ষমতা প্রয়োগ কেবলমাত্র বিশেষ সরকারী বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা করা;

৪. তালাক দানের ক্ষমতা কেবলমাত্র স্বামীর হাতে ন্যস্ত করা;

৫. তালাক দানের ক্ষমতা যদিও চূড়ান্তভাবে স্বামীকে দেয়া হবে কিন্তু সে সঙ্গে স্ত্রীকেও ক্ষেত্র ও অবস্থান বিশেষ তালাক গ্রহণের সুযোগ দেয়া।

এ পাঁচটি ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে দেখতে চাই ঃ

১. কেবলমাত্র স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষমতা দেয়ার উপায় নেই। কেননা এতে করে স্বামীকে কঠিন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করে দেয়া হবে। আর পারিবারিক জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও ভঙ্গুরতা প্রবল হয়ে দেখা দেবে। তালাকে আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতি সাধন হয় কেবল স্বামীর— স্ত্রীর নয় বরং স্ত্রী তো নিত্য নতুন স্বামী গ্রহণের সুযোগ পেলে প্রতিবারে নতুন করে দেন-মোহর পেয়ে আর্থিক দিক দিয়ে বড়ই লাভবান হতে পারবে। নিত্য নতুন সাজসজ্জা, নিত্য নতুন ঘরবাড়ি ও নিত্য নতুন পুরুষের ক্রোড় লাভের সুযোগ পাবে। ক্ষতির দিকটি সম্পূর্ণই পড়বে স্বামী বেচারার ভাগ্যে। কেননা দেন-মোহর ও যাবতীয় খরচ তাকেই বহন করতে হয়। কাজেই তালাক দানের ক্ষমতা কেবল স্ত্রীর হাতে থাকলে স্বামীর অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে তা প্রয়োগ করে নতুন স্বামী গ্রহণ করার জন্যে চলে যেতে পারবে। আর তখন এ ক্ষমতার অপপ্রয়োগের আশংকাও খুব তীব্র হয়ে দেখা দেবে। স্ত্রীলোকের মন-মেজাজ দ্রুত পরিবর্তনশীল, স্পর্শকাতর, ক্রোধান্ধ। পরিণাম সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তায় অক্ষম। স্বামী তার সাথে সামান্য ব্যাপার নিয়ে একটু মতভেদ করলেই স্ত্রী অতিষ্ট হয়ে তালাক দিয়ে ফেলবে এবং নতুন স্বামীর সন্ধানে বের হয়ে পড়বে।

২. স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে তালাক দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে তালাক দানের ব্যাপারটি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে; যদিও ইসলাম পারস্পরিক বোঝাপড়া করাকে নিষেধ করেনি। কিন্তু তাই বলে বোঝাপড়া ও স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে তালাক দিলে তালাক সিদ্ধ হবে না, এমন শর্ত ইসলামে করা হয়নি। কেননা এরূপ শর্ত করা হলে স্ত্রী স্বামীর সাথে ইচ্ছাপূর্বক অমানুষিক ও অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেও তালাকের পরিণাম থেকে রেহাই পেয়ে যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় বহু সংখ্যক স্বামীরই দাম্পত্য জীবন মারাত্মকরূপে বিষাক্ত ও দুঃসহ হয়ে পড়ত। তাছাড়া স্ত্রী তো ঘরবাড়ির ব্যয়ভার বহন করে না, স্বামীকেও কোনো অর্থ দিয়ে সাহায্য করে না, করতে বাধ্য নয়, এজন্যে তার কোনো দায়িত্ব নেই। এমতাবস্থায় সে কেন তালাকে সম্মতি দেবে ? আর তখন স্বামীকেই বা কি করে এমন স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে বলা যায়, যে তাকে ভালোবাসে না ? শুধু তাই নয়— ঘৃণা করে, আদৌ সহ্য করতে পারে না অথচ তালাক নিতেও সম্মত নয় ?

৩. সরকারী ব্যবস্থাপনায় তালাক ঘটানো সম্পূর্ণ ইউরোপীয় রীতি। এর ক্ষতি ও কদর্যতা এখন দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রকট হয়ে পড়েছে। কেননা তা করা হলে উভয়কেই দাম্পত্য জীবনের কলুষতাকে হাটের মাঝখানে তুলে ধরতে হবে, প্রত্যেককেই অপর পক্ষের নৈতিক দোষ, কলংক ও

দুর্বলতা প্রমাণিত করতে হবে বিচারকদের সামনে। আর একাজে যে সামাজিক নৈতিকতা ও সংহতি-স্থিতির পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক, তা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না।

৪. তালাকদানের ক্ষমতা কেবল স্বামীর হাতে ন্যস্ত করা হলে সেটা হবে সত্যই এক স্বভাবসম্মত ব্যবস্থা। কেননা পারিবারিক জীবনের সব রকমের দায়দায়িত্ব প্রধানত তাকেই বহন করতে হয়। আর্থিক প্রয়োজন তাকেই পূরণ করতে হয়। সে ইচ্ছা করে বারে বারে নতুন বিয়ে করে দেন-মোহর দেয়ার, বিয়ে-উৎসবের খরচ বহন করার ঝুঁকি গ্রহণ করতে সহজে রাজি হতে পারে না। সে একবারের বিয়েকে স্থায়ী করে রাখার জন্যে চেষ্টিত হবে প্রাণপণে। আর সে তালাক দিতে রাজি হলেও তা হবে ঠিক তখন, যখন স্ত্রীর সাথে একত্রে ঘর করার আর কোনো উপায়ই অবশিষ্ট নেই।

অপরদিকে, পুরুষরা সাধারণত সহ্যশক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। পারিবারিক জীবন যত ঝড়-ঝাপটাই আসুক, যতই কষ্ট হোক, যতই জটিলতা দেখা দিক, বাইরের কিংবা ভিতরে, সবই সে অকাতরে সইতে পারে, সয়ে থাকে। তার পক্ষে তালাকের জন্যে তৈরী হওয়া কেবল তখনই সম্ভব, যখন দাম্পত্য জীবন সব রকমের সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত তালাক দেয়ার ও নতুন করে বিয়ে করে ঘরে আনার পরিণাম, দাম্পত্য সুখ ও আর্থিক ব্যয় বহনের দিক দিয়েও সে সব সময়ই সজাগ থাকে। কাজেই তার পক্ষে যখন-তখন তালাক দানের ক্ষমতা প্রয়োগ হওয়া সহজ মনে করা যেতে পারে না, অন্তত যদ্দিন একত্রে মিলেমিশে ও সুখে থাকার শেষ আশাটুকু নিভে না যাবে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, স্বামী সব সময় এ চরম অবস্থায় পড়েই তালাক দানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে না, বরং প্রায়ই দেখা যায়, স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য ঝগড়াঝাটি ও কলহের দরুন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, একান্তই অকারণে স্ত্রীকে শুধু কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তালাক দেয় অথবা এও দেখা যায় যে, নিত্য নতুন বধুয়ার মধু লুণ্ঠনের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে স্বামী তার এক স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে, ফলে এ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে নানাভাবে লাঞ্ছিত-নিপীড়িত ও অপদস্ত হচ্ছে। এর প্রতিবিধান কি করা যেতে পারে?

এর জবাবে বলা যায়, দুনিয়ার যে কোনো ব্যবস্থাই খারাপভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আর ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি চরিত্রহীন ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হয়, তাহলে তার পক্ষে সবক্ষেত্রে সীমা লংঘন করে যাওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ অবস্থা এই যে, স্বামী স্ত্রীর তুলনায় অধিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে থাকে, ঘর-সংসার ও সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাকেই বেশি করে ভাবতে হয়— অন্তত স্ত্রীর তুলনায়। তাই এ সাধারণ অবস্থাকে সামনে রেখেই সাধারণ বিধান হিসেবে তালাক দানের ক্ষমতা মূলত স্বামীর হাতেই অর্পন করা হয়েছে। বস্তুত নিয়ম কখনো ব্যর্থ যায় না। প্রত্যেক সাধারণ নিয়মকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্যে অনুরূপ ব্যক্তি-চরিত্র ও সমাজ পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়। আর এজন্যে দীর্ঘ সময় চেষ্টা-সাধনা ও যত্নের প্রয়োজন। তালাক দানের সুযোগ ও স্বামীর ক্ষমতা একটা সাধারণ নিয়ম; কিন্তু স্বামীর চরিত্রহীনতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের দরুন কিছু লোক যদি এ সুযোগের অপব্যবহার করে, তাতে আসল মূলনীতির কোনো দোষ নেই। আর প্রত্যেক সাধারণ নীতির প্রয়োগে কারো না কারো কিছু-না-কিছু অসুবিধা কিংবা ক্ষতি সাধিত হয়েই থাকে। এটাও বিচিত্র কিছু নয়। কাজেই বৃহত্তর কল্যাণের দৃষ্টিতেই সাধারণ নীতির যথার্থতা বিচার করতে হবে। উপরোক্ত ক্ষতি ও অকল্যাণের দিকটির সংশোধন করা গেলে পুরুষকে তালাক দানের ক্ষমতা দেয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে। এ কারণেই ইসলামে তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামীকে দেয়া হয়েছে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ - (البقرة)

সে যার হাতে বিয়ের মূল গ্রন্থি নিবদ্ধ রয়েছে।

তাফসীরে মাযহারী এর অর্থ লিখেছে ঃ

اَلزَّوْجُ الْمَالِكُ لِعَقْدِهٖ وَحَلِّهٖ -

স্বামীই হচ্ছে বিয়ের বন্ধন ও সে বন্ধন খোলার কর্তৃত্বের অধিকারী।

তাবারানী ও বায়জাবীতেও এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, শা'বী, শুরাইহ্, মুজাহিদ ও আবূ হানীফা প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন।

(تفسير المظهرى : ج-١، ص-٢٣٣)

আল্লামা আ-লূসী এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

وهو التفسير المثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... عن ابن عمر مرفوعا وقال جمع من الصحابة - (روح المعانى : ج-٢، ص-١٥٤)

আয়াতের এ ব্যাখ্যা রাসূল থেকে বর্ণিত, বর্ণিত হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে রাসূলে করীম (স)-এরই কাছ থেকে, তাঁরই কথা হিসেবে আর সাহাবীদের এক জামা'আতও এ মতই পোষণ করতেন।

এ পর্যায়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে— এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَيِّدِ ىْ زَوَّجَنِىْ اَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهَا فَجَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : يَاَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالَ اَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهٗ اَمَتَهٗ لَمْ يُرِيْدُ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَهُمَا- اِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ اَخَذَ بِالسَّاقِ -

হে রাসূল! আমার মালিক ও মনিব তার দাসীকে আমার কাছে বিয়ে দিয়েছিল। এখন সে আমার ও আমার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। এ কথা শুনে নবী করীম (স) মুসলিম জনগণকে একত্রিত করলেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। বললেন ঃ তোমাদের কি হয়েছে। তোমাদের এক-একজন তার দাসের কাছে তার দাসীকে বিয়ে দেয়। আর তার পরে তাদের দুজনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। জেনে রাখ, তালাক দেয়ার ইখতিয়ার তার, যে বিয়ে করেছে।

বস্তুত কুরআন ও হাদীসের এসব দলীল এবং মনীষীদের ব্যাখ্যা ও সমর্থন এ পর্যায়ের অকাট্য দলীল। এ দলীলসমূহ অতীব স্পষ্ট। এর অন্য কোনোরূপ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। এসব মিলে এক সঙ্গে একথা প্রমাণ করে যে, তালাক দেয়ার ক্ষমতা ও অধিকার কেবলমাত্র স্বামীর। এমন কি রাসূলের পক্ষেও স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার ছিল না। অতএব দুনিয়ার কোনো দেশের কোনো সরকার বা সরকারী পদাধিকারী কোনো ব্যক্তির, আদালতের কোনো বিচারপতির কিংবা ইউনিয়ন কাউন্সিলের কোনো চেয়ারম্যানের— নিজ ইচ্ছেমতো তালাক দেয়ার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কই খারাপ হয়ে যায়, কেউ যদি কারো অধিকার আদায় না করে, তাহলে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার।

তালাক দানের কয়েকটি পন্থা

স্বামী-স্ত্রীর বিয়ে-সূত্রের অধিকারী। এ সূত্র ছিন্ন করার কিংবা রাখার ব্যাপারে তার অধিকারই স্বীকৃত। এ অধিকার অনুযায়ী বিয়ে সূত্রকে ছিন্ন করে দেয়ার নামই হলো শরীয়তের পরিভাষায়

তালাক। এ তালাক কয়েক প্রকারে হতে পারে, তালাক দেয়ার পরও নতুন বিয়ে-অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেই যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার অধিকার থাকে তবে তা হবে রিজ্য়ী তালাক। আর যদি সে অধিকার না থাকে, তাবে তাকে বলা হবে বায়েন তালাক।

রিজয়ী তালাক-এর সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ

فَهُوَ الَّذِىْ يَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهٗ اِعَادَةِ الْمُطَلَّقَةِ اِلَى الزَّوْجِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلٰى عَقْدٍ جَدِيْدٍ مَا دَامَتْ فِىْ الْعِدَّةِ رَضِيَتْ اَوَلَمْ تَرْضٍ - (الزواج والطلاق الزكى الدين شعيان : ص-١٠٢)

রিজয়ী তালাক হচ্ছে সে তালাক, যার পরও স্বামী তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে নতুন আক্‌দ অনুষ্ঠান না করেই ইদ্দতকালের মধ্যেই— রাজি হোক আর নাই হোক— ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার পায়।

আর 'বায়েন তালাক' দু'প্রকারে হতে পারে। একটি ছোট বায়েন আর অপরটি বড় বায়েন। 'ছোট' বায়েন তালাক হচ্ছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ لَا يَسْتَطِيْعُ الزَّوْجُ بَعْدَهٗ اِعَادَةَ الْمُطَلَّقَةِ اِلَى الزَّوْجِيَّةِ اِلَّا بَعْدَ عَقْدٍ جَدِيْدٍ - (اَيْضًا)

সে তালাক, যার পর স্বামী তালাক দেয়া স্ত্রীকে নতুন বিয়ে অনুষ্ঠান না করে ফিরিয়ে নিতে পারে না। তার মানে এ তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে হলে নতুন করে বিয়ের আক্‌দ হতে হবে।

আর বড় বায়েন তালাক হচ্ছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ لَا يَسْتَطِيْعُ الزَّوْجُ بَعْدَهٗ اِعَادَةَ الْمُطَلَّقَةِ اِلَى الزَّوْجِيَّةِ اِلَّا بَعْدَ اَنْ تَتَزَوَّجَ بِرَجُلٍ اٰخَرَ زَوْجًا صَحِيْحًا وَ يَدْخُلَ بِهَا دُخُوْلًا حَقِيْقًا لَمْ يُفَارِقْهَا اَوْ يَمُوْتَ عَنْهَا وَ تَنْقَفِىْ عِدَّتُهَا مِنْهُ - (ايضا)

সে তালাক, যার পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে না। পারে কেবল একটি অবস্থায়। আর তা হচ্ছে এই যে, স্ত্রীলোকটি অপর এক স্বামী গ্রহণ করবে সহীহ্ পন্থায় এবং সে তার সাথে প্রকৃতভাবেই সহবাস ও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে। এরপর তাদের মাঝে বিচ্ছেদ হবে কিংবা সেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে রেখে মরে যাবে ও তার পরে এ মৃত্যুর ইদ্দত পালিত হবে।

বিভিন্ন প্রকারের তালাক কেন

তালাক ব্যবস্থায় এরূপ বিভিন্ন পন্থার অবকাশ রাখার মূলে ইসলামী শরীয়তের এক বিশেষ কল্যাণময় উদ্দেশ্যে নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে, শরীয়তের বিধানদাতার একমাত্র কামনা হলো পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের অক্ষুণ্নতা ও স্থায়ীত্ব বিধান অর্থাৎ স্বামী যদি কোনো জটিল মুহূর্তে বা বিশেষ কারণে তালাক দিতে বাধ্য হয়, তাহলে সে যেন ঠিক সেই পন্থায়ই তালাক দেয়, যে পন্থায় তালাক দিলে পরে তার স্ত্রীকে পুনর্বহাল করার শরীয়তসম্মত ও সম্মানজনক উপায় বর্তমান থাকে। হয় এমন অবস্থা হবে যে, ইদ্দতের মধ্যেই তাকে অবাধে ও নির্ঝঞ্ঝাটে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে আর তা যদি নাও হয় তবুও অন্তত পক্ষে যেন এরূপ হয় যে, নতুন করে বিয়ের অনুষ্ঠান করে ফিরিয়ে নিতে পারবে; কেননা এ দু'ধরনের তালাকে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায় না। রাগের বশবর্তী হয়ে কিংবা স্ত্রীকে শাসন করার উদ্দেশ্যে কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিতেই চায় তাহলে সে যেন এ পর্যায়ের কোনো তালাক দেয়। তাহলে এর পর তাকে আফসোসও করতে হবে না, আর চরমভাবে লজ্জিত ও লাঞ্ছিতও হতে হবে না।

কিন্তু যদি রাগের বশবর্তী হয়ে অথবা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একসঙ্গে তিন তালাকই দিয়ে দেয়, তাহলে এর পর যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, যে দুঃখ ও দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয় স্ত্রীকে, স্বামীকে, সন্তান-সন্ততিকে, গোটা পরিবারকে, তা ভাষায় বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। এর পর যে দুঃখ ও অনুতাপ জাগে স্বামীর অন্তরে, তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই থাকে না তার হাতে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, তিন তালাক দেয়ার পরও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা বসবাস করতে থাকে। আর এ হচ্ছে সুস্পষ্টরূপে জ্বেনার অবস্থা, নিঃসন্দেহে তা হারাম। তাই কোন লোকেরই একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া উচিত নয়। এর পরিণাম তালাকদাতা স্বামীকেই ভোগ করতে হয়। আর সে পরিণাম অত্যন্ত দুঃখময়, নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক। এ থেকে বাঁচার জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত সব মানুষেরই।

তালাক দেয়ার পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার মাত্র দুটো উপায় উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তার কারণ এই যে, এ দুটো উপায়ই চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে গোটা পরিবারকে রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট। আর তিন তালাক দেয়ার পরও স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখতে না পারা এবং ফিরিয়ে রাখার সুযোগ না থাকাও অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। এ হলো সীমালংঘনকারীর জন্যে শরীয়তের তরফ থেকে একটি শাস্তি। যে লোক এ কাজ করবে, তার শাস্তিও তাকে ভোগ করতে হবে। তাতে করে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী এ স্ত্রীকে নিয়ে ঘর না করারই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে। অতএব সে পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেই এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে ধরে নিতে হবে। কেননা যদি কেউ বাস্তবিকই নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাহলে নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ তাকে দেয়াই সমীচীন। তাই শরীয়তের এ ব্যবস্থা এ দৃষ্টিতে সত্যিই কল্যাণময়।

‘হিলা বিয়ে’ জায়েয নয়

পূর্বোক্ত আলোচনায় একথা বলা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে কিংবা সুন্নতী নিয়মে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার কোনো উপায় থাকে না। সে তার জন্যে হারাম হয়ে যায়, হারাম হয়ে যায়— বলতে হবে— চিরতরে, তবে শরীয়াত একটি মাত্র উপায়ই উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তা হলো ঃ

حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ - (البقرة : ٢٣٠)

‘সে স্ত্রীলোকটি অপর স্বামী বিয়ে করবে।’ তারপর সে দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেয় তারপরে যদি তারা পুনর্মিলিত হতে চায় এবং আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম রাখতে পারবে বলে যদি মনে করে, তাহলে তাদের দু'জনের পুনরায় বিবাহিত হতে কোনো দোষ নেই।

আল্লামা আ-লুসী আয়াতটুকুর তাফসীর করেছেন এ ভাষায় ঃ

اَىْ تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهٗ وَيُحَا مِعُهَا فَلَا يَكْفِىْ مُجَرَّدُ الْعَقْدِ - (روح المعانى : ج-٢، ص-١٤١)

অর্থাৎ সে স্ত্রীলোকটিকে অপর এক স্বামীর সাথে বিবাহিত হতে হবে এবং সে তার সাথে সহবাস করবে। এ দৃষ্টিতে শুধু বিয়ের আকদ হওয়াই এ আয়াতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট হবে না।

তিনি আরও লিখেছেন ঃ এ আয়াত থেকে একসঙ্গে দুটো কথা জানা গেল। একটি এই যে, অপর এক পুরুষের সাথে বিয়ের ‘আকদ হতে হবে— তা বোঝা গেল زوجا শব্দ থেকে। আর দ্বিতীয় এই যে, সে পুরুষের সাথে তার যৌন সঙ্গম অনুষ্ঠিত হতে হবে। এ কথা জানা গেল تنكح শব্দ থেকে।

আর تنكح শব্দ থেকে যদি শুধু عقد نكاح ‘বিয়ের আকদ’ই অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে বলতে হবে যে, কুরআনের আয়াত থেকে যদিও শুধু বিয়ের আকদই বোঝায়, কিন্তু এর পরে হাদীস থেকেও বোঝায়

যে, শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়, স্বামী-স্ত্রীর মধুমিলনও অপরিহার্য। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাফায়া নামক এক ব্যক্তির প্রাক্তন স্ত্রী এসে রাসূলে করীমের খেদমতে আরয করল ঃ আমি বর্তমানে আবদুর রহমান ইবনে জুবাইর-এর স্ত্রী; কিন্তু তার পুরুষত্ব নেই। এজন্যেই আমি আমার প্রথম স্বামীর সাথে আবার বিবাহিতা হতে চাই। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ

لَا حَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهٗ وَ يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ – (بخارى، شافعى، احمد)

না, তা পারবে না যতক্ষণ তুমি তোমার বর্তমান স্বামীর মধু পান করবে এবং সে পান করবে তোমার মধু।

ইকরামা তবেয়ী বলেছেন ঃ এ আয়াতটি আয়েশা নাম্নী একটি মেয়েলোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তার বর্তমান স্বামীর সাথে যদি তার যৌন সঙ্গম সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় তাহলে সে প্রাক্তন স্বামীর সাথে নতুন করে বিবাহিতা হতে পারবে। এ হাদীসের বর্ণনা উল্লেখ করে আল্লামা আ-লূসী লিখেছেন ঃ

وَفِىْ ذٰلِكَ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّ النَّاكِحَ الثَّانِىْ لَا بُدَّ اَنْ يَّكُوْنَ زَوْجًا –

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বিবাহকারী ব্যক্তিকে অবশ্য যথাযথভাবে স্বামী হতে হবে।

অর্থাৎ শুধু বিয়ের আকদ হলেই চলবে না, যৌন সঙ্গমও হতে হবে। আর শুধু আকদ ও যৌন সঙ্গম হলেই চলবে না, দ্বিতীয় বিবাহকারীকে পুরাপুরিভাবে স্বামী হতে হবে। তার মানে, তার সাথে এ স্ত্রীলোকটির স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে বসবাস করতে হবে। অস্থায়ী বা এক রাত্রির স্বামী-স্ত্রী নয়, সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মে যেরূপ স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করা হয়, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তেমনি হতে হবে। তার পরে যদি সে তালাক দেয়, তবেই তার পক্ষে প্রথম স্বামীর নিকট যাওয়ার ও বিবাহিতা হওয়ার সুযোগ হবে।

কিন্তু বর্তমান কালে যেমন সাধারণ রীতি হিসেবে দেখা যায়, কেউ তার স্ত্রীকে রাগের বশবর্তী হয়ে একসঙ্গেই তিন তালাক দিয়ে দিলো, পরে অনুতাপ জাগল, ঘর-সংসারের বিধ্বস্ত রূপ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, তখন কোনো বন্ধু-বান্ধব, খালাত ভাই, মামাত ভাইকে ডেকে আকদ করিয়ে এক রাত একত্রে থাকতে দিলো। পরের দিন সকাল বেলায় তার কাছে থেকে তালাক নিয়ে পরে সে নিজেই আবার তাকে বিয়ে করল। এ রীতি কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত নয়, প্রমাণিত নয় কোনো হাদীস থেকে। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ মনগড়া, নিজেদের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত এক জঘন্য পন্থা। পরিভাষায় এরূপ বিয়েকে বলা হয় 'হিলার বিয়ে' বা نكاح تحليل। এ বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু অপর একজনের জন্যে স্ত্রী লোকটিকে হালাল করে দেয়ার বাহানা করা। তার মানে এই যে, দ্বিতীয়বারে যে লোক বিয়ে করে তার মনে এ ভাব জাগ্রত থাকে যে, সে এ স্ত্রী-লোকটিকে দাম্পত্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বিয়ে করছে না। সে শুধু এক রাতের স্বামী। রাত শেষ হওয়ার পরই সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, যেন অপর একজন তাকে স্থায়ীভাবে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করার জন্যে বিয়ে করতে পারে। ঠিক স্ত্রীলোকটির মনেও এ অবস্থা— এ কথাই জাগ্রত থাকে। আর প্রথম স্বামী— যার জন্যে এত কিছু করা হচ্ছে— সেও জানে যে ও মেয়ে-লোকটি আসলে তারই স্ত্রী, মাত্র এক রাতের জন্যে তাকে অপর এক পুরুষের স্ত্রী হিসেবে তার অঙ্কশায়িনী হবার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।.......বস্তুত এ চিন্তা ও এরূপ কথা যে কত লজ্জাকর, কত জঘন্য, বীভৎস, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরূপ কাজ কুরআন হাদীস সমর্থিত হতে পারে না, হতে পারে না ইসলামের উপস্থাপিত বিধান। অথচ তাই আজ নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে সমাজের যত্রতত্র, শরীয়তসম্মত (?) বিধান রূপে।

হাদীসের পরিভাষায় এরূপ বিয়ে যে করে, তাকে বলা হয় محلل — যে অপরের জন্যে হালাল করে দেয়ার জন্যে বিয়ে করে। হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ -

যে লোক এভাবে হালালকারী হয় এবং যার জন্যে সে হালালকারী হয়— এ উভয়ের ওপরই নবী করীম (স) লা'নত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَلِّلِ قَالَ لَا- اِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لَا دَلْسَةَ وَ لَا اِسْتِهْزَا بِكِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ تَذُوْقُ الْعُسَيْلَةَ -

নবী করীম (স)-কে হালালকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ না, এরূপ বিয়ে করা যাবে না। বিয়ে হবে শুধু তা-ই, যা অনুষ্ঠিত হবে পারস্পরিক আগ্রহে, যাতে কোনোরূপ ধোঁকাবাজি থাকবে না, যা করলে আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে করা হবে না কোনোরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপপূর্ণ আচরণ। আর তার পরে পরস্পরের মধু মিলন হতে হবে।

ইবনে শায়বা ও আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

لَا أُوْتِيَ بِمُحَلِّلٍ وَ لَا مُحَلَّلَ لَهٗ اِلَّا رَجَمْتُهُمَا -

আমার কাছে এরূপ হালালকারী ও যার জন্যে হালাল করা হয় তাকে পেশ করা হলেই আমি তাদের দুজনকেই 'রজম' বা সঙ্গেসার করব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে দুজনকে শাস্তি দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ هلاهمازان 'কেননা এরা দুজনই জ্বেনাকার' অর্থাৎ যে হালাল করে সেও জ্বেনা করে; আর যে এরূপ তাকে বিয়ে করে, সেও তার সাথে জ্বেনাই করে। এজন্যে যে, এ উপায়ের জন্যে মেয়েলোকটি হালাল হয়ে যায়নি।

আর এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

مَا تَقُوْلُ فِيْ اِمْرَأَةٍ تَزَوَّجْتُهَا لِأُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا لَمْ يَأْمُرْنِيْ وَلَمْ يَعْلَمْ ؟

আমি একটি মেয়েলোককে বিয়ে করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তাকে তার স্বামীর জন্যে হালাল করে দেব, সে আমাকে কিছুই আদেশ করেনি এবং কিছুই জানা যায়নি। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

তখন জবাবে হযরত ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ

لَا اِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ اِنْ اَعْجَبَتْكَ اَمْسَكْتَهَا وَ اِنْ كَرِهْتَهَا فَارَقْتَهَا وَاِنْ كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا سِنَاحًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ ﷺ -

না, এরূপ বিয়ে জায়েয নয়। বিয়ে শুধু তাই হবে, যা হবে ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে। তোমার পছন্দ হলে তাকে রেখে দেবে আর পছন্দ না হলে তাকে আলাদা করে দেবে— যদিও এরূপ বিয়েকে আমরা রাসূলে করীম (স)-এর যমানায় সুস্পষ্ট জ্বেনার মধ্যেই গণ্য করতাম।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ - لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهٗ -

(ابن ماجه، حاكم، بيهقى)

তোমাদেরকে ধার করা খাসির বিষয়ে বলব ? সাহাবাগণ বললেন : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তখন তিনি বললেন : সে হলো হালালকারী। আর হলালকারী ও যার জন্যে হালাল করা হয়— এ দুজনের ওপরই আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। অতঃপর সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে। তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? জবাবে তিনি বললেন :

هُوَ رَجُلٌ عَصَى اللّٰهَ فَأَنْدَمَهُ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا -

সেই ব্যক্তি তো আল্লাহ্র নাফরমানী করেছে, এজন্যে তিনি তাকে লজ্জিত করেছেন। সে শয়তানের আনুগত্য করেছে, ফলে তার জন্যে মুক্তির কোনো পথ রাখা হয়নি।

ইমাম মালিক, আহমদ, সওরী এবং আরো অনেক ফিক্হবিদের মতে 'হালাল' করার শর্তে কোনো বিয়ে শুদ্ধ হবে না। পূর্বোদ্ধৃত দলীলসমূহের ভিত্তিতেই তাঁরা এ মত কায়েম করেছেন। তবে হানাফী মাযহাবের লোকদের মতে এরূপ বিয়ে মাকরূহ। কিন্তু প্রথমোক্তদের মত যে এ ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী এবং অকাট্য দলীলভিত্তিক তাতে সন্দেহ নেই। যে 'তাহলীল' বিয়ে এবং 'হালালকারী' সম্পর্কে রাসূলে করীম (স) লা'নত ঘোষণা করেছেন, তাকে শুধু মাকরূহ বলে ছেড়ে দেয়া কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না। বস্তুত এ 'তাহলীল' বিয়ের সুযোগ নিয়ে সমাজে যে অশ্লীলতার বন্যা প্রবাহিত হয়েছে, তাতে গোটা সমাজটাই পংকিল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এতে করে তিন তালাকের পর স্ত্রীর হারাম হয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিন তালাকের পর এত সহজে স্ত্রী লাভের সুযোগ থাকলে কেউই তিন তালাক দিতে একবিন্দু পরোয়া করবে না। তাই তো দেখা যায়, সমাজের লোকেরা তালাক দিতে গেলেই একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে ফেলে। এর পরে যে স্ত্রীকে চিরদিনের তরে হারাতে হবে এমন কোনো আশংকা বোধও তাদের মনে জাগে না। অথচ শরীয়তের এরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল এই যে, লোকেরা যেন তিন তালাক না দেয়। যদি দেয়ই, তাহলে যেন বুঝে-শুনেই দেয় এবং দিয়ে যেন তাকে আবার ফিরিয়ে পাওয়ার কোনো আশা না করে। কুরআন এবং হাদীস থেকে একথা স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে। অতএব এর ব্যতিক্রম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খুলা তালাক

আর এক প্রকারের তালাক আছে, যাকে বলা হয় খুলা তালাক। 'খুলা তালাক' মানে, স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকতে রাজি নয়, সেজন্যে সে তালাক নিতে চায়; কিন্তু স্বামী তালাক দিতে ইচ্ছুক নয়। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে স্বামীকে তালাক দিতে রাজি করে নেয়। ইসলামে একে বলা হয় 'খুলা তালাক' এবং শরীয়তে এরূপ তালাকের অবকাশ রয়েছে। কেননা স্ত্রী যদি কোনোমতেই স্বামীর সাথে থাকতে প্রস্তুত না হয় আর স্বামীও তাকে তালাক দিতে প্রস্তুত নয়— এরূপ অবস্থা একজন নারীর পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাই সুযোগ রাখা হয়েছে, স্ত্রী যদি স্বামীকে টাকা-পয়সা দিয়ে তালাক দিতে বাধ্য করতে পারে এবং সে তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্ত্রীর মুক্তিলাভের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে সামনে রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَّخَافَا أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ - (البقرة : ٢٢٩)

স্ত্রীকে বিদায় করে দেয়ার সময় তোমাদের দেয়া জিনিসপত্র থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্যে জায়েয নয়। অবশ্য এ অবস্থা স্বতন্ত্র যে, দম্পতি যদি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করতে না

পারার আশংকা বোধ করে। এরূপ অবস্থায় যদি তারা দুজন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান পালন করতে পারবে না বলে ভয় করে, তাহলে তাদের দুজনের মাঝে এ সমঝোতা হওয়ায় কোনো দোষ নেই যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু দিয়ে তালাক গ্রহণ করবে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এ আয়াত থেকে খুলা তালাকের সুযোগ প্রমাণিত হয় এবং এও প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যদি টাকা-পয়সার বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে তালাক গ্রহণ করে এবং স্বামী সে অর্থ গ্রহণ করে তবে তাতে কোনো দোষ হবে না। ইকরামা তাবেয়ীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ

هَلْ كَانَ لِلْخَلْعِ —খুলা' তালাকের কোনো ভিত্তি আছে কি ?

তিনি বললেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ خَلْعٍ كَانَ فِى الْاِسْلَامِ فِىْ اُخْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ -

ইসলামী সমাজে প্রথম 'খুলা' তালাক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই'র বোন সাবিত ইবনে কায়েসের স্ত্রীর ব্যাপারে।

হযরত উমর (রা) একজনকে বলেছিলেন ঃ

اِخْلَعْهَا وَلَوْ بِقُرْطِهَا

তোমার স্ত্রীর একটি কানের বালার বিনিময়ে হলেও তাকে খুলা করে দাও (অর্থাৎ তালাক দিয়ে দাও)।

মনে রাখতে হবে, খুলা তালাকের অবকাশ ইসলামে আছে একথা ঠিক। আর এর সুযোগ রাখা হয়েছে এমন সব স্ত্রীর মুক্তিলাভের উপায় ও পন্থা হিসেবে, যখন স্বামীর সাথে একত্রে থাকার কোনো উপায়ই থাকে না তখনকার মর্মান্তিক অবস্থায় প্রয়োগ করার জন্যে। কিন্তু ইসলামে একে কিছুমাত্র উৎসাহিত করা হয়নি। শুধু এতটুকুই নয়, সত্যি কথা এই যে, ইসলামে তালাক দানের মতোই স্ত্রীর পক্ষে খুলা তালাক গ্রহণকেও অত্যন্ত খারাপ মনে করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স)-এর বাণী হলো ঃ

اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَاسٍ فَحَرَّامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ -

(مسند احمد، ابوداؤد،ترمذى، حاكم عن ثوبان)

যে মেয়েলোক তার স্বামীর কাছে তালাক চাইবে কোন দুঃসহ কারণ ছাড়াই, তার জন্যে জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে।

নবী করীম (স) আরও বলেছেন ঃ

اَلْمُخْتَلِعَاتُ هِىَ الْمُنَافِقَاتُ -

'খুলা' গ্রহণকারী স্ত্রীলোকেরাই হচ্ছে মুনাফিক স্ত্রীলোক।

অতএব এ কাজ কোনো নারীরই করা উচিত নয়। নারী ও পুরুষ— স্ত্রী ও স্বামী সকলেরই কর্তব্য ইসলামী সমাজের পরিবার-দুর্গকে সুরক্ষিত করে রাখা এবং এ দুর্গকে কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন না করা।

এক সঙ্গে তিন তালাক

এখানে আরও একটি জটিল প্রশ্ন থেকে যায়। তালাক দেয়ার কোনো কোনো রীতি ও পদ্ধতিতে স্ত্রীকে যথেষ্ট কষ্ট ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাতে না স্ত্রীর প্রতি সুবিচার হয়, না এ ক্ষতি ও কষ্ট

থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করার কোনো উপায় আছে। আর তা হচ্ছে এক সঙ্গে এক বৈঠকে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার রীতি এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তালাক দেয়া। এর ফলে স্ত্রীকে তো বটেই— স্বামীকেও— আর সত্যি কথা এই যে, গোটা সংসারটিকেই চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ে যেতে হয়। স্বামীর নিকট থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোনো উপায় স্ত্রীর হাতে না থাকার কারণে স্ত্রীকে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হয়।

এর জবাবে বলা যায়, তালাক দানের যে ক্রমিক নিয়ম রয়েছে, তা-ই হচ্ছে তালাক দেয়ার সঠিক ও শরীয়তসম্মত পদ্ধতি। পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, তালাক প্রয়োগের একটা সুস্পষ্ট স্তর রয়েছে। প্রথমে এক তালাক দেবে। তারপর হয় তাকে ফিরিয়ে নেবে, না হয় দ্বিতীয় তুহর-এ আর এক তালাক দেবে। দ্বিতীয়বারের পর হয় তাকে ফিরিয়ে নেবে, না হয় তৃতীয় তালাক প্রয়োগ করবে। এ তৃতীয়বার তালাক প্রয়োগের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার উপস্থিত কোনো সুযোগ নেই। কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত তালাক দানের এই হচ্ছে পদ্ধতি। একসঙ্গে একই বৈঠকে— একই সময়, একই শব্দে তিন তালাক দেয়ার রীতি কুরআন প্রদত্ত পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সূরা আল-বাকারার নিম্নোদ্ধৃত আয়াতে এ পদ্ধতিরই উল্লেখ হয়েছে ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ -

তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগপূর্ণ তালাক হচ্ছে মাত্র দুবার। তারপর হয় তাকে সঠিকভাবে রেখে দেবে, না হয় সম্পূর্ণরূপে তাকে ছেড়ে দেবে।

তাফসীরের গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীর লেখা হয়েছে এরূপ ঃ

اَىْ عَدَدُ الطَّلَاقِ الَّذِىْ يَسْتَحِقُّ الزَّوْجُ فِيْهِ الرَّجْعَةَ مَرَّتَانِ - (ابو السعود)

যতবার তালাক দিলে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে, তা হলো একবার ও দুইবার মাত্র।

সূরা الطلاق। এও এ কথাই বলা হয়েছে। এতে করে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তালাক দেয়ার কাজটি হঠাৎ করে ফেলার মতো কোনো কাজ নয়। বরং তা খুবই ধীরে সুস্থে, চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা করে— এক-এক পা কর অগ্রসর হয়ে করার কাজ। 'রিজয়ী' তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার এ সুযোগ রাখাটাও অত্যন্ত মানবিক ব্যবস্থা। একবার কি দুবার তালাক দেয়ার পর স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মনেই নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে বিবেচনা করার ফলে নতুন চিন্তা জেগে উঠতে পারে এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদের পরিবর্তে স্থায়ী মিলন কামনায় উভয়ের মন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এত সব সুযোগ থাকার পরও যদি কেউ তা গ্রহণ করতে রাজি না হয়; বরং চূড়ান্ত বিচ্ছেদ সাধনেরই স্থির সংকল্প হয়, তাহলে তাকে রক্ষা করার কেউ থাকতে পারে না। কেউ যদি একসঙ্গেই তিনটি তালাক দানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহলে কুরআনের ঘোষণানুযায়ী সে নিজের ওপর নিজে জুলুম করে। একসঙ্গে তিন তালাক দেয়া যতোই অবাঞ্ছনীয় হোক না কেন, তা যে কার্যকর হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে সে কুরআনের পদ্ধতি অনুসরণ করেনি বলে কঠিন গুনাহের অপরাধে অপরাধী হবে, তাও নিশ্চিত।

এক সঙ্গে তিন তালাক সম্পর্কে বিভিন্ন মত

একসঙ্গে বা এক শব্দে তিনটি তালাক দিয়ে দিলে তাতে তিনটি তালাকই হয়ে যাবে, না তা এক তালাক গণ্য হবে, এ সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে খানিকটা মতভেদ রয়েছে। এখানে তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা যাচ্ছে।

তাউস, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, নখয়ী ও ইবনে মুকাতিল এবং জাহিরী মাযহাবের মনীষীগণের মতে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তাতে এক তালাক গণ্য হবে। তাঁদের দলীল হিসেবে তাউস বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে; আবা-সাহবা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন ঃ

اَتَعْلَمُ اِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَ اَبِيْ بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ اِمَارَةِ عُمَرَ -

(مسلم، طحاوی، مسند احمد، نسائی)

নবী করীম (স)ও হযরত আবূ বকরের খিলাফত আমল পর্যন্ত একসঙ্গে দেয়া তিন তালাক এক তালাক গণ্য হতো এবং উমরের সময়ে থেকে তা তিন তালাক গণ্য হতে শুরু হয়েছে, তা কি আপনি জানেন ?

জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ হ্যাঁ।

অথচ ইমাম আওজায়ী, নখয়ী, সুফিয়ান সওরী, ইমাম মালিক ও তাঁর সঙ্গী ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালিক ও তাঁর ছাত্রগণ, ইমাম শাফিয়ী ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ, ইমাম আহমদ ও তাঁর সঙ্গী-সাথী, ইসহাক ইবনে রাওয়ায়, আবূ সওর ও আবূ দাউদ প্রমুখ বিপুল সংখ্যক তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী ফিকাহবিদগণ একবাক্যে এ মত প্রকাশ করেছেন ঃ

اِنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ ثَلاَثًا وَ قَعْنَ وَلٰكِنَّهُ يَاثِمُ - (عمدة القارى شرح البخارى : ج-٢٠، ص-٢٣٣)

যে লোক একসঙ্গে তিন তালাক দেবে, তার দেয়া তিনটি তালাক কার্যকর হবে, তবে সে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে। সে সঙ্গে তাঁরা আরো বলেছেন ঃ

من خالف فيه فهو شاذ مخالف لاهل السنة وانما تعلق به اهل البدع ومن لا يلتفت اليه لشذ وذة عن الجماعة التى لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة -

(عمدة القارى : ج-٢٠، ص-٢٣٣)

উপরোক্ত সর্বসম্মত মতের বিপরীত যাঁরা মত দিয়েছেন, তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম এবং তাঁরা সুন্নতপন্থীদের বিরোধী মতাবলম্বী। এ বিপরীত মত কেবল বিদআতপন্থীরাই আঁকড়ে ধরেছে। আর তাঁরা সংখ্যায় কম বলে নগণ্য ও অনুল্লেখযোগ্য। কেননা তাঁরা এমন জামা'আতের বিপরীত মত পোষণ করেছে, যাঁদের সম্পর্কে এমন ধারণা কিছুতেই করা যেতে পারে না যে, তাঁরা কুরআন-হাদীসের কিছুমাত্র রদবদল করেছেন।

এই বিপরীত মতের সমর্থনে— একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তাতে এক তালাক হওয়া মতের অনুকূলে— হযরত ইবনে আব্বাস সমর্থিত যে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তার জবাবে ইমাম তাহাভী বলেছেন ঃ

انه منسوخ بيانه (ايضا)

একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তাতে এক তালাক হওয়ার মতটি বাতিল হয়ে গেছে।

এ মতটির বাতিল হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত ঘটনার বিবরণ এই যে, হযরত উমরের খলীফা থাকাকালে একদিন উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْكَانَ لَكُمْ فِيْ الطَّلاَقِ اِنَاةٌ وَاِنَّهُ مَنْ تَعجَّلَ اَنَاةَ اللّٰهِ فِيْ الطَّلاَقِ اَلْزَمْنَاهُ اِيَّاهُ - (ايضا)

সমবেত জনগণ, তালাকের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা বড় সুযোগ দেয়া হয়েছিল। এখন যে লোক তালাকের ব্যাপারে আল্লাহ্র দেয়া এ সুযোগ গ্রহণে তাড়াহুড়া করল; আমরা তাকে তার ফল গ্রহণে বাধ্য করে দিলাম (একসঙ্গে তিন তালাক হওয়ার ফয়সালা দিলাম)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এ বিবরণ দেয়ার পর লিখেছেন ঃ

فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ وَلَمْ يَدْفَعْهُ دَافِعٌ فَكَانَ ذٰلِكَ اَكْبَرُ الْحُجَّ فِىْ نُسْخِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذٰلِكَ - (ايضا)

এ কথা শুনে তখনকার উপস্থিত লোকদের একজনও তাঁর কোনো প্রতিবাদ করলেন না, কেউ তাঁর এ কথায় বাঁধা দিলেন না। ফলে তৎপূর্ব ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যাওয়া ও তিন তালাক কার্যকর হওয়ার রায় বলবত হওয়া সম্পর্কে এই হলো সবচেয়ে বড় দলীল।

আইনী অতঃপর বলেন ঃ

لَمَّا خَطَبَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ بِذٰلِكَ فَلَمْ يَقَعْ اِنْكَارٌ صَارَ اِجْمَاعًا - (ايضا)

হযরত উমর যখন সাহাবীদের সম্বোধন করে এ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিলেন, তখন তার কোনো প্রতিবাদ হয়নি বলে এ মতটির ব্যাপারে তাঁদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য ইজমা— স্থাপিত হলো।

আর ইজ্মা সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

اِنَّ الْاِجْمَاعَ مُوْجِبٌ عِلْمِ الْيَقِيْنِ كَالنَّصِّ -

ইজ্মা নিঃসন্দেহে দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ জ্ঞান দান করে, ঐকান্তিক বিশ্বাস সহকারে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যেমন কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট অকাট্য ঘোষণাকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) তাঁর স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে রাসূলে করীমের নিকট এ খবর বললেন। তিনি এ খবর শুনে বললেন ঃ 'তোমার স্ত্রীকে তুমি ফিরিয়ে গ্রহণ করো।' তিনি বললেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا اَكَانَ لِىْ اَنْ اُرَاجِعَهَا -

হে রাসূল, আমি যদি আমার স্ত্রীকে (এক তালাক না দিয়ে) একসঙ্গে তিন তালাক দিতাম, তাহলেও কি আমি তাকে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারতাম ?

তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ

لَا كَانَتْ تَبِيْنُ مِنْكَ وَكَانَتْ مَعْصِيَةٌ - (دارقطنى، ابن ابى شيبه)

না, ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কেননা তিন তালাক দিলে তোমার স্ত্রী তোমার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। আর এভাবে তিন তালাক দেয়া তোমার অবশ্যই গুনাহ।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবনে উমর তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দেন নি, দিয়েছিলেন এক তালাক। তাই তাঁর দেয়া তিন তালাককে এক তালাক বানাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

উপসংহার

পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠন

পরিবার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি। নিরপেক্ষ ও আনুগত্যপ্রবণ মনোভাব নিয়ে তা বিচার করলে যে কোনো লোক এর তাৎপর্য, বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য-মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারবেন এবং যদি কেউ তা বাস্তব জীবনে অনুশীলন করে চলেন তাহলে পারিবারিক জীবন যে উন্নত মানের অখণ্ড মাধুর্য, পবিত্রতা ও স্থিতি সহকারে যাপন করা সম্ভব হবে, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এ গ্রন্থ রচনার মূলে গ্রন্থকারের একমাত্র আন্তরিক উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের বর্তমান পারিবারিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হোক এবং ইসলামের মহান আদর্শে পুনর্গঠিত হয়ে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমতের অধিকারী হোক।

বস্তুত বর্তমান সময় মুসলমানদের পারিবারিক জীবন ইসলামী আদর্শের অনুসারী নয়। কোথাও তা পুরাপুরিভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং গোটা পরিবারই ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শ ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলেছে। আর কোথাও সম্পূর্ণ না হলেও ইসলামের অনেক নীতিই অনুসৃত ও প্রতিপালিত হচ্ছে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, একদিকে ইসলামের পারিবারিক আদর্শ সম্পর্কে চরম অজ্ঞতাজনিত রক্ষণশীলতা এবং অপরদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতে উৎক্ষিপ্ত অত্যাধুনিকতা আজ মুসলিম সমাজের পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে এক মহা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আজ মুসলিম পরিবারে ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শের জীবন-যাত্রার প্রবর্তন হচ্ছে। পর্দা প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে, চলেছে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা ও প্রেম-ভালোবাসার অভিনয়। নাচ ও গানের অনুষ্ঠান আজ জাতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে চলছে সহশিক্ষা। যুবতী নারী আজ ঘর সংসারের ক্ষুদ্র পরিবেশ ডিঙ্গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নানা কাজের বিশাল উন্মুক্ত ময়দানে— নাট্যমঞ্চে, ক্লাবে-পার্টিতে, সভা-সমিতির টেবিলে। বেতার যন্ত্রে ও ছায়া-যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে অবাধ সংমিশ্রণের প্লাবন ছুটছে। নারী সমাজের কণ্ঠে আজ ধ্বনিত হচ্ছে ঃ 'রইব না আর বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগতটাকে'। ফলে পারিবারিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে, শুদ্ধতা ও পবিত্রতা বিঘ্নিত হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে শুরু হয়েছে মহাভাঙ্গনের তরঙ্গাভিঘাত। মহাপ্রলয়ের প্রচণ্ডতায় পারিবারিক জীবনের সব মাধুর্য-কোমলতা চূর্ণ-বিচূর্ণ। শিশু সন্তান মায়ের স্নেহ-বাৎসল্যপূর্ণ ক্রোড় থেকে বঞ্চিত হয়ে লালিত-পালিত হচ্ছে ধাত্রী আর চাকর-চাকরানীর অনুশাসনে। বিগত শতকের শুরুতে পাশ্চাত্য সমাজে যে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বিপর্যয়ের প্লাবন এসেছিল এবং চুরমার করে দিয়েছিল সেখানকার পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঠিক সেই প্লাবনই এসে দেখা দিয়েছে আমাদের এই সমাজে। এ কারণে ঠিক যে পরিণতি সেখানে ঘটেছিল, আমাদের সমাজেও ঠিক তাই ঘটতে শুরু হয়ে গেছে প্রচণ্ড আকারে। আমাদের দেশেও বর্তমানে গর্ভনিরোধ ও বন্ধ্যাকরণের পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণের হিড়িক পড়ে গেছে। এতে অজান্তে সমাজদেহে পাপ জিবানু সংক্রমিত হয়ে এ আঘাতকে প্রচণ্ডতম ও সর্বগ্রাসী করে তুলেছে। তাই জ্বেনা ব্যভিচার আজ এ সমাজের দিন-রাতের অতি সাধারণ ঘটনা। অবৈধ সন্তানের চিৎকার আজ ঘাটে-পথে, ঝোঁপে-ঝাড়ে, ড্রেনে-ডাস্টবিনে, বায়ুলোককে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। স্বামী-সংসার-সন্তান ছেড়ে স্ত্রীরা আজ ভিন-পুরুষের কাঁধে ভর দিয়ে মহাযাত্রায় মেতে উঠেছে। এক স্ত্রী রেখে বহু স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন, স্ত্রীকে এক কথায় তালাক দিয়ে আবার

তাকে লাভ করার জন্যে অবৈধ পন্থাবলম্বন কিংবা নতুন স্ত্রী গ্রহণ— এসব আজ অতি সাধারণ ঘটনা। এসব ঘটনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ মোটেই ইসলামী নয়। আর ইসলামী নয় বলেই আজ আমাদের পরিবার মহাভাঙ্গনের মুখে পারিবারিক জীবন শান্তি ও সুখ থেকে বঞ্চিত। এ কারণেই এখানকার মানুষ আজ কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

এরূপ অবস্থায় অনতিবিলম্বে আমাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবন পুনর্গঠনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা না চালালে পারিবারিক জীবনকে চূড়ান্ত বিপর্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করার কোনো উপায়ই থাকবে না। আমরা চাচ্ছি, সমাজ ও পরিবারের কল্যাণকামী সব মানুষই এদেশের সমাজের পরিবার ও পারিবারিক জীবনের আদর্শভিত্তিক পুনর্গঠনের অতীব দায়িত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

আমাদের পারিবারিক জীবনের বর্তমান বিপর্যয়ের কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তার পুনর্গঠনের জন্যে অপরিহার্য পদক্ষেপগুলোর এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাচ্ছে। এ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের জন্যে সমাজের সুধী ও সরকারী দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১. এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম কাজ হলো, সাধারণভাবে সব নারী পুরুষের এবং বিশেষভাবে যুবক-যুবতীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজ ও পরিবার মুসলমানদের সমাজ ও পরিবারের জন্যে কোনো দিক দিয়েই আদর্শ ও অনুসরণীয় হতে পারে না। আমাদের আদর্শ হচ্ছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর গড়া ইসলামী সমাজ ও পরিবার ব্যবস্থা। ইউরোপীয় সমাজ ও পরিবারে রীতিনীতি শুধু পারিবারিক বিপর্যয়েরই সৃষ্টি করে না, মানুষকে পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট চরিত্রের বানিয়ে দেয়। অতএব তাদের দেখাদেখি— তাদের অন্ধ অনুকরণ করে আমরা কিছুতেই পশুত্বের স্তরে নেমে যেতে পারিনে।

২. নারী ও পুরুষের দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশার একটা নীতি ও সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে ইসলামে। পাশ্চাত্য সমাজে এক্ষেত্রে নেই কোনো বিধি-নিষেধ, কোনো সীমা-সরহদ। অতএব পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুসরণ না করে ইসলামের আদর্শকেই অনুসরণ করতে হবে আমাদের। মুহাররম নারী পুরুষ ছাড়া দেখা-সাক্ষাত ও অবাধ মেলামেশার কোনো সুযোগই যেন আমাদের সমাজে না থাকে, তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের মেয়ে ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন, অতএব তাদের কর্মক্ষেত্রও কখনো এক হতে পারে না, এক ও অভিন্ন হতে পারে না তাদের উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাঙ্গন। একই ক্লাস-কক্ষে পাশাপাশি ও কাছাকাছি বসে পড়াশুনা, একই অফিস-কক্ষে সামনা-সামনি বা মুখোমুখী ও পাশাপাশি বসে কাজ করা যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ করতে হবে। নিম্ন শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। আলাদা করতে হবে নারী ও পুরুষের শিক্ষাকেন্দ্র ও কর্মক্ষেত্র। নারী সমাজের প্রধান কর্মক্ষেত্র হতে হবে তার ঘর ও পরিবার। কেবলমাত্র প্রয়োজন কালেই মেয়েরা ঘর থেকে বের হবে। অকারণ ঘোরাফেরা করা, পথে-ঘাটে, পার্কে-লেকে, বাগানে-রেস্তোরাঁয় 'হাওয়া খেয়ে' বেড়ানো, দোকানে-বাজারে শপিং করা এবং হোটেল-ক্লাবে, পার্টিতে দাওয়াতে মেয়েদের অবাধ যাতায়াত ও বিচরণ বন্ধ করতে হবে এবং নিতান্ত অপরিহার্য কাজগুলোকে বিধিবদ্ধ ও নিয়মানুগ করতে হবে।

৪. সমাজে বেশি বয়স পর্যন্ত ছেলে ও মেয়ের অবিবাহিত থাকার বর্তমান রেওয়াজ পরিবর্তিত না হলে অনেক প্রকারের অন্যায়-অনাচারই বন্ধ করা যাবে না। তাই বিয়েকে শুধু সহজসাধ্যই নয়, উপযুক্ত বয়স হলে অবিলম্বে বিয়ে অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে, সেজন্যে সামাজিক তাগিদ এবং চাপও সৃষ্টি করতে হবে। এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, বিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কি নৈতিক

সামাজিক— কোনো প্রকারেরই দায়িত্ববোধ জাগতে পারে না ছেলে বা মেয়ের মধ্যে। তাই এ ব্যবস্থা কার্যকর হওয়া একান্তই অপরিহার্য। সেই সঙ্গে এক সাথে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের পথ নিয়ন্ত্রণ সহকারে ও শরীয়তের কড়া বাধ্যবাধকতার মধ্যে উন্মুক্ত রাখতে হবে। তাকে বন্ধ করা কিংবা অসম্ভব করে তোলা অথবা তার জন্যে ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করা, অন্য কথা, ছলচাতুরীর সাহায্যেই একাধিক বিয়ের সুযোগ থাকা কিছুতেই উচিত হবে না।

৫. বিধবা নারীর পুনর্বিবাহের প্রচলন সাধারণ পর্যায়ে না হলেও সমাজের উচ্চ পর্যায়ে পরিত্যক্ত হতে যাচ্ছে। আর এর দরুন নৈতিক ও পারিবারিক দিক দিয়ে দেখা দিচ্ছে অনেক বিপর্যয় অথচ বিধবা বিয়ের বিধান ছিল বিশ্ব-নারী জাতির প্রতি ইসলামের এক বিশেষ অবদান। আজ তাকেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। এক বা দুই সন্তানের যুবতী মা বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হলে পরে পুনরায় বিয়ে করতে রাজি না হওয়ার প্রবণতা বর্তমানে উচ্চ সমাজে প্রবল; বরং এ কাজকে ঘৃণ্য মনে করা হচ্ছে। এ ভাবধারার আমূল পরিবর্তন জরুরী।

৬. ইসলামী মূল্যবোধ ও মূল্যমানের ভিত্তিতে অপরিহার্য প্রয়োজনে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার অনুমতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অবস্থা যদি এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, স্ত্রী স্বামীর সাথে আর থাকতেই পারছে না, তখন হয় স্বামীকে আপনা থেকেই তাকে তালাক দিতে রাজি হতে হবে, না হয় স্ত্রী তার নিকট থেকে 'খুলা' তালাক গ্রহণ করবে অথবা আদালত বিয়ে ভেঙ্গে দেবে। একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তার স্ত্রী তো 'হারাম' হয়ে যাবেই, সেই সঙ্গে ইসলামী পদ্ধতির বিপরীত পন্থায় তালাক দেয়ার কারণে তাকে কঠিন শাস্তিও দিতে হবে।

৭. নাচ ও গানের বর্তমান ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। যুবতী সুন্দরী মেয়েরা কামোন্মত্ত ভিন পুরুষদের সামনে নিজেদের রূপ ও যৌবন সমৃদ্ধ যৌন আকর্ষণমূলকভাবে অঙ্গভঙ্গি দেখিয়ে নাচবে ও গাইবে— এ ব্যাপারটি কোনো পিতামাতারই বরদাশত হওয়া উচিত নয়, উচিত নয় দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের তা বরদাশত করা। এ ধরনের সব কাজ আইনত বন্ধ করে দেয়া উচিত, অন্যথায় পরিবার হবে অশ্লীলতার কালিমায় পঙ্কিল, পারিবারিক জীবন হবে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত।

৮. সর্বোপরি জেনা-ব্যভিচারের আড্ডাগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। এজন্যে শরীয়তের শাস্তি পুরাপুরি কার্যকর করতে হবে। কোড়া ও প্রস্তর নিক্ষেপণে মৃত্যুদণ্ড দানের যে শরীয়তী বিধান রয়েছে তা যদি যথার্থভাবে কার্যকর হয় তাহলে সমাজ থেকে ব্যভিচার অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে। সমাজ হবে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, নিষ্কলুষ।

এসব হলো পরিবার ও পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠনের জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা। আর এসবের আগে প্রয়োজন হচ্ছে দ্বীন-ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের জাতীয় শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ ও সমগ্র দেশে চালু করা। জনগণের মাঝে নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করতে হবে, নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে সর্বাগ্রে। তা যদি করা যায়, তাহলেই আমাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবন আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে।

সন্দেহ নেই, একাজ অনেক বড়, অনেক ব্যাপক এবং দীর্ঘদিনের চেষ্টা-যত্ন ও পরিকল্পনা-ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন এজন্যে। এ কাজ এক ব্যক্তির নয়, গোটা সামজের দেশের সরকারের। হয় বর্তমান সমাজ ও সরকার এ কাজ করবে শরীয়তী দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে। অন্যথায় সমাজ ও সরকারকে এমনভাবে পুনর্গঠিত হতে হবে যাতে করে আমাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবন ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হতে পারবে, অন্তত সে পথে কোনোরূপ বাধা ও প্রতিবন্ধকতাই থাকবে না।

আমাদের সমাজের সুধীমণ্ডলী এ কাজে উদ্বুদ্ধ হবেন কি?

গ্রন্থপঞ্জী

(١) القران الحكم :

١. لغات القران ٢. المفردات الراغب الاصفهانى ٣. لغات القران عبد الرشيد تعمانى

(٢) تفسير :

١. أحكام القران للجصاص ٢. أحكام القران لابن العربى ٣. فتح القدير للشوكانَ ٤، تفسيرابن كثير ٥. تفسير قرطبى ٦. انوارالتنزيل واسرار التاويد ٧. تفسيرابو السعود ٨. تفسير روح المعانى ٩. تفسير المظهرى للبانى بتى ١٠. تفسير مراح لبيد ١١.تفسير المراغى ١٢. الكشاف ١٣. تفسير فتح البيان ١٤. تفسير روح ابيان ١٥. تفسير فتح البيان ١٦. تفسير محاسن التاويل ١٧. تفسير بغوى ١٨. تفسير بيضاوى ١٩. تفهيم القران از مولانمودودى ٢٠. احكام القران للبيهقى -

(٣) الاحاديث :

١. بخارى ٢. مسلم ٣. ابوداؤد ٤. ترمذى ٥.ابن ماجه ٦. نسائى ٧. دارمى ٨. مؤطا امامىالك ٩. طحاوى ١٠. مسند احمد ١١.دارقطنى ١٢.بلوغ المرام ١٣. حاكم ١٤.البزار ١٥. البيهقى ١٦. ابن خزيمة ١٧. ابن حبان ١٨. ابن ابى شيبه ١٩. رياض الصالحين ٢٠. طبرانى كبير ٢١. جمع الفوائر ٢٢. طبرانى الاوسط.

(الف) شروح الحديث :

١. عمدةالقارى شرح البخارى ٢. نبوى شرح مسلم ٣. نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار للشوكانى ٤. معالم السنن شرح ابوداؤد هنى بذل المجهود شرح ابوداؤد ٦. بلوغ الامانى شرح الفتح الربانى مسند احمد ٧.التعليق المصبيح شرح المشكوة المصابيح ٨. سبل السلام شرح بلوغ المرام ٩. المسوى شرح المؤطا امام مالك ١٠. الجامع الكبير .

(٤)كتب مختلفة :

١. حجة اللهه البالغة ٢. المبسوط ٣. فقه الاسلام للخطيب ٤. الاستيعاب ٥. المرأة المسلمة ٦. المرأة بين الفقه والقانون ٧. المرأة بين البيت والمجتمع ٨. ردالمختار على الدرامختار ٩. السيل الجرار المتسد فق على حدائق الازهار ١٠. منهاج العابدين ١١. مفتاح الخطابية عن الحاكم ١٢. نورااليقين فى سيرة سيد المر سلين ١٣. المعقاد حقائق الاسلام ١٤. الجواب الكافى ١٥. الزواج الوطلاق ١٦. الملل والنحل للشهر ستانى ١٧. وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفى ١٨. بداية المجتهد ١٩. دار المختار ٢٠. نفيسى ٢١. الجوزجانى ٢٢. اسلام اور جنسيات ٢٣. نظام حقوف زن دراسلام ازمرتضى مظهرى ٢٤. دائرة المعارف ٢٥. بجله المنار ٢٦. زمزم ٢٧. دوزنام جنك كراجى ٢٨. روزنام دعوت هلى ٢٩. مابنامه رضوان -

গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তার প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার কালেমা তাইয়েবা, ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা, মহাসত্যের সন্ধানে, বিজ্ঞান ও জীবন বিধান, বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব, আজকের চিন্তাধারা, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, সুন্নাত ও বিদয়াত, ইসলামের অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন, সুদমুক্ত অর্থনীতি, ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, কমিউনিজম ও ইসলাম, নারী, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ, আল-কুরআনের আলোকে শিরক ও তওহীদ আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত, আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, ইসলাম ও মানবাধিকার, ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম, ইসলামে জিহাদ, হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড), ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তার কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদুদী (রহ)-এর বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড) ও ইসলামে হালাল হারামের বিধান, মুহাম্মদ কুতুবের বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত এবং ইমাম আবু বকর আল-জাসসাসের ঐতিহাসিক তাফসীর আহকামুল কুরআন। তার অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত আল কুরআনে অর্থনীতি এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তারই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তার রচিত স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন নামক দুটি গ্রন্থ।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ)১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্ট সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার
এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

(ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)